দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে
পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষক

প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুজিত কুমার মণ্ডল

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

"দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"

Submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Sujit Kumar Mandal, Associate Professor, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, Kolkata -700032 and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Supervisor: Sujit Kumar Mandal 29/09/2023

Candidate: Priyanka Biswas.

Dated:

Dated: 29'09'2023

Associate Professor
DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032

কৃতজ্ঞতা

আমার গবেষণা কর্মটি শুরু হয়েছিল এক যশস্বী অধ্যাপক ড. স্যমন্তক দাস মহাশয়ের হাত ধরে। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিশীল, ক্ষুরধার বিশ্লেষণের তত্ত্বাবধানে আশ্রয় পেয়ে সারাজীবন কৃতার্থ থাকব। আমার গবেষণার স্বপ্ন ও সংকল্পটিকে বিগত কয়েক বছর ধরে পরম স্নেহে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথাসম্ভব সাহায্য করেছিলেন এই মানুষটি। ব্যক্তিগত জীবনের অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেও মাথার উপর রেখেছিলেন অভয়, আস্থা ও সান্ত্বনার হাত। গবেষণার প্রায় শেষ পর্বে এসে তাঁর আকস্মিক চলে যাওয়া দিশেহারা ও বিহ্বল করে তুলেছিল। ঠিক সেই সময় আমার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ড. সুজিত কুমার মণ্ডল মহাশয় তাঁর সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব শীঘ্রই গবেষণা কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে পুনরায় চালিত করে সন্দর্ভের অসমাপ্ত অংশটিকে সমাপ্ত করার কাজে প্রতি মুহূর্তে সহযোগিতা করেছেন। এই দুইজন মানুষকেই আমার নতশির কৃতজ্ঞতা।

কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগীয় সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে। আরেকজন ভরসার স্থল ছিলেন বাংলা বিভাগীয় অধ্যাপক ড. আব্দুল কাফি। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়া এই গবেষণাপত্র নির্মাণের কাজে যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও সকলকে ধন্যবাদ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের গ্রন্থাগারিক নিতাইদা ও সুদীপদাকে ধন্যবাদ অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য। বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক আইভিদি ও হরিশদাকে তাঁদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

আমার গবেষণাকর্মের অন্যতম সহযোগিতা পেয়েছি কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী থেকে। এই লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক শ্রীসন্দীপ দত্ত মহাশয়ের উদার সহযোগিতা আমার কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তিনিও আজ পরলোকগত। তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সল্টলেক নাট্যশোধ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

গাজন শিল্পী লক্ষিন্দর পণ্ডিত ও অশ্বিনী কুমার নাইয়াকে জানাই বিশেষ ধন্যবাদ। এনাদের উদার মানসিকতা ও অকৃপণ সহযোগিতার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আরও অগণিত গাজন শিল্পীবৃন্দ, দলমালিক, তত্ত্বাবধায়কসহ নানান কর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। তাদের সাহায্য ছাড়া এ কাজ অসম্ভব ছিল।

ধন্যবাদ জানাই আমার জীবনসঙ্গী ড. সত্যজিৎ হালদারকে। দীর্ঘ গবেষণা কর্মের পথ চলায় প্রতি মুহূর্তে যার সহযোগিতা আমায় এগিয়ে নিয়ে গেছে। প্রণাম জানাই আমার মা ও বাবাকে। যাদের আশীর্বাদ, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আমার অন্যতম সম্বল। প্রণাম জানাই আমার শ্বশ্রূপিতা ড. পরিমলেন্দু

হালদারকে যার উৎসাহ ও পরামর্শে গবেষণা কর্মটি এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ভালোবাসা জানাই আমার ক্ষুদ্র কন্যাটিকে। তাঁর অনেক সহযোগিতা ও ত্যাগ জড়িয়ে আছে আমার কাজের মধ্যে। ধন্যবাদ আমার সহোদর ডাঃ প্রত্যূষ বিশ্বাস ও ভাতৃবধূ পৃথা বিশ্বাসকে। তাদের ভালোবাসা ও উৎসাহ আমার এগিয়ে চলার পাথেয়। প্রণাম জানাই আমার শ্বশ্রূমাতাকে। ভালোবাসা জানাই পরিবারের ছোট সদস্য প্রত্যয়, প্রসিদ্ধা ও অদিতিকে। পরিবারের বাকি অন্যান্য সদস্যদের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। যাঁদের শুভকামনা ও আশীর্বাদ আমার চলার পথের সঙ্গী ছিল। তাদেরকেও ধন্যবাদ।

এছাড়া বিভিন্ন ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ও পাশে থেকেছে যারা, রাজীব আহমেদ দাদা, বিশ্বজিৎ হালদার দাদা, পীযুষ হালদার দাদা, অনির্বাণ সেনগুপ্ত দাদা, প্রসেনজিৎ মিত্র দাদা, সুকৃতি কুণ্ডু, তীর্থঙ্কর মণ্ডল, সায়ন ভট্টাচার্য, পাভেল স্তালিন বর্মন, অমিত কুমার নন্দী, পৌলমী রায়, লিপিকা বিশ্বাস, উত্তম রায়, রবিউল ইসলাম, বিশ্বজিৎ সরদার, অর্ণব বিশ্বাস, অমিতাভদা ও বাপিদাকে ধন্যবাদ।

বিভাগীয় নমিতাদি ও গোবিন্দদাকেও জানাই ধন্যবাদ।

সর্বোপরি স্বীকার করি যে বিগত কয়েক বছরে ব্যক্তিগত ও নানান প্রতিকুল পরিস্থিতির সাথে অতিমারীর পরিবেষ্টনীতে থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা সন্দর্ভটি নির্মাণ করেছি। তবুও যদি কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি ও অন্যান্য ভুল-ত্রুটি থেকে যায় সেজন্য অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা- ৭০০০৩২

প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সূচিপত্র

ভূমিকা **১-২৫**

প্রথম অধ্যায় **২৬-৫৪**

ক্ষেত্রসমীক্ষা: প্রতিবেদন ও সমীক্ষকের অভিজ্ঞতা

১.১ ক্ষেত্রসমীক্ষা: প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি

১.২ প্রাকপ্রস্তুতি, প্রশ্নপত্র ও এলাকা নির্বাচন

১.৩ সমীক্ষার প্রতিবেদন ও প্রাপ্ত পাঠ্য

১.৪ সমীক্ষকের অভিজ্ঞতা

দ্বিতীয় অধ্যায় **৫৫-১০২**

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিবগাজন ও ধর্মগাজন উৎসব: প্রাথমিক পরিচিতি ও সামাজিক তাৎপর্য

২.১ শিব-পার্বতী ও গাজন উৎসব

২.২ গাজন, চড়ক ও সঙ

২.৩ গাজন উৎসবের রীতিনীতি

২.৪ শিবগাজন ও ধর্মগাজন

২.৫ গাজন উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য

তৃতীয় অধ্যায় **১০৩-১৯৫**

বাংলা লোকনাট্য ও গাজনপালা: বিষয়-বৈচিত্র্য ও কালান্তর

৩.১ বাংলা লোকনাট্য ও গাজন

৩.২ গাজনপালা'র বিষয় বৈচিত্র্য

৩.৩ বিষয়ানুগ বিভাজন

৩.৪ জনসচেতনতা ও লোকশিক্ষার উপাদান

৩.৫ গাজনপালা'র বিষয় বিবর্তন

চতুর্থ অধ্যায়: **১৯৬-২৪৪**

গাজন লোকনাট্য: আঙ্গিক ও অভিনয় পাঠ্য হিসেবে বিশ্লেষণ

৪.১ গাজনপালাভিনয়ের আঙ্গিক

৪.২ গাজনের সময় ও আসর

৪.৩ বাদ্যযন্ত্র, যন্ত্রানুসঙ্গ ও আলো
৪.৪ অভিনেতা ও দর্শক
৪.৫ আঙ্গিক ও আহার্য অভিনয়ের ধরন
৪.৬ গাজন অভিনয়ের আঙ্গিকগত বিশেষত্ব

পঞ্চম অধ্যায়: **২৪৫-৩০৭**
গাজন উৎসব ও পালাভিনয়: সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সাম্প্রতিক অবস্থা
৫.১ নিম্নবর্ণ ও বর্গের সংস্কৃতি ও গাজন
৫.২ গাজন কৃত্যানুষ্ঠান থেকে মনোরঞ্জক পালাভিনয়
৫.৩ গাজন পালাভিনয় ও লোকশিক্ষা
৫.৪ গাজনের বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তনঃ সময়ের দলিল
৫.৫ লোকনাট্য গাজনের ভবিষ্যৎ

উপসংহার **৩০৮-৩১৩**

পরিশিষ্ট-১: সমীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র **৩১৪-৩৩৬**

পরিশিষ্ট-২: সমীক্ষায় প্রাপ্ত সাহিত্যিক পাঠ্য **৩৩৭-৩৫১**

পরিশিষ্ট-৩: সমীক্ষায় প্রাপ্ত আলোকচিত্র **৩৫২-৩৭১**

গ্রন্থপঞ্জি **৩৭২-৩৮৯**

ভূমিকা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার গাজন উৎসবের জনপদ

ভূতাত্ত্বিক গবেষকরা মনে করেন চব্বিশ পরগনার মৃত্তিকার বয়স প্রায় তিন হাজার বছর এবং এখানকার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি আদিম ঐতিহাসিক যুগ থেকে আদি মধ্যযুগীয় সময়কালের মধ্যে আবর্তিত হয়েছিল। পুরাণেও এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—*রামায়ণে* এই অঞ্চলকে 'পাতাল বা রসাতল' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর সঙ্গমে এসেছিলেন। '*পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী*-'তে এখানকার মসলিন কাপড় ও মূল্যবান দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানির উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সূতিবস্ত্রের কারণে এখানকার উল্লেখ পাওয়া গেছে। রোমান কবি ভার্জিল তাঁর কবিতায় গঙ্গারিডি জাতির প্রশংসা করেছেন। টলেমির ভূগোলে চব্বিশ পরগনার বন্দর 'গঙ্গে', 'আগ্‌গা', 'তিলোগ্রাম্মাম' এর উল্লেখ রয়েছে। ডিওডোরাস ও মেগাস্থিনিসের বর্ণনাতেও গঙ্গারিডি সভ্যতার উল্লেখ পাওয়া গেছে।[১]

বর্তমান গবেষণার নির্বাচিত অঞ্চল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল এবং তার বর্তমান ভৌগোলিক এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—১৭৫৭ সালের ৩রা জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধের আগেই মীরজাফরের সাথে ইংরেজদের সন্ধি হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হওয়ার পর অল্প কিছুদিনের জন্য বাংলার নবাব হিসেবে মীরজাফর খাঁকে ঘোষণা করা হয়। আসলে ইংরেজরাই ছিল প্রকৃত শাসক। পরবর্তীকালে সেই ক্ষমতা নিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। মীরজাফর তার শাসনকালীন সময়ে যে চব্বিশটি মহাল বা পরগনা জমিদারি স্বরূপ প্রদান করেছিলেন তা থেকেই পরবর্তীকালে ২৪ পরগনার উৎপত্তি হয়েছে।

১৭৫৭ সালের ১৫ই জুলাই, পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ আর নবাবদের মধ্যে সন্ধি হয়েছিল। যার ৯নং ধারার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কলকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত ভূ-ভাগকে ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারি ভুক্ত করা হয়েছিল।[২] ১৭৫৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর ইংরেজ ও নবাবদের সন্ধিকে সমর্থন করে নবাবের পরওয়ানা বের হল, তাতে ২৫টি মহলের উল্লেখ করা হয়েছিল। যথা—খাসপুর / মাগুরা / এক্তিয়ারপুর / মেদনমল্ল / বারিদ হাটি / ঘুর (অংশ) / খাড়ি / দক্ষিণ সাগর / কলকাতা (অংশ) / মানপুর (অংশ) / আমিরাবাদ (অংশ) / আজিমাবাদ / মুড়াগাছা / শাহপুর / পেচাকুলি / শাহ নগর (অংশ) / মহম্মদপুর / মেলাং মহল / হাতিঘর / আকবরপুর (অংশ) / বেলিয়া (অংশ) / বাসুন্দি (অংশ) এবং পাইকান পরগনার অংশ।[৩] ১৭৫৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর চব্বিশ পরগনা জেলার জন্ম হয়।[৪] ১৭৫৯ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে মীরজাফর খাঁ লর্ড ক্লাইভকে এক পরওয়ানা দ্বারা চব্বিশ পরগনার জায়গীর প্রদান করেন। ১৭৬৫ খ্রী. অব্দ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চব্বিশ পরগনার শুধুমাত্র জমিদার নয়, তার শাসকরূপও অধিগ্রহণ করে।[৫] ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চব্বিশ পরগনায় দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব আদালতও স্থাপিত হয়। সেই সাথে বর্ধমান থেকে কয়েকটি

সম্পত্তিও এর রাজস্ব বিভাগের অধীনে আসে। তারপর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান চব্বিশ পরগনা জেলা গঠিত হয়।[৬] এই জেলার আয়তন ১৩২১২ বর্গ কিমি। এই জেলার পূর্বদিকে রায়মঙ্গল নদী ও বাংলাদেশ, পশ্চিমদিকে ভাগীরথী ও হুগলী নদীসহ মেদিনীপুর জেলা, উত্তরদিকে নদীয়া এবং দক্ষিণদিকে ঘন অরণ্যে আবৃত সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।[৭] এর সদর ছিল বারাকপুর এবং মহকুমা ছিল ডায়মণ্ডহারবার। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এই জেলায় ছিল ৫টি মহকুমা ৩৯টি থানা। স্বাধীনতার পরে হয় ৬টি মহকুমা ও ৪২টি থানা।[৮] ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৪ পরগনা জেলার শাসনকার্য কলকাতার সঙ্গে একই সাথে হত।[৯] ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেওয়া হয় ২৪ পরগনা থেকে।[১০] ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা হিসেবে স্বাতন্ত্র্যতা প্রতিষ্ঠা করার পর আরও প্রশাসনিক সুবিধার্থে ৫টি মহকুমা (আলিপুর সদর, ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং, বারুইপুর, কাকদ্বীপ) এবং ২৯টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি ব্লক সুন্দরবন অধীনস্থ যথা—সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর ১ ও ২ নং, জয়নগর ১ ও ২ নং, ক্যানিং ১ ও ২ নং, কুলতলি, বাসন্তী ও গোসাবা। আসলে পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চলের বেশির ভাগটাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত। কাকদ্বীপ থানার ১ নং লাট থেকে সাগরদ্বীপের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২৮ মাইল হল এর পশ্চিমসীমা।

সুন্দরবনাঞ্চলের বাইরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্য ব্লক হল—বজবজ ১ ও ২ নং, মহেশতলা, ভাঙড় ১ ও ২ নং, সোনারপুর, বারুইপুর, ফলতা, মগরাহাট ১ ও ২ নং, বিষ্ণুপুর ১ ও ২ নং, মন্দিরবাজার, কুলপী, ডায়মণ্ডহারবার ১ ও ২ নং।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশে নদ-নদী সমুদ্রের পলি সঞ্চয়ের ফলে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ গড়ে উঠেছে যা নিয়ে সুন্দরবনাঞ্চল গঠিত হয়েছে। এই সুন্দরবনাঞ্চলটির মধ্যে গোসাবা, কুলতলি, বাসন্তী, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, গঙ্গাসাগর, হাড়োয়া, মিনাখা—এই ১৫টি থানার মোট ১৯টি উন্নয়নশীল ব্লক নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা রয়েছে। যেগুলি ১,০৯৩টি মৌজায় বিভক্ত। এর মধ্যে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে রয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা। সুন্দরবনাঞ্চলের অন্তর্গত সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘী, জয়নগর, কুলতলি, বাসন্তী ও গোসাবা নিয়ে মোট ১১টি থানা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা। হান্টরের বর্ণনানুযায়ী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাটি গঠিত হয়েছে—ভাগীরথী, বিদ্যাধরী, ইছামতী, কালিন্দী, পিয়ালি, রায়মঙ্গল, বেতনা, সোনাই প্রভৃতি নদীগুলির পলিমাটি দিয়ে।[১১]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণে সুন্দরবনাঞ্চল অবস্থিত হওয়ায় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়, নদীবহুল এলাকার নদ-নদীর জলোচ্ছ্বাস, নদীর মজে যাওয়া, শ্বাপদ সঙ্কুলতা, নদীর অনবরত গতি পরিবর্তন, বিপদসঙ্কুল পরিবেশ, ভূমিকম্প—এ সব ছিল এখানে জনবসতি গড়ে ওঠার অন্তরায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ঠিক কবে যে জনবসতি শুরু হয়েছিল তার কোন সঠিক তথ্য প্রমাণ ও ইতিহাস না মেলায় জানা যায় না। পুরাণ, ইতিহাস, বৈদিক সাহিত্য ও এদেশে আগত বেশ কিছু

পর্যটকের দেওয়া বিবরণ থেকে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পাওয়া বেশ কিছু প্রত্নতত্ত্ব ও এখানকার মানুষের ভাষা—প্রভৃতি থেকে এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় দীর্ঘদিন ধরে অষ্ট্রিক জাতির মানুষ বসবাস করে আসছে। পরে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হলে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে তাদের ঠাঁই হয় নীচের স্তরে। এ জেলার ভূমি সন্তান হিসেবে যেমন আছেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখরা তেমনি রয়েছেন পৌণ্ড্র, ক্ষত্রিয়, হাড়ি, ডোম, বাগদী, চণ্ডাল, তিয়র, রাজবংশী, কৈবর্ত প্রভৃতি তথাকথিত শূদ্ররা। এছাড়া অষ্ট্রিক বা আদিম মানবজাতির কিছু বংশধর ছিল আর ছিল মূলত গঙ্গারিডি জাতি। এই জাতিই হল এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী। এদের মূল অংশ 'পুণ্ড্রবর্ধনীয়'রা প্রাচীন পৌণ্ড্রদেশ থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষত্রিয় জাতি। তপসিলভুক্ত জাতির মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের পরিমাণই সর্বাধিক। যারা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্যপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পিছিয়ে গিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকূলে শ্বাপদ সংকুলিত অরণ্যভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং ক্রমশ একটি বসতিপূর্ণ রাজ্য গড়ে তোলে যা বর্তমানে এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বলা যেতে পারে। মূলত গঙ্গারিডির পুণ্ড্রবর্ধনীয়েরা এবং তার সাথে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সমন্বয়েই এই বসতি গড়ে উঠেছিল বলা যায়। যদিও অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতিরা ঠিক কবে এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল তার সঠিক কোনো তথ্য ও প্রমাণ নেই। তবে অনুমান করা যায় যে, যখন থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বা নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার ভূমি গঠন ও তা বসবাসের উপযোগী হয়েছে, তখন থেকে এদেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির মানুষের আগমন ঘটেছে।[১২] আসলে যে সমস্ত মানুষেরা এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ছিলেন পাশ্ববর্তী অঞ্চলের তপসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ। বর্তমানেও এই অঞ্চলের প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ এই শ্রেণিভুক্ত।[১৩] পুণ্ড্রজাতির সাথে সুন্দরবন সভ্যতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বলির পাঁচপুত্রের পাঁচটি কৌমরাজ্য ছিল। যথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুম্ভ ও পুন্ড্র। এদের মধ্যে পুণ্ড্র কোমের বংশধররা হলেন এখনকার পোদ জাতি। যার অস্তিত্ব দক্ষিণবঙ্গে যথেষ্ট।[১৪] ১০০০-৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাদের মধ্যে সংকলিত '*ঐতরেয় ব্রাহ্মণে*'-র শুনশেপ উপাখ্যানে পুণ্ড্রদের দস্যুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজে এরা ছিল পুলিন্দ, শবর ও অন্ধ্রজাতির মতোই।

১২৮০ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত *বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার'* প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুণ্ড্রদেশ ও জাতিপ্রসঙ্গে বলেছেন—"আগে পুণ্ড্র, পরে বঙ্গ।"[১৫]

> "এদের (পুঁড়া বা পোদ) আদিমতা সম্পর্কে মনুর শেষোদ্ধৃত বচন থেকে জানা যায় যে, তখন এদেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই বা আর্যজাতি আইসে নাই। সমুদ্রতীর হইতে পদ্মা পর্যন্ত এদেশে এক্ষণে বহু সংখ্যক পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পুঁড়া শব্দটি পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ বোধহয়, পোদ শব্দও তাহাই বোধহয়। তবে এই পুঁড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে সেই পৌণ্ড্র দিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরানী, কাকেশীয় নহে। তবে কাকশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক তদনুরূপ হইয়াছে। জাতিবিদ পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষের আদিমবাসীরা সকলেই তুরানীয় ছিল, আর্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক বন্য ও পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়া

বাস করিতেছে। আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতকগুলি জাতিদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রহিল। আধুনিক অনেক অপবিত্র হিন্দুজাতি তাহাদিগেরই অংশ। পুঁড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বোধহয়”।[১৬]

এছাড়াও এই অঞ্চলে বাস করেন কাওড়া, বাগদি, নমঃশূদ্র, ধোবি, রাজবংশী, কৈবর্ত, মাহিষ্য প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছেন বেশ কিছু মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ। পূর্ববঙ্গের যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ জেলা থেকে নমঃশূদ্ররা এসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। জঙ্গল হাসিলের কারণে এখানে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও ভূমিজদের আগমন ঘটেছিল। এরাই প্রথম গোষ্ঠীবদ্ধভাবে আধুনিক বসতি স্থাপন করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাঁওতালদের পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশ এসেছিল রাঁচি, বীরভূম, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগনা এবং পুরুলিয়া থেকে। এছাড়া, উপনিবিষ্ট হয়েছেন মেদিনীপুর ও কিছু বাংলা ঘেঁষা ওড়িশার অধিবাসীগণ। বিশেষ করে কাকদ্বীপ, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, সাগর প্রভৃতি অঞ্চলে এদের অবস্থান।[১৭] তবে পেশাগত দিক থেকে প্রায় সকলেই কৃষিজীবী।

স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবী

নীহাররঞ্জন রায় তার ‘*বাঙালি ইতিহাস আদিপর্ব*-গ্রন্থে বলেছেন—

“সত্যিই আমরা সাধারণত যে ইতিহাস পড়ি, তাও পূর্ণাঙ্গ নয়, সেগুলি দেশের জনসংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিলাস-বৈভব ইত্যাদির বিবরণ মাত্র। অতীতকালে সাধারণ লোকও ছিলেন, তাঁদের সমাজ আনন্দ-উৎসব, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম ইত্যাদি সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় সবই ছিল, তাঁরাই ছিলেন সংখ্যায় অধিক। কোন দেশের সংখ্যা গুরুদের বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হতে পারে না।”[১৮]

আর এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষগুলোর জীবনে যুগ ও সময়ের সাথে সাথে যতই পরিবর্তন আসুক বদল ঘটেনি তাদের সংস্কার-সংস্কৃতিতে। যে সংস্কারের সাথে আজন্মকাল ধরে মিশে আছে লৌকিক দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, যা বর্তমানকালেও বহমান। এই সাধারণ মানুষগুলো তাদের সাদামাটা জীবনের আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ, আহার-বসন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-অপসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে তাদের কৃষিজীবনের সাথে সাথে উৎপাদন তথা প্রজনন ও যাদুশক্তির প্রতি বিশ্বাস—এসব কিছুকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছে এই গ্রাম্য লোকদেবতাদের। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর *‘হিন্দুদের দেব-দেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ(প্রথম পর্ব)’* গ্রন্থে বলেছেন ভারতীয় ধর্মচর্যার বিবর্তন ধারার মতো ভারতীয় দেবতাদেরও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে। তিনি বলেন—

“বেদ থেকে উপনিষদ- উপনিষদ থেকে পুরাণ- পুরাণ থেকে লৌকিক রীতিতে একই দেবচরিত্রের কত পরিবর্তন কত রূপান্তর ঘটেছে তার বিবরন যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেমনি চমকপ্রদ। এককালে

প্রধান দেবতা পরবর্তীকালে হয়েছেন অপ্রধান। কত দেবতার ঘটেছে বিলুপ্তি; আবার কত কত নতুন দেবতার হয়েছে আবির্ভাব। একদা প্রধান্যহীন দেবতার হয়েছে উচ্চতর মহিমায় অধিষ্ঠান, আবার কোন কোন মহাপ্রতাপশালী দেবতা গৌরব হারিয়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছেন। আর্যেতর সংস্কৃতি থেকে কত দেবতা এসেছেন হিন্দুদেবসভায়, কত দেবতা এসেছেন পুরানতন্ত্র এমন কি বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক হিন্দু দেবতার মিছিলে।"[১৯]

লৌকিক দেবতাদের হাত ধরেই তাদের সংস্কারে এসেছে টোটেম। পরবর্তীকালে তারাই হয়েছে দেবতাদের বাহন। তাদের অস্তিত্ব আজও বর্তমান। এই দেবতাদের উৎপত্তির মূলে রয়েছে আদিম মানুষের কামনা-বাসনা ও আত্মরক্ষার মূলত ৩টি অভিপ্রায়। যথা—

(ক) দেহরক্ষার জন্য আহার,

(খ) নিরাপদে থাকার জন্য রোগ ও বিপদ থেকে মুক্তি লাভ এবং

(গ) বংশরক্ষার জন্য সন্তান লাভ।[২০]

এক এক সময় ও পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী এক একটি লৌকিক দেবতাদের উৎপত্তি হয়েছে তাদের জীবনে। যেমন—আদিস্তরে বন্য যাযাবর শিকারজীবী মানুষদের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজন ছিল বৃক্ষ, পশুপাখি, শিকার, জল, অগ্নি প্রকৃতির দেব-দেবী। পরবর্তীকালে কৃষিজীবী মানুষের জীবনে এসেছে গৃহদেবতা, শস্য, বৃষ্টিকেন্দ্রিক দেব-দেবী। তবে লৌকিক দেবতাদের উল্লেখ শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং অনেকেই এদেরকে মানবরূপী দেবতা বলে বিশ্বাস করায় অনেক গবেষকগণ মনে করেন আদিম সমাজের গাছ, পাথর, নদী, পাহাড়, সূর্য, শস্য, পশু প্রভৃতি বিমূর্ত পূজার ধারাটি যখন মূর্তি পূজায় রূপান্তরিত হয়েছিল তখন স্থানীয় সমসাময়িক কোন প্রভাবশালী বা শ্রদ্ধেয় মানুষেরই অবয়ব এবং নামগ্রহণ করে লৌকিক দেবতার মূর্তি গঠন ও নামকরণ করা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, এই লৌকিক দেবতাদের উদ্ভব কবে কিভাবে কোথায় হয়েছিল? এই লৌকিক দেব-দেবীর উদ্ভবকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালেই বাংলাদেশে এদের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং প্রতিষ্ঠা পায় বলে গবেষকগণ মনে করেন। এই দিক থেকে অনুমান করা যায়, যে এঁদের আবির্ভাব কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এই সময়ের মধ্যে।[২১] ত্রয়োদশ শতাব্দী অর্থাৎ ১২০২ বা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে তুর্কি বিজয় ঘটে।[২২] এইসময় ছিল সেন বংশের রাজত্বকাল। সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে এক ও অদ্বিতীয় ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কৃতি। যা ছিল মূলতঃ সমাজের ব্রাহ্মণ শ্রেণিরই হস্তগত। নিম্ন বর্ণ হিন্দু শ্রেণির থেকে অনেক দূরে কেবলমাত্র গণ্যমান্য অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা অস্পৃশ্যতা, নিপীড়ন ও অত্যাচারের বোঝা থেকে কিছুটা স্বস্তির সন্ধান পায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতি বা অব্রাহ্মণ্য অন্য লৌকিক ধর্মসংস্কৃতিকে অবলম্বন করে। এদের সহজ সাধনায় তারা শান্তির বার্তা খুঁজে পায় তাই তারা দলে দলে সেই পথ অবলম্বন করে। সমাজে দেখা দেয় এক বিশাল আলোড়ন

কারণ সমাজের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকা এই অশিক্ষিত নিম্নবর্গীয় হিন্দু শ্রেণির ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামি, অতিচার, ছুঁৎমার্গ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে সমাজের অভিজাত ব্রাহ্মণ্য শ্রেণি একদিকে যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে অন্যদিকে তেমনি সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়। ধর্মকে কেন্দ্র করে সমাজের এই পরিস্থিতিতে আরেকটি অভিশাপ হল তুর্কি আক্রমণ ও পরাজয়। যার ফল কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের সমস্ত স্তরে—রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, সমাজনীতি থেকে ধর্মনীতি প্রতিটা ক্ষেত্রে বাঙ্গালির এই পরাভব বুঝিয়ে দিয়েছিল উচ্চ-নীচ শ্রেণি নির্বিশেষে আত্মরক্ষা ও আত্মগঠনের প্রয়োজনীয়তা কতটা। ফলে তারা আর্য-অনার্য, উচ্চ-নীচ, অভিজাত-অনভিজাত সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যেই একাত্মতার প্রয়োজন বুঝেছিল আর তাকে বাস্তবায়িত করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তারা অবলম্বন করেছিল দেব-দেবীকে।

তুর্কি আক্রমণের প্রায় দেড়শো বছর পর বাংলাদেশে সমাজ পুনর্গঠনের গণশক্তিমূলক সংগঠন শুরু হয়।[২৩] ইতিমধ্যে সমাজে কিছুটা স্থিতাবস্থা ফিরে আসে ইলিয়াস শাহী ও হোসেনশাহী বংশের সুশাসনের ফলে। বাংলাদেশের সর্বত্রই মোটামুটি কিছুটা শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করছে এমন সময় বর্ণ হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ নিজেদের অক্ষমতা ও তাদের সমাজের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে কোনোভাবেই যাতে প্রকাশ না পায় সেই উদ্দেশ্যে এতদিন সে সব নিম্ন শ্রেণির অনভিজাত মানুষগুলিকে অস্পৃশ্যতার নিরিখে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তাদের সাথেই মিলিত হয়। আসলে তারা এটা বুঝেছিল যে, নিজেদের আত্মরক্ষা করতে গেলে এই বিশাল অংশ নিম্নবর্গকে দূরে সরিয়ে রাখা চলবে না তাই তারা মিলনের হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের দিকে। ফলস্বরূপ অন্যদিকে এতদিন ধরে অত্যাচারিত, নিপীড়িত এই নিম্নবর্গীয় মানুষগুলিও নিজেদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে আশার আলো দেখতে পেয়ে তারাও হাত বাড়িয়ে দেয়। ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য এতদিনের চরম ভেদাভেদ মুছে গিয়ে মিলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে আর্য-অনার্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, লোকজীবনের সাধনা সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ, লোক সমাজে পূজিত অপৌরাণিক দেব-দেবীর আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূতকরণ প্রভৃতি। ফলে গ্রাম্য যে সকল দেব-দেবী, যারা এতদিন কেবলমাত্র সমাজের নিম্নবর্গীয় শ্রেণির দ্বারাই পূজিত হত তারা উচ্চশ্রেণির সহযোগিতায় সমাজের সর্বস্তরে স্থান পায়। এরা লৌকিক দেব-দেবী। এঁরা মূলতঃ আর্যতর ও অনার্য পরিকল্পনা থেকে উদ্ভুত। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সর্বত্রই এঁরা বিরাজমান যেমন— মাকাল ঠাকুর, পাঁচু ঠাকুর, বনবিবি, আটেশ্বর, কালুরায়, মুণ্ডমূর্তি, ওলাইচণ্ডী, নারায়নী, হাড়িঝি, সাত-বোন, পীর গোরাচাঁদ, রংকিনী, করম রাজা, দক্ষিণরায়, মানিকপীর, ক্ষেত্রপাল, ঘাটুদেবতা, ধর্মঠাকুর, সত্যপীর প্রভৃতি। এদের মধ্যে প্রধান মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি। এই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবী বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, পথের পাশে, বড় বড় গাছতলায়, নদী বা পুকুরধারে, চালাঘরের কোথাও আদরে কোথাও অনাদরে ছড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি বিজয়ের পরবর্তীকালে লৌকিক দেব-দেবীর যথেষ্ট প্রকাশ ও প্রচার হলেও এরা আসলে বাংলার লোকসমাজে আদিবাসী গোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত হয়ে আসছিল বহুকাল থেকে। আর্যরা

এদেশে আসার আগে আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে এইসব দেব-দেবী সম্পর্কে বেশ কিছু ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, বিশ্বাস ছিল। পরে অন্য ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের এই ধারণায় পূজা-পদ্ধতি ও বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে এই সাথে সেগুলির রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে তবে এই পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে ঘটেনি কিংবা বলা যায় আভ্যন্তরীণ কাঠামোটি একই রয়ে গেছে। আসলে এই পরিবর্তন ঘটেছিল প্রাচীন পৌরাণিকযুগ পর্যন্ত। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেছেন যে আর্যরা এদেশে আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মসংস্কৃতি বজায় ছিল। সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটেছে জৈন ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠা পায় আনুমানিক চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে। তখন বাংলায় গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল এবং এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছিল মূলত জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক।[২৪] বাংলার আদি ধর্ম ছিল মূলতঃ অবৈদিক যদিও তার সম্পর্কে যথার্থ সন্ধান করা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয়। যুগ যুগ ধরে নানা পরিবর্তনের ফলে জীবধারায় যেমন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তেমনই পরিবর্তন ঘটেছে ধর্মব্যবস্থাতেও। তবে কিছু কিছু লৌকিক আচার, মেয়েলি ব্রত, লৌকিক দেব-দেবীর পূজার মধ্য দিয়ে তার স্বাতন্ত্র্য রূপটি হলেও আজও টিকিয়ে রেখেছে অর্থাৎ এগুলির মধ্যে দিয়েই বাংলাদেশে তার কিছুটা ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

তবে একথা বলা যায় যে আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার বহির্ভূত আদিম জনসমাজে লৌকিক ধর্মসংস্কারের আদিরূপটি বজায় ছিল। আজও বাংলার নানা অঞ্চলে নানা পরিবর্তনের পরেও আদিম লোকসংস্কৃতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেই বেশ কিছু লৌকিক দেব-দেবীর সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের পূজা-পদ্ধতি, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, লোকাচার, বেশ ব্যাপকভাবেই টিকে আছে আর বাংলার গ্রাম-গঞ্জ, আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বংশ পরম্পরায় সরল বিশ্বাসে এই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবী পূজিত হয়ে আসছেন। গ্রামের কোথাও গাছতলাতেই এইসব লোক দেব-দেবীর আশ্রয়স্থল হয় আবার কোথাও কোথাও আটচালা বা মন্দিরও নির্মিত হয়। পশুবলি থেকে নাচ-গান সবই এর পুজোৎসবের অঙ্গ। মূলত আর্যতর গোষ্ঠীই এই পূজা-পার্বণ করেন। সংস্কৃত মন্ত্র বর্জিত এই পূজায় সাধারণত মৌখিক চলতি ভাষাতেই ছড়া, গান এসবের মাধ্যমে পূজা নিবেদন করা হয়। আদিম অস্ট্রিক কোমের রীতি পালন করা হয়। কোন ব্রাহ্মণ নয়। মূলত আদিম অধিবাসীরাই এর পূজারি। এরকম আদিম কোমের রীতি-নীতি প্রচলিত দক্ষিণবঙ্গের একটি জনপ্রিয় উৎসব হল—শিব-কেন্দ্রিক গাজন উৎসব।[২৫]

লোকদেবতা শিব ও শিব মন্দির

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গাজন উৎসব পালন হয় দু'ধরনের—শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন। শিবের গাজন শিবঠাকুরকেন্দ্রিক ও ধর্মের গাজন ধর্মঠাকুরকেন্দ্রিক। পুরাণের দিকে তাকিয়ে আমাদের আদি

সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করলে পশুর নাম আসে যা অঞ্চলভেদে কেবলমাত্র পরিবর্তিত হয়। এর কারণ হল—আদিম মানুষের প্রথমাবস্থায় তার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ছিল—খাদ্য ও বস্ত্র। যেগুলি সে পেত পশুর কাছ থেকে। তাই প্রথমাবস্থায় পশুই ছিল মানুষের আরাধ্য দেবতা। এরপর ক্রমশ পশুপূজার জায়গায় এসেছে মানবাকৃতি দেবতা এবং আরাধ্য পশুটি হয়েছে ঐ দেবতার বাহন। ঠিক এইভাবেই নন্দী বা ষাঁড় পূজা ক্রমে শিবপূজায় রূপান্তরিত হয়েছে আর ষাঁড় হয়েছে শিবের বাহন।[২৬]

প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রতিভূ পুরুষরূপে শিব আর্য পরিমণ্ডলে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে তিনি হয়েছেন জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তাই তার আরেক নাম দেবাদিদেব মহাদেব বা মহেশ্বর। তিনি আদি, তিনিই অনাদি। প্রাচীন বর্ণাশ্রম প্রথায় বিভক্ত ভারতবর্ষীয় সমাজে আর্য-অনার্য, ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেই তার ভক্ত। কোথাও হলধর, কোথাও মহাদেব, কোথাও শিব বা কোথাও মহেশ্বর ভিন্ন জনের ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে তিনি পূজিত হয়েছেন যুগ যুগ ধরে। মানুষের ভূমিকর্ষণের প্রাক্ পর্যায়েই শিবের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাম্র-প্রস্তর যুগের শিবের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায়।[২৭] আদিম ভারতীয় ও আর্যভারতীয়দের মধ্যে মিলন ও মৈত্রীকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষে লিঙ্গরূপী শিবের প্রচলন হয়।[২৮] শিব অনার্য জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবতা। প্রাচীন ভারতে অনার্যদের মধ্যে অবিনশ্বর আত্মার প্রতীকরূপে শিবের উপাসনা হত। সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে পাওয়া যোগীশ্বর পশুপতি মূর্তি আঁকা একটি শিলমোহর প্রমাণ করে যে প্রাচীন ভারতে শিব উপাসনার প্রচলন ছিল।[২৯] এছাড়া মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় শিবলিঙ্গের মতো পাথর পাওয়া গেছে। হরপ্পায় পোড়ামাটির মৃত্তিকা মূর্তি পাওয়া গেছে।[৩০] এগুলিও প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিলমোহরে আঁকা বৃষ ও পুরুষমূর্তি, শিলমোহরে আঁকা ত্রিদেবমূর্তি যার চারপাশে বাঘ, হাতি, গণ্ডার ও মহিষ এবং অধোভাগে হরিণ খোদাই করা, শৃঙ্গসহ মাথায় মুকুট বিশিষ্ট চারটি বন্য জন্তুর বিশিষ্ট মূর্তি, হরপ্পায় পাওয়া শ্লেট পাথরের ওপর নটরাজ মূর্তি—এগুলিকে স্যার জন মার্শাল ও বহু পণ্ডিতগণ শিবের প্রতীক বলেই মনে করেছেন।[৩১]

শিব দেবতা জ্ঞানে পূজিত হন ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশেও। যেমন—সোক্যা কন্নোন নামে জাপানে, কুয়াম মিন নামে চীনে, তিনমাথাওয়ালা কুঠারধারী শিব স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় পূজিত হন। এছাড়াও ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে জড়িত এমন শিবের পূজার প্রচলনও রয়েছে—বোর্ণিও, চম্পা, সুমাত্রা, জাভা, সুমের, মিশর, ক্রিট, মালদ্বীপ প্রভৃতি নানা দেশে। বাংলায় শিবপূজার যে ধারাগুলি রয়েছে তা হল—

(১) প্রাক আর্যস্তরের শিব,

(২) বৈদিক যুগের রুদ্র শিব,

(৩) পৌরাণিক যুগের শিব এবং

(৪) লৌকিক বা আঞ্চলিক শিব

বাংলায় পালবংশের সাথে সাথে বৌদ্ধধর্মের দীপ নির্বাপিত হয় এবং সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শৈব ধর্মের জোয়ার আসে। এ সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন—

> "সেন বংশের পারিবারিক দেবতা বোধহয় ছিলেন সদাশিব। বিজয় সেন শিবের আবাহন করিয়েছিলেন শম্ভু নামে। বল্লাল সেন করিয়াছিলেন ধুর্জটি এবং অর্ধনারীশ্বর নামে। লক্ষ্মণ সেন এবং তার পুত্রদ্বয় লিপিতে নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন নাই।"[৩২]

শুধু সেন যুগেই নয় গুপ্ত যুগেও এই বাংলায় শিবের উপাসনা চলত, এর প্রমাণ স্বরূপ বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর থানার কাশীপুর ও সরিষাদহ গ্রাম থেকে পাওয়া সূর্য ও নৃসিংহমূর্তি, মথুরাপুর থানার ১১৪ নং লাট গোবিন্দপুর গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রমাণ করে গুপ্তযুগে শিবপূজার চলন ছিল।[৩৩] সেন রাজবংশের শৈব ধর্মের স্বীকৃতি পাওয়ার সাথে সাথে বাংলার মানুষ বৌদ্ধ ধর্মের থেকে মুক্ত হয়ে শৈব ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চায়। ইতিমধ্যে জৈনধর্ম থেকেও মানুষ বেশ অনেকটাই সরে এসেছিল। এবার বৌদ্ধধর্মও সরতে শুরু করে। এই সময় আগমন ঘটে গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাবের। সেন পরবর্তীকালে মুসলমান আমলে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের জোয়ার আসে। এই সময়েই শিবের আবির্ভাব ঘটে। ক্রমে শিবের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি সক্রিয় হতে শুরু করে। শিবের বৈদিক রূপের পাশাপাশি লৌকিক রূপটির প্রচলন আগেই ছিল। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের কাছে এই ধর্মটি প্রবেশ করায় তারা নিজেদের মতো করে শিবকে আপন করে নেয়। তাদের কাছে শিব হয়ে ওঠে ঘরের মানুষ। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—

> "তিনি (শিব) চাষাদের হাতে পড়িয়া চাষা হইলেন।"[৩৪]

ভিন্ন পুরাণে রয়েছে শিবের ভিন্ন রূপ। যথা—শিবপুরাণের '*বায়বীয় সংহিতায়*'—চন্দ্র, সূর্য থেকে শুরু করে মানুষ, রাক্ষস এমনকি পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, লতা-গুল্ম সমস্ত কিছুই সৃষ্টির উৎস শিব অঙ্গ।[৩৫] শিবপুরাণের '*জ্ঞানসংহিতায়*' শিব ধ্বংসের দেবতা তবে প্রত্যক্ষভাবে তিনি ধ্বংসের দেবতা হলেও পরোক্ষে তিনি পুরাণ সৃষ্টির কর্তা।[৩৬] কালক্রমে শিবের রূপেরও নানান পরিবর্তন ঘটেছে, যথা—শিবপুরাণের *বায়বীয় সংহিতা*'র শিব হলেন সমাধিস্থ শিব।[৩৭] *বায়ুপুরাণ* ও *ভাগবতে* শিব হলেন বীরভদ্র। যাকে একেবারেই অনার্য শিব বলা যায়। বীরভদ্র রূপের দুটি দিক—একদিকে তিনি গণদেবতার জন্ম দেন আবার অন্যদিকে দেবতার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষমতার মিলিত শক্তিকে প্রদর্শন করেন।[৩৮] *বামনপুরাণে* শিব উচ্চ সমাজের দেবতা যিনি উচ্চতর সমাজের হয়ে অনার্য জনগোষ্ঠীকে বধ করেছেন।[৩৯] *ঋকবেদ, অথর্ববেদ, যজুর্বেদ, কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এ শিবকে আর্যদের দেবতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণের মতো মঙ্গলকাব্যেও শিবকে 'পরমেশ্বর' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *অন্নদামঙ্গল কাব্যে* শিব গৃহস্থ সংসারী ভিখারি মানুষ। স্বামী ও জনকরূপী। অসততাও লক্ষ্য করা যায় তার চরিত্রে।[৪০] রামেশ্বরের *শিবায়ন* কাব্যে শিব কৃষক। বাঙালির শিবরাত্রি ব্রতে শিব আদিম শিকার নির্ভর মানুষের আরাধ্য দেবতা। এখানে শিবকে প্রস্তরখণ্ডরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪১] আসলে মানুষ যুগে যুগে

নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিবের রূপ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাই আদিম টোটেম ভাবনা দিয়ে শুরু হয়ে কালক্রমে তার নানান রূপ বদল ঘটেছে।[৪২]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ বা ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকে বাংলা সাহিত্যে যে বহুমুখী ধারা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম বিষয় ছিল শিবপ্রসঙ্গ।[৪৩] পরবর্তীকালে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে আধুনিক রচনাগুলিতে শিবভাবনার পরিচয় সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। পুরাতন বাংলা কাব্যগুলিতে শিবকে গ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবী পরিবারের কর্তা রূপে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতকে রচিত সর্বানন্দের টীকাসর্বস্ব গ্রন্থের একটি শ্লোকে রয়েছে—

> "জরদগবঃ কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি
> তং ব্রাহ্মণী প্রচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্ রুমায়াং লশুনস্য কোহঘর।"[৪৪]

(জরদগব অর্থাৎ বুড়ো ষাঁড়) এই বাক্যের মধ্যে দিয়ে শিব প্রথম বাংলা কাব্যে ভিখারি রূপে এবং তাঁর ষাঁড় নিয়ে দেখা দিয়েছেন। মধ্যযুগীয় আখ্যানগুলিতে শিব দেখা দিয়েছেন বাঙালির উপাস্য অথচ একেবারেই কৌম পরিচয়ে গ্রামবাংলার অভাবী সংসারী গৃহকর্তারূপে। যেমন—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ রায় রচিত *'শিবায়ন'* কাব্যে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামেশ্বর (ভট্টাচার্য) চক্রবর্তী রচিত *'শিবায়ন'* বা *'শিব-সংকীর্তন'* কাব্যে, কবি বিজয়গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল কাব্যেও শিবকে লোকায়ত রূপে দরিদ্র, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা, ব্যর্থ সংসারী—এ সমস্ত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৫] নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'ধর্ম ও সংস্কৃতি—প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট'-এ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বাংলা কাব্যের শিব আসলে বেদপূর্ব কৃষিজীবী অবৈদিক সমাজের দেবতা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে তার বৈদিক রুদ্র বা পৌরাণিক রূপটির সংস্কৃতকরণ ঘটে লৌকিক শিবে পরিণত হয়েছেন।[৪৬] কৃষিজীবী এই শিবকে কেন্দ্র করেই পালিত হয় শিবের গাজন উৎসব। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও যা ধরা দিয়েছে তার *'কালান্তর', 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'* প্রভৃতি রচনায়। এখানে তিনি শিব প্রসঙ্গে নানা বক্তব্য রেখেছেন। বলেছেন—

> "... একদিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা; অন্যদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।"[৪৭]

বাংলার লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্যে শিবঠাকুর আর্য-অনার্য ও উচ্চ-নীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন। লোকায়ত ছড়া থেকে পৌরাণিক সাহিত্য, প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক যুগ সর্বদাই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে রয়েছেন। বাঙালির জীবিকা-সাহিত্য-ধর্ম-সমাজ-শিল্প-সংস্কৃতি জীবনের সমস্ত কিছুতেই তাঁর অধিষ্ঠান। বাঙালির লোককথা, লোকনাট্য, লোকসংগীত সর্বত্রই তাঁর অবস্থান। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যগুলি লোকসাহিত্যের মৌখিক আকর বলা যায়। পুরানো বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক এবং তা সমাজের উচ্চশ্রেণির বিশেষত ছিল ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত সম্পত্তি কিন্তু তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী ফলস্বরূপ সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। নিম্নবর্গ বাঁচার তাগিদে এবং উচ্চবর্ণ

নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে সমাজে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের সমন্বয় ঘটে। বেশ কিছু বিষয় আদান-প্রদানও হয় তাদের মধ্যে, যার অন্যতম একটি বিষয় ছিল দেব-দেবী। যার ফলস্বরূপ তথাকথিত আর্য, অনার্য, পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ঠিক এই সময়েই মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয় এবং সংস্কৃত পুরাণের আর্য দেবতা শিব এই সময়েই অনভিজাত নিরক্ষর অনার্য কৃষিজীবী ঘরের মানুষে রূপান্তরিত হন। একদিকে নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় অন্যদিকে নিম্নবর্ণের মানুষের উপর সমাজের উপরতলার মানুষের শোষণ, পীড়ন, জমিদার, বর্গাদারের অত্যাচারের নিপীড়নের স্বীকার হয়েও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ নিম্নবর্গীয় মানুষের কৃষিই ভরসা। কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, ক্যানিং, নামখানা, কচুখালি, সন্দেশখালি কিংবা বারাসাত লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলের প্রত্যন্তরের অধিকাংশ মানুষ আজও কৃষি নির্ভর। কৃষিজমিই এদের পরিবারের বেঁচে থাকার উপায়। তাই এদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় পুরোটাই নির্ভর করে কৃষি উৎপাদনের ওপর। সেইজন্যই কৃষিজমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চব্বিশ গরগনার দেবধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ শিবকেই কৃষিদেবতারূপে অবলম্বন করেছেন। শিব একাধারে সৃষ্টি ও সংহারের দেবতা। একদিকে তিনি কৃষিকেন্দ্রিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দূর করেন ওপরদিকে হলধররূপী শিব ফসল উৎপাদনেও সহায়ক। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলির কাছে শিবের হলধর রূপটিই বেশি জনপ্রিয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রখ্যাত শিবমন্দির

সুন্দরবন অঞ্চলকে শিবের দেশ বলা যায়। এই অঞ্চলের প্রাচীন শিবমন্দিরের প্রাচুর্যতা ও জনপ্রিয়তা দেখে অনুমান করা যায় যে এখানকার অধিকাংশ মানুষই শৈব ছিল। এখানে শিব উপাসনার বর্তমানে যে মন্দিরগুলিকে প্রধান বলা যায় সেগুলো হল—মন্দিরবাজার থানার বানচাবড়ার কেশবেশ্বর, হাউড়ীর হাটের ভুবনেশ্বর ও যোগেশ্বর, বিষ্ণুপুর থানার জয়রামপুরের খড়্গেশ্বর, জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাতের আদ্যা মহেশ, গঙ্গাসাগরের চিন্তাহরণেশ্বর, পাথরপ্রতিমার চতুর্মুখ, আদিশিব ও গদামথুরার অষ্টম খণ্ডের গোবিন্দেশ্বর, কাকদ্বীপের থানার ১০ নং লাটরতনপুরের মহাদেব, ডায়মণ্ডহারবারের বোলসিদ্ধির অনাদিশ্বর, রায়দিঘী থানার চিত্রাভাগের অম্বুলিঙ্গ শিব প্রভৃতি বিচিত্র নামধারী আর্যশিব।[৪৮]

মন্দিরের পাশাপাশি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শিবকেন্দ্রিক বেশ কিছু 'দোল' বা 'দেউলে'র অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন-মথুরাপুর থানার মধ্যে লট নং ১১৬, পুরাতন আদিগঙ্গার খাত থেকে প্রায় ১০ মাইল পূর্বে জটার দেউল অবস্থিত। এটি আবিষ্কৃত হয় আনুমানিক ১৮৬০-এর দশকে জঙ্গল পরিষ্কার করার সময়।[৪৯] এই 'দেউল' সম্পর্কে ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির বিবরণীতে বলা হয়েছে—

"Mr. Swinhoe has published a figure of the ruins lately discovered in lot no. 106. The temple is of the Buddhist type of architecture."[৫০]

তবে সব বিশেষজ্ঞরা একে বৌদ্ধস্থাপত্য বলে স্বীকার করতে নারাজ। অনেকের মতে এটি মুসলমান আমলের দেউল-এর পারিপার্শ্ব থেকে প্রস্তর মূর্তি সহ অন্যান্য যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তার সবই প্রায় মুসলমান যুগের নিদর্শন। তবে এই তাম্রলিপিটি বর্তমানে লুপ্ত। অনেকের মতে, জটার দেউলে স্থাপত্যরীতির সাথে ভুবনেশ্বরের দেউল স্থাপত্যের মিল পাওয়া যায়। এগুলির নির্মাণকাল আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী। এই জটার দেউল থেকে ৬ মাইল দূরে লট নং ১১২ তে 'দেল বাড়ি' বা 'দেউলবাড়ি' নামে জায়গায় একটি ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। যার অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। এটিও আনুমানিক ১৯১৮ সালে জঙ্গল সাফ করার সময় পাওয়া যায়। এই জায়গা থেকে পূর্বদিকে আধ মাইল গেলে প্রায় এক বিঘা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা গিয়েছিল। জটার দেউলের প্রায় ১২-১৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে জগদ্দল গাঙের কাছে ১৯২১-২২ সাল নাগাদ জঙ্গল কাটার সময় আরও একটি দেউলের মতো মন্দির খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে চারটি বিষ্ণুমূর্তি ও একটি নটরাজমূর্তি পাওয়া যায়।

এখানে শিব উপাসনার বর্তমান যে মন্দিরগুলোকে প্রধান বলা যায় সেগুলো হল—

জায়গার নাম – মন্দিরের নাম – কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল

দক্ষিণ বারাসত—আদ্যামহেশ মন্দির—সপ্তদশ শতকের সূচনায় প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরবাজার থানা এলাকায় বানচাবড়ার (বাহিনচাওড়া) এর রঘুনাথপুর গ্রামে— কেশবেশ্বর মন্দির—১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরবাজার থানার জগদীশপুর গ্রামের হাউড়ীহাটে—ভুবনেশ্বর ও যোগেশ্বর মন্দির—আনুমানিক ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

রায়দীঘি থানার অন্তর্গত বড়শী গ্রামে—অম্বুলিঙ্গ মন্দির—প্রতিষ্ঠা কবে জানা যায় না।

ডায়মণ্ডহারবার থানার অন্তর্গত বোলসিদ্ধি গ্রামে—অনাদিশ্বর মন্দির—পুরনো মন্দিরটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ১৩৩৬ সালে বা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নতুন মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

বারুইপুর থানার অন্তর্গত বারুইপুর কলেজের কাছে—নন্দিকেশ্বর মন্দির—১৭৪৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়রামপুরে—খড়্গেশ্বর মন্দির—১৩২৯ সালে অর্থাৎ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা থানার হরিণডাঙা ব্লকের মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রাম পাইকান (বজবজ)—বুড়োশিব মন্দির—১১৮৮ সন অর্থাৎ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

ক্যানিং এলাকায় মাতলা নদীর তীরে—মহেশ্বর মন্দির—আনুমানিক ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

৭ নং লাট শিবকালী নগর—ঈশানেশ্বর শিবমন্দির—১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

গঙ্গাসাগরে—চিন্তাহরণেশ্বর শিবমন্দির—১৯৫০-৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত।

জয়নগরের বেলপুকুর—বিশ্বেশ্বর ও রুদ্রেশ্বর শিবমন্দির—১২৮৯ সাল অর্থাৎ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

জয়নগর থানার মজিলপুর ভট্টাচার্য পাড়ায়—বৈদ্যনাথ শিবের আটচালা মন্দির—১৭৩৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

জয়নগর থানার মিত্রপাড়ায়—দ্বাদশ আটচালা শিবমন্দির—১৭৬১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

বৈদ্যপুর নলপুকুর—বৈদ্যপুর শিবমন্দির

মথুরাপুর বাপুলিবাজার—মথুরাপুরের পাঁচটি শিবমন্দির

টালিগঞ্জ—হরিহরধাম শিবমন্দির (দ্বাদশ শিবমন্দির)

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ১১৬ নং লাটে জে. এল. নং ১৩ রায়দীঘি থানার পশ্চিম জটা গ্রামে—জটার দেউল—আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতকে ইস্টক নির্মিত।

সুন্দরবনাঞ্চলের নলগোড়া পঞ্চায়েতের সোনাটিকারী বা সোনাটিকলী গ্রামে—সোনাটিকারী শিবমন্দির—প্রতিষ্ঠিত কবে জানা যায় না।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আরও বহু উল্লেখযোগ্য শৈব ক্ষেত্র রয়েছে যেমন—বেলে দুর্গানগরের শিবালয়, গদামথুরার গোবিন্দেশ্বর, তারানগরের শিবমন্দির, নলগোড়ার বৈকুণ্ঠেশ্বর, বহড়ুর শিবমন্দির, রামরতনপুরের মহাদেব, খাঁড়ি-খাঁড়াপাড়ার ত্র্যম্বকেশ্বর, মালঞ্চগ্রামের শিবমন্দির, সোনটিক্রি গ্রামের শিবমন্দির, সূর্যপুরের অঘোরনাথ নবতীর্থের শিবমন্দির, উত্তর কল্যাণপুরের শিবমন্দির, হরিনাভীর ভবানীশ্বর, গড়িয়া মহাশ্মশানের শিবমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উক্ত মন্দিরগুলির অধিকাংশেই শিব লিঙ্গমূর্তিতে পূজিত হন।

লোকদেবতা ধর্মঠাকুর

শিব ঠাকুরের পাশাপাশি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ধর্মঠাকুরের পুজোর যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। এখানে শিবগাজনের পাশাপাশি ধর্মের গাজনেরও চল রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকারগণ *'শূন্যপূরাণ'*-এর রচনাকাল সম্পর্কে অনুমান করে বলেন এটি রচিত হয়েছিল আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে এবং তারা অনুমান করেন যে এই 'শূন্যপূরাণ' থেকেই ধর্মপূজায় গাজনের সূত্রপাত ঘটেছিল এবং আরও পরবর্তীকালে শিবপূজায় গাজন উৎসবের প্রবেশ ঘটেছিল তাই বর্তমানে গাজন উৎসব পালিত হয় শিব ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে।[৫১] তবে শিবের গাজনের কাছে ধর্মের গাজন এখন অনেকটাই নিষ্প্রভ।

'ধর্মমঙ্গল' এ রয়েছে রাণী রঞ্জাবতী ধর্মকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টায় গাজন উৎসবের প্রচলন করেছিলেন—

"গাজন লইয়া এল ময়না মন্ডলে
শিরে ধর্মপাদুকা সোনার চতুর্দোলে"[৫২]

গৌড়ে গাজন মেলা বা উৎসবের কথা ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে মানিক গাঙ্গুলির *'ধর্মমঙ্গল'* এ উল্লেখ রয়েছে—

"গায়ে ছিল বাদ্যভান্ড তাতে ছিল কাঠী
কোলাহল কেঁপে গেল গৌড়ের মাটি"[৫৩]

ধর্মঠাকুরের ধ্যানমন্ত্রে তাঁর পরিচয় মেলে-

"ওঁ ধর্ম রাজায় নমঃ
ওঁ যস্যান্তং নাস্তি নীদিমধ্যং ন চ করচরনং
নাস্তি কায়নিনাদং নাকারং নেবরূপং ন চ ভয় মরনম্
নাস্তি জন্ম বয়শ্চ যোগেন্দ্র ধ্যানগম্যঃ সকল গুণময়
সখ্যভাব প্রণীতঃ ভক্তানাং কামদাতৃ সকল গুনময় সুবরজ পাতু।।"[৫৪]

এর অর্থ হল—যিনি সব কিছুকে ধারণ করেন তিনিই ধর্ম; অর্থাৎ সর্বশূন্য নিরাকার, সর্বশক্তিমান এক বিশেষ শক্তিই ধর্ম বা ধর্মঠাকুর। ধর্মপুরাণ বা ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের বাহন 'উলুক'। পরে কখনও কূর্ম আবার কখনও খচ্চর বা ঘোড়া হয়েছে।[৫৫] ধর্ম ঠাকুরের কোনো মূর্তি নেই। প্রাথমিক ভাবে গোলাকৃতি শিলাখণ্ডই এর প্রতীক, এই প্রস্তরপূজা এসেছে আদিম নিষাদ সম্প্রদায় থেকে গোলাকার প্রস্তরখণ্ড এখানে গোলাকার পৃথিবী বা সূর্যের প্রতীক হতে পারে। শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, ধর্মশিলা (sun stone) প্রভৃতি প্রকৃতির প্রতীকরূপে প্রস্তরখণ্ডের পূজাও এসেছে এখান থেকেই। ধর্মশিলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কূর্মাকৃতি। কখনো কূর্ম নিজেই ধর্মদেবতা আবার কখনো কূর্ম তার বাহন। ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি ছিল না। একখণ্ড প্রস্তরকে পূজা করা হত। কোনো কোনো জায়গায় আবার প্রস্তরখণ্ডের গায়ে টুকরো টুকরো চাঁচ বা পিতলের পেরেক ধর্মঠাকুরের চক্ষুরূপে পরিচয় দেওয়া হয়। অধিকাংশ জায়গাতেই প্রস্তরখণ্ডটি গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির।

বহু প্রচলিত মৌলিক দেবতা ধর্মঠাকুরের পূজার উৎপত্তি যে কিভাবে হয়েছিল আজকে তা নিরূপণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। 'ধর্ম' শব্দটি সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচর্য বলেছেন—

"ধর্ম শব্দটির উৎপত্তির মূলে কোন না কোন ভাবে ডোম শব্দটির কল্পনা করা অসমীচীন হইবে না"।[৫৬]

আসলে ডোমদের পূজিত দেবতা ছিল ডোমরায় তাই আশুতোষ বাবু দেখিয়েছেন, এই 'ডোমরায়' শব্দটির ধ্বনিতত্ত্বের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে 'ধর্ম' শব্দটির আগমন ঘটেছে এইভাবে— ডোমরায় > ডোমরা > ডোরমা > ডোরম > ধম > ধরম > ধম্ম > ধর্ম।[৫৭] পুরাতত্ত্ববিদ সুধাংশু কুমার রায় বলেছেন—ধর্ম বা ধম্ম—এই প্রাগৈতিহাসিক শব্দটি এসেছে 'ডো-আহম-রা' নামক মিশরীয় ফারাও রাজাদের মধ্যে একজন জনপ্রিয় ধর্মপ্রাণ রাজার নাম থেকে। এই রাজা 'ডো-অহম-রা' মিশর থেকে বিতাড়িত হয়ে তার অনুগত প্রজাদের নিয়ে সমুদ্র পথে রাঢ় অঞ্চলে চলে আসেন। মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ মমি করে রাজমহল পাহাড়ের এক গুহায় লুকানো ছিল। তাঁর প্রজারা ডো-আহম বা ডোম নামে পরিচিত ছিল। ডো-আহম-রা এর মৃত্যু বার্ষিকী দিবসে 'ডো-আহম' সম্প্রদায় অশৌচ পালন করত, মনের দুঃখ জানাবার জন্য বিকট গর্জন করে অনেক রকমভাবে আত্মনিগ্রহ করত। সেই থেকেই রাঢ়বঙ্গে ও পরে অন্যত্র ধর্মগাজনের অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়।

ডোম জাতিভুক্ত লোকেরাই প্রধানত ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজারি হন। আবার কোথাও কোথাও অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষেরাও ধর্মঠাকুরের দেয়াসী হন। যেমন—হাঁড়ি, কৈবর্ত প্রভৃতি। ডোম পূজারিরা 'পণ্ডিত' উপাধি ধারণ করে। কোনও কোনও জায়গায় ব্রাহ্মণরা ডোমদের পূজাবিধির নির্দেশাবলী দেন। কোনও কোনও জায়গায় ব্রাহ্মণ ও ডোমদের পূজারীদের মিলিত চেষ্টায় ধর্মদেবতার বাৎসরিক পূজা হয়। নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মপূজারী 'দেয়াসী' ও উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত পূজারীদের 'দেবংশী' বলা হয়। ভিন্ন জায়গায় ধর্মঠাকুরকে ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যথা—

দেপুরে—জগৎরায়

ইন্দাসে—বাঁকুড়া রায়

পাণ্ডগ্রামে—বুড়োধর্ম

বৃন্দাবনপুরে—শ্যামরায়

গোপুরে—স্বরূপনারায়ণ

মঙ্গলপুরে—রূপনারায়ণ

জোড়গ্রামে—কালুরায়

বাঁকুড়ায়—কালাচাঁদশিব

গোপালপুরে—কাঁকড়াবিছা

জয়পুরে—ধর্মঠাকুর

পশ্চিমপাড়ায়—যাত্রাসিদ্ধি

বেদুড়াগ্রামে—মোহন রায়

বড়জোড়া ও বেলিয়াতোড়ে—ধর্মরাজ

পখন্নায়—ধর্ম ঠাকুর।

এছাড়া ক্ষুদিরায়, শীতলনারায়ণ প্রভৃতি নামেও পূজিত হয়।[৫৮] দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ইনি ধর্মরাজ নামেই সুপরিচিত।

আদিম কৌম রীতির সাথে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আজীবিক, বৌদ্ধ ও আর্যের ধর্মসংস্কার যুক্ত হয়ে এক মিলিত মিশ্রিতরূপই আজকের ধর্মপূজা পদ্ধতি।[৫৯] পশুবলি ধর্মপূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণত ৩ ধরনের—

এক. নিত্যপূজা—যাঁদের বাড়িতে পারিবারিক ধর্মশালা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে নিত্যপূজা হয়। সেখানে বলিদান হয় না।

দুই. অতিরিক্ত মানসিকপূজা ও ভোগদান।

তিন. বার্ষিক পূজা, সাধারণত চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ় মাসে হয়।[৬০]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যে সমস্ত জায়গায় ধর্মপূজা হয়

১. উস্তি থানার অন্তর্গত শেরপুর কাজলাপাড়ায় বৈশাখী পূর্ণিমার ধর্মরাজ পূজা হয়। মূর্তিটির সাথে বিষ্ণুমূর্তি বা জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তির প্রচলন আছে। এই পূজার পুরোহিত যুগী সম্প্রদায়ের উপবীত গ্রহণ করেন।

২. ফলতা থানার বেলসিংহা বহরপুরে আরেক পরিবারে ধর্মপূজা হয়। এখানে মাটির মন্দিরে ধর্মরাজকে পূজা করা হয়। ধর্মরাজ এখানে বিভিন্ন আকৃতিরূপে পূজিত হন এবং এখানকার পুজারিরা সম্ভবত জাতিতে ডোম।

৩. ডায়মণ্ডহারবার থানার জোবরালী গ্রামে ধর্মপূজা হয়। পাকা গাঁথুনি ও খোলার চালে ধর্মরাজ এখানে পূজিত হন। ধর্মরাজ তিনটি শিলায় অধিষ্ঠিত এখানে। এখানকার পূজারীরা নামযোগী সম্প্রদায়ভুক্ত।

৪. সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বাওয়ালী চকমানিক গ্রামে পূজো হয় ধর্মরাজের। মন্দিরের চাল টিন ও খোলার কিন্তু মেঝে শ্বেত পাথরের। পূজারী জাতিতে মাহিষ্য। ধর্মমূর্তি চুতুষ্কোণ শিলাসনে দুপাশে দুটি, এবং মাঝখানে রয়েছে শালগ্রাম শিলা।

৫. ডায়মণ্ডহারবার পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের ধনবেড়িয়া গ্রামে ধর্মপূজা হয়। এখানকার মূর্তিটি একেবারেই অন্যরকম। ২১/২"। ৬টি কষ্টিপাথরের খোদাই করা যমরাজের মূর্তিকে এখানে পুজো করা হয়। যার হাতে থাকে যমদণ্ড এবং বাহন মহিষ।

৬. দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাচীন শিবতীর্থ পাইকানের বাবা বুড়ো শিবের মন্দিরের একটু দূরেই ধর্মরাজের পুজো হয়। যদিও বর্তমানে ধর্মরাজ এখানে পণ্ডিতদের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছে তবে চৈত্র মাসে চড়ক মেলার সময় মহাসমারোহে একে নিয়ে আসা হয়। এখানকার ধর্মরাজের যাবতীয় সেবার দায়িত্বে রয়েছেন চক্রবর্তী ও ভট্টচার্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ। চৈত্র মাসে শিবকে কেন্দ্র করে এই মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট চড়ক ও অভিনব গাজন উৎসব ও জমজমাট মেলা হত। ‘বাঁটিঝাঁপ’, ‘বান ফোঁড়’, ‘কাঁটাগোড়’, ‘আগুনঝাঁপ’ প্রভৃতি হত। যা এখনও হয় তবে বর্তমানে এই চড়ক উৎসবটি এই এলাকায় নস্করদের চড়ক নামে খ্যাত। এ ছাড়াও সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে ছড়িয়ে আছে ধর্মরাজ ঠাকুরের নানান ছোট বড় মন্দির।

পশ্চিমবাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার নিম্নবর্গীয় কৃষি সমাজে শিব ধরা দিয়েছেন হলধর রূপে। দক্ষিণে সুন্দরবনাঞ্চলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য শিবের থান ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে বহু দিন ধরেই পালিত হয়ে আসছে গাজন উৎসব। আমন ধান ঘরে তোলার পর চৈত্র মাসে পুরাতন বছরের শেষ ও নতুন বছরের সূচনার প্রাক্কালে শিব-পার্বতীর বিবাহ মিলন কল্পনায় আগামী বছরে যথেষ্ট শস্য উৎপাদন ও স্বাচ্ছন্দ্যের কামনাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য তবে গাজন কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎসবই নয় এর একটি মনোরঞ্জনমূলক দিকও রয়েছে। গাজন উৎসবে আয়োজন করা হত গাজনগানের। নাচ, গান, সংলাপ, অভিনয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই গাজনপালা ছিল নিম্নবর্গীয় দরিদ্র হিন্দুসমাজের কাছে বিনোদনের অন্যতম উপাদান। আসলে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবনাঞ্চল বাদাবন জলাভূমি সঙ্কুল হওয়ায় নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রোগ-ব্যাধি, কুসংস্কারমূলক প্রতিবন্ধকতায় ঘেরা ছিল এদের জীবন তাই তারা আস্থা রেখেছিল ঐ সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীর উপর। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য গান রচনা ও সুর দিয়ে বাদ্যযন্ত্র ও নাচ সহযোগে মাহাত্ম্য প্রচার করত। ক্রমে এর সাথে অভিনয় যুক্ত হয় এবং কিছু পরিবর্তন ঘটে আকার নেয় লোকনাট্যের। এমনই একটি লোকনাট্যরূপে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে গাজনপালা। গ্রামের মানুষের আত্মবিশ্বাস, মিথ, রিচ্যুয়াল নিয়ে মৌখিকভাবে রচিত নাট্যধর্মী রচনা যা মুখে মুখেই প্রচারিত হয়। উৎসবের পাশাপাশি গাজন শিল্পচর্চাও বটে। গ্রামের মানুষের সারাবছর ব্যস্ততার অবসরে বিনোদনের পাশাপাশি শিল্প প্রতিভার চর্চার একটি অন্যতম মাধ্যম এটি আবার সময়ের সাথে সাথে এর সাথে যোগ হয়েছে ব্যবসায়িক মানসিকতাও। গ্রামে গ্রামে তৈরি হয়েছে পেশাদারি গাজনদল। ব্যবস্থা হয়েছে অভিনয় প্রশিক্ষণের। অনেকেই পালা

রচনা, সুর দেওয়া, নির্দেশনা এগুলিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরিবর্তনশীল যুগ ও রুচির সাথে তাল রেখে পরিবর্তন এসেছে গানের কথা, সুরে, সংলাপে, রসবোধে, মঞ্চে, পোশাকে, প্রসাধনে, আলো, শব্দ, বাদ্যেও। কেবলমাত্র গাজন উৎসবেই নয় বর্তমানে যে কোনো মেলা অনুষ্ঠান বা কেবলমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যেই গাজনপালা পরিবেশিত হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়েছে নিজের জেলার পাশাপাশি অন্যান্য জেলাতেও তবুও গাজন যেহেতু গ্রামাঞ্চলের নিম্নবর্গীয় হিন্দুসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাই অর্থনৈতিক দিক থেকেও এর কাঠামো বেশ দুর্বল। যুগ পরিবর্তনের সাথে দর্শকের রুচির যে বদল ঘটেছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বদল আনতে হয়েছে দলের পরিকাঠামোতে তাই ব্যয় যথেষ্ট অথচ আয় বিশেষ না হওয়ায় শিল্পীদের বাৎসরিক উপার্জনও বেশ কমই বলা যায়। নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝে তাদের শিল্প প্রতিভার সঠিক বিকাশও সম্ভব নয়। তবু কেবলমাত্র গাজনের প্রতি প্রাণের আবেগেই এখনও অনেক মানুষ আছেন যারা এই পেশাকে আপন করেছেন।

দক্ষিণবঙ্গের গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে অনেক গবেষণা হয়েছে। যেখানে বার বার উঠে এসেছে এই উৎসবের উদ্ভব, এর রীতি-নীতি, এর সাথে মিশে থাকা ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্ধকুসংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গ। তবুও মনে হয় এর আরও অনেক দিক রয়েছে যা অলক্ষ্যে থেকে গেছে। গাজনকে যুগোপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে এর ধর্মীয়, পৌরাণিক দিকগুলি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। সংলাপে, গানের কথায় ও সুরে, পোশাকের আধুনিকতায়, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও আদিরসাত্মক ইঙ্গিতের ফলে দর্শক রুচি পরিবর্তনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এর ফলে গাজন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আজ আধা যাত্রা আধা গাজনের রূপ নিয়েছে। এর মূলে অনেকটাই অর্থনৈতিক কাঠামো দায়ী। কেবলমাত্র শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় এই লোকনাট্যটির বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ দুর্বল। এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে এই সমস্ত দিকটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা: লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে নানান লৌকিক দেব-দেবী। যারা মূলত এখানকার নিম্নবর্গীয় অধিবাসী সমাজে পুজিত হয়। এই সব লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে এখানকার নিম্নবর্গীয় অধিবাসী সমাজে গড়ে উঠেছে বিশ্বাস, আস্থা, ধর্মীয় আচার, উৎসব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এর অধিকাংশটাই সুন্দরবনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় একসময় তা ছিল জল-জঙ্গলে ভরা প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে জীবনকে রক্ষা করা মানুষের কাছে দুর্বিষহ বিষয় ছিল। সেই কারণেই এখানকার খেটে খাওয়া অস্থির জীবনের অধিকারী নিম্নশ্রেণির মানুষগণ আস্থা রাখতে বাধ্য হয়েছিল নানান লৌকিক দেবতার উপর। সেই কারণেই শিব এখানে লোকদেবতার পর্যায়েই পড়ে বলা যায়। এখানকার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে শিবের থান ও মন্দির। অন্যান্য লৌকিক দেবতার মতো শিবকে কেন্দ্র করে এখানকার মানুষের মনে যেমন আস্থা, বিশ্বাস গড়ে উঠেছে তেমনি

উদ্ভব হয়েছে ধর্মীয় উৎসব আচার-রীতির। গাজন হল এখানকার শিবকেন্দ্রিক সবথেকে জনপ্রিয় ধর্মীয় আচার ও উৎসব। আসলে কেবলমাত্র শিব নয় শিবের সাথে শিবপত্নীর যৌথরূপকে কেন্দ্র করে সারা বছর ভালো কৃষি উৎপাদনের আশায় দক্ষিণবঙ্গের কৃষিজীবী এই মানুষগুলি এই উৎসব পালন করত। আসলে কৃষির উৎপাদনের উপরেই যেহেতু এদের সারা বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করত তাই সেই ভালো কৃষি উৎপাদনের আশাতে একসময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঘরে-ঘরে, গ্রামে-গ্রামে চৈত্রমাস ব্যাপী পালিত হতো গাজন উৎসব।

সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। গাজনের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে এই পরিবর্তন। ধর্মীয় গাজন উৎসবের অঙ্গ হাসি মজায় ভরা মনোরঞ্জনমূলক অংশটি এখন রূপ নিয়েছে পেশায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে তৈরি হয়েছে অগণিত গাজনদল। বর্ষাকাল ব্যতীত সারা বৎসরব্যাপী নিজ জেলার সর্বত্র তো বটেই এমনকি অন্যান্য জেলাতেও অর্থের বিনিময়ে গাজনপালা পরিবেশন করে এই পেশাদারি গাজনদলগুলি। একদিকে নিম্নবিত্ত শ্রেণির কাছে এটি মনোরঞ্জনের এক অন্যতম মাধ্যম আবার অন্যদিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মূলত নিম্নবর্ণীয় মানুষের সারাবছরের অর্থ উপার্জনের একটি উপায়। তাই প্রথম অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত গাজনদল, শিল্পী, বাদ্যকার, মালিক, আহ্বায়ক এদের সাক্ষাৎকারের মাধমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন, পদ্ধতি, প্রাক্‌প্রস্তুতি, প্রশ্নমালা, প্রভৃতির বিবরণ দিয়ে অধ্যায় শেষে সমীক্ষাটির প্রতিবেদন, প্রাপ্ত পাঠ্য এবং অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায় অংশে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এই শিব-পার্বতী কেন্দ্রিক গাজন উৎসব সম্পর্কে। গাজন উৎসবের রীতি-নীতি আলোচনায় চড়ক, সঙ সম্পর্কে ও আলোচিত হয়েছে। এখানে যেমন রয়েছে শিবকেন্দ্রিক গাজন উৎসব তেমনি ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে ধর্মের গাজনের বহুল প্রচলন ও রয়েছে সেজন্য এই বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে এবং অধ্যায়টির শেষে গাজন উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা লোকনাট্য বলতে কি বোঝায় এবং গাজন কতখানি লোকনাট্য সে বিষয় উল্লেখ করে গাজনপালার মধ্যেকার নানান বিষয়ক বৈচিত্র্য যা প্রলক্ষিত হয় তা ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিত দলগুলির পরিবেশনার অনুপাতে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে গাজন লোকনাট্যের কাহিনি মূলত যে বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মাণ করা হয় সে সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য, গাজনপালার মধ্যে লুকিয়ে থাকা জনসচেতনতা ও লোকশিক্ষার উপাদান এবং পালাগুলির বিষয় বিবর্তন।

চতুর্থ অধ্যায়টিতে লোকনাট্য গাজনের আঙ্গিক ও অভিনয়গত দিকটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে গাজনপালা অভিনয়ের আঙ্গিক, গাজনপালা পরিবেশনের সময়, গাজনের আসর, গাজনপালা পরিবেশনে সহায়ক বাদ্যযন্ত্র, যন্ত্রানুষঙ্গ, আলো, গাজনপালার অভিনেতা,

দর্শক, গাজনপালার আঙ্গিক ও আহার্য অভিনয়ের ধরন এবং অভিনয়ের আঙ্গিকগত বিশেষত্বকে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রামানিক তথ্য সহ বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বর্তমানে চারিদিকে মনোরঞ্জনমূলক উপাদান হরেক রকম। তার ফলে পূর্বের ধর্মীয় গাজনের উন্মাদনা অনেক হ্রাস হয়েছে আবার গাজনে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি প্রবেশের ফলে গাজনপালা দর্শনে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সেই জন্যই তাদের পরিবেশনায় পরিবর্তনও ঘটেছে। সময়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক নানান প্রতিবন্ধকতাও দেখা দিয়েছে। এ সমস্ত কিছু আলোচিত হয়েছে গাজন উৎসব ও পালা অভিনয়ের সাম্প্রতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্যে পঞ্চম অর্থাৎ শেষ অধ্যায়টিতে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ধর্মীয় উৎসব ছিল গাজন উৎসব। পুরাতন বছরের শেষ ও নতুন বছরের প্রারম্ভের প্রাক্কালে শস্যকেন্দ্রিক এই উৎসব পালনের উদ্দেশ্য ছিল আগামী বছরে যেন ভালো শস্য উৎপাদন হয়। আসলে কৃষিপ্রধান এই পরিবারগুলির কাছে সারাবছরের সুখ শান্তি নির্ভর করত এই শস্য উৎপাদনের উপর। ধর্মীয় এই উৎসবটি একসময় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় মানুষের গ্রামে গ্রামে এমনকি ঘরে ঘরে পালিত হত। চার দিন ধরে এই উৎসবে পালিত হত নানান রীতি-নীতি। সময়ের ক্রমে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে এবং ওই উৎসবেরই মনোরঞ্জনমূলক একটি অংশ যা বর্তমানে সম্পূর্ণ একটি পেশায় পরিণত হয়েছে এবং তারও আবার বিবর্তন ঘটেছে, সমাজে আর মানুষের কাছে এই ধর্মীয় উৎসব গাজন এবং পেশারূপে লোকনাট্য গাজনের বর্তমান চাহিদা কতটুকু, গাজন উৎসবে অংশ গ্রহণে ও উন্মাদনায় ভাটা সৃষ্টির কারন, পাশাপাশি লোকনাট্যরূপে গাজনের পেশাকে অবলম্বন করে কিভাবে এক শ্রেণির মানুষ জীবন অতিবাহিত করছে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পেশা হিসেবে কতটা বা তাকে অবলম্বন করতে ভরসা পাবে, কিভাবে পালাগুলি সমাজ সংস্কার করছে দর্শকদের অবচেতনে নানান বিষয়ের উপর আলোকপাত ঘটিয়ে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা বর্তমান গবেষণাটির মূল লক্ষ্য ছিল। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের উক্ত পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে সেই দিকগুলিকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. অভিষেক মণ্ডল, "সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু এবং আঞ্চলিক ইতিহাস", *বঙ্গলোক-ষান্মাসিক*, সংখ্যা-১ (বর্ষ-১, নভেম্বর ২০১৪-এপ্রিল ২০১৫): ১২৫ । বর্তমান ভারতের পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশে গঙ্গার প্রধান শাখা দুটির মধ্যবর্তী অঞ্চল গঙ্গারিডি। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিস তার '*ইন্ডিকা*' গ্রন্থে এই রাজ্যের উল্লেখ করেন।

২. ঐ

৩. নারায়ণ ঘোষাল, "বঙ্গ ইতিহাসের অনুসঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ", *গ্রামীণপুঁথি:* প্রাচীন ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, শারদ সংখ্যা (৩৪ তম বর্ষ, ২০১৫): ৯৬

৪. নারায়ণ ঘোষাল, "বঙ্গ ইতিহাসের অনুসঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ", *গ্রামীণপুঁথি:* প্রাচীন ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, শারদ সংখ্যা (৩৪ তম বর্ষ): ৯৬-৯৭

৫. নিখিলনাথ রায়, "চব্বিশ পরগণা-একটি জেলার জন্মকথা", *কৌশিকী,* ৩য় পর্যায়, (জানুয়ারী-১৯৯৫): ৬৪

৬. নিখিলনাথ রায়, "চব্বিশ পরগণা-একটি জেলার জন্মকথা", *কৌশিকী,* ৩য় পর্যায়, (জানুয়ারী-১৯৯৫): ৬৮-৭০

৭. নারায়ণ ঘোষাল, "বঙ্গ ইতিহাসের অনুসঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ", *গ্রামীণপুঁথি:* প্রাচীন ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, শারদ সংখ্যা (৩৪ তম বর্ষ, ২০১৫): ৯৬

৮. নিখিলনাথ রায়, "চব্বিশ পরগণা - একটি জেলার জন্মকথা", *কৌশিকী,* ৩য় পর্যায়, (জানুয়ারী-১৯৯৫): ৬৭

৯. নিখিলনাথ রায়, "চব্বিশ পরগণা - একটি জেলার জন্মকথা", *কৌশিকী,* ৩য় পর্যায়, (জানুয়ারী-১৯৯৫): ৬৮

১০. নারায়ণ ঘোষাল, "বঙ্গ ইতিহাসের অনুসঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ", *গ্রামীণপুঁথি:* প্রাচীন ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, শারদ সংখ্যা (৩৪ তম বর্ষ, ২০১৫): ৯৬ । পঞ্চান্নগ্রামকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১১. নিখিলনাথ রায়, "চব্বিশ পরগণা - একটি জেলার জন্মকথা", *কৌশিকী,* ৩য় পর্যায়, (জানুয়ারী-১৯৯৫): ২১০

১২. অভিষেক মণ্ডল, "সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু এবং আঞ্চলিক ইতিহাস", *বঙ্গলোক-ষান্মাসিক,* সংখ্যা-১ (বর্ষ- ১, নভেম্বর ২০১৪-এপ্রিল ২০১৫): ১২৫

১৩. ঐ । এই তপসিলি জাতি ও উপজাতির মধ্যে অধিকাংশ মানুষই পোদ বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

১৪. কালিদাস দত্ত, "দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতীত: মৌর্য, সুঙ্গ ও কুষাণ যুগ", *গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা,* ১ম সংখ্যা (১৪ বর্ষ, মাঘ ১৪০২, জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬): ৮

১৫. ধূর্জটী নস্কর, "সুন্দরবনের স্থাননাম ও গ্রামনাম", *গঙ্গারিডি,* বর্ষাকালীন সংখ্যা (১৬বর্ষ, জুলাই-আগস্ট, ১৯৯৮, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৫): ৫৮

১৬. গৌতম হালদার, "সুন্দরবন সমীক্ষা: প্রকৃতি ও পরিবেশ", *গঙ্গারিডি,* ১১ সংখ্যা (২০ বর্ষ, নভেম্বর, ২০০২, অগ্রহায়ণ ১৪০৯): ৯

১৭. নিখিলনাথ রায়, "চব্বিশ পরগণা- একটি জেলার জন্মকথা", *কৌশিকী,* ৩য় পর্যায়, (জানুয়ারী-১৯৯৫): ২১২

১৮. অভিষেক মণ্ডল, "সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু এবং আঞ্চলিক ইতিহাস", *বঙ্গলোক-ষান্মাসিক,* সংখ্যা- ১ (বর্ষ-১, নভেম্বর ২০১৪-এপ্রিল ২০১৫): ১২৭

১৯. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (২য় পর্ব)* (কলকাতা: ফার্মা, কে.এল.এম প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২), ৩

২০. অভিষেক মণ্ডল, "সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি জলবায়ু এবং আঞ্চলিক ইতিহাস", *বঙ্গলোক-ষান্মাসিক,* সংখ্যা- ১ (বর্ষ-১, নভেম্বর ২০১৪-এপ্রিল ২০১৫): ১২৮

২১. বিমলেন্দু হালদার, *দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা (প্রথম খণ্ড)* (কলকাতা-৬৪: বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০১ জানুয়ারী): ৫৫

২২. ঐ

২৩. ঐ

২৪. ঐ

২৫. মালিনী ভট্টাচার্য, "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসাংস্কৃতিক ভূগোল", *লোকশ্রুতি,* volm.1 (পৌষ, ১৪০৯, ডিসেম্বর ২০০২): ১২৫

২৬. বিমলেন্দু হালদার, "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনগোষ্ঠী", *গ্রামোন্নয়ন কথা,* ৪র্থ সংখ্যা (৪র্থ বর্ষ, এপ্রিল-জুন ২০০৪): ১৩

২৭. প্রদ্যুৎ সরকার, "দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লোকসমাজে শিবের গাজন", *লোক, গ্রামীণ বিনোদন, সেকাল ও একাল,* Vol-VI (২০০৪ অক্টোবর): ৩৮১

২৮. ঐ

২৯. প্রদ্যুৎ সরকার, "সুন্দরবনের লোকসমাজে শিবের গাজন", *সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা,* সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা (২য় খণ্ড), (২০১২ জুলাই- ডিসেম্বর): ২৮৬ । সিন্ধু সভ্যতা বর্তমান পাকিস্থান ও উত্তর ভারতে ছিল, যার প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে ছিল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর। মহেঞ্জোদারো ঐ সময় নগর পরিকল্পনা ও পুরকৌশলে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান অর্জন করেছিল।

৩০. ঐ

৩১. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (২য় পর্ব)* (কলকাতা: ফার্মা, কে.এল.এম প্রাঃ লিঃ, ২০০৩), ১১১-১১৪

৩২. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)* (কলকাতা-৭৩: দে'জপাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ ২০০১), ৫৪৯

৩৩. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড)* (কলকাতা-৭৩: দে'জপাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৬), ১১২৪

৩৪. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড)* (কলকাতা-৭৩: দে'জপাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৬), ৫৭২

৩৫. নারায়ণ ঘোষাল, "বঙ্গ ইতিহাসের অনুসঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ", *গ্রামীণপুঁথি:* প্রাচীন ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, শারদ সংখ্যা (৩৪ তম বর্ষ, ২০১৫): ৬৯

৩৬. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, "গ্রামদেবতা: উৎপত্তি বিকাশ ও শ্রেণিবিভাগ", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* লোকসংস্কৃতিবিদ-বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৪, (বর্ষ-১, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৯): ৩৮

৩৭. সঞ্জয় ঘোষ, "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতি", *গ্রামোন্নয়ন কথা,* ২য় সংখ্যা, মেলাপার্বণ, (একাদশ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১০): ৫

৩৮. ডঃ বঙ্কিম মাইতি, "লোকদেবতা", *লোকভাষ,* ১ম সংখ্যা (২য় বর্ষ, চৈত্র ১৪২০): ৮৭

৩৯. নারায়ণ ঘোষাল, "বঙ্গ ইতিহাসের অনুসঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ", *গ্রামীণপুঁথি:* প্রাচীন ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, শারদ সংখ্যা (৩৪ তম বর্ষ, ২০১৫): ৬৭

৪০. নারায়ণ ঘোষাল, "বঙ্গ ইতিহাসের অনুসঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ", *গ্রামীণপুঁথি:* প্রাচীন ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, শারদ সংখ্যা (৩৪ তম বর্ষ, ২০১৫): ৬৮

৪১. মাধুরী সরকার, "শিব: সৃষ্টি পুরাণে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩, (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ২৭৫

৪২. মাধুরী সরকার, "শিব: সৃষ্টি পুরাণে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩, (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ২৭৬

৪৩. মাধুরী সরকার, "শিব: সৃষ্টি পুরাণে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩, (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ২৭৮

৪৪. মাধুরী সরকার, "শিব: সৃষ্টি পুরাণে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩, (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ২৭৯

৪৫. মাধুরী সরকার, "শিব: সৃষ্টি পুরাণে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩, (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ২৮২। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় এই সাহিত্যগুলি লোকধর্ম, লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল।

৪৬. মাধুরী সরকার, "শিব: সৃষ্টি পুরাণে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩, (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ২৭৯

৪৭. অলোকরঞ্জন চক্রবর্তী, "পুরনো বাংলাকাব্যের শিবঃ উৎস ও বিবর্তন", *নবহট,* নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ, বইমেলা, ২-৩ সংখ্যা, শরৎ ও শীত সংখ্যা (১৪১৯): ৮১

৪৮. নাজিবুল ইসলাম, "জল ও জঙ্গল", *সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা,* সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা (২য় খণ্ড) (২০১২ জুলাই- ডিসেম্বর): ২৯২

৪৯. বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩ খণ্ড)* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ২০১৩), ২১৩ । এই নামকরণের পিছনে অনেক কল্পনা ও গবেষণা রয়েছে। কেউ মনে করেছেন জটাধারী বড় বড় বাঘ এখানে ঘুরে বেড়াত তাই এই নামকরণ, আবার কারও মতে এখানে জটাধারী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৫০. ঐ

৫১. প্রচ্ছদ পরিচিতি, "শিবের বিয়ে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা- ৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ২৭৯

৫২. বুদ্ধদেব রায়, "গাজন উৎসব ও গান", *রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ১৯৮১, ডিসেম্বর) : ৭৯

৫৩. বুদ্ধদেব রায়, "গাজন উৎসব ও গান", *রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ১৯৮১, ডিসেম্বর): ৮০

৫৪. বৃহস্পতি মণ্ডল, "খেজুড়ির অজানবাড়ির চড়কমেলা", *পুণ্যিপুকুর,* ১লা বৈশাখ, ১৪১৯, ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৩৩

৫৫. তারা প্রণব ব্রহ্মচারী, *বহুরূপে দেবতা তুমি* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৪), ১০৪

৫৬. ডঃ অমরেন্দ্রনাথ রায়, "গাজন নিয়ে দু-এক কথা", *পুণ্যিপুকুর,* ১লা বৈশাখ, ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৪৫

৫৭. ঐ

৫৮. ভব রায়, "রাঢ় বাংলার ধর্মগাজন", *নকশি কাঁথা,* ১ম সংখ্যা (১ম বর্ষ, ১ম এপ্রিল-৩০শে জুন, ২০০৮): ১৮

৫৯. দীনেশ সেন, "জটার দেউল এক অনন্য স্থাপত্য কীর্তি", *সুচেতনা* (২৭ বর্ষ, ২০০৬): ৮-৯

৬০. বাণী দাস, "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ধর্মপূজা, পূজারী ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট", *ধৃতি,* লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, ৪র্থ সংকলন (পৌষ-মাঘ ২০১৪, জানুয়ারি ১৯৯৮): ১৫

প্রথম অধ্যায়

ক্ষেত্রসমীক্ষা: প্রতিবেদন ও সমীক্ষকের অভিজ্ঞতা

১.১ ক্ষেত্রসমীক্ষা: প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি

বাংলার লৌকিক জীবনের সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করতে গেলে ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজন হয় একেবারে প্রথমে। ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া লোকসংস্কৃতিতে গবেষণার কাজ অসম্ভব। সময়ের সাথে সাথে কোনো স্থানের লৌকিক জীবনের সংস্কৃতিতে দেখা দেয় বিবর্তন আর কিভাবে এই বিবর্তন ঘটছে এবং তার প্রভাবে সেখানকার মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনের আরও নানান ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তন ঘটছে—এ সকলই সম্যকভাবে নির্ণয় করা যায় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে। অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস তার *'লোকসংস্কৃতিবিদ্যা'* গ্রন্থে বলেছেন-

> "ক্ষেত্রসমীক্ষা ছাড়া লোকসংস্কৃতি বিদ্যা নুন ছাড়া তরকারি, জল ছাড়া মাছ। ক্ষেত্রসমীক্ষা না করে যারা লোকসংস্কৃতি বিদ্যা চর্চা করেন তাদের বলা হয় 'armchair folklorist'. লোকসংস্কৃতিবিদ্যা একদিকে, প্রায়োগিক অন্যদিকে তাত্ত্বিক। এ হল মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক নির্ণয়ের---অধীত বিদ্যাকে প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝে নেওয়ার---দ্বিমুখী জ্ঞান কাণ্ড। এ হল পূর্ণাঙ্গ তত্ব বা ক্ষেত্র---লব্ধ তথ্যের উপর গড়ে ওঠে, আর এ হল সুবিন্যস্ত তথ্য যা তত্ত্বের আলোয় বিশ্লেষিত হয়।"[১]

ক্ষেত্রসমীক্ষা বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে 'Folklife and Fieldwork" নামক প্রবন্ধে Peter Barts বলেছেন—

> 'Field work is the observation and careful documentation or collection of events and materials as they occur in their natural context or environments. For those involved in folk life studies, these events and materials are the result of tradition and are passed on from generation to generation by word of mouth, by observation, and by imitation. For the professional folklorist, fieldwork generally includes analysis and interpretation, as well as collection and classification of cultural materials.'[২]

ক্ষেত্রসমীক্ষা কর্মটি সাধারণত কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয়। যথা—

১। এলাকা বা অঞ্চল

২। জাতিগত বা ঐতিহ্যগত এবং

৩। কোনো বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক।

যদি কোনো একটি বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয় তবে সেই বিশেষ বিষয় সম্পর্কে অঞ্চলগত ও জাতিগত বা ঐতিহ্যগত ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায় ক্ষেত্রসমীক্ষাটির মাধ্যমে। সাধারণত ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোন একটি বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট এলাকার উপরে আলোকপাত করা হয়। যেমন—লোকসংস্কৃতির উপর ক্ষেত্রসমীক্ষা, সামুদ্রিক

ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রভৃতি। আবার কখনো কখনো ক্ষেত্রসমীক্ষাকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র পরিসরেই অন্তর্ভুক্ত রাখা হয় না। যেমন—লোকজীবনকেন্দ্রিক ক্ষেত্রসমীক্ষায় কেবলমাত্র গ্রামজীবনই আবদ্ধ থাকে না সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি সেখানে যেহেতু গ্রামজীবনের সীমা ছাড়িয়ে নগর জীবনেও প্রবেশ করে তাই সেক্ষেত্রে ততদূর অবধি ক্ষেত্রসমীক্ষার বিস্তার ঘটাতে হয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা বা ক্ষেত্রানুসন্ধান হল নৃ-বিজ্ঞানীদের তথ্য সংগ্রহের প্রধানতম পদ্ধতি যা 'ফিলড ওয়ার্কস মেথডস' (Field work methods) নামে অভিহিত হয় এবং যার দ্বারা নৃতত্ত্ব-জাতিগত গবেষণা-অনুশীলন সুনির্দিষ্টতা লাভ করে।[৩]

উপরিউক্ত 'ফিল্ড ওয়ার্কস মেথডস' এর ইংরেজী 'ফিল্ডওয়ার্ক' শব্দটির বাংলা অর্থ করলে হয়—'ক্ষেত্রানুসন্ধান,' 'ক্ষেত্রসমীক্ষা', 'ক্ষেত্রগবেষণা,' 'ক্ষেত্রকর্ম', 'ক্ষেত্রজরিপ' প্রভৃতি। নির্বাচিত স্থানে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়ে বিশিষ্ট উপকরণের ব্যবহারে ও পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ করাকে 'ক্ষেত্রসমীক্ষা', 'ক্ষেত্রানুসন্ধান,' 'ক্ষেত্রগবেষণা,' 'ক্ষেত্রকর্ম', 'ক্ষেত্রজরিপ' প্রভৃতি বলা হয়। পুরাতনীচর্চার প্রাথমিক পর্যায় ও শৌখিন লোকসংস্কৃতি চর্চার রোমান্টিক প্রয়াসের কাল অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের নৃতত্ত্ব সম্মত বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতির গুরুত্ব ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে ও বাড়তে থাকে। লোকসংস্কৃতি শাস্ত্রের শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় জ্ঞানানুশীলনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যা বর্তমানে লোকসংস্কৃতির গবেষণা অনুশীলনে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষেত্রসমীক্ষা হল প্রত্যক্ষ পটভূমিতে একটি বিশিষ্ট বিষয়ের অভিনিবিষ্ট অনুশীলন। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হল সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণাগার তাই লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিকে 'ক্ষেত্রবিজ্ঞান' বলে উল্লেখ করা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানীকে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে তার বিষয়গত জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতাকে সমৃদ্ধ করে যার মধ্য দিয়ে সে এক নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। জাতীয় উপাদানসমূহের ও জাতীয় কল্যাণমুখী কর্মের সঠিক প্রয়োগ ও মূল্যায়ন মূলত নির্ভর করে বিশদ ও বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর। তাই ক্ষেত্রসমীক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে বলা যায়—

> 'One developed area in Folklore studies is the collection of folklore in its proper context. Only when this is done can collected materials have qualitative as well as quantitative value, depth as well as breath.'[৪]

> 'Fieldwork is the principal method by which anthropologists gather information'[৫]

সমাজবিজ্ঞান লোকসংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ববিদদের কাছে কোনো বিষয়ে গঠিত সুসংবদ্ধ তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা হল প্রধানতম পদ্ধতি। সক্ষম ক্ষেত্রগবেষণাকারী বা ক্ষেত্রানুসন্ধানী গবেষক সংগ্রাহকের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োজনীয়তা

লোকসংস্কৃতি গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এটা একদিকে যেমন লোকসংস্কৃতির গবেষণা অনুশীলনের পথকে প্রশস্ত করে অন্যদিকে একে লোকসংস্কৃতি গবেষকদের কাছে প্রাথমিক পাথেয় বলা যায়। এ বিষয়ে তুষার চট্টোপাধ্যায়ে তার *'লোকসংস্কৃতি তির তত্ত্বরূপ ও সন্ধান* গ্রন্থে বলেছেন-

> "ক্ষেত্রনুসন্ধান লোকসংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে, কারণ ক্ষেত্রনুসন্ধান লোকসংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে উদ্ধার করে আনে এবং লোকসংস্কৃতির গবেষণা অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করে।"[৬]

গবেষকরা নির্বাচিত বিষয়ে ক্ষেত্রানুসন্ধানের দ্বারা মূল তথ্য ও উপকরণসমূহ সংগ্রহ করেন যার মধ্য দিয়ে একটি তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত বা বিশ্লেষণমূলক সত্যে উপনীত হন। তাই ১৯৪২ সালের ১১ই এপ্রিল এ বিষয়ে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আলেকজান্ডার ক্রেপ বলেছিলেন—

> 'The field worker is undoubtedly doing the more important works, because without him the analyst would have nothing to do.'[৭]

লোকসংস্কৃতিচর্চায় ক্ষেত্রানুসন্ধান না করলে নানারকম বিভ্রান্তি, সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের অভাব, সঠিক তথ্য না পাওয়ার সম্ভাবনা এবং ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং তার সঠিক পদ্ধতিগত প্রয়োগ লোকসংস্কৃতিচর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসংস্কৃতিচর্চা শুধুমাত্র বাহ্যিকজ্ঞান বা তথ্যাদির উপর নির্ভর করে সার্থকরূপ লাভ করতে পারে না। সঠিক ক্ষেত্রসমীক্ষা সেখান থেকে প্রাপ্ত সঠিক তথ্যাদির সংগ্রহ তার পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ তাকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করে। ক্ষেত্রসমীক্ষা ব্যতীত লোকজীবনের বাস্তব পরিচয় পাঠ অসম্ভব এবং একমাত্র ক্ষেত্রসমীক্ষাই লোকসংস্কৃতিচর্চার সার্থকতার অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক শর্ত। একজন গবেষক ততক্ষণ পর্যন্ত লোকসংস্কৃতিবিদরূপে পরিগণিত হতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কর্মপ্রচেষ্টার পরিচালিকা শক্তির প্রেরণা ও উদ্যম এবং অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞান তার ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয়। ক্ষেত্রানুসন্ধানকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়—

১। প্রারম্ভিক কার্য

২। পূর্ব প্রস্তুতি

৩। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষা

৪। পরবর্তী অনুশীলন

এই চার বিভাগানুযায়ী ক্ষেত্রসমীক্ষা কার্যের যে কর্মসম্পাদন করা হয় তা চারপ্রকার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে যথা—

১. লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সাধারণ তত্ত্বমূলক জ্ঞান।

২. অনুসন্ধানমূলক বিষয়গত জ্ঞান।

৩. সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান ক্ষেত্র সম্পর্কিত আঞ্চলিক জ্ঞান।

৪. প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রগবেষণা সংক্রান্ত পদ্ধতিবিদ্যাগত জ্ঞান।

১. সাধারণ তত্ত্বমূলক জ্ঞানের দ্বারা লোকসংস্কৃতি গবেষক তাঁর নির্বাচিত বিষয়টির স্বরূপ ও পরিধি বিষয়ে অবহিত হন। এক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তত্ত্বমূলক জ্ঞান তার কাজের পথনির্দেশক বলা যায়। যা তার মূল কাজটির সমস্যা ও সমাধানের পদ্ধতি বা উপায় নির্বাচনে সহযোগিতা করে। সুরভী বন্দ্যোপাধায় তাঁর *'গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি'* গ্রন্থে বলেছেন—

> "বিষয় নির্বাচনের সময় গবেষকের নিজস্ব ক্ষমতার পরিমাণও অবশ্য বিবেচ্য। নির্বাচিত বিষয়টির সাধারণ উপযোগিতা আছে কি না, বিষয়ের বক্তব্য, সুযোগ, গভীরতা, সীমাবদ্ধতাকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা যাবে কি না, বিষয় নিরীক্ষণের পদ্ধতিটি আয়ত্ত করা সম্ভব কি না, বিষয়ের উপযোগী তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব কি না-নির্দিষ্ট সময় ও শব্দসীমার মধ্যে গবেষকের কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে কি না—এই সকল দিকগুলির কথাও বিষয় নির্বাচনের প্রাথমিক স্তরেই ভেবে রাখতে হবে"[৮]

২. ক্ষেত্রসমীক্ষার পূর্বে গবেষক তার বিষয়টির উদ্দেশ্যনুযায়ী তত্ত্বজ্ঞানের অতিরিক্ত পরিকল্পনা-অভিমুখীন বিষয়গত সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন।

৩. ক্ষেত্রসমীক্ষাটিকে সার্থকরূপে সম্পাদন করার জন্য নির্বাচিত স্থানের আঞ্চলিক ও জনতত্ত্বগত পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হন।

৪. সর্বশেষে ক্ষেত্রসমীক্ষাকারী ক্ষেত্রসমীক্ষায় ক্ষেত্রানুসন্ধানকর্মের পদ্ধতিবিদ্যাগত জ্ঞান এবং পূর্ববর্তী ক্ষেত্রানুসন্ধানকর্মের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা তার স্বকীয় ক্ষেত্রসমীক্ষা কর্মের পথ প্রদর্শক রীতি-পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে।

সুতরাং উপরের চারটি বিষয় থেকে এ কথা বলা যায় যে, ক্ষেত্রসমীক্ষায় গবেষকের সাধারণ তত্ত্বজ্ঞান, বিষয়গত উপলব্ধি, নির্দিষ্ট বস্তু বা স্থান বিষয়ক জ্ঞান, ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতিবিদ্যাগত জ্ঞান লোকসংস্কৃতি কর্মে একান্তই গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপায় যার দ্বারা লোকসংস্কৃতির কাজটি সঠিক, নির্ভুল অব্যাহত ভাবে ঘটতে পারে।

লোকসংস্কৃতিচর্চায় লোকসংস্কৃতিবিদদের কর্মপরিধিকে বিশ্লেষণ করলে চারটি বিষয় পাওয়া যায়। যথা—

প্রথম, ক্ষেত্রসমীক্ষা

দ্বিতীয়, ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিভাজন

তৃতীয়, সেগুলির সংরক্ষণ ও সংকলন

চতুর্থ, অনুশীলন

এই শেষোক্ত পর্যায় 'অনুশীলন' অর্থাৎ সেখানে লোকসংস্কৃতির বিষয়টির উপাদান-উপকরণের বিচার-বিশ্লেষণ তাৎপর্য, প্রভৃতির ব্যবহার বা প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে অনুশীলন করা হয় তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে প্রথম পর্যায় অর্থাৎ 'ক্ষেত্রসমীক্ষা' থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের উপর।

ক্ষেত্রসমীক্ষা লোকসংস্কৃতি গবেষকদের বহুবিধ অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞানের পূর্ণতার সম্প্রসারণ ঘটায় এবং সুসংহতি লাভ করায় ক্ষেত্রসমীক্ষা কেবলমাত্র জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটায় না, সংশ্লিষ্ট সকল পাঠকের পাঠ্যপুস্তকের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি ঘটায় এবং অনুশীলন কর্মটিকে সজীব করে তোলে। ভারতবর্ষের অধিকাংশই গ্রামজীবন। গ্রামজীবনই ভারতীয় জনজীবনের ও সংস্কৃতির আখর। এখানেই অধিকাংশ মানুষের বসতি। তাই ভারতীয় লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে গ্রামসমীক্ষার মূল্য সবচেয়ে প্রথমে দিতে হবে। এদেশের উন্নয়নশীলতার সাথে সাথে গ্রাম সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই বিবর্তনের কারণেই গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির কাঠামোর সমীক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন।

নৃতাত্ত্বিক বা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছেও ক্ষেত্রসমীক্ষার স্বতন্ত্র্য মূল্য রয়েছে। তাঁরা যেকোনো সংস্কৃতি বলয়ের সংস্কৃতিরেণুগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীক্ষা ও সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করেন। সুতরাং এ কথা স্বীকার্য যে সফল গবেষণা কাজে ক্ষেত্রসমীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

পদ্ধতি

ক্ষেত্রসমীক্ষার গুরুত্ব ও সংগ্রহ পদ্ধতি বিষয়ে প্রথম নজর দেন নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা। ক্ষেত্রসমীক্ষায় যে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির প্রয়োগ হয় তা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুইডেনে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহে বিশেষভাবে ব্যবহার হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানীতেও এই বিষয়টির ব্যবহার ছিল। এর পরবর্তীকালে নৃতত্ত্ববিদগণ যে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেন তাকে বলা হয় 'General Methodology-Ethnographic Approach to Field Work'। এরপর হার্বাট হালপার্ট ক্ষেত্রসমীক্ষার জাতিত্ত্বমূলক পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ করেন। এলেন লোমাকস সেই জাতিতত্ত্বমূলক পদ্ধতিতে উপযোগবাদ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রয়োগ করেন। ম্যাকএডওয়ার্ড লীচ এই পদ্ধতি প্রয়োগকে সমর্থন করেন। এর পরবর্তীকালে নৃতাত্ত্বিকগণ ও লোকসংস্কৃতিবিদগণের প্রচেষ্টায় ক্ষেত্রসমীক্ষার পদ্ধতি প্রয়োগে আরও উন্নতি ঘটে। যাদের মধ্যে ফ্র্যাজ্ঞ বোয়াস, মেলভাইল, হার্সকোভিষ্ট, উইলিয়ম ব্যাসকস প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

'লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা' গ্রন্থে রেবতীমোহন সরকার বলেছেন—

> "বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষার কাজ শুরু করার পূর্বে কর্মক্ষেত্রটিকে বিশেষভাবে তৈরি করে নিতে হবে। সমীক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণীত হয়ে গেলেই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিদান করতে হবে। লক্ষ করার বিষয় যে সমীক্ষা কাজটি কতখানি ফলপ্রসূ হবে তা এগুলির কার্যকরী প্রয়োগের উপরেই নির্ভর করবে। কৃষিক্ষেত্র ঠিকমত প্রস্তুত না হলে যেমন কৃষিকাজ করা যায় না ঠিক তেমনই সমীক্ষা ক্ষেত্রটি উপযুক্তভাবে তৈরি না করতে পারলে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যাবে না। ফলত, সমগ্র উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে"[৯]

ক্ষেত্রানুসন্ধান কর্মটি যথাযথ ভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন। সমীক্ষাকর্মের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্যবলি সংগ্রহের জন্য এই উদ্দেশ্য রচিত বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিসমূহের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর এগুলিকে প্রয়োজনানুযায়ী প্রয়োগ করার কৌশলকে আয়ত্ত করা আবশ্যিক কাজেই পদ্ধতিগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে তাদের মধ্যস্থিত সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে জেনে নিতে হবে। ক্ষেত্রানুসন্ধানে যথাযথ কর্মপদ্ধতি অনুসরণে মৌলিক, বিশুদ্ধ, সার্থক ও প্রামাণিক গবেষণালব্ধ ফল লাভ সম্ভব। এই কর্মপদ্ধতিটি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। যথা—

১। প্রারম্ভিক পর্ব

ক। এই পর্বে সাধারণ বিষয়গত পরিচয় পাওয়া যায়।

খ। অনুসন্ধান করার বিষয়টিকে স্থির করা হয়।

গ। ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য বিশেষ স্থান বা অঞ্চলটিকে নির্বাচন করা হয়।

২। ক্ষেত্রসমীক্ষায় যাত্রার প্রাক-প্রস্তুতি পর্ব

ক। তত্ত্বগত প্রস্তুতি—ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলন এবং ঐ বিষয় সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ করা হয়। এছাড়া ঐ বিষয়ের অনুরূপ বিষয়ে পূর্ববর্তী কোনো কাজ হয়ে থাকলে তাও পাঠ করা হয়। এরপর ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য নির্বাচিত অঞ্চলটির সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক নানান বিষয়ে ধারণা তৈরি করা হয়।

খ। সংযোগগত প্রস্তুতি—নির্বাচিত অঞ্চলটির সাথে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য সংযোগ স্থাপন করা হয়। অঞ্চলটির অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন সমীক্ষকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

গ। বস্তুগত প্রস্তুতি—ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা গ্রহণ করা হয়। সমীক্ষককে নির্বাচিত অঞ্চলটির মানচিত্র, সাক্ষাৎকারের জন্য প্রশ্নতালিকা, আবেদনপত্র, কাগজপত্র, কাগজ, কলম, নোট, বই, খাতা, ক্যামেরা, রেকর্ডার, ল্যাপটপ, চার্জার, মোবাইল, ট্রাইপড, ব্যাটারি প্রভৃতি গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্য যেমন—মশারি, টর্চ, খাবার, ঔষধ প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়।

৩। প্রাথমিক উপস্থিতি পর্ব—

এই পর্বে ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য যাত্রা করা হয়। নির্বাচিত অঞ্চলটিতে সমীক্ষক উপস্থিত হওয়ার পর এবং সেখানে অবস্থানের পর সমীক্ষককে তার প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি সম্পাদন করতে হয়। অঞ্চলটির অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে হয়।

৪। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধানকর্ম—

সমীক্ষককে উপযুক্ত সহায়ক অধিবাসী বা তথ্যদাতা নির্বাচন করতে হয়। ক্ষেত্রটি সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর তার স্থানীয় মানচিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে স্থানটির প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে হয় যেমন—গ্রামের নাম, পরিধি, থানা, পোস্ট অফিস, জনজাতি, মন্দির, উৎসব, ভাষা প্রভৃতি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত।

৫। উদ্দেশ্যমুখী কর্মসাধন—

এই পর্বে সমীক্ষককে তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্দেশ্যমুখী কর্মটি সাধন করতে হয়। তিনটি পর্যায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব। যথা—প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যাদিকে শ্রেণিবদ্ধ করে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে ঐ লিপিবদ্ধ তথ্যাদি থেকে মন্তব্যে উপনীতকরণ করা হয়।

৬। ক্ষেত্রসমীক্ষকের অভিজ্ঞতা—

এই পর্বে ক্ষেত্র কর্ম ও সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়। যথা- ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময়ে নানান সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়েও উল্লেখ করা হয়। এছাড়া স্থানীয় সহযোগিতা অসহযোগিতা, তথ্যাদি সংগ্রহে সুবিধা অসুবিধা ও নানান মতামত উল্লেখ করা হয়।

ক্ষেত্রগবেষণা পদ্ধতির সাহায্যে ক্ষেত্রসমীক্ষাটি সত্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব এবং নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণ তখনি সম্ভব যখন সমীক্ষক বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হন এবং তথ্য উপকরণগুলি সংগ্রহ করেন। এই উপকরণ সংগ্রহ বিষয়ক ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতির মুখ্য ধারা দুটি। যথা—

১। নমুনা সমীক্ষা পদ্ধতি—

বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর পরিমণ্ডল থেকে অল্প অংশ নির্বাচন করে সেটিকে প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপন করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করাই হল নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি। এর মূল বিশিষ্টতাগুলি হল— এই কৌশলটি কম ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ কারণ এটি হল ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের প্রতিফলন অর্থাৎ যখন সমরূপ কোন বিষয়ে গবেষণা করা হয় তখন এর মধ্যস্থিত কয়েকটি মাত্র একক এর অনুধাবন করে সমগ্র পরিমণ্ডলটির বিষয়ে ধারণা তৈরি করা হয়। এছাড়া এই পদ্ধতিতে নমুনার

আকার সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেটিকে বিস্তৃত ভাবে অধ্যয়ন করা যায় এবং বিভিন্ন তথ্যকে যাচাই করে যে-কোনো ধরনের সন্দেহকে দূর করা যায় যা সামগ্রিক অধ্যয়নে অসম্ভব। এই পদ্ধতিতে নমুনাটি যদি সমগ্র অধ্যয়ন পরিমণ্ডলকে সঠিক ভাবে প্রতিনিধিত্ব করে এবং অধ্যয়ন বিষয়টি যদি সমপ্রকৃতির হয় তাহলে নমুনার ফল সার্থক হয়।

নমুনা সমীক্ষা পদ্ধতি—

নমুনা সমীক্ষার কাজ সুসম্পন্ন ভাবে করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা—

ক। আভিপ্রায়িক বা ইচ্ছাকৃত নমুনাচয়ন, খ। অবাধ নমুনাচয়ন, গ। স্তরীভূত নমুনাচয়ন ঘ। নিয়মানুগ, ঙ। মিশ্র, চ। সুবিধামূলক, ছ। আত্ম-নির্বাচিত, জ। তুষারবল

ক। আভিপ্রায়িক বা ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমুখীন নমুনাচয়ন (Purposive sampling)

এক্ষেত্রে সমীক্ষক নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামতো নমুনাচয়ন করেন। সমীক্ষক যে বিষয়ে সজাগ থাকেন তা হল তাঁর অধ্যয়িত বিষয়বস্তুটি যেন সমগ্র অনুসন্ধান পরিমণ্ডলটিকে প্রতিনিধিত্ব বা চালনা করে এবং প্রক্রিয়াটি ইচ্ছাকৃত হলেও এর সংগ্রহ ও ব্যবহার যেন অগোছালো বা অসংযত না হয়।

খ। অবাধ নমুনাচয়ন (Random sampling)

এটি সর্বাধিক কার্যকরী ও ব্যবহৃত নমুনাচয়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণভাবে সম্ভাবনার উপরেই নির্ভর করে। সমীক্ষকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে এটি সম্পাদন করা হয় না। এটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অধ্যয়নের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী ও সুবিধাজনক একটি পদ্ধতি।

গ। মিশ্র নমুনাচয়ন (Startified sampling)

এটি উপরোক্ত ইচ্ছাকৃত এবং অবাধ নমুনাচয়ন এই দুটি পদ্ধতির মিশ্র একটি পদ্ধতি। তথ্য সংক্রান্ত স্তরগুলি নির্বাচনে ইচ্ছাকৃত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয় এবং প্রতিটি স্তর থেকে অধ্যয়ন এককগুলিকে নির্বাচনের জন্য অবাধ পদ্ধতিটিকে প্রয়োগ করা হয়।

ঘ। নির্ধারিত অংশের নমুনাসংগ্রহ পদ্ধতি (Quota sampling)

এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অধ্যয়ন পরিমণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে প্রতিটি স্তর থেকে অধ্যয়ন উপযুক্ত বিষয়গুলিকে নির্ধারণ করা হয় যাকে নির্ধারিত অংশ বলা যায়। এরপর সমীক্ষক গোষ্ঠীর মধ্যেকার প্রত্যেক সমীক্ষক তাদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নির্ধারিত অংশগুলিকে নির্বাচন করে সমীক্ষাকার্যটি করা হয়। সমগ্র কাজটি সুসম্পাদন সম্ভব তাদের সকলের মধ্যে সংহতি বজায়ের মাধ্যমে।

ঙ। গুচ্ছ নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Cluster sampling)

এই পদ্ধতিতে গুচ্ছাকার এককগুলিকে সংঘবদ্ধ করা হয়। অধ্যয়ন পরিমণ্ডলটি যখন সুবিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকায় ঘটানো হয় তখন এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয় তবে এই পদ্ধতিটি বহু সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ।

চ। সুবিধামূলক নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Convenience sampling)

এই পদ্ধতিতে সমীক্ষকের সুবিধা মতো অধ্যয়ন নমুনা নির্বাচন করা হয়। সমীক্ষকের সুবিধা মতো স্থান বা তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করা হয় তবে এটি স্বল্প সময় হলেও এর নির্ভরযোগ্যতাও খুবই কম।

ছ। আত্ম-নির্বাচিত নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Self selected sample)

অনেক সময় অধ্যয়ন পরিমণ্ডলের মানুষেরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তথ্য দান করেন। এই ধরনের সমীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত না হওয়ায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত হওয়ায় একে আত্ম-নির্বাচিত নমুনাচয়ন পদ্ধতি বলা হয়।

জ। তুষারবল নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Snowball sampling)

যখন কোন বৃহৎ পরিমণ্ডল থেকে তথ্যসংগ্রহ অসুবিধাজনক হয় তখন তুষারবল নমুনাচয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে বৃহৎ পরিমণ্ডলের যে সকল ছোট ছোট পরিসরে ঐ বিশিষ্টতা রয়েছে তাদের থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। তবে এক্ষেত্রে ঐ পরিসরগুলির মধ্যে সংযুক্ত হওয়ায় সংগৃহীত তথ্যটি একটি বিশালাকার ধারণ করতে পারে।

২। উপাদান সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য বা উপাদান সংগ্রহ বিষয়ে সুরভী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর '*গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি*' নামক গ্রন্থে বলেছেন—

> "তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হল, গবেষকের অনুসন্ধানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা। সাহিত্যিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিবিধ সমালোচনামূলক গ্রন্থ, আত্মজীবনী, বিচিত্র নান্দনিক মূল্যবোধ ও মতবাদ এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। তথ্য সংগ্রহের পর গবেষককে তার প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা বুঝে এই সকল তথ্যের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। এই সব তথ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক ও বৈপরীত্যমূলক মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই প্রয়োগ করা উচিত। পরিশেষে, গবেষককে মনে রাখতে হবে, সংগৃহীত তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ভাবাবেগ, যুক্তিবর্জিত মতপ্রাধান্য নয়, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিই তার বক্তব্যকে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। গবেষককে সর্বদা মনে রাখতে হরে, যা ছাপার হরফে প্রকাশিত তাই সর্বদা নির্ভুল বা গ্রহণযোগ্য নয়, আর সেই কারণেই তথ্যগুলির সচেতন পরীক্ষা ও সততা যাচাই করা একান্ত কর্তব্য"[১০]।

ক্ষেত্রসমীক্ষার উপাদান সংগ্রহ পদ্ধতিটি চারটি পর্যায়ে ঘটে। যথা—

ক। পর্যবেক্ষণ- ক্ষেত্রসমীক্ষাকার্যে পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি দুই প্রকার। যথা—অ) অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ এবং আ) নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ

অ) অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ—অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ আবার দুই প্রকার। যথা—

প্রথম, অনিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণহীন পর্যবেক্ষণ—এই পদ্ধতিতে সমীক্ষক ক্ষেত্রে অবস্থান না করে সমীক্ষার কাজটি করেন ফলে এই পর্যবেক্ষণের গুরুত্বও কম।

দ্বিতীয়, অনিয়ন্ত্রিত অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ—এই পদ্ধতিটি সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। তবে এর সাফল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রসমীক্ষকের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। তিনি ক্ষেত্রটিতে অবস্থান করে কর্মসম্পাদন করেন এর ফলে তিনি ক্ষেত্রটির সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

আ) নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ—এই পর্যবেক্ষণ লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষার সহায়ক পদ্ধতি নয়। এটি একটি কৃত্রিম পদ্ধতি। এটিকে গবেষণাগারে পরীক্ষার সমতুল্য বলা যায়।

খ) সাক্ষাৎকার- ক্ষেত্রসমীক্ষায় পর্যবেক্ষণ পর্যায়ের পরের পর্যায় হল সাক্ষাৎকার। চারটি উপায়ে এই পর্যায়টি সম্পাদিত হয়। যথা—অ) স্বতঃস্ফূর্ত বা নির্দেশবিহীন সাক্ষাৎকার, আ) উদ্দেশ্যমুখী বা নির্দেশানুসারী সাক্ষাৎকার, ই) কেন্দ্রীভূত বা সুসংহত সাক্ষাৎকার, ঈ) সুগভীর বা গভীরতামূলক সাক্ষাৎকার।

অ) স্বতঃস্ফূর্ত বা নির্দেশবিহীন সাক্ষাৎকার- এই সাক্ষাৎকারে উত্তরদাতা মুখ্য স্থানে অবস্থান করেন। উত্তরদাতার ইচ্ছানুসারেই অলোচনা চলে বা সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়।

আ) উদ্দেশ্যমুখী বা নির্দেশানুসারী সাক্ষাৎকার- এই সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার গ্রাহক বা প্রশ্নকর্তা মুখ্য স্থানে অবস্থান করেন। পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নির্দেশিকার মাধ্যমে গ্রাহক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন।

ই) কেন্দ্রীভূত বা সুসংহত সাক্ষাৎকার- এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ঘটনার সাথে যুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় পূর্ব পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকার মাধ্যমে। এটিকে শাসনাধীন সাক্ষাৎকারও বলা যায়।

ঈ) সুগভীর বা গভীরতামূলক সাক্ষাৎকার- এই সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রাহক উত্তরদাতার মনের গভীরে কৌশলে প্রবেশ করে তার ব্যক্তিত্বের গতি প্রকৃতি ও অভিপ্রায় অনুধাবন করেন। এটিকে মনোসমীক্ষার একটি পর্যায়ভুক্ত বলা যায়।

গ) প্রশ্নমালা নির্মাণ

এই পর্যায়ে সমীক্ষক সাক্ষাৎকারের পূর্বে একটি প্রশ্নমালা নির্মাণ করেন। যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র সাক্ষাৎকার অংশটির রূপনির্মাণ করা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় এই প্রশ্নমালা নির্মাণ ক্রিয়াটি দুটি পদ্ধতিতে ঘটে। যথা— অ) সংগঠিত প্রশ্নমালা ও আ) অসংগঠিত প্রশ্নমালা

অ) সংগঠিত প্রশ্নমালা- এই প্রশ্নমালা আবার দুরকমের হয়। যথা- অবাধ প্রশ্নমালা এবং সীমিত প্রশ্নমালা।

অবাধ প্রশ্নমালায় কেবলমাত্র প্রশ্ন থাকে, উত্তরদাতা তার ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি উত্তর দিতে পারেন আর সীমিত প্রশ্নমালায় প্রশ্ন থাকে কিন্তু তার উত্তরকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। যেমন—উত্তরে হ্যাঁ বা না এর বিষয় থাকলে উত্তরদাতার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতাকে এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

আ) অসংগঠিত প্রশ্নমালা- এই প্রশ্নমালায় কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে না। প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার ‘ছক’ লিপিবদ্ধ করা থাকে। সাক্ষাৎকার গ্রাহক তার ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী আগে পরে প্রশ্নগুলি স্থাপন করে উত্তর সংগ্রহ করেন।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় উপকরণ সংগ্রহ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি হল :

(ক) শব্দগ্রাহক যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ

(খ) আলোকচিত্র ও ক্যামেরার ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ (স্থির, চলমান)

(গ) কাগজ-কলমে নোট গ্রহণ

(ঘ) সংক্ষিপ্ত লিখন

(ঙ) শব্দ-প্রতিবেদন যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ

(চ) লেখ-অঙ্কন এবং

(ছ) প্রত্যক্ষ সমীক্ষণ

ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজটিকে সফল করে তোলার নেপথ্যে সেই বিষয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ও সামগ্রিক সংস্কৃতির জ্ঞান, তত্ত্ব ও পদ্ধতি বিদ্যাগত জ্ঞানের সাথে প্রয়োজন হয় পূর্ববর্তী গবেষকগণের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নির্ভর তথ্যাবলি। সেই সাথে প্রয়োজন ক্ষেত্রগবেষকের যোগ্যতা ও সুকার্য পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ সচেতনতার। পূর্বে ক্ষেত্রগবেষকের কাজ ছিল—বিষয় সমুহ পর্যবেক্ষণ, নথিভুক্তকরণ, ফটোচিত্র, ভাষ্যপাঠ্য সংগ্রহ করা ও রেকর্ড করা প্রভৃতি। ঐ সংগৃহীত তথ্যাদির মূল্যায়নের কাজ করতেন অপর এক শ্রেণীর গবেষক। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় যিনি মূল্যায়ন করেন তিনিই প্রত্যক্ষভাবে তথ্যাদিসংগ্রহ করেন। একজন সার্থক ক্ষেত্রসমীক্ষকের সমীকরণ হল তিনি একাধারে একজন শিক্ষাবিদ, কলাবিদ, ঐতিহাসিক, জনসংযোগে সমর্থক, সংস্কৃতি সচেতন এবং যান্ত্রিক কারিগর।

আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীর কাছে কোন গতানুগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সার্থক ক্ষেত্রসমীক্ষা সম্ভব নয়। ক্ষেত্রগবেষককে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র ও সংগৃহীত বস্তুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং কোন গতানুগতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ না করে বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে কাজটির

পরিকল্পনা গ্রহণ ও ক্ষেত্রানুসন্ধান পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যাতে প্রচলিত পদ্ধতিগুলির গ্রহন-বর্জনের মাধ্যমে এক নতুন অনুসন্ধিৎসুতায় উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং যে বিষয়গুলি একজন গবেষকের একটা সার্থক ক্ষেত্রসমীক্ষা ঘটাতে পারে তা হল—প্রচলিত পদ্ধতিবিদ্যাগত জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ক্ষমতা, প্রয়োজনানুযায়ী নতুন কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ সম্পর্কিত দক্ষতা।

১.২ প্রাকপ্রস্তুতি, প্রশ্নপত্র ও এলাকা নির্বাচন

প্রাকপ্রস্তুতি

ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে পূর্ব প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন। গবেষণাটির পূর্বে ক্ষেত্রসমীক্ষক দ্বারা প্রকৃত সমীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমুহের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে। সমীক্ষার বিষয় নির্বাচনের পর ক্ষেত্রটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর মানচিত্রের ব্যবহারে তার ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে সঠিক ধারণা তৈরি করার জন্য সেখানকার ভূপ্রকৃতির গঠন বৈশিষ্ট্য বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা হয়েছে। তারপর ঐ স্থানে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ব্যবস্থা এবং তার ব্যয় বিষয়ে ও নির্বাচিত অঞ্চলটির প্রশাসনিক কার্যালয়, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বাজার দোকান, থানা, পোস্ট অফিস প্রভৃতি বিষয়ের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি স্থানটির অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার পূর্বেই এই সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং নিম্নলিখিত পদ্ধতি বা ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে—

১। প্রারম্ভিক পর্বের প্রস্তুতি-

প্রাকপ্রস্তুতির প্রারম্ভিক পর্বে যে বিষয়গুলি গ্রহণ করা হয়েছে তা হল—

ক) বিষয়গত পরিচয়- নানান পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রভৃতি থেকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে সমীক্ষক বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় জ্ঞান লাভ করেছেন এবং নির্বাচিত বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বে যে সমস্ত আলোচনা, গবেষণা হয়েছে সেগুলি অনুসন্ধান করে তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করছেন।

খ) উদ্দেশ্য নির্ধারণ- সমীক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য হল সমীক্ষার উদ্দেশ্য স্থির করা। ক্ষেত্রসমীক্ষাটির উদ্দেশ্য কি জানা না থাকলে কোনো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাই সমীক্ষক প্রাথমিক ভাবে সেই কাজটি সম্পাদন করেছেন।

গ) অঞ্চল নির্বাচন- প্রাথমিকভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিশেষ অঞ্চলগুলিকে নির্বাচন করা হয়। আকস্মিকভাবে গ্রাম সমীক্ষাতে ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে তাই সমীক্ষা ক্ষেত্রে পৌঁছানোর পূর্বেই অঞ্চলটিতে অবস্থানের সময়, কাজের পরিকল্পনা ও পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে।

২। যাত্রার পূর্বপ্রস্তুতি-

প্রাথমিক পর্বের প্রস্তুতির পর ক্ষেত্রসমীক্ষক ক্ষেত্রে যাত্রার পূর্বেকার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। এই প্রস্তুতির তিনটি পর্যায় ছিল। যথা—

ক) তত্ত্বগত প্রস্তুতি- সমীক্ষক দ্বারা নির্বাচিত বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে নানান গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করা হয়েছে এবং তার কাজের অনুরূপ যে সমস্ত কাজ পূর্বে হয়েছিল সেগুলি বিষয়ে পাঠ করা হয়েছে। এরপর সমীক্ষক তার নির্বাচিত বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে ওই স্থলটি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা তৈরি করেছেন। কোনো স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করার পূর্বে সেখানকার ভূপ্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন কারণ কোনো স্থানের ভূপ্রকৃতির ধরনের সাথে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে। সমীক্ষক সেই কাজটিও করেছেন।

খ) সংযোগগত প্রস্তুতি- সমীক্ষক তার নির্বাচিত বিশেষ অঞ্চলটির সাথে সংযোগস্থাপন করবেন। ক্ষেত্রটির স্থানীয় অধিবাসীগণের সাথে তাকে সংযোগ তৈরি করতে হবে এবং ক্ষেত্রসমীক্ষা কার্যের ঐ কয়দিন অবস্থান করার জন্য অঞ্চলটিতেই কোন একটি নিরাপদ আবাসস্থল তাকে নির্ধারণ করতে হবে ও তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

গ) বস্তুগত প্রস্তুতি- ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময় সমীক্ষকের নানান বস্তুর প্রয়োজন হয় এবং সমীক্ষা ক্ষেত্রে অবস্থান করার সময় সমীক্ষকের দৈনন্দিন ব্যবহারিক বস্তুরও প্রয়োজন হয় তাই সমীক্ষাকার্যের পূর্বে সমীক্ষকের সেই সকল বস্তুসংক্রান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যেমন—তার কাজসংক্রান্ত পত্র পত্রিকা, গ্রন্থাদি, প্রশ্নাবলী, নির্বাচিত অঞ্চলের একটি মানচিত্র, সমীক্ষা কার্যের স্থান ও কাল অনুযায়ী নিজের পোশাকবিধি, এছাড়া সমীক্ষাকার্যে ব্যবহৃত দ্রব্য যথা—কাগজ, কলম, রেকর্ডার, ক্যামেরা, ল্যাপটপ, চার্জার প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র প্রয়োজন তা প্রস্তুত করা হয়েছে। সেই সাথে সমীক্ষক তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও আপতকালীন যে সকল দ্রব্য প্রয়োজনীয় যেমন- দেশলাই, মোমবাতি, খাবার, টর্চ, দড়ি, মশারি, ঔষধপত্রাদি প্রভৃতির প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

৩। প্রাথমিক পর্বের প্রস্তুতি-

এরপর ক্ষেত্রসমীক্ষক নির্বাচিত ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন এবং কার্যটি শুরুর পূর্বে কর্মক্ষেত্রটিকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করেছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ এই প্রস্তুতির উপরেই সমীক্ষাটির ফল নির্ভর করে। যেহেতু এটি উপযুক্ত ভাবে করতে না পারলে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় না ফলত সমগ্র কর্মটি সার্থকতা লাভ করতে অক্ষম হয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় গ্রামের অধিবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য এবং কাজটি সম্পাদনের জন্য ওই স্থলে সমীক্ষককে কয়েকদিন অবস্থান করতে হয়েছে তাই ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই ওই স্থানে নিজের সাময়িকভাবে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হয়েছে। এরপর সমীক্ষক গ্রামের মানুষদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করেছেন। তাদের মতো করে যথাসম্ভব

তাদের সাথে মিশে গিয়ে নিজের সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য এবং কতদিন সেখানে অবস্থান করবেন সে সম্পর্কে তাদের অবহিত করেছেন। সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে যে সকল মানুষদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া সম্ভব সেই মানুষগুলির মনে প্রথমে নিজের প্রতি আস্থা তৈরি করেছেন তার পর তাদের সাথে সম্প্রীতিমূলক সংযোগ ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্বন্ধস্থাপন করে সমীক্ষাকার্যটি করেছেন।

৪। ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কর্মের পূর্বে প্রস্তুতি-

সমীক্ষক সমীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তথ্যসংগ্রহ কর্মটি শুরু করার পূর্বে যে সকল প্রস্তুতই নিয়েছেন সেগুলি হল—

বয়সে অত্যন্ত তরুণরা সামাজিক কোনো বিষয়ে দীর্ঘদিনের ধারণা সম্পর্কে অবহিত হন না তাই সে সম্পর্কে কোনো বিশেষ ধারণা তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না আবার সমকালীন বা সাম্প্রতিক বিষয়ে তারাই বিশেষ অবহিত হন। সুতরাং সমীক্ষকের জিজ্ঞাস্য বিষয় অনুযায়ী ক্ষেত্রবন্ধু নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেই সাথে ক্ষেত্রবন্ধুকে ঐ বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করানোও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কারণ সমীক্ষক ও তথ্যদাতা ক্ষেত্রবন্ধু উভয়ের আন্তরিকতা, আগ্রহ, নিষ্ঠায় সঠিক তথ্য সংগৃহীত হয় তাই ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে অনুসন্ধান কর্মের পূর্বে ক্ষেত্রসমীক্ষক সঠিক সংবাদ বা তথ্যদাতা নির্বাচন করেছেন।

কোনো স্থানের ক্ষেত্রসমীক্ষা করার পূর্বে সেই স্থানের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, রীতি-নীতি বিষয়ে সমীক্ষক অবহিত হলে কাজটি সার্থক করতে অনেক সুগম হয়। এছাড়া এই বিষয়ে অবহিত হলে সেখানকার মানুষজন প্রভাবিত হন, ফলত তার প্রতি সহানুভূতিশীল মনস্ক হন এতে তার কর্মসম্পাদন সহজ হয় তাই সমীক্ষক আঞ্চলিক রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

কোনো স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময় সেখানকার অধিবাসীদের সাথে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমীক্ষক তথ্য সংগ্রহ করেন তাই তাদের ভাষা বিষয়ে সমীক্ষক বোধগম্য হয়েছেন।

স্থানের নাম, আয়তন, সীমানা, অধিবাসীদের জাতি, ভাষা, পেশা, থানা, পোস্ট অফিস, বাজার, রেল স্টেশন, দোকান, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, ধর্মক্ষেত্র, সভা-সমিতি, উৎসব প্রভৃতি অর্থাৎ ঐ স্থানটি সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করা হয়েছে।

কোনো স্থানের অবিাসীদের উপর সমীক্ষাকার্য করার পূর্বে প্রশাসনকে সেই কাজ সম্পর্কে জানানো এবং অনুমতি নেওয়া জরুরি। সেই কাজটিও সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রশ্নপত্র

ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে মূলতঃ চারটি পর্যায়ে । যথা---

(ক) পর্যবেক্ষণ, (খ) সাক্ষাৎকার, (গ) প্রশ্নমালা নির্মাণ এবং (ঘ) বিষয়টি সম্পর্কে সমীক্ষা।

পর্যবেক্ষণ বিষয়টি ক্ষেত্রসমীক্ষা কার্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত্রসমীক্ষায় পর্যবেক্ষণ এর পরের পর্যায় হল সাক্ষাৎকার। এই পর্যায়ে সমীক্ষক তার বিষয় সম্পর্কিত ব্যক্তিজনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নানান তথ্যসংগ্রহ করেছেন। সাক্ষাৎকারের পূর্বে সমীক্ষক একটি প্রশ্নপত্র নির্মাণ করেছেন। পূর্বপরিকল্পিত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তিনি ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকারের সময় নির্বাচিত সংবাদদাতার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছেন।

প্রশ্নমালার ভাষা স্পষ্ট, সহজবোধ্য ও স্বল্পায়তনের। বিতর্কিত, জটিল বিষয়কে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রশ্নমালা নির্মাণ দুটি পদ্ধতিতে ঘটেছে। যথা—১। সংগঠিত প্রশ্নমালা এবং ২। অসংগঠিত প্রশ্নমালা।

১। সংগঠিত প্রশ্নমালা- এই প্রশ্নমালা দুরকম হয়। যথা—অবাধ প্রশ্নমালা এবং সীমিত প্রশ্নমালা।

অবাধ প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রশ্ন থাকে, উত্তরদাতা তার ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি উত্তর দিতে পারেন। এই ধরনের প্রশ্ন এই প্রশ্নমালায় কমই ছিল আর সীমিত প্রশ্নমালায় প্রশ্ন থাকে কিন্তু তার উত্তরকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। যেমন—উত্তরে হ্যাঁ বা না এর বিষয় থাকলে উত্তরদাতার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয় এই ধরনের প্রশ্ন বেশ কিছু সংখ্যক রাখা হয়েছে।

২। অসংগঠিত প্রশ্নমালা- এই প্রশ্নমালায় কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে না। প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার ‘ছক’ লিপিবদ্ধ করা থাকে। সাক্ষাৎকার গ্রাহক দ্বারা তার ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী আগে পরে প্রশ্নগুলি করে উত্তর সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নমালায় প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা রক্ষাও এক্ষেত্রে করা হয়েছে। প্রশ্ন প্রতিবাদ্য তালিকা পদ্ধতিটি তিনটি রীতিতে হয়। যথা— দ্বৈতরূপী প্রশ্ন, বহুমুখী নির্বাচন এবং বাচ্য তালিকা। দ্বৈতরূপী প্রশ্ন এর ক্ষেত্রে উত্তর এভাবে লিপিবদ্ধ থাকে—হ্যাঁ/না, ভালো/খারাপ, ঠিক/ভুল প্রভৃতি। প্রশ্নমালাটিতে প্রয়োজনে এরকম বেশকিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছে। বহুমুখী নির্বাচনের এক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত একাধিক সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে। এরকম প্রশ্ন এই তালিকায় বিশেষ রাখা হয়নি এবং বাচ্য তালিকা হল যেখানে সম্পর্কহীন বা ক্ষীণ সম্পর্কযুক্ত উত্তর-সমন্বিত প্রশ্নতালিকা দেওয়া থাকে। গুরুত্ব অনুযায়ী সেখানে নির্দেশিত সংখ্যার উত্তর প্রদানে প্রার্থিত হয়। এই বিষয়টিকেও এই সাক্ষাৎকারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব হল গাজন উৎসব। গাজন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি জনপ্রিয় লোকনাট্যও বটে। এই গবেষণা সন্দর্ভের বিষয় হল ‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’। বর্তমানে পূর্বের গাজন উৎসবের জনপ্রিয়তা অনেক হারিয়েছে আবার পেশাদারি গাজনপালা দলের জনপ্রিয়তা বর্তমানে যথেষ্ট। চারিদিকে মনোরঞ্জনের হরেক উপাদান থাকা সত্ত্বেও গাজনপালা তার জনপ্রিয়তা কিভাবে বজায় রেখেছে? ভবিষ্যতেই বা কতটা তা ধরে রাখা সম্ভব? এই পেশায় যুক্ত মানুষগুলির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কয়েকটি জনপ্রিয়

গাজনদলের শিল্পী, অভিনেতা, বাদ্যকার, তত্ত্বাবধায়ক, মালিক ও অন্যান্য সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে একটি প্রশ্ন তালিকা গঠন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ওই প্রশ্নতালিকাভুক্ত। যথা—

১. গাজন শিল্পকলার শিল্পীদের শ্রেণিবিভাজন বা বর্গীকরণ

২. আঞ্চলিক বিস্তার-ক্ষেত্র নির্ধারণ,

৩. শিল্পীদের পরিচয়, বয়স, পারিবারিক পেশা, অন্য কোনো পেশা

৪. বাণিজ্যিক পরিস্থিতি, জনপ্রিয়তার পরিসীমা নির্ধারণ, সম্ভাব্য পরিস্থিতি অনুমান, ধর্মীয় প্রেরণা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, এই শিল্পকর্ম খণ্ডকালীন নাকি পূর্ণকালীন, বাৎসরিক আয়, শিল্পীর অর্থনৈতিক মান, কৃষি ও এই শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

৫. শিল্পকলায় ব্যবহৃত উপকরণ—দল চালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ম্যানেজার বা দলমালিকের বাৎসরিক খরচের পরিমাণ।

৬. দলের নাম, ঠিকানা, অনুষ্ঠানের অঞ্চলের সীমা, অনুষ্ঠানের বাৎসরিক সংখ্যা, অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্য, দলের বয়স বা প্রাচীনতা, শিল্পীসংখ্যা, তাদের বর্ণ বা শ্রেণি।

৭. শিল্পীদের বাৎসরিক অবসর, তাদের বিদ্যায়তনিক শিক্ষা কতদূর, সন্তানদের শিক্ষা, ভবিষ্যত স্বপ্ন।

৮. কতটা রূপান্তর ঘটেছে, শিল্পোন্নয়ন, জনপ্রিয়তা, সাম্প্রতিক সমস্যা, সমাধানের উপায়।

এলাকা নির্বাচন

ক্ষেত্রসমীক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল ক্ষেত্র নির্বাচন। ক্ষেত্রসমীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র সেই সকল স্থান যেখান থেকে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমীক্ষক তার গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় উপরকরণাদি বা তথ্যাদি পেতে পারেন। নির্বাচিত সঠিক স্থান বা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলে এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি গবেষকের গবেষণা কাজের অনিবার্য উপায় অবলম্বন।

ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে এলাকা নির্বাচন প্রয়োজন। সমীক্ষার বিষয় নির্বাচনের পর ক্ষেত্রটিকে নির্বাচন করা হয়। আকস্মিকভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষা করলে তাতে ফলপ্রসু হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ক্ষেত্র নির্বাচনের পূর্বে সেই ক্ষেত্রের নাম, অবস্থান, সেখানকার যানবাহন পরিস্থিতি কেমন সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। ক্ষেত্রটির একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরি করা প্রয়োজন। এরপর মানচিত্রের ব্যবহারে তার ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে সঠিক ধারণা তৈরি করা হয়। কোনো স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করার পূর্বে সেখানকার ভূপ্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন কারণ কোনো স্থানের ভূপ্রকৃতির ধরনের সাথে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন ওতপ্রোত ভাবে

জড়িয়ে থাকে। কোনো স্থানে ক্ষেত্র সমীক্ষা করার সময় সেখানকার অধিবাসীদের সাথে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমীক্ষক তথ্যসংগ্রহ করেন তাই তাদের ভাষা সম্পর্কেও সমীক্ষককে বোধগম্য ও অবগত হওয়া প্রয়োজন। কোনো স্থানের ক্ষেত্রসমীক্ষা করার পূর্বে সেই স্থানের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী রীতি-নীতি বিষয়ে সমীক্ষক অবহিত হলে কাজটি সার্থক করতে অনেক সুগম হয়। এছাড়া এই বিষয়ে অবহিত হলে সেখানকার মানুষজন প্রভাবিত হয়, ফলত তার প্রতি সহানুভূতিশীল মনস্ক হন এতে তার কর্মসম্পাদন সহজ হয়। সেই সাথে সমীক্ষকের অবস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। ক্ষেত্রটিতে অবস্থানের সময়, কাজের পরিকল্পনা ও পরিধি নির্ধারণ করতে হয়। এ ভাবেই সমীক্ষক তার সমীক্ষার বিষয়ের মূলে পৌছতে পারেন। তার সাথে প্রয়োজন নিরলস পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা।

গবেষণা সন্দর্ভটির বিষয় যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য তাই গাজন উৎসব ও লোকনাট্য গাজনপালা সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের জন্য গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য অঞ্চল হিসাবে নির্বাচিত করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে। গাজন উৎসব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে সকল অঞ্চল নির্বাচন করা হয় সেগুলি হল জয়নগর ও লক্ষীকান্তপুর অঞ্চল এবং লোকনাট্য রূপ গাজনপালা বিষয়ে পেশাদারি গাজনদলগুলির তথ্যসংগ্রহের জন্য যে সকল অঞ্চল নির্বাচন করা হয় সেগুলি হল কাকদ্বীপের কুলতলি, কামারহাটি, গরানকাটি, রায়পুর, রঘুনাথপুর, শানকিজাহান, প্রভৃতি এলাকা। এছাড়াও গাজনপালা পরিবেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যসংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে দুই রকম এলাকা—কিছু গ্রামীণ এলাকার পরিবেশনা আর কিছু শহর ও শহরতলি এলাকার পরিবেশনা। গ্রামীণ পরিবেশনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে লক্ষ্মীকান্তপুর, জয়নগর প্রভৃতি এলাকা আর শহর ও শহরতলি এলাকার পরিবেশনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে হোটর, মগরাহাট, বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর, ছিটকালিকাপুর এবং উল্টোডাঙ্গা এলাকার পেশাদারি পরিবেশনা।

১.৩ সমীক্ষার প্রতিবেদন ও প্রাপ্তপাঠ্য

> "প্রতিবেদন রচনা শুরুর প্রাক্কালে সমগ্র বিষয়টির একটি সুন্দর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুকে গবেষণার উদ্দেশ্যটিকে সম্মুখে রেখে সংগঠন করতে হবে।"[১১]

প্রতিবেদনে কোনো ভ্রান্ত ধারণার সম্ভাবনা যেন না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন মতবাদ প্রণয়ন যেন স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়। প্রতিবেদন রচনা সম্পর্কে রেবতী বাবু তার *'লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিদ্যা'* গ্রন্থে বলেছেন কোনো নিয়মাবলি নেই তবে কতকগুলো মুখ্য নির্দেশিকা প্রয়োগ করার কথাও বলেছেন।

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য: ক্ষেত্রগবেষণায় যে বিষয়টিকে অনুসন্ধান করা হয় তার উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেই উদ্দেশ্যটিকে উল্লেখ করা প্রয়োজন সবার পূর্বে। যে ধরনের অনুকল্প গৃহীত ও পরীক্ষিত হবে সেটিরও ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ থাকবে। যে গবেষণাটি করা হবে তার সামাজিক তাৎপর্য

উল্লেখ করা হবে এবং যদি গবেষণার বিষয়টির কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি থাকে সেটিকেও উল্লেখ করতে হবে এবং সেই সাথে পূর্বে অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত ঐ রকম কাজের ধরন ও তার ফলাফলের উল্লেখ করতে হবে।

সমীক্ষাকাজের সংগঠন: ক্ষেত্রসমীক্ষা কাজে সমীক্ষামন্ডলী প্রয়োজন। ক্ষেত্রকর্মীদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রভৃতির বিবরণ দিতে হবে। তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা পর্যবেক্ষণ কৌশলের প্রকৃতি উদঘাটন করে সে বিষয়ে উল্লেখ করতে হবে। সেই সাথে ক্ষেত্রকর্মীদের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ দানের বিবরণ দিতে হবে। ক্ষেত্রকর্মীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ অর্থাৎ প্রশ্নমালা পূরণ করার পদ্ধতি, সেগুলির শ্রেণিবিন্যাস ও সারণীকরণ পদ্ধতিরও উল্লেখ করতে হবে।

বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত: ক্ষেত্রসমীক্ষা কাজে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি যেন স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়। তথ্য সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যুক্তিসম্মত ও পরিসাংখ্যিক চিন্তাধারার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে ধরনের ভিত্তির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় সেগুলিকেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত সমস্ত মতবাদ এর পশ্চাতে প্রয়োজনীয় যুক্তিযুক্ত এবং পারসাংখ্যিক প্রমাণ দেখাতে হবে। বিভিন্ন সন্দেহ ও অনিশ্চয়তাকে উল্লেখ করে যথাযথ ব্যাখ্যা করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি: গবেষণা কাজে গ্রন্থপঞ্জি অপরিহার্য বিষয়। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, পুস্তক, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধগুলিও সঠিক স্থানে উল্লেখ করতে হবে। সমরূপী বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় রচিত প্রতিবেদন, পুস্তক, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকাগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে সাজিয়ে উল্লেখ করতে হবে।

পরিশিষ্ট: পরিশিষ্ট স্বচ্ছ ও ক্রমান্বয়ী হবে। পরিশিষ্টের মধ্যে প্রশ্নমালা, অনুসূচি, বিভিন্ন তালিকা, বা নির্দেশিকা উল্লেখ করতে হবে। যদি অন্যান্য কোন প্রতিবেদন, বা কোনো পুস্তিকা থেকে সাহায্য নেওয়া হয় তবে সেগুলিও পরিশিষ্টতে উল্লেখ করতে হবে। যে সমস্ত ঘটনাকে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় বা বিভিন্ন পরিভাষার নামের সাথে পরিচিতি দান করা হয় সেগুলিও পরিশিষ্টের মধ্যে উল্লেখ করা হবে।

পাদটীকা: এটি পরিশিষ্টের মতন। এটি পরিভাষাকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে। কখনও কখনও কোনো বিপরীতধর্মী বক্তব্যের উপর আলোকপাত ঘটানোর জন্য ও পাদটীকার ব্যবহার হয়। কোনো বিশেষ উৎস সম্পর্কে নির্দেশ ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ও পাদটীকার ব্যবহার হয়। পৃষ্ঠার নীচে এটি উল্লেখ করা হয়।

অভিকল্প: যখন গবেষণাকর্মী কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হন এবং কোনো সামাজিক সমস্যা নিরসন বা বিকাশমূলক অভিকল্প তার কাজের মধ্যে থাকে তখন বিশেষভাবে অভিকল্প দানের প্রয়োজন হয়। প্রতিবেদনের শেষে এটিকে উল্লেখ করা হয়। অভিকল্প সর্বদা যুক্তিসম্মত কার্যকারণের ভিত্তিতে রচিত এবং প্রয়োগমূলক হয়।

এই গবেষণার জন্য উপরিউক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি পর্যায়ে তা সম্পন্ন করা হয়েছে—

(ক) পূর্বপরিকল্পিত ভাবে কোনো এলাকায় যোগাযোগ করে বেশ কিছুদিন ধরে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে।

(খ) পূর্বপরিকল্পিত ভাবে কারোর সাথে যোগাযোগ না করে ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়টি এমন যে সঠিক তথ্যসংগ্রহের জন্য বার বার ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। গাজন উৎসবের রীতি-নীতিগত বিষয়ে একই ক্ষেত্রে বার বার উপস্থিত হওয়া সম্ভব কিন্তু গাজনের লোকনাট্যগত বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা থাকে না। কোনোস্থানে হয়ত একমাস ব্যাপী গাজন লোকনাট্য পরিবেশন হয় সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। অন্য স্থানে কিছুদিন পর ক্ষেত্রসমীক্ষা করার সময়ে সেই শিল্পী মানুষগুলির সাথেই বারে বারে সাক্ষাৎ ঘটেছে। বারবার তাদের সাথে কোনো বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা গেছে। এই সমীক্ষায় গ্রামের অধিবাসী যারা গাজন উৎসব পালন করেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তারা যেমন গুরুত্ব পেয়েছেন সেই সাথে গাজন শিল্পী, দল মালিক, বাজনাদার, দলের অন্যান্য সহকর্মী এমনকি গাজনের সন্ন্যাসীরাও গুরুত্ব পেয়েছেন। লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলের গ্রাম্য পরিবেশনা যেমন গুরুত্ব পেয়েছে কলকাতা শহরের পরিবেশনাও ততটাই গুরুত্ব পেয়েছে। মেলা বা পূজা উৎসব উপলক্ষ্যে বিনামূল্যের গাজন পরিবেশনা যেমন গুরুত্ব পেয়েছে মগরাহাটের মৌখালি অঞ্চলের টিকিটের বিনিময়ে অনুষ্ঠিত গাজনপালা পরিবেশনও ততটাই গুরুত্ব পেয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোনো এলাকায় একবার উপস্থিত হয়ে বা দুএকজনের সাথে কথা বলে সঠিক তথ্যসংগ্রহ করা যায় না। লোকসংস্কৃতি বিবর্তনমূলক একটি প্রক্রিয়া। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "বহুকাল হইতেই গ্রামের প্রাচীন সংগঠন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পয়িাছে। ... তাহা ইতিমধ্যে এক নতুন রূপ লইতে আরম্ভ করিয়াছে। কি ধারায় এই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে এবং তাহার ফলে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কি পরিবর্তন অনুভব করা যাইতেছে তাহা গ্রাম সমীক্ষার ফলেই সম্যকভাবে জানা যাইতে পারে।"[১২]

এই বিবর্তনমূলক লোকসংস্কৃতির বদল কিভাবে ঘটছে গাজন উৎসব ও লোকনাট্য গাজনপালার মধ্য দিয়ে তা উদঘাটন করার জন্যই বার বার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণি, বয়সের মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে অন্দরের সন্ধান কাজ করা হয়েছে।

১.৪ সমীক্ষকের অভিজ্ঞতা

গবেষণার একেবারে প্রথম পর্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু পূর্বে এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয় গাজন উৎসব ও লোকনাট্য ছিল তাই সেই সময় ক্ষেত্রসমীক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে গবেষকের প্রথম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়। পরবর্তী এই গবেষণায় সেই কাজটি আরও প্রসারিত হওয়ায় ধারাবাহিক ভাবে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়েছে।

গবেষণার প্রথম পর্যায়ে গবেষণার বিষয়টি স্থির করার পর ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। পূর্বে গবেষণা অভিসন্দর্ভের সময় বেশ কিছু গাজনদলের এবং শিল্পীদের সাথে যোগাযোগ ঘটেছিল। তাদের সাথে পুনরায় সংযোগস্থাপন করা হয়। তারপর গবেষণা কার্যটিকে দুটি ভাগ করা হয়—একটি গাজনের উৎসবগত দিক অন্যটি গাজনের লোকনাট্যগত দিক। দুটি দিক এরও আবার দুটি করে দিক রয়েছে—গ্রামীণ ও শহুরে। সেই অনুযায়ী ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চলগুলিকে নির্বাচন করা হয়। এরপর প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা—ক্যামেরা, রেকর্ডার, ল্যাপটপ, প্রয়োজনীয় বই, খাতা, প্রভৃতি সংগ্রহ করে এবং বিভাগীয় সম্মতি পত্র নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা কাজটি শুরু করা হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-১ (১৪.০৭.২০১৬, উল্টোরথ)

গাজনপালা দলগুলি প্রতিবছর উল্টোরথের দিন ঘটস্থাপন করে। ঐ দিন গদিঘরে পূজার আয়োজন করা হয়। পূজা শেষে দলে যুক্ত শিল্পীরা একত্র হন। পুরাতন বছরের শিল্পীদের সাথে অনেক সময় নতুন শিল্পীরা যোগ দেন। তাদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। সকলে একত্র হওয়ার পর শিল্পীরা একে একে নিজেদের নাম পরিচয় দান করেন। কিছু পরিবেশন করেন (সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র)। ঐ দিন দল মালিকের সাথে টাকার চুক্তি হয়। ঐ দিন ঐ বছরের পালা নির্ধারণ, চরিত্র নির্ধারণ কোন চরিত্রে কোন শিল্পী অভিনয় করবেন যাবতীয় নির্ধারণ করা হয়। ঐ দিন থেকে অনুষ্ঠানের বায়না নেওয়া শুরু হয়। পত্রের মাধমে স্বাক্ষর দ্বারা বায়না গ্রহণ করা হয়। সবশেষে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেন দল মালিক। ঐ দিনের পর থেকে মহড়া শুরু হয়। চলে বিশ্বকর্মা পূজার আগে পর্যন্ত। বিশ্বকর্মা পূজার দিন থেকে পালা পরিবেশন শুরু হয়।

১৪ই জুলাই সকালে শিয়ালদহ থেকে জয়নগরগামী ট্রেন ধরে সমীক্ষক পৌঁছে যান জয়নগর স্টেশনে। তারপর সেখান থেকে অটোতে করে জামতলা বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে অন্য অটো বদল করে পঞ্চাননতলায় পৌঁছিয়ে দেখা গেল সেখানে আদি পঞ্চানন গাজনতীর্থ দলের ঘটস্থাপন ও পূজার প্রস্তুতি চলছে। গাজনদলের শিল্পীরাই মূলত পূজার কর্মকর্তা ও আয়োজক। এরপর পুরোহিত মশাই পূজা শুরু করেন। মাঝে প্রবলবৃষ্টি হলেও পূজা চলতে থাকে। প্রায় একটা নাগাদ পূজা শেষে প্রসাদ বিতরণ হয়। এর মাঝে গাজনদলের মালিক শ্রী অশোক নস্করকে দু একবার দেখা গেছে মাত্র। এরপর সকল শিল্পীরা গদিঘরে জমায়েত হন। সেখানে প্রধান আসনে দলমালিক শ্রী অশোক নস্কর

অবস্থান করেন। বাকি শিল্পীরা গোল হয়ে বসেন। বাদ্যযন্ত্রগুলি রাখা থাকে। একটি মাইক্রোফোন রাখা থাকে। শিল্পীরা একে একে নিজের নাম ও শিল্পীসুলভ পরিচয় দিয়ে একটি বা একাধিক করে পরিবেশন করেন। পুরাতন বছরে যে সকল শিল্পী ছিলেন তারা নাম পরিচয় দান অপেক্ষা পরিবেশনায় বেশি গুরুত্ব দেন এবং নতুন যে সকল শিল্পী যোগ দেন তারা পরিবেশনার পাশাপাশি পরিচয় দানে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। নতুন শিল্পীদের মধ্যে শিল্পী অভিনেতা লখিন্দর পণ্ডিতকে যোগ দিতে দেখা যায়। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজন শুরু হয়। একা ক্ষেত্রসমীক্ষা কাজে যাওয়ার কারণে তাদের আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করেই বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফেরার জন্য সমীক্ষককে রওনা দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের মাঝে দলমালিক বায়না নিতে শুরু করেন। এই অনুষ্ঠানটি শেষ হয় বিকেল ৪টে নাগাদ।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-২ (১২.০৪.২০১৭, জয়নগর কেশবেশ্বর মন্দির)

জয়নগরের কেশবেশ্বর মন্দির অতিপ্রাচীন ও বিখ্যাত একটি শিবমন্দির যা ঐ অঞ্চল এমনকি সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ। এখানকার চৈত্রমাসের গাজন উৎসব আজও মানুষের কাছে খুবই আবেগের ও ধর্মবিশ্বাসের। ২০১৭ সালের চৈত্রমাসে ১২ই এপ্রিল তারিখে কেশবেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশ্যে সকালবেলা যাত্রা শুরু করা হয়। শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছিয়ে দেখা যায় দলে দলে সন্ন্যাসীরা ট্রেনের উদ্দেশ্যে চলেছেন। কখনও ঢাক বাজিয়ে আবার কখনও এমনিই। এরপর শিয়ালদাহ-লক্ষ্মীকান্তপুরগামী ট্রেনে উঠে জয়নগর স্টেশনে নামা হয়। তারপর সেখান থেকে অটোতে কেশবেশ্বর মন্দিরে পৌঁছানো হয়। মন্দিরের বেশ কিছু দূরেই অটোচালক নামিয়ে দেন এবং তারা যেতে অরাজি হন। পথে যেতে যেতেই লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল চোখে পড়ে ছিল যারা মন্দিরের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে চলেছেন। সেই ভিড়ের কারণেই বেশ কিছুটা হয়ে নেমে যেতে হয়। এরপর সন্ন্যাসীর দলের সাথে পায়ে হেঁটে মন্দিরে পৌঁছাই বেলা বারোটা নাগাদ। শিশু থেকে বৃদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম সেখানে দেখা যায়। মন্দিরের পাশ থেকে পথ চলে গেছে মন্দিরের পেছনে পুকুর অবধি। হাজার হাজার মানুষ কখনও সবান্ধবে কখনো সপরিবারে আবার কেউ একাকী পুকুরে স্নান করছেন, উত্তরীয় খুলে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছেন, শিবের উদ্দেশ্যে ফুল দিচ্ছেন। চৈত্রমাসের দাবদাহেও পুকুরের জল কানায় কানায় পূর্ণ। তারপর উত্তরীয় খুলে, স্নান সেরে কেউ পায়ে হেঁটে কেউ দন্ডী কাটতে কাটতে মন্দিরে চলেছেন। মন্দিরে বাবা কেশবেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে ভক্তরা ছুঁড়ে দিচ্ছেন কাঁচা আম, ফল ইত্যাদি। তারপর উপোস ভঙ্গের জন্য পাশেই বিক্রয় হওয়া দই এর সরবতে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন। মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে বাতাসার স্তুপ। মানসিক পূরণের জন্য নিবেদিত সেই বাতাসা কিছুক্ষণ অন্তর কর্মকর্তারা ছুড়ে দিচ্ছেন ভক্তদের মধ্যে। মাঝে মাঝে বোল উঠছে বাবা কেশবেশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে। এ ভাবেই চলতে থাকে বিকেল তিনটে অবধি। দুপুর আড়াইটা নাগাদ গাজনের মূল তিন সন্ন্যাসী দেবতাকে নিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করেন। পাট নিয়ে পাশের মাঠের কিছু অংশে প্রদক্ষিণ করে তারা আবার মন্দিরে ফিরে আসেন। ভক্তরা তাদের মালা পরিয়ে প্রণাম করেন। এর পর চলে শঙ্খচিলের অপেক্ষা। ততক্ষণে মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণে ভারা বাঁধা হয় চড়কের ঝাঁপান এর জন্য।

এখানকার প্রচলিত রীতি হল আকাশে শঙ্খচিল দেখতে পেলে তবেই ঝাঁপান শুরু হয়। বিকেল চারটে নাগাদ খবর পাওয়া গেল আকাশে শঙ্খচিল দেখা গেছে। এরপর শুরু হল ঝাঁপান উৎসব। বাঁশের মাচায় উঠে ঝাঁপ দিতে থাকেন একের পর এক অগণিত মানুষ। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম এবং ক্রমশ অন্ধকার নেমে আসতে থাকায় ঐ স্থানে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ানোও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এরপর সন্ধ্যা নেমে এলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-৩ (৫.১২.২০১৭, সূর্যশিখা—ফড়ের মেলা)

বিশ্বকর্মাপূজার পর থেকে পরবর্তী বর্ষার আগে পর্যন্ত পেশাদারি গাজনপালাদলগুলি অর্থের বিনিময়ে পালা পরিবেশন করেন। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে তাদের পরিবেশনা পৌঁছে যায় শহরতলি এমনকি শহরেও। কখনও পূজা উৎসবকে কেন্দ্র করে এই পালার আসর বসে আবার কখনও ফড়ের মেলা উপলক্ষ্যে ও এই পালার আয়োজন হয়। এরকমই এক ফড়ের মেলার খবর জানা যায় ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে মুকুন্দপুরের কাছে সূর্যশিখা ক্লাবের মাঠে। কালীপূজা ও ফড়ের মেলা উপলক্ষ্যে সেখানে গাজনপালার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ ক্যামেরায় সাহায্যকারী রাজাদাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর দেখা গেল মাঠের এক ধারে কালীপুজোর আয়োজন চলছে এবং মাঠে ফড়ের মেলা বসেছে। নিকটবর্তী ক্লাবঘরে আদি দিগ্বিজয়ী গাজনতীর্থ দলের গাজনশিল্পীরা তখনও নিদ্রামগ্ন। আগের দিন রাত্রে জেগে অনুষ্ঠান করা এবং অনুষ্ঠান শেষে ঐ স্থানে পৌঁছানোর ক্লান্তি তখনও তাদের দূর হয়নি। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখতে না পাওয়ার খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায় রাত্রে পূজা শেষ হওয়ার পর পালা অভিনয় শুরু হবে। ফড়ের মেলায় পুরে দেখা যায় মাঠে বেশ কিছু অংশে ছোট ছোট গোলাকারে মানুষের জমায়েত ঘটেছে তাদের মধ্যে নানা রকম খেলা চলছে। ঐ গুলিই আসলে ফড়ের আসর। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় সারারাত ঐ আসর চলবে। পূজা এবং পূজা শেষে গাজনপালা অনুষ্ঠান হলেও ফড়ের আসর চলবে। কিছু ছবি সংগ্রহ করা হয় ক্যামেরায় কিন্তু হঠাৎই ঐ আসরের এক ব্যক্তি নিষেধ করেন এবং তাকে প্রমাণ দেখিয়ে পূর্বে সংগ্রহ করা সমস্ত ছবি নষ্ট করে দিতে বাধ্য করেন। পালা অভিনয় সংগ্রহ করার অনুমতি চাওয়ায় ওনারা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ওনাদের একান্ত অনুরোধে গবেষক ফিরে আসতে বাধ্য হন।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-৪ (৮.১২.২০১৭, মুকুন্দপুর—খুদিরাবাদ)

মুকুন্দপুরের সূর্যশিখা ক্লাবের অদূরে খুদিরাবাদ অঞ্চলে ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে গাজনপালা পরিবেশন হয়। বেশ কয়েকদিনব্যাপী এখানে গাজনপালার আসর বসে প্রতিদিন সন্ধ্যায়। এর আয়োজক আদগার শেখ যিনি সুপরিচিত রাজু ভাই নামে। প্রায় দশদিনব্যাপী এই আয়োজনে প্রতিদিনই একটি করে পেশাদারিদল পালা পরিবেশন করে। সন্ধ্যা ৮ টা থেকে ৯ টার মধ্যে পালা শুরু হয়। রাত ১১ টা থেকে ১২টার মধ্যে সমাপ্ত হয়।

প্রথম দিন উপস্থিত হয়ে দেখা যায় মাঝারি আয়তনের একটি মাঠ রাস্তার ধারে। তার একপাশে তৈরি করা হয়েছে মঞ্চ। তার পিছনে সাজঘর। সেখানে শিল্পীরা সাজ পোশাক ও প্রসাধনে নিজেদের তৈরি করছেন। মঞ্চে চলছে আলো ও শব্দ নিয়ন্ত্রণের নানান যন্ত্র দ্বারা প্রস্তুতি। ঐ দিন আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পালা পরিবেশিত হয়। কাকদ্বীপ, কামারহাটি, (কুলতলি) এদের ঠিকানা। যে পালাটি পরিবেশিত হয় তার নাম—'কর্মের শেষ পর্বে ভালোবেসে কি পেলাম'। বাপিদার সহযোগীতায় ক্যামেরায় সমস্ত পালাটি রেকর্ড করা হয়। পূর্ব প্রস্তুত করে রাখা প্রশ্নমালা দ্বারা সাজঘরে উপস্থিত হয়ে ঐ দলের দলমালিক, আয়োজক, অভিনেতাগণ, বাদ্যকারগণের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তত্ত্বাবধায়ক—বাপি হালদার, অভিনেতা—পবিত্র সরদার, পাঁচু সরদার, নায়িকা চরিত্রের অভিনেতা—শঙ্কর অধিকারী, ইন্দ্রজিৎ ঘরামী, বিক্রম সর্দার। পুরুষ চরিত্রের অভিনেতা—নরেন সর্দার, জয়দেব সর্দার, মদন সর্দার বিশ্বজিৎ হালদার, তবলা শিল্পী—বিষ্ণু পদ হালদার, মালিক—শম্ভু হালদার, নির্দেশক—নরেশ অধিকারী, অন্যান্য নারী চরিত্রাভিনেতা—নরেন সর্দার। এদের যে সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয় পরিশিষ্ট অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-৫ (১৪.১২.২০১৭)

৫ই ডিসেম্বর তারিখে মুকুন্দপুরের সূর্যশিখা ক্লাবের মাঠে আয়োজিত যে পালা পরিবেশনের ছবি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল এবং পালা পরিবেশন রেকর্ড করতে নিষেধ করা হয়েছিল সেটি ছিল দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পরিবেশনা। এর কয়েকিদন পরেই ১৪ই জিসেম্বর ২০১৭ সালে এর অদূরে মুকুন্দপুরের খুদিরাবাদের দাসপাড়ায় দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা আবার পালা পরিবেশন করেন। সকলের অনুমতি নিয়ে পালাটি ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয় এবং শিল্পীবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের নিবেদিত পালার নাম ছিল—'মৃত্যুশয্যায় বিয়ের বাসর'। দলটির ঠিকানা—কাকদ্বীপ, কামারহাটি (কুলতলি)। অভিনেতারা হলেন—গোপীনাথ মালী, কৌশিক শিকারী, পুরুষ চরিত্রাভিনেতা—জয়ন্ত নাইয়া, লখিন্দর পন্ডিত, শঙ্কর মণ্ডল, ছোট্টু নাইয়া, নারী চরিত্রাভিনেতা—সুপ্রভাত মণ্ডল, কুমার রাজু। ইনি আসলে মুসলমান। যার আসল নাম আরিফ হোসেন পেয়াদা। মুসলমানধর্মী জানলে সমস্যা হতে পারে। তাই রাজু নামটি ঘোষণা করা হয়, এছাড়া কুমার সুজিত দাস ও মধুময় সর্দার শ্রেষ্ঠাংশে একাধারে অভিনেতা, পালা রচনাকার এবং নির্দেশক অশ্বিনী নাইয়া। অক্টোপ্যাড শিল্পী সুজিত নাইয়া, বাঁশি বাদক—গোপীনাথ মালী, তবলা শিল্পী—কৌশিক শিকারি, গায়ক ও অভিনেতা—শঙ্কর মণ্ডল। পরিশিষ্ট অংশে সাক্ষাৎকারগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-৬ (১৫.১২.২০১৭)

১৫ই ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মুকুন্দপুর দাসপাড়ায় খুদিরাবাদে শিল্পতীর্থ গাজনসংস্থার পরিবেশনা হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। শিল্পীরা সাজঘরে সাজসজ্জায় প্রস্তুতিকালীন এবং মঞ্চে আলোক ও শব্দ যন্ত্রের প্রস্তুতি চলাকালীন মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়। প্রায় টানা ঘন্টা খানেকের বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে

যায়। আয়োজক পরিস্থিতি দেখে ঐ দিনের পরিবেশনা বাতিল করে দেন এবং পরদিন ঐ দলের যেহেতু অন্য কোথাও পালা পরিবেশনের চুক্তি ছিল না তাই পরদিন পালা অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-৭ (১৬.১২.২০১৭)

পরদিন অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে যথা সময়ে উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখা যায় সেদিন আবহাওয়ার পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো। মঞ্চে ও সাজঘরে প্রস্তুতি চলছে। তাদের নিবেদিত পালার নাম ছিল—‘মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম’। এদের প্রতিষ্ঠাতা—নন্দু মণ্ডল, সৌমিত্র মণ্ডল, প্রযোজক—উত্তম সামন্ত, মহাদেব মণ্ডল, পরিচালক—নবীন হালদার, অরুণ মণ্ডল, আলো—পাত্র ইলেক্ট্রনিক, নিয়ন্ত্রণে—মাষ্টার নিমাই ও জগন্নাথ কোঠারি, অক্টোপ্যাড বাদ্যকার—মিষ্টার লাল্টু নস্কর, তবলায়—মাস্টার গোবিন্দ প্রামাণিক, চরিত্রচিত্রণে—অনুপ মণ্ডল, সুধাকণ্ঠে—বাবুসোনা শিকারী, কম্পিউটারে—পঙ্কজ মণ্ডল, নায়ক—সীতারাম বক্সী, নায়িকা—অজয়, অন্যান্য অভিনেতা—নবীন হালদার, তপন মণ্ডল প্রমুখ। দলের তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ভাবে ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়। তবে আগের দিনের পরিস্থিতির কারণে শিল্পীরা এতটাই বিপর্যস্ত ছিলেন যে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দানে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাদের মানসিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এবং ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে কেবলমাত্র পালা পরিবেশনাটিকেই রেকর্ড করে ফিরে আসা হয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-৮ (১৭.১২.২০১৭)

পূর্বের ক্ষেত্রসমীক্ষাগুলি হল বিনামূল্যে দর্শকদের জন্য আয়োজিত গাজনপালা তবে এখন কোথাও কোথাও টিকিটের বিনিময়েও গাজনপালা পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত ক্ষেত্রসমীক্ষাটি তেমনি একটি গাজনপালা পরিবেশনের আসর। পূর্ব নির্ধারিত ঐ গাজনপালার আসরটিতে পৌঁছানোর জন্য ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে শিয়ালদহ থেকে ডায়মণ্ডহারবারগামী ট্রেন ধরা হয় দুপুর আড়াইটা নগাদ। মগরাহাট নামক স্টেশনে নেমে অটোতে গোপীনাথপুর মৌখালির উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হয়। স্থানে পৌঁছিয়ে দেখা যায় আয়োজক বিরাট ব্যবস্থা করেছেন। ধামুয়া উত্তর গ্রামপঞ্চায়েত কার্যালয়ে টিকিট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিকিট মূল্য ২০ টাকা। মৌখালি ফুটবল খেলার মাঠে বিশাল জায়গা জুড়ে সম্পূর্ণ বাঁশ ও ত্রিপল দিয়ে তাঁবুর আকারে সম্পূর্ণ ঘেরা আসর বানানো হয়েছে। প্রবেশ পথ নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা। টিকিট পর্যবেক্ষণ করে তবেই প্রবেশ করা অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখা গেল দর্শকদের মাটিতে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঝে বাঁশ দিয়ে এই বিভাজন করা হয়েছে। চারিদিক ঘেরা আসরের মাঝখানে তিনদিক খোলা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে বেশ উঁচুতে। প্রচুর আধুনিক আলোর ব্যবস্থা ও শব্দনিয়ন্ত্রক যন্ত্রের আয়োজন করা হয়েছে। মাইকে অনবরত ‘দ্য নাট্যমঞ্জরী’ গাজনতীর্থের নাম ঘোষণা চলছে এবং সেই সাথে ঐ দলের বিখ্যাত অভিনেতা হরিসাধন মণ্ডলের নাম ঘোষণা চলছে অনবরত। এই প্রচারমূলক ঘোষণার মাঝে মাঝেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে নানারকম নির্দেশাবলী ঘোষণা চলছে। পূর্বে গাজনপালা আসরগুলির তুলনায় এখানে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা যে অনেক বেশি তা

আয়োজনের পাশাপাশি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। পুরুষবিহীন কেবলমাত্র মহিলারা সদলবলে এসেছেন আবার সপরিবারেও অনেকে এসেছেন যা অন্যত্র বিরল। ঐ দিন কুলতলির ঘটি হারানিয়া বাজারের দি নাট্যমঞ্জরী গাজনতীর্থ দলের পরিবেশনার পরিকল্পনা ছিল। পালার নাম—'বিধবার গায়ে হলুদ'। অভিনয়ে গাজন মেগাস্টার হরিসাধন মণ্ডল ও সুন্দর নাইয়া। এছাড়া ভক্ত মণ্ডল, সঞ্জয় মণ্ড, পুতুল মণ্ডল, এবং আরও অনেকে। পরিচালনায়—শুকদেব দাস, নির্দেশনায় হরিসাধন মণ্ডল। সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় পালা শুরু হয়ে ১১ টার মধ্যে সমাপ্ত হবে।

দর্শকাসনে অধিষ্ঠিত গোবিন্দপুর নিবাসী দুলাল সরদার নামে কথা বলে জানা যায় প্রতিবছরই টিকিটের বিনিময়ে এরূপ গাজনপালার আসর বসে। অন্যান্য মনোরঞ্জনের উপাদান থাকলেও যেহেতু বছরে একবার এরূপ আয়োজন হয় তাই টিকিটের বিনিময়ে অনুষ্ঠান হলেও তারা দেখেন। তিনি জানান ঐ দিন ঐ স্থানে গাজন অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার জন্য বিশেষ যানবাহন চলাচল করে। তাই রাতে গাজনপালা অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফিরতে দর্শকদের কোন রকম অসুবিধা হয়না। টিকিট কাউন্টারে দেখা যায় কেউ ৪টে কেউ ১০টা এমনকি ১২টা টিকিট কাটছেন একসাথে। আবার কেউ ৫০ টাকা দিয়ে ৩টে টিকিট নিতে চাইছেন। কেউ সঙ্গী কিশোরীর জন্য হাফ টিকিট চাইছেন। কেউ বা দুজন একটি টিকিটেই প্রবেশ করতে চাইছেন। তবে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় যে কর্মকর্তারা এ বিষয়ে বেশ কঠোরভাবে নিয়ম বজায় রেখে দর্শকদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছেন। তবে গাজনপালা দেখতে আসা দর্শক মনোরঞ্জন সরদার জানান—"টিকিট না পেলে হাউসফুল হলে বাঁশ খুলে দেবে তখন ঢুকে যাবে। তিনি বলেন বিগত তিন-চার বছর ধরে নিয়মিত প্রতি বছর এরকম টিকিটের বিনিময়ে পালার আয়োজন হচ্ছে। তিনি বলেন—"আশে পাশে কোন অনুষ্ঠান হয় না, সন্ধ্যেবেলায় কি করব তাই এসেছি।" এদিকে মাইকে ঘোষণা হতে থাকে পালার নাম—'বিধবার গায়ে হলুদ'। ঘোষণার মাঝে ঘোষক দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন—"কেন বিধবার গায়ে হলুদ হচ্ছে!" দর্শকরা চিৎকার করে নিজেদের মতো উত্তর দেন। দর্শকাসনে দেখা যায় কেউ সদলবলে চপ মুড়ি জলযোগ করছেন, কেউ বা নিজের জুতো দিয়ে বসার জায়গাটির দখল রেখে কোথাও গেছেন। অশীতিপর বৃদ্ধা নীহার মণ্ডল জানান বিগত ৬-৮ বছর ধরে তিনি এরূপ পালা পরিবেশন দেখছেন। বিনামূল্যে গাজনপালা দেখা গেলেও এখানে টিকিটের বিনিময়ে তার দেখতে আসার অন্যতম কারণ—"ঘরের কাছে হয়" এবং 'সবার সাথে এসে দেখতে ভালো লাগে'। এক দম্পতি শম্পা মণ্ডল ও ধনঞ্জয় মণ্ডল জানান—টিভিতে সিরিয়াল রোজ একঘেয়ে লাগে। এটা বছরে একবার বেশ অন্যরকম তাই ভালোই লাগে দেখতে। সুজিত সিকদার নামে যুবক জানান—তিনি আসেন কমেডির জন্য। সিনেমাতেও এত কমেডি থাকে না। কমেডির জন্য এই পালা ভালো লাগে দেখতে।

ইতিমধ্যে মঞ্চে ঘণ্টা পড়ে, ধুপ ও গঙ্গাজল ছিটিয়ে অভিনয় শুরু হয়। দর্শক আসন অন্ধকার তার মধ্যে চা বিক্রেতা তার ব্যবসা করেন। বাইরে ত্রিপল দিয়ে অস্থায়ী চপের দোকান, পাপড় ভাজার

দোকানে তখনও ভিড়। সারি দিয়ে রাখা আছে সাইকেল বাইক, একধারে বেশ কিছু টোটো, অটো। সপরিবারে এসেছেন যারা তাদের। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে আসে, রাত বাড়তে থাকে, কেবল গাজনপালার আওয়াজে মুখরিত হয়ে থাকে সম্পূর্ণ এলাকা। ফেরার পথে বহুদূর অবধি কানে আসতে থাকে সেই আওয়াজ।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-৯ (১৮.১২.২০১৭)

১৮ই ডিসেম্বর ২০১৭ সালে বিকেলে আবার মুকুন্দপুরে দাসপাড়ার খুদিরাবাদ অঞ্চলে উপস্থিত হওয়ার কারণ ঐ দিন সেখানে নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলটি পালা পরিবেশন করেন। তাদের পবিবেশিত পালার নাম—'রক্ত পিপাসু কালো ছায়া'। পুরুষ চারিত্রাভিনেতা—সাধন সরদার, নায়ক—কনক হালদার, নারী চরিত্রাভিনেতা—ভূপতি সর্দার, নায়িকা—শশাঙ্ক সরদার, অমিয় সরদার, বিশেষ চরিত্রে গাজন জগতের 'ক্লাসিকাল অ্যান্ড কমার্শিয়াল কমেডিয়ান' গাজন সুপারষ্টার সমীর হালদার, যন্ত্রানুসঙ্গীতে মিলন শিকারী, জওহর হালদার, কাশীনাথ পাল, ও মাস্টার সৌদাস হালদার। সুর ও আবহে—মাষ্টার শম্ভু নস্কর ও মাস্টার সুভাষ হালদার, আবহ সঙ্গীতে—সোনাই মণ্ডল, আলো—মা নারায়ণী ইলেকট্রিক, নিয়ন্ত্রণে—তাপস সরদার, ধ্বনি—সূর্য সাউণ্ড সার্ভিস, নিয়ন্ত্রণে—কৃষ মণ্ডল, উপদেষ্টা—ভরত বৈদ্য, মিলন মণ্ডল ও মিলন শিকারি। ঐকান্তিক সহযোগিতায় হারাধন মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও পবিত্র বৈদ্য।

শিল্পী ও আয়োজকমণ্ডলীর সাথে আলাপচারিতার সুযোগ ঘটলেও তাদের ব্যস্ততা ও অনিচ্ছার কারণবশত শিল্পীদের আলাদা আলাদা ব্যক্তি বিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তবে তাদের পরিবেশিত পালাটিকে সম্পূর্ণ রূপে ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-১০ (১১.০২.২০১৮)

জয়নগর লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলের একেবারেই গ্রামীণ উৎসবটিকে এই ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। জয়নগর স্টেশন থেকে ভ্যান রিক্সায় সিদ্ধিবেড়ে মোড় সেখান থেকে পায়ে হেঁটে শ্যামপুর গ্রামে। গ্রামের শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়েছে গাজন উৎসব। চড়কের দিন ১৪ই এপ্রিল ২০১৮ সালে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখা যায় গ্রামের শিশু থেকে প্রবীন বেশ কিছু সন্ন্যাসী ঝাঁপান এর উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছেন। জনবসতির মধ্যেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে খুবই ছোট আকারে আয়োজন করা হয়েছে ঝাঁপান অনুষ্ঠানের বিকেল থেকে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান চলে সন্ধ্যা অবধি।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-১১ (২০.০৩.২০১৮)

২০১৮ সালের ২০ই মার্চ তারিখে বারুইপুর শাঁখারি পুকুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। শিয়ালদহ থেকে বারুইপুরগামী বারুইপুর লোকাল ট্রেনে উঠে বারুইপুর স্টেশনে নামলাম। স্টেশনের পাশেই অটোস্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে অটোতে উঠে ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছালাম শাঁখারিপুকুর ফুটবল খেলার মাঠে। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল খোলা মাঠে তৈরি হয়েছে মঞ্চ। পিছনে সাজঘরে

চলছে শিল্পীদের সাজপোশাক, প্রসাধনের প্রস্তুতি। সাজঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল পরিচিত মুখ। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থদলের শিল্পীবৃন্দ। তাই নতুন করে তাদের সাথে আলাপচারিতার বিশেষ প্রয়োজন হয়নি। বাৎসরিক ব্যবসা যে ভালোই চলছে সে বিষয়ে তারা নানান খবর জানান। এরপর শুরু হয় তাদের সেই বছরের পালা 'কর্মের শেষ পর্বে ভালোবেসে কি পেলাম'। পূর্বে মুকুন্দপুরেও ঐ পালাটিই পরিবেশিত হয়েছিল। কয়েকটি বাক্য গঠনের পার্থক্য আর সামান্য কিছু পোশাকের পার্থক্য ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হয়নি। তবে শব্দনিয়ন্ত্রণ ত্রুটির কারণে ধ্বনিগত বেশ সমস্যা এখানে ঘটেছিল।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-১২ (৫.০৫.২০১৮)

২০১৮ সালের ৫ই মে তারিখে একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয় লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকায়। এর পূর্বে যে ক্ষেত্রসমীক্ষাগুলি করা হয়েছিল সেগুলিতে দলগুলি ছিল পেশাদারি গাজনদল। কিন্তু ঐ অঞ্চলে অনেক অপেশাদারিদল রয়েছে যেগুলি কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই পালা পরিবেশন করে। এই দলগুলির সাথে অর্থ রোজগারের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামেরই অধিবাসীরা দল তৈরি করেন। তারাই পালা রচনা করেন, নির্দেশক পরিচালক তারাই, অভিনেতা ও বাদ্যকার সকলেই গ্রামের অধিবাসী। নিজেরাই গ্রামের কোন স্থানে মহড়া দেন। তারপর চৈত্রমাসে গাজনের সময় গ্রামেই তা পরিবেশন করেন। গ্রামের অধিবাসীরাই তাদের দর্শক। এনারা অর্থের বিনিময়ে কোথাও পালা পরিবেশন করেন না। এনারা পেশায় অন্য কোন কাজের সাথে যুক্ত। কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই কাজের অবসরে গাজনপালা করেন।

ঐ গ্রামেরই অধিবাসী সৌদাস সাঁপুই। যিনি গবেষকের পূর্ব পরিচিত। উক্ত দিনে ঐ অঞ্চলে পৌঁছনোর পর প্রথম সৌদাসবাবু নিয়ে যান কামারচক গাজন সংস্থার কাছে। পরিচয় করিয়ে দেন সদস্যদের সাথে। তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি পরিশিষ্ট অংশে উল্লেখ করা হল। এরপর সৌদাসবাবু নিয়ে যান রঘুনাথপুরে। সেখানে হর গৌরী গীতিনাট্য গাজনসংস্থার কাছ থেকে যে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় তাও পরিশিষ্ট অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সৌদাসবাবুর সাথে উপস্থিত হওয়া যায় রায়পুরে। সেখানকার রায়পুর গীতিনাট্য গাজনগান দলের শিল্পীদের সাথে আলাপ চারিতায় প্রাপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এরপর গন্তব্যস্থল রাজারামহাট। সেখানকার বুড়োশিবতলায় গাজনগানের আসর বসে। সেই গানের শিল্পীদের সাথে কথপোকথন থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-১৩ (২৮.০৩.২০১৮)

বাঘাযতীন নেতাজী সুভাষ মেট্রোস্টেশনে নেমে অটোতে মাত্র ৫ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া গেল পঞ্চসায়র এলাকায়। একেবারেই শহরের বুকে বসেছে গাজনপালার আসর। চারিদিকে বহুতলের মাঝে ঝুপড়ি এলাকায় মানুষের সমাগম হয়েছে এই দর্শকাসনে। দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ঐ বছরেরই নিবেদন 'মৃত্যুশয্যায় বিয়ের বাসর' পালাটি পরিবেশিত হয়। এখানেও দেখা যায় যে সামান্য বাক্যগঠন, জায়গার

নামের উল্লেখের সময় পঞ্চসায়র এলাকা ও তার পার্শ্ববর্তী জায়গার নামের উল্লেখ ও সাজপোশাকে বিশেষত নায়িকার পোশাকে শহুরে প্রভাব ও পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়া অন্যবিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

ক্ষেত্রসমীক্ষা-১৪ (২৮.০৪.২০১৮)

গড়িয়া স্টেশনে নেমে গড়িয়া বাজার অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়ে বৈশাখী সংঘের নিকট মাঠে ২৮ই এপ্রিল আয়োজিত হয় আদি মুক্তাঙ্গন গাজনসংস্থার গাজনপালা কিন্তু পালা পরিবেশনের কিছু পূর্বে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীগণ মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে আপত্তি জানানোয় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়। পরদিন অন্যত্র বায়না থাকায় দলটিকে পরদিন ঐ স্থানে পালা পরিবেশনের অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। দর্শক, আয়োজক ও দলের সদস্যবৃন্দ সকলেই বিপর্যস্তবোধ করেন তবে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে এ কাজ সকলেই হাসিমুখে পালন করেন।

গবেষণাটির প্রাথমিক বিষয় ছিল ক্ষেত্র সমীক্ষামূলক কাজ। সময়ের সাথে সাথে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও লোকনাট্য গাজনপালার সংস্কৃতিতে যে বিবর্তন ঘটেছে এবং তার প্রভাবে এই অঞ্চলে এই বিষয় সম্পর্কিত মানুষদের লৌকিক, অর্থিনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনে যে বিবর্তন ঘটেছে-এসকল সম্যকভাবে নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজন ছিল ক্ষেত্রসমীক্ষার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও লোকনাট্য গাজনপালার বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষা কর্মটি তাই প্রথমেই সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণার প্রথম দুই বছরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় নির্বাচিত অঞ্চলগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে গবেষণা বিষয়কেন্দ্রিক তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য বিষয়ক অসংখ্য ছবি, ভিডিও, গাজনপালা, সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে। তারপর সেইগুলি থেকে কিছু তথ্য ও রেকর্ডকে বেছে নেওয়া হয়েছে। গবেষণাকার্যে ক্ষেত্রসমীক্ষার পরবর্তী পর্যায় হল গবেষণাকাজটির প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্যগুলিকে সাজানো। তথ্য সংগ্রহের সময়েই সেগুলিকে তারিখ অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়। এবার বিষয় অনুযায়ী সেগুলিকে শ্রেণিভুক্ত করা হবে। ক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্যাদি থেকে বিষয় অনুযায়ী তথ্যগুলিকে নির্বাচন করে শ্রেণিবিভাজন, বিশ্লেষণ ও বিবরণ দ্বারা গবেষণা কাজটি সার্থক করা সম্ভব হবে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত মৌখিক আখ্যানগুলিকেও তালিকাভুক্ত করাও গবেষণা কাজের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অংশ। সেই সাথে ঐ মৌখিক আখ্যানগুলির লিখিত রূপদান করাও গবেষণার অন্যতম প্রধান কাজ। এইভাবে সার্বিক বিষয় বা পর্যায়গুলিকে সঠিক পদ্ধতিতে সচেতন ভাবে পালনের মাধ্যমে ক্ষেত্রসমীক্ষা কার্যটি সঠিক ভাবে করা এবং তাকে গবেষণাকাজে প্রয়োগ করে একটি সার্থক গবেষণাকর্মে উপনীত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতিবিদ্যা (১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৯: অঞ্জলি পাবলিশার্স, আগষ্ট, ২০০৬), ২২৯

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, “গ্রামসমীক্ষা”, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* Vol.No2 (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৫): ১

৩. Encyclopaedia of Anthropology, U.S.A, 1976, P. 169. Field work method হল ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে কোনো অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের লোকসমাজকে অনুধাবন করার পদ্ধতি।

৪. Harbest Halpert, “Folklore Breath versus Depth”, *Journal of American Folklore,* Vol.71, No.280 (April- June, 1958): 97

৫. Harbest Halpert, “Folklore Breath versus Depth”, *Journal of American Folklore,* Vol.71, No.280 (April- June 1958):.169

৬. তুষার চট্টোপাধ্যায়, *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও সন্ধান* (কলকাতা- ৭৩: দে’জ পাবলিশিং, ২০০২), ২৪

৭. Alexander H. Krappe,“conteence on the character and state of studies in Folklore”, *Journal of American Folklore,* Vol.59 (1966): 500

৮. সুরভী বন্দ্যোপাধায়, *গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি* (কলকাতা- ৭৩: দে’জ পাবলিশিং, ২০০১), ২২

৯. রেবতী মোহন সরকার, *লোকসংস্কৃতির পদ্ধতি বিদ্যা* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৬), ৫৫

১০. সুরভী বন্দ্যোপাধায়, *গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি* (কলকাতা- ৭৩: দে’জ পাবলিশিং, ২০০১), ২২

১১. রেবতী মোহন সরকার, *লোকসংস্কৃতির পদ্ধতি বিদ্যা* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৬), ১৬৯

১২. দুলাল চৌধুরী, “লোকসংস্কৃতি সমীক্ষার পদ্ধতি”, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* Vol.No.2 (শ্রাবণ-আশ্বিন মাস ১৩৯৫): ১৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিবগাজন ও ধর্মগাজন উৎসব: প্রাথমিক পরিচিতি ও সামাজিক তাৎপর্য

২.১ শিব-পার্বতী ও গাজন উৎসব

প্রজননের অন্যতম প্রতীক হল শিব। শিবলিঙ্গের সাথে যুক্ত থাকে শস্যদেবীর যোনিপট। লৌকিক ধারণা অনুযায়ী বলা যায় শিব ও শিবানীর অভিন্নতারূপে প্রজননের তত্ত্বটি এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। শিব যেমন সৃষ্টির দেবতা গৌরী তেমনই পৃথিবীদেবী ধরিত্রী। যেখানে উৎপাদন হয়ে থাকে তাই শিব ও পার্বতীর মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে চৈত্র গাজন উৎসব পালন হয় যা আসলে শস্যোৎসব। বাংলাদেশে অন্য সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় উপকুল সুন্দরবন অঞ্চল বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের মানুষের কাছে বর্ষশেষের গাজন উৎসব হল নতুন বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনার আনুষ্ঠানিকরূপ তাই শিবকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি ও ধ্বংসের উদ্দেশ্যে তৈরি হয় গাজন উৎসব ও গাজন গান। পুরাতন কৃষিকার্যের সমাপ্তি ও নতুন কৃষিকার্যের সূচনালগ্নে হয় এই উৎসব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চৈত্রমাসিক এই গাজন উৎসবকে অনেকে মনে করেন শিব-পার্বতীর বিবাহ উৎসব। চৈত্রমাস হল শিব-পার্বতীর বিবাহের মাস। শিব ও পার্বতীর বিবাহ মিলনকে কেন্দ্র করেই চৈত্র মাসের শেষে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় গাজন উৎসব তাই চৈত্র মাসকে মনে করা হয় মধুমাস।

গাজনকে মনে করা হয় শিব ও পার্বতীর বিবাহ। শিব অর্থাৎ মঙ্গল। শিব বিয়েও করেছেন জগতের মঙ্গলের জন্য। তেত্রিশ কোটি দেবতাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ হয়েছে কেবলমাত্র শিব-পার্বতীর আর যেহেতু চৈত্রমাস হল শিব-পার্বতীর বিবাহের মাস তাই মনে করা হয় যে, নীল চণ্ডিকা বা নীলপরমেশ্বরীর সাথে শিবের বিবাহ মিলনে শিবভক্ত সন্ন্যাসীর দল হল অনুগামী বরযাত্রী। এই বরযাত্রীগণ দ্বারা বারবার শিবমাহাত্ম্যসূচক ধ্বনি ধ্বনিত করা হয় অর্থাৎ গর্জন করা হয় যা থেকে অনুষ্ঠানটির নাম হয় 'গাজন'।[১] অনেকে বলেন বাংলায় চৈত্র মাস হল শিবের বিয়ের মাস। তাই এই মাসে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ নিষিদ্ধ। শিবের বিবাহকেন্দ্রিক চৈত্রমাসের গাজন উৎসবে বাংলায় শিবের ভক্তগণ নানারকম সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বরযাত্রী হিসেবে শিব বিবাহের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। নৃত্য-গীত এবং চিৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যা অনেকটা গর্জনস্বরূপ তাই এই গর্জন থেকেই গাজন নামের উৎপত্তি হয়েছে অনুমান করা হয়। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে শিব-পার্বতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে নানারকম কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব পালিত হয়। যথা—দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরে শিব রথে চড়ে বিবাহ করতে যায়। উদয়পুরে কৃষিকে স্মরণ করে শিব-গৌরীর বিয়ের দিন কনের গাত্রহরিদ্রা হয় গমের বর্ণে, হিমালয় অঞ্চলের 'দুরে লা' উৎসব পালিত হয় তাও শিবকেন্দ্রিক।[২] বাংলায়ও শিব-পার্বতীর বিবাহকেন্দ্রিক উৎসব পালিত হয় 'গাজন' ও 'গম্ভীরা' নামে। বাংলার কাব্য, পুরাণেও শিবের

বিয়ের উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন—কবিকঙ্কণের ‘*চণ্ডীমঙ্গলে*’, রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গলে,* রামেশ্বর চক্রবর্তীর *শিবায়ন কাব্যে,* কালিদাসের *কুমারসম্ভবে* শিবের বিবাহের বর্ণনা রয়েছে।[৩] বাংলার বহু মন্দির গাত্রে, নকশায়, স্থাপত্যে, চিত্রে শিবের বিবাহের দৃশ্য দেখা যায়। যেমন—জোকার গুরুসদয় সংগ্রহশালায় আনুমানিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে দুটি পটচিত্রে শিবের বিয়ের দৃশ্য আঁকা রয়েছে।[৪] বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর—বাংলার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে শিবের বিবাহ দৃশ্য দেখা যায়।[৫] *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, চণ্ডীমঙ্গলকাব্য* প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গাজন উৎসবের প্রসঙ্গ রয়েছে।[৬]

শিব কখনো পার্বতীর সাথে যুগল মূর্তিতে হন উমা-মহেশ্বর, কখনো অর্ধনারীশ্বর আবার কখনো সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে ধরা দেন নীলের গাজন বা চৈত্রের চড়ক উৎসবে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ তাই কৃষিকে কেন্দ্র করেই বাংলার লৌকিক ধর্মের অনেকাংশই পালিত হয় এবং কৃষিকে ভিত্তি করে অনেক উৎসব পালিত হয়। বাঙালীর কাছে শিব স্বয়ং কৃষক। শস্য উৎপাদনের প্রতি গভীর মমত্ববোধই বাংলাদেশে শিবঠাকুরের বিপুল জনপ্রিয়তার প্রধানতম কারণ। শিবের কৃষক রূপটি বাংলার মতো দুই চব্বিশ পরগনা জেলাতেও দেখা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বর্তমানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, জেলে কৈবর্ত থেকে শুরু করে নমঃশূদ্র, গোয়ালা, চিত্রকার, তিলি, মালাকার, যুগী, সূত্রধর, অধিকারী, পরই, কাপালী, তন্তুবায়, নাপিত, সদগোপ, কুম্ভকার, চর্মকার, কর্মকার, শুড়ি, মাহিষ্য, তিয়র, হাড়ি, দুলুই, বাগদি, ডোম, কাওরা—নানা বর্ণের মানুষ নানান কাজে যুক্ত হলেও যেহেতু কৃষিই এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা আর কৃষির দেবতা শিব তাই প্রতি বছরের শেষে ও নতুন বছর শুরুর পূর্বে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাংলায় কৃষিদেবতা শিবকে কেন্দ্র করে নানান আচার-অনুষ্ঠান হয় যা কৃষি প্রজনন বিষয়ক। শিব কৃষিদেবতা, প্রজননেরও দেবতা। তাই কৃষি প্রজননের উদ্দেশ্যেই এই আচার অনুষ্ঠান। আসলে বাংলার কৃষিপ্রধান পরিবারগুলোর সারা বছরের সুখ-সমৃদ্ধির কামনাতেই এই আচার পালন করা হয়।

২.২ গাজন, চড়ক ও সঙ

গাজন

শিব পার্বতীর এই বিবাহকেন্দ্রিক উৎসব ‘গাজন’ সম্পর্কে বহু গ্রন্থে বহু উল্লেখ পাওয়া গেছে। তারাপদ সাঁতরা ‘গাজন’ সম্পর্কে বলেছেন এটি বাংলার প্রকৃত গণউৎসব। হরিদাস পালিত ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ পত্রিকায় (১৩১৮) বলেছেন—

> “বহুজনগণের চীৎকার, বিপুল বাদ্যোদ্যম গর্জন তাই বোধ হয় উৎসব কালক্রমে গাজন নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।”[৭]

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি গাজন উৎসব সম্পর্কে তাঁর *'পূজাপার্বণ'* গ্রন্থে লিখেছেন—

> "শিবের গাজন এক বৃহৎ ব্যাপার। ... শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু 'গাজন' শব্দ আসিয়াছে।"[৮]

আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর *'বাংলার লোকসংস্কৃতি'* গ্রন্থের (১৯৮২) ৬৬-৬৯ পৃষ্ঠায় চড়ক ও গাজন সম্পর্কে লিখেছেন—

> "বাংলার লৌকিক শৈব ধর্মের মধ্যে এদেশের একটি প্রাগৈতিহাসিক উৎসবের ধারা প্রবেশ করেছে। তা গাজন নামে পরিচিত। এর সঙ্গে গোঁড়া হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণের কোন সম্পর্ক নেই, তথাপি জনসাধারণের মধ্যে শৈবর্মের প্রভাব বশত তা আজ সাধারণত 'শিবের গাজন' বা 'আদ্যের গাজন' বলে পরিচিত। আদ্য শিবের আর এক নাম। কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে তাকে নীলের গাজন অথবা সাধারণভাবে নীলপুজো বলে উল্লেখ করা হয়। মনে করা হয় যে নীল বলতে নীলকণ্ঠ বুঝায়। নীলকণ্ঠ শিবের আর এক নাম। নিম্নবঙ্গে তাকে 'দেলপূজা' অর্থাৎ 'দেল' এর পুজো বুঝায়।"[৯]

গাজনের উৎপত্তি বিষয়ে বলা যায় মানুষের একেবারে মৃত্তিকালগ্নে জাত একটি অনুষ্ঠান হল এই চড়ক বা গাজন উৎসব, তাই সমাজ নৃতাত্ত্বিক বিচারের দৃষ্টিতে চড়ক বা গাজনের জন্ম ইতিহাস পাওয়া বাস্তবিক মূল্যবান প্রেক্ষণীয় বিষয়। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমাজবিদ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (১৯৫০-৭২) তাঁর *'হিন্দু আচার অনুষ্ঠান'* এর (১৩৭৭ বঙ্গাব্দে) ১৩৩-৩৭ পৃষ্ঠায় 'চড়ক পূজা' শীর্ষক প্রবন্ধে চড়ক বা গাজন উৎসবের প্রাচীনতা ও শাস্ত্রীয় স্বীকৃতিমূলক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি কোনো তিথিতত্ত্বসহ, *'লিঙ্গপুরাণ', 'শিবপুরাণ', 'বিদ্ধর্মপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'* প্রভৃতি কোনো পুরাণে বা কোনো সূত্র বা ভাষ্যে কোথাও চড়ক বা গাজনের উল্লেখ পাননি তবে কোথাও কোথাও উচ্চবর্ণের আচার অনুষ্ঠানের সাথে এর সংযোগ আছে এরকম দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "বস্তুত এই পূজা ও ইহার অঙ্গীভূত উদ্দাম উৎসব এবং বান-বড়শী ফোঁড়া প্রভৃতি বীভৎস অনুষ্ঠান প্রাচীন পাশুপতদিগের কোনও সম্প্রদায় বিশেষের সহিত সংযুক্ত থাকা অসম্ভব নহে। নানারূপ কুৎসিত ও বীভৎস আচরণের জন্য শিবোপাসক হইলেও এইসব পাশুপত সম্প্রদায় প্রাচীনকাল হইতেই দেশের আভিজাত্যমানী সমাজে অজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে।"[১০]

আদিতে গাজন ছিল অনার্য জাতি বা লিঙ্গ উপাসকদের উৎসব। এরা ছিল মূলত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ। পিতৃপুরুষদের পুজো, নবান্ন, পৌষপার্বণ প্রভৃতি উৎসব, পান-সুপারি-ঘট প্রভৃতির ব্যবহার, বৃক্ষ-লিঙ্গ-শিলা প্রভৃতির উপাসনা এদের ধর্মীয় সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বর্তমানেও কোনো কোনো পূজা ও ধর্মাচারের মধ্যে এই সংস্কার রীতিগুলো টিকে রয়েছে। গাজন উৎসব তারই অন্যতম নিদর্শন। প্রসঙ্গত বলা যায়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর, মজিলপুর এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলিতে এই ধরনের প্রাচীন প্রথা এখনও টিকে রয়েছে। সেখানে গাজনগান বা লোকনাট্যের দলগুলি পারস্পরিক বিনিময় প্রথার মাধ্যমে একে অপরের পাড়ায়

গাজনপালা গান অভিনয় অনুষ্ঠান করার রীতি এখনও রয়েছে এবং অনুষ্ঠান অঞ্চলের মানুষের পক্ষ থেকে অতিথি দলটিকে পান সুপারি দিয়ে স্বাগত জানানোর পুরাতন রীতিটি আজও পালিত হয়। একে বলা হয় 'মান্য' দেওয়া, সুতরাং গাজন প্রাক্ আর্য-অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত হয়েও বর্তমান বাঙালীর ধর্মকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক একটি উৎসব অনুষ্ঠান।

লোকসংগীত বিশারদরা 'গাজন' শব্দটির ধ্বনিগত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে—প্রাচীনকালে যোদ্ধাদের মধ্যে গাজন উৎসবের প্রচলন ছিল। যোদ্ধারা যুদ্ধে যাত্রার আগে ঢাক, ঢোল বাজিয়ে ও নানা রকম মুখোশ পরে নিজেদের উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যে নৃত্য, গীত করত। এই সময় এরা রণ হুঙ্কারও করত। সেই হুঙ্কার বা 'গর্জন' থেকে এই গাজন শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।[১১]

'গাজন' শব্দটির অর্থ ও উৎপত্তি নিয়ে নানা লোকের নানা মত।

ক) কেউ বলেন 'গা' এর অর্থ গ্রাম বা গাঁ এবং 'জন' অর্থাৎ জনসাধারণ, সুতরাং এটি গ্রামের জনসাধারণের উৎসব।

খ) কয়েকদিনের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে বহু লোকের একত্রে পূজা করাকে গাজন বলে।

গ) গাজন শব্দের এর আভিধানিকগত দিক থেকে একে বলা হয় শিবের উৎসব।

ঘ) অভিধানকারগণ গাজন শব্দের উৎপত্তি নির্দেশ করে বলেছেন—গাজন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ 'গর্জন' থেকে।

গর্জন (সংস্কৃত শব্দ) > গজ্জন (প্রাকৃত শব্দ) > গাজন (বাংলা শব্দ)[১২]

এই উৎসবে ভক্তগণ ঢাকের বাদ্য ও অন্যান্য বাদ্য সহকারে নাচ গান সহযোগে গর্জনাকারে চিৎকার করে আরাধ্য দেবতার জয়ধ্বনি দিত, তাই এই অনুষ্ঠানকে প্রথমে গর্জন এবং ক্রমে গাজন নামকরণ করা হয়েছে।

ঙ) যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর *'পূজাপার্বণ'* গ্রন্থে গাজন-এর নামকরণ বিষয়ে বলেছেন—

> "শিবের গাজন এক বৃহৎ ব্যাপার। ... শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু 'গাজন' শব্দ আসিয়াছে।"[১৩]

চ) অনেকের মতে শাল বা গজারি বা গর্জন গাছের খুঁটি সারা বছর কোন পুকুরে ডোবানো থাকে। চৈত্র মাসে গাজন উৎসবে সংক্রান্তির আগের দিন ভক্তরা সেই খুঁটিটিকে (গর্জন গাছের) জলাশয় থেকে তুলে তার গায়ে তেল মাখিয়ে সেটি মাটিতে উল্লম্বভাবে শক্ত করে পুঁতে দেন। একে বলে 'গাছ জাগানো', কেউ কেউ 'গাছ লাগানো'ও বলেন। এরপরই উৎসবের সূচনা হয়। অনেকের অনুমান এই গর্জন গাছের থেকে উৎসবের নাম গাজন হয়েছে।

ছ) গজারি গাছ হল শিবের প্রতীক। শিবের আরেক নাম গজারি। অনেকের ধারণা সেই থেকেই এই উৎসবের নাম হয়েছে গাজন।

হুগলী, হাওড়া ও দুই চব্বিশ পরগনায় চৈত্র উৎসব গাজনকে বলা হয় চৈতে গাজন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আগের দিনে একে 'চৈতে কাপ'ও বলা হতো।

জ) 'গাজন' শব্দটি মূলত গর্জ ধাতুর অন প্রত্যয়ে 'গর্জন হয়েছে।

ঝ) গাজন শব্দের আরেক অর্থাৎ 'মাতন'। এই উৎসবে শিবভক্তরা উল্লাস-জয়ধ্বনি সহকারে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

ঞ) কারও মতে, 'গী' ধাতুর অর্থ গান করা। গৈ > অন = গায়ন, অর্থাৎ সমবেত কণ্ঠে গান করা বা গায়ন থেকে গাজন শব্দের আগমন ঘটেছে। এই উৎসবেও শিবভক্তদের সমবেত কণ্ঠে গান এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

গাজনের সময়কাল সম্পর্কে ধারণা করার জন্য *'বাংলার লোকসংস্কৃতি'* (১৯৮২) নামক গ্রন্থে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের দেওয়া গাজন বিষয়ে বিবরণ (পৃ. ৬৬-৬৯ এর মধ্যে) এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়। তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন তা হল—সাধারণত গাজন উৎসবের পক্ষকাল স্থায়ী হয়। এই উৎসবের বেশিরভাগ অনুষ্ঠান হয় চৈত্রমাসের শেষভাগে এবং সম্পূর্ণ হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিনে। সূর্য সেদিন দ্বাদশ রাশির পথে ভ্রমণ শেষ করে এবং পরদিন নতুন পথে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে নতুন রাশিতে প্রবেশ করে।

গ্রামবাংলায় মূলত নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত অসংখ্য দরিদ্র মানুষ সন্ন্যাসগ্রহণ করে গাজনে অংশগ্রহণ করে। সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধন গাজন উৎসবের অন্যতম বিষয়। আসলে এতে অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বাস করে যে, এই সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা তাদের সংসারের আর্থিক দৈন্যতা দূর হবে এবং আরাধ্য দেবতা শিবের মঙ্গলাশীর্বাদে সংসারে স্বচ্ছলতা আসবে। আবার কেউ কেউ কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমির মাঝে আর্থিক ও সামাজিক দুঃখ-যন্ত্রণা-অভাব ভুলে কয়েক দিনের জন্য নিখাদ আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেই গাজন ও চড়ক উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

চড়ক ও গাজন উৎসবের পালনীয় রীতি-আচারগুলির মধ্যে মিশে থাকে এক আদিম বিশ্বাস। আদিম মানুষদের বিশ্বাস ছিল যে—রক্ত প্রজননের উৎস। লোকসংস্কৃতি গবেষণা শাখার *'রক্ত ও লোকসংস্কৃতি'* নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় (১৬ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৪১১) এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। আদিম মানুষেরা নরবলি পশুবলি দিয়ে সেই রক্ত জমিতে ছিটিয়ে দিত ভালো ফসল পাওয়ার আশায়। গাজনোৎসবে পালিত 'কাঁটাঝাঁপ', 'বটিঝাঁপ', 'বাণফোঁড়া' প্রভৃতি আচরণগুলোর মাধ্যমে রক্তপাত ঘটানোর মধ্যে সেই নিদর্শন পাওয়া যায়। গাজনোৎসবে পালিত এই আচরণের উদ্দেশ্যও ছিল ভালো কৃষিবর্ষ পাওয়া। নিজের পিঠে বাণ ফুঁড়ে চড়কগাছে পাক খাওয়া আসলে সূর্যের উদ্দেশ্যে নিজেকে বলি দেওয়া। যাতে সূর্য দেবতা সন্তুষ্ট হয় এবং পরিমিত রোদ-জল-বৃষ্টি ঘটিয়ে ফসল উৎপাদনে সহায়ক হয়। এগুলিকে Human Sacrifice-এর আওতায় প্রতীকীরূপে চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন—

"বাণফোঁড়া বা রক্তপাতের উদ্দেশ্যে যে সব অনুষ্ঠান চড়ক পূজার সঙ্গে জড়িত তাহার মূলে সুপ্রাচীন কৌম সমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান।"[১৪]

গাজন উৎসবের মধ্যে আদিম সংস্কৃতির ধারা বেশ প্রবলভাবে বিদ্যমান। গাজন উৎসব যেহেতু গ্রামীণ কৃষিনির্ভর নিম্নসম্প্রদায়ের উৎসব তাই এর উৎসবের ভক্ত সন্ন্যাসীরা মূলত অনুচ্চবর্ণের মানুষজন। উচ্চবর্ণের দু-একজন সন্ন্যাসী কোথাও কোথাও দেখা যায় তবে তা ব্যতিক্রমীর পর্যায়েই পড়ে। এদের সন্ন্যাসগ্রহণের একটি বিশেষ প্রথা হল 'কাকবলি'। গাজনের সাথে প্রেতপূজা ও নদীপূজা মিশে রয়েছে। 'কাকবলি' অর্থাৎ কাককে দেওয়া অর্ঘ্য। 'বলি' কথাটির অর্থ হল কর বা বাধ্যতামূলক। এই ধরনের আচরণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হতে দেখা যায়। কাক হল আচরণে প্রেতাত্মার প্রতিভূ। এছাড়া 'আগরা পূজা', 'চিতা জাগানো' নামক আদিমসংস্কারগুলো প্রেত-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর মধ্যেও রয়েছে এক অন্ধ যাদু বিশ্বাস। ধূপচালনার মন্ত্র পড়ে শিবের 'ভর' করা হয় কোনো কোনো ব্যক্তির উপর তারপর সেই ব্যক্তিকে দিয়ে গ্রামের কোনো শ্মশানে পড়ে থাকা মৃতদেহের অংশ বিশেষ আনিয়ে তার পূজা করা হয়। যদিও এটা এখন অনেক জায়গাতেই বন্ধ হয়ে গেছে। 'চড়ক' উৎসবে একটি শাল বা গজারি বা গর্জন গাছের খুঁটিকে সারা বছর ধরে কোনো পুকুরে ডোবানো থাকে। সংক্রান্তির দিনের আগের দিন ভক্তরা সেটা তুলে গায়ে তেল মাখিয়ে মাটিতে পোঁতেন। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'গাছ জাগানো' এর পিছনে রয়েছে এক আদিম যাদুসংস্কার। গাছটি এখানে শিবের প্রতীক রূপে ব্যবহার হয় এবং পার্বতী যেহেতু পৃথিবীদেবী তাই 'গাছ জাগানো' বিষয়টি উর্বরতা কামনাকে প্রকাশ করে সুতরাং এটিকে যৌন প্রতীকী ধর্মাচার বা কালট্ও বলা যায়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন যে 'গো-অর্চনা' করা হয়। সেটাও উর্বরতা ভিত্তিক কৃষিসমাজের কামনায় করা হয়। এছাড়া গাজন উৎসবে এমন কিছু আচরণ করা হয় যার সাথে ব্যাধি বিষয়টি যুক্ত বলে মনে করেছেন অনেক গবেষক যেমন, গবেষক দুলালকান্তি চৌধুরী মনে করেছেন গাজন উৎসবে পালিত 'কাঁটারিঝাঁপ', 'কাঁটাঝাঁপ', 'বাণফোঁড়া' বিষয়গুলি সাথে আদিম শল্যচিকিৎসার সাযুজ্য রয়েছে। তাঁর মতে বছরের পর বছর এগুলি পালন করার ফলে হাঁপানি, যক্ষ্মা এ জাতীয় রোগ মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিম্নবর্গীয় মানুষগুলি একে শিবের আশীর্বাদ বলেই অন্ধবিশ্বাস করে। তারা যুক্তি তক্কো বিজ্ঞান বোঝে না। যুগ যুগ ধরে এদের ধারণায় মিশে থাকা বিশ্বাস মনের গভীরে গেঁথে রয়েছে। তবুও একথাই বলা যায় যে এই আদিম বিশ্বাসে ভর করে যুগ যুগ ধরে এগুলো তারা পালন করে আসছে। এরকম আরেকটি যাদুবিশ্বাস দেখা যায় পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো জায়গায়। সেখানে নারদ, শিব, ও দুর্গার সং সেজে প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ির সামনে থেকে সামান্য মাটি তুলে নেয়। তারা বিশ্বাস করে এতে তাদের ঘরের দোরের মাটির অংশ হর-পার্বতীর অধীনে রইল। নতুন বছরের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-প্রতিবন্ধকতা থেকে হর-পার্বতীই বাড়ি বা পরিবারটি রক্ষা করবেন। এছাড়া সন্ন্যাসীদের শরীরে বান বা বর্শা গেঁথে চড়ক গাছের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে মানত চোকানো এও এক অন্ধ বিশ্বাস। এর পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও না কোনও উদ্দেশ্য থাকে আরাধ্য দেব-দেবীর কাছে। আদিমসংস্কৃতির ধারার পরিবর্তিত রূপটির ধারক ও বাহক হিসেবে বর্তমান হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে গাজন অনুষ্ঠানটি মূলত লক্ষিত। এর ভিন্ন

অংশ যেমন—মড়াখেলা, মুখোশখেলা—এই আচার অনুষ্ঠানগুলির প্রাচীনতা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তা আদিমযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। 'নীলপূজা'র দিন শোলমাছ পুড়িয়ে ভাত রান্নার প্রথাটিও আদিম একটি সংস্কার। আদিম সংস্কার ও বিশ্বাসের সাথে যেমন যাদুবিশ্বাস, মন্ত্র-তন্ত্র জড়িয়ে রয়েছে তেমন গাজনের সাথেও মন্ত্র-তন্ত্র, যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। যেমন—মনে করা হয় শিবের অনুচরদের মধ্যে রয়েছে ভূত-প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী ও সমস্ত শ্মশানবাসী তাই নীলপূজার আগের দিন পান সুপারি দিয়ে এই সমস্ত শ্মশানবাসীকে নিয়ন্ত্রণ করে সন্ন্যাসীরা এবং 'নীল' পূজার দিন শোলমাছ পোড়ানো ভাত শ্মশানে তাদের উদ্দেশ্যে দিয়ে আসার মধ্য দিয়ে রয়েছে যাদু বিশ্বাস তবে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল, গাজন উৎসবের উদ্দেশ্যই ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণের আশা, যা এক অন্ধবিশ্বাস। নীলপূজার আগেরদিন আবাল্যবৃদ্ধবনিতার দল নববস্ত্র পরিধান করে কালিঘাট সংলগ্ন গঙ্গায় স্নান সেরে ঘটে করে বাঁকে ঝুলিয়ে গঙ্গাজল নিয়ে সারারাত্রি হেঁটে এসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের আমতলার কাছে জয়রামপুরে অবস্থিত মন্দিরে শিবের মাথায় সেই জল ঢালে কেউ কেউ আবার নিজের পছন্দের মন্দিরে শিবের মাথায় ঢালে রোগমুক্তি ও ভালো ফসল পাবার আশায়, সারাবছর স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার উদ্দেশ্যে। ভক্তিই এখানে তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত। 'চড়ক' বা 'ধর্মদোল' পূজার মন্ত্রের মধ্যে মিশে রয়েছে ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য উভয় দিকই। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক এই দুটির মিশেল ঘটেছে এখানে। শাস্ত্রীয় দিক থেকে উল্লেখ করা যায় শিবপুরাণ এর কথা। ব্রাহ্মণ্য এও মন্ত্রের ভাষা স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃত। আবার অব্রাহ্মণ্য মন্ত্রগুলি পুরোপুরিভাবেই লৌকিক। যার ভাষা গ্রামের মানুষের মতোই সহজ সরল আবেগ প্রবণ।

চড়ক ও গাজন উৎসবে যাঁরা সন্ন্যাসী হতেন বা সঙ সেজে নাচ গান করতেন তাদের অংশগ্রহণের মূল কারণ ছিল আর্থিক দারিদ্রতা। একদিকে তারা বিশ্বাস করত যে আরাধ্য দেবতার আশীর্বাদে তাদের দৈনন্দিন জীবনের দারিদ্রতার অবলুপ্তি হবে, অন্যদিকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল বাবুদের বাড়িতে চড়কে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল কিছু প্রাপ্তি যোগের আশা। তাদের নানারকম কষ্টসাধ্য ক্রিয়াকাণ্ডের পরিবর্তে দর্শকদের কাছ থেকেও কিছু প্রাপ্তিযোগ হত। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছেন—

> "কলিকাতার চড়ক পূজাই তো এক রকম প্রায় উঠিয়া গেল। এক শত বৎসর পূর্বে কলকাতার অধিবাসী প্রায় চৌদ্দ আনা বাঙ্গালীই ছিল, এবং ছোট খাটো দোকানি-পসারি শিল্পী শ্রমিক সবই বাঙ্গালী ছিল। বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে তখনও ক্ষয়রোগ দেখা দেয় নাই তাই উৎসবে পূজা পার্বণে ভদ্রেতর বাঙ্গালী জনসাধারণের উৎসাহ ছিল নিম্ন শ্রেণির লোকদের আনন্দ ও ধর্ম-বিশ্বাস পর্ব-দিবসকে জাঁকাইয়া তুলিত। দুই একটি পূজায় এই শ্রেণীর লোকেরা নিষ্ঠুর কৃচ্ছ্রতার সহিত মানত-প্রতিপালন করিত ও ব্রত উৎযাপন করিত। এই সব কৃচ্ছ্রতার মধ্যে চড়কের বাণফোঁড়া একটা বড় অনুষ্ঠান ছিল। ... আজ ষাট বৎসর হইল চড়কের এই প্রকার বাণ ফোঁড়া প্রভৃতি ব্যাপার উঠিয়া গিয়াছে। সমাজ হইতে স্বাভাবিক ভাবেই লোপ পাইয়াছে। বাঙালী নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে শক্তি ও উৎসাহের ক্রমিক বিলোপ এবং তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হওয়াই ইহার মুখ্য কারণ।"[১৫]

চড়ক ও গাজনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য হল মানবমন ও শরীর থেকে পশুপ্রবৃত্তির নির্গমণ ঘটানো এবং শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে ওঠা অর্থাৎ আত্মশুদ্ধিকরণ। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী চড়ক ও গাজনে অংশগ্রহণকারীদের সাথে পাশুপত সম্প্রদায়ের কোন এক শাখার সাদৃশ্য পেয়েছেন যার সাথে অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নরেন্দ্রনাথ বাবু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "পাঁচটি বিষয়ের উপর পাশুপত ধর্ম কেন্দ্রীভূত— কার্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। জগত ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে পাশুপাত ধর্ম বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ ধারণাই পোষণ করে। এরও মূল প্রতিপাদ্য দুঃখ ও দুঃখের নিবৃত্তি। বৌদ্ধধর্মের মত পাশুপত ধর্মও কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী। পাশুপত কার্যকারণতত্ত্ব সাংখ্য আশ্রয়ী। কার্য বলতে জগতকে, জাগতিক বস্তু ও প্রাণীসমূহকে বোঝায়। পাশুপত তত্ত্বে যাদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে পশু। জীব বা পশুর গুনসমূহের নাম বিদ্যা এবং উপাদান সমূহের নাম কলা। একজন মানুষ আসলে কলা ও গুণ যুক্ত পশু। যতদিন দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততদিন সে অবিশুদ্ধ এবং যখনই এই বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয় তখন সে শুদ্ধ পর্যায়ে উন্নীত হয়।"[১৬]

অনেকে গাজনের উৎসবের সাথে আদিম সমাজের বৃষ্টিপাত করানোর উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করেন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় চড়ক ও গাজনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে 'নায়ক' পত্রিকার 'চড়ক-সংক্রান্তি' নামক প্রবন্ধের ৯১-৯৩ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করে লিখেছেন—

> "আমাদের পুরাতন বর্ষ শেষ হইল আজ চৈত্র সংক্রান্তির দিনে। এই দিনই অজ্ঞাত ভবিষ্যতের বক্ষে একটি আশার যব রাখিতে হয়। যেন কাল হইতে সব নতুন হইবে, নতুন বর্ষ, নবীন আশা, নবীন উদ্যোগ, সবই যেন নূতন হইবে। তাই আজ পুরাতনের শেষ, কাল নবীনতার সূচনা। জীবনটাকে স্বাদু করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এক একটা উৎসব, এক একটা পূজা, এক একটা জন্মতিথি, যেন নূতনের সূচক ও প্রবর্তক হইয়া আমাদিগকে সজ্ঞান করিয়া তোলে। তাই এই সকল দিনকে 'বৎসরকার দিন' বলা হয়। অর্থাৎ এই সকল আমাদের জীবন প্রবাহের যেন এক একটা ছেদ, এক একটা পুরাতন অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এবং নূতনের সূচনা। ... তাই প্রগাঢ় রসবিৎ হিন্দুগণ আজ চৈত্র সংক্রান্তির দিন সংসারের সং বাহির করিয়া থাকেন। এ যে কেবল সং এর খেলা, এতে কেবল ব্যঙ্গ, কেবল বিদ্রূপ, নিয়তির সহিত কেবল উপহাস, সেইটুকু বুঝাইবার জন্য আজ সংক্রান্তির সং যোটানো হয়। দেখ, দেখ ঐ অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল-স্বরূপ চড়ক দণ্ডের চক্রের উপর দড়ি বাঁধিয়া এত লোকে ঘুরিতেছে। কেহ পিঠ ফুঁড়িয়াছে, কেহ জিভ ফুঁড়িয়াছে, কেহ বা হস্ত পদবন্ধ হইয়া কেবল ঘুরিতেছে। দে পাক, দে পাক, কেবল পাক দিতেছে, আর পাক খাইতেছে। ১৩২৭ পাক আমরা খাইলাম।"[১৭]

গাজন উৎসবটিতে মূলত অন্ত্যজ শূদ্ররাই অংশগ্রহণ করতেন। আদিতে বাংলার সমাজ ছিল কৌমভিত্তিক আর সেই কৌম জাতির অন্যতম ছিল পৌণ্ড্র ও কর্বট সম্প্রদায়, এছাড়াও ছিল হাড়ি, ডোম, বাগদি, বাউড়ি প্রভৃতি সম্প্রদায়। অনুমান করা হয় যে, বর্তমানের পোদ ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ই প্রাচীন পৌণ্ড্র ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বংশধর। সমাজে তখন উচ্চ, মধ্য, নিম্ন নানা বৃত্তির মানুষেরই বাস ছিল। তখন বাংলা ছিল তন্ত্রধর্মের অন্যতম ক্ষেত্র। গুপ্ত যুগের পর পাল রাজাদের রাজত্বকালে বাংলায়

বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারাও তন্ত্রধর্ম গ্রহণ এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করেছিল। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ছিল জাতিভেদহীন। পাল রাজারা যে ৪০০ বছর রাজত্ব করেছিল সেই সময়ে বাংলায় মিশ্র বা সংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। এর পরে সেন রাজাদের রাজত্বকাল। তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই বলা যায় ব্রাহ্মণরা ছাড়া বাংলার বাকি সমস্ত জাতিই সংকর বা মিশ্র জাতি—বৃহদ্ধর্ম পুরাণে একথার উল্লেখ রয়েছে সুতরাং বাংলার লোকউৎসব গাজনকে তাই মিশ্র সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয় বলা যায়।

গাজন উৎসবটিতে উচ্চশ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতেন না। পুরাণে উল্লেখ রয়েছে অসুররাজ বানের দ্বারা শিবকে তুষ্ট করার মধ্যেই গাজন উৎসবের অন্তর্নিহিত বীজটি সুপ্ত রয়েছে। বান অসুররাজ, সুতরাং সে অনার্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তার উপাস্য দেবতা শিব এবং আদিতে অনার্যরা শিবলিঙ্গের উপাসক ছিলেন। গাজনে যেহেতু শূদ্ররাই মূলত অংশগ্রহণ করেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে শূদ্ররা আর্য নাকি অনার্য জনগোষ্ঠী? এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ডঃ রামশরণ শর্মা বলেছেন—

> "শূদ্ররা আর্য না প্রাগ্-আর্য জনগোষ্ঠী আর যদি তাঁরা আর্যই হন তবে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন কবে? শূদ্র জনগোষ্ঠীর নৃকুলগত বর্গীকরণের ক্ষেত্রে যে সব মতামত আছে তা পরস্পর বিরোধী। প্রথমে মনে করা হত, শূদ্ররা ছিলেন আর্যদেরই এক পূর্বতরঙ্গ। পরে ধরে নেওয়া হয় যে শূদ্ররা প্রাগ্ আর্য জাতিগুলোরই এক শাখা। কোন মতের পক্ষেই প্রমাণ দেওয়া হয়নি কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এমন ভাবার প্রবণতা আসতে পারে যে শূদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যদের কিছুটা সারূপ্য ছিল।"[১৮]

তবে তিনি আরও একটি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সারূপ্য থাকা সত্ত্বেও শূদ্রদের মৌলিকতা নিরূপিত হয়নি। তবে একথা সত্যি যে, লৌকিক উৎসব গাজন যেমন ছিল উচ্চশ্রেণি বা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত, তেমনই আজও তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রয়েছে তবে গাজন ও চড়ক উৎসব সর্বক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব মুক্ত নয়, কারণ শূদ্রসংস্কৃতিতে সম্প্রীতির কথা বলা হয় তাই প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব থাকে এবং লিঙ্গপূজা প্রথমে অনার্যজাতির হলেও পরে এতে আর্যরাও অংশ নিয়েছিল আর বরাবরের জন্য আর্য-অনার্য সকলেই ছিল শিবের উপাসক।

গাজন উৎসবে মূলত নিম্নবর্ণীয় দরিদ্র শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করলেও কোথাও কোথাও বা পরোক্ষভাবে এই উৎসবে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তবে মূলত বাংলার কৃষিজীবী শ্রমিক শৈব উপাসকগণেরাই অংশ নেন। তবে সব জায়গাতেই পৌরহিত্যের কাজটি করেন ব্রাহ্মণসম্প্রদায়।

কামার, কুমোর, শবর, ছুতোর, ডোম, কৈবর্ত, পোলিয়া, মাহালি প্রভৃতি বর্ণসম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষগণ গাজনোৎসবে অংশগ্রহণ করে তাদের 'ভক্ত' বা 'ভক্ত্যা' বলা হয় আবার কোথাও 'দেয়াসী' নামে অভিহিত হন। গাজনোৎসবে ভক্তরা সন্ন্যাসগ্রহণ করে অংশগ্রহণ করায় তাদের সন্ন্যাসী বলা হয়। যারা সরাসরি ভাবে আচার-আচরণগুলির সাথে যুক্ত থাকে তাদের 'বালা' বা 'সাই' নামে অভিহিত করা

হয়। বিভিন্ন আচরণীয় কর্মানুযায়ী তাদের আবার অভিহিত করা হয়। বীরভূমে ধর্মের গাজনে প্রধান সন্ন্যাসীকে 'দেয়াসী' বা 'দেবাংশী' বলা হয়। বাঁকুড়ায় বলা হয় 'পাটভক্ত'। ইনিই পাট সাজানো, বহন করা, পুকুরে স্নান করানোর দায়িত্ব পালন করেন। 'পাটভক্তা' বা মূলসন্ন্যাসীদের পদটি অধিকাংশ জায়গাতেই বংশানুক্রমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। গ্রামের মানুষের ধারণা স্বয়ং শিবই এই নির্দেশ দেন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সংগ্রহ করা এরকম ৫৩টি গাজনে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসীর নাম হল— সর্বাধ্যক্ষ, ধর্মাধিকারী, বালা, রায়বালা, প্রথমবালা, ধূলিসাভট, ডাবর স্বামী, নীলপত্র, ভাণ্ডারী, জলসাভট, দ্বারপাল, ক্ষীরপাত্র, কোটাল, হনুমান, পাটসঙ্গি বা পট্টসঙ্গ, মাধুলী বা মাদলী, প্রণামকোঙর, ভোগবটু বা ভোগপাত্র, পুস্পবুট, চলনপাত্র, খেচরাপাত্র বা খিচরিপাত্র, ধূপসঙ্গি, যন্ত্রবটু, পাত্রবটু, ছত্রবটু বা ছত্রবালা অথবা ছত্রসঙ্গি, বিভূতিপাত্র, মৎস্যধানী, বস্ত্রপটু, নেত্রকোটাল, বাচয়াসিংহ, ডাচয়াসিংহ, উঠিয়াসিন বা উঠিয়ানিম, ঘন্টাধারী, সর্বত্র, সাধনী, লাঠিপাত্র, মহাবালা, নীরপত্র, স্থানপাত্র, অস্ত্রবটু, চন্দনপাত্র, পুষ্পপাত্র, বাটসঙ্গি বা বাটয়াসিন, মুদ্রাধিকারী, ডোলী, চামরধারী, শঙ্খধারী, বেনীপাত্র, মাদলী, স্থুলপাত্র, কর্তা, ব্যঞ্জনপাত্র এবং গন্ধবটু।[১৯]

গাজন উৎসবটি মূলত অব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের হলেও সব জায়গাতেই পৌরোহিত্যের কাজ করেন ব্রাহ্মণসম্প্রদায় এবং তাদের মন্ত্রও অঞ্চল ভেদে ভিন্ন। কোনো কোনো জায়গায় আবার ব্রাহ্মণ্য মন্ত্রের সাথে অব্রাহ্মণ্য মন্ত্রও যুক্ত হয়। যেমন—তারকেশ্বরের গাজনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত মন্ত্রের সাথে অব্রাহ্মণ্য শবরী মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ—

'ক্লিং ক্লিং ক্লিং । ওঁ কামরাজায় স্বাহা' (সংস্কৃত মন্ত্র)
'হংস রথে এসো প্রভু জটা উড়ে যায়
আমার ঠাকুর ভোলানাথ সেবক চাইলে যায়' (শবরী মন্ত্র)[২০]

রাঢ় দেশের ধর্মগাজনই ক্রমে শিবগাজনে পরিণত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে পূর্বে ধর্মগাজন ছিল বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান।[২১] শিব-গাজন উৎসবেও মূলত নিম্নবর্ণীয় মানুষেরা অংশগ্রহণ করলেও প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা নেন ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মানুষ। সুতরাং গাজন উৎসবটি মূলত নিম্নবর্ণীয়দের উৎসব হলেও উচ্চবর্ণের মানুষও এতে অংশগ্রহণ করে। ভক্ত্যা অর্থাৎ সাঙ্গ বা সন্ন্যাসীরা গাজনের মূল ভূমিকা পালন করলেও বা সংখ্যায় সর্বাধিক অংশগ্রহণকারী হলেও পৌরহিত্যের ক্ষেত্রে তাদের কোনো অধিকার নেই। সেই দায়িত্বটি পালন করেন উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত। এর মূলে হল— বাংলায় গাজনোৎসবটিকে একসময় নিম্নবর্ণীয়দের জাতীয় উৎসব বলা যেত এবং বঙ্গে বসবাসকারী নিম্নবর্ণীয় মানুষের সংখ্যাই সর্বাধিক তাই ব্রাহ্মণ্য শ্রেণি নিজেদের আধিপত্যটিকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই পৌরোহিত্যের ভূমিকাটি নির্ধারণ করেন এবং নির্ধারণ করার সময় তাঁরা নিম্নবর্ণীয়দের বোঝান যে ব্রাহ্মণ্য পৌরোহিত্যের স্পর্শে অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণীয় হিন্দু শ্রেণি সম্প্রদায়ের এই উৎসব উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত

হয়। ফলস্বরূপ উচ্চবর্ণের আধিপত্যটি বজায় থাকে আর নিম্নবর্ণেরা কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এ প্রসঙ্গে এম. এন. শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন সেটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—

> "সংস্কৃতায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি 'নিচু' হিন্দু জাতি বা উপজাতি বা অন্য কোন গোষ্ঠী তার লোকাচার, ক্রিয়াবিধি, মতাদর্শ ও জীবনচর্যাকে একটি উঁচু এবং প্রায়শই 'দ্বিজ' জাতির আদলে পরিবর্তিত করে। বর্ণভিত্তিক স্তর কাঠামোয় ওই জাতির যে স্থান স্থানীয় সমাজের দ্বারা সনাতনভাবে স্বীকৃত। তার থেকে উচ্চতর স্থানের দাবি সাধারণত ওই ধরনের পরিবর্তনের পরেই আসে। এই দাবির স্বীকৃতি পেতে লেগে যায় বেশ কিছু সময়, বলতে কি, দু-এক পুরুষও।"[২২]

এই সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটি আসলে দুটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করে না বরং তাদের বর্ণগত বিভাজন সামাজিকভাবে আরও বাড়িয়ে দেয়।

চড়ক

গাজন উৎসবের শেষ পর্যায় হল চড়ক। অনেকে চড়ক পুজোও বলেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক হয়। চড়কের উৎপত্তি নিয়ে ভিন্ন জনের ভিন্ন মত রয়েছে। কারও মতে শ্রীকৃষ্ণের সাথে বাণরাজার যুদ্ধের সময় শিবকে তুষ্ট করার জন্য বাণ রাজা তপস্যা করে। তার আত্মনিগ্রহ থেকেই চড়কের উৎপত্তি হয়েছে। গাজন উৎসবের চড়ক পুজোর সাথে শিবের কোনো সম্পর্ক নেই বরং সূর্যের সাথে এর একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মসংহিতাতে আছে—অসুররাজ বলির জ্যেষ্ঠ ও প্রিয় পুত্র বাণ ছিলেন শিবভক্ত। গভীর শিবভক্তির জন্য তাকে শিবপুত্র বলে অভিহিত করা হত কিন্তু অসুর কুলের সন্তান হওয়ার কারণে তার শিবপূজায় বাধা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে শিবের কন্যা ঊষার সাথে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপনে প্রণয় ঘটে। সেই সম্পর্ক প্রকাশিত হলে বাণ রাজার সাথে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণের চক্রাঘাতে বাণ রাজার দুই হস্তচ্ছেদ হয়। তখন বাণ রাজা শিবের বর পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে তুষ্ট করার জন্য ঐ অবস্থাতেই নৃত্য করে। তাতে শিব তুষ্ট হয়ে বাণ রাজাকে বরদান করেন যে, বাণ রাজার কোনো ভক্ত ঐ রকম কষ্ট স্বীকার করে নিরাহার থেকে নৃত্য করলে সেও শিবের পুত্রত্ব লাভ করবে।[২৩]

আবার *হরিবংশ* এর বিষ্ণুপর্বে আছে—সহস্র বাহু নিয়ে বাণ রাজা কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাধা দিলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কৃষ্ণ বাণ রাজার সব হাত বাণবিদ্ধ করলে সেই অবস্থাতেই শিবকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বাণ রাজা নৃত্য করে। এতে শিব সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করেন যে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এরকম নৃত্য করলে শিবের পুত্রত্ব লাভ করবে। এরপর থেকে বাণ রাজার ভক্ত ও অনুচরেরাও তার পুত্রত্ব পাওয়ার উদ্দেশ্যে রক্ত তর্পণের মাধ্যমে শিবসাধনা করেন তাই

অনেকে মনে করেন বাণ রাজার রক্ত অর্ঘের মধ্য দিয়ে শিব তুষ্টির এই পুজাৎসবই পরবর্তীকালে চড়ক বা গাজনোৎসব নামে খ্যাত হয়েছে। যার মূলমন্ত্র হল আত্মপীড়ার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি।[২৪]

বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে এই কিংবদন্তিকে একটি ছড়া ও গানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন—

"সেই বাণরাজা নিজ দেহ ফুঁড়ে নানা বাণে।
সঙের সৃষ্টি করেছিলেন এই চৈত্র সংক্রান্তির দিনে।।
এই চড়কেরও সৃষ্টি হল সেই দিন হতে।
স্পষ্ট করে লেখা আছে দেখুন পুরাণেতে।।"[২৫]

বৃহদ্ধর্ম পুরাণ এর উত্তরখণ্ডের নবম অধ্যায়ে চৈত্র সংক্রান্তির গাজনোৎসবে শিবপূজায় অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে—

"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্ষাণ নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
স্নায়াৎ ত্রিসন্ধ্যাং রাত্রৌ চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।।
শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রতিকরঃ পরঃ।
ক্ষত্রিয়াদিষু যো মত্তো দেহং সংপীজ ভক্তিতঃ।।
অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে চ পদে পদে।
সর্বকর্মপরিত্যাগী শিবোৎসবপরায়ণঃ।।
ভক্তির্জগিরনং কুর্যাৎ রাত্রৌ নৃত্যকুতুহলৈঃ।
নানাবিধৈমহাবাদ্যৈর্নৃ তৈশ্চ বিধিধৈরপি।।
নানাবিশধরৈর্নৃত্যৈ প্রীয়তে শঙ্করঃ প্রভুঃ।
কিমলব্ধং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে।।
তস্মাৎ গর্বপ্রযত্নেন তোষণীয় মহেশ্বরঃ।
শঙ্খবাদ্যং শঙ্খতোয়ং বর্জয়েৎ শিবসন্নিধৌ।।
গ্রামাদ্বহিরিমং শম্ভোরুৎসবং কারয়েন্মুদা।
উপোষ্য হুত্বা সংক্রান্ত্যাং ব্রতমেতৎ সমর্পেয়ৎ।।[২৬]

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ১৩১০ বঙ্গাব্দে 'নব্যভারত' পত্রিকায় 'চড়ক উৎসব' শীর্ষক রচনায় লিখেছেন— মধ্যভারতের দুইটি সরিৎ বাণগঙ্গা ও পানগঙ্গা 'খাউ' নামক একটি পর্বতশৃঙ্গের তলায় এসে মিলিত হয়ে গোদাবরী নদীতে এসে মিলিত হয়। মানিক দুর্গের কয়েক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এবং চান্দা নগরের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত এই পর্বতশৃঙ্গে বাণ রাজা শিবকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রথমে তপস্যা করেন এবং ক্রমে উগ্র থেকে উগ্রতরভাবে সাধনা করেন।[২৭]

চড়ক শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে। যেমন—

ক) কেউ কেউ মনে করেন চড়ক শব্দটির উৎপত্তি হয়ে ‘চক্র’ শব্দটি থেকে। বারো মাস ও ছয় ঋতু চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এই উৎসব তারই লৌকিক প্রতীক। সেই জন্যই এর নাম হয়েছে চড়ক।

খ) গাজনোৎসবের একেবারে শেষ পর্যায় হল চড়ক। এই পর্যায়ে গর্জন গাছে চড়া ও নানা রকম কৌশল প্রথা পালন করা হয়। অনেকে মনে করেন এই ‘চড়া’ থেকেই চড়ক নামকরণ হয়েছে।

গ) অনেকে এই উৎসবটিকে সূর্য পূজা বলে মনে করেন। তাদের ধারণা অনুযায়ী সূর্যের চক্রাকারে পরিক্রমণের প্রতীকই হল চড়ক গাছ।

ঘ) কৃষি প্রধান বাংলাদেশে চড়ক উৎসবের উদ্দেশ্যে হল ভালো কৃষি উৎপাদন। শিব কৃষিদেবতা। পার্বতী ধরিত্রী, যেখানে উৎপাদন হয় আর গাজন উৎসব হল শিব-পার্বতীর বিবাহকেন্দ্রিক উৎসব। শিবলিঙ্গ প্রজননের প্রতীক। তার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় ভূমিতে উল্লম্ব করে বিদ্ধ করা গাজন বা গর্জন গাছের। সেই গাছে পাক খেয়ে ঘোরার সাথে সাদৃশ্য মেলে জমিকর্ষণ বা বীজ ছড়ানোর। এই জীবন চক্র থেকেই চড়ক নামটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন অনেকে।

ঙ) চৈত্র সংক্রান্তির দিনেই সূর্যের অয়ন বা যাত্রা শুরু বলে মনে করা হয়। ভারতীয় পঞ্জিকার গণনা অনুযায়ী সূর্য দ্বাদশরাশি পরিক্রমা করে পুনরায় ওই পথেই আবার যাত্রা শুরু করে। এই যে নতুন করে আবার পথ চলা শুরু বা চক্রপথে আবর্তন এ থেকেই চড়ক শব্দের উৎপত্তি হতে পারে বলে কারও কারও মত।

চ) ‘চড়ক’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে চক্র শব্দটি থেকে। ‘চক্র’ শব্দটি স্বরভক্তিতে হয় ‘চকর’, ‘চক্কর’। এর বর্ণ বিপর্যয় ঘটে হয় চরক। পশ্চিমাঞ্চলে তার রূপান্তর ঘটে হয়েছে ‘চরখ’, ‘চরখী’, ‘চরখা’। বাংলাতেও ‘চরকী’ বা ‘চরকা’ শব্দের প্রয়োগ আছে। ‘চরখ’ শব্দটি থেকেই ‘চড়ক’ শব্দটি বাংলায় এসেছে।

গাজনোৎসবে সন্ন্যাসীরা বাণ রাজার তপস্যাকেই অনুকরণ করেন। যে সমস্ত আত্মপীড়ন প্রথাগুলি গাজন উৎসবের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে তার পিছনেও মাইথোলজি রয়েছে। যেমন—‘ঝুলঝাঁপ’ সম্পর্কে রয়েছে যে—বানরাজা যখন উপলব্ধি করল যে শুধুমাত্র পূজার দ্বারা শিবের অভীষ্ট লাভ সম্ভব নয় তখন এক বৃক্ষের নীচে আগুন জ্বালিয়ে বৃক্ষশাখায় দুই পা বেঁধে ঐ আগুনের উপর মাথা ঝুলিয়ে দেন। তারই অনুকরণস্বরূপ সন্ন্যাসীরা দিবাগমের পূর্বে ঝুলঝাঁপ পালন করে। এরপর বাণ মহাদেবের নামোচ্চারণ করে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে নীচে কণ্টকাকীর্ণ উপত্যকায় ঝাঁপ দেন। সন্ন্যাসীরা এর অনুকরণস্বরূপ ‘কাঁটাঝাঁপ’ পালন করেন। এরপর বাণ রাজা শিবের উদ্দেশ্যে প্রাণদানের জন্য তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র পৃথিবীতে বিদ্ধ করে বৃক্ষশাখা থেকে পতিত হন। গাজনোৎসবে এটি সন্ন্যাসীরা ‘বঁটিঝাঁপ’ স্বরূপ পালন করেন। এরপর বাণ রাজা বাণ দ্বারা নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করে পৃষ্ঠ দেশে বিদ্ধ বাণটিকে বৃক্ষশাখায় বেঁধে ঝুলতে লাগলেন এবং তখন শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রদান করেন।[২৮]

চড়ক উৎসবের অন্যতম একটি বিষয় হল ঝাঁপ। ‘ঝুলঝাঁপ’, ‘কাঁটাঝাঁপ’ ও ‘বঁটিঝাঁপ’—তিনটি ঝাঁপের পূর্বে সন্ন্যাসীরা শিবের কাছে অনুমতি নেয় বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। একে বলে ‘মাথাচালা’। এই সময় সন্ন্যাসীরা শিবের ঘরের সামনে বসে মাথা ঘোরাতে থাকে। আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিবের মাথায় ফুল, গঙ্গাজল দিতে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না শিবের মাথা থেকে ফুল নীচে পড়ে সন্ন্যাসীরা মাথা চালতে থাকেন। ফুল পড়ার পর সন্ন্যাসীরা বাদ্যসহ নৃত্য করতে করতে ঝাঁপ আরম্ভ করেন। মাথা চালার সময় অনেক সন্ন্যাসী অসুস্থ হয়ে পড়ত। সাধারণ মানুষ একে ভর হওয়া বলত। তখন তার মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে তার পদধূলি নিত। এই সন্ন্যাসীরা কখনো মূল বা প্রধান সন্ন্যাসীর বা চড়ক আয়োজক বাবুর দোষের উল্লেখ করে আসন্ন বিপদ জানাতো। তারপর দোষী তার দোষ স্বীকার করত। পূজার শেষে সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ হয়। তিন ধরনের ঝাঁপ হয়। যথা—‘কাঁটাঝাঁপ’, ‘বঁটিঝাঁপ’ ও ‘ঝুলঝাঁপ’। উঁচু বাঁশের ওপর থেকে সন্ন্যাসীরা নীচে লাফিয়ে পড়ে বা ঝাঁপ দেয়। বাঁশের নীচে লোহার পেরেক, কাঁটা ইত্যাদি রাখা হয় তার নীচে থাকে খড়। পেরেক বা কাঁটাগুলো এমন কৌশলে বাঁকিয়ে রাখা হয় যেন সন্ন্যাসীদের গায়ে ক্ষত তৈরি করতে না পারে তবে কখনো লোহার শলাকা বা বঁটি থাকে। তখন তাদের বুক চিরে রক্তপাতও ঘটায়।

‘কাঁটাঝাঁপ’ হল- বিকালে স্নানের পর ঢাক, কাঁসি সহযোগে জঙ্গল থেকে বৈঁচি ফলের কাঁটাযুক্ত ঝাড় কেটে এনে স্তুপাকারে রেখে তারপর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে কাঁটাগুলোকে ভেঙে দেয়। এর পিছনে বাঁশের ভারা বেঁধে একে একে শিবের নামোচ্চারণ করে সেখান থেকে ঐ কাঁটাস্তুপের ওপর ঝাঁপ দেয়। একে ‘কাঁটাঝাঁপ’ বলে। ‘কাঁটাঝাঁপে’র পরদিন পালিত হয় ‘বঁটিঝাঁপ’। স্নানের শেষে সন্ন্যাসীরা ধারবিহীন বেশ কয়েকটি বঁটি মাথায় করে এনে একটা বড় চটের কাপড়ের ওপর খড় বিছিয়ে তার ওপর বঁটিগুলিকে সারি দিয়ে রাখে। তারপর একদল লোক এই চটের কাপড়টিকে শক্ত করে ভারার নীচে মেলে ধরে আর সন্ন্যাসীরা একে একে শিবের নামোচ্চারণ করে ভারার উপর থেকে নীচে বঁটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একে ‘বঁটিঝাঁপ’ বলে। আরেকটি হল ‘ঝুলঝাঁপ’। মাটির উপর দুটি স্তম্ভ ছয় ফুট দূরত্ব রেখে উল্লম্ব ভাবে পোঁতা হয়। তাদের মাথার উপর একটা কাঠের আল রাখা হয় যার ওপর দুটি আট ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দণ্ড থাকে। তার নীচে মাটিতে কয়লার আগুন জ্বালানো হয়। সেখানে পুরোহিত নতজানু হয়ে বসে নানা রকম গন্ধদ্রব্য ঐ আগুনে আহুতি দেয়। একজন সন্ন্যাসী এই সময় লাফিয়ে কাঠের আলটি ধরে দণ্ড দুটির ওপর পা রেখে আগুনটির উপর মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে দুলতে থাকে। সেই সময় পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে।

চড়কের এই ঝাঁপের উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থ *হরিবংশ* এর বিষ্ণু পর্বে রয়েছে যে—শোনিতপুরের সহস্র বাহু বিশিষ্ট রাজা বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ আটক হলে শ্রীকৃষ্ণের সাথে বাণের যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাণের সহস্র হাতকে বাণবিদ্ধ করে হত্যা করতে উদ্যত হলে বাণের উপাস্য দেবতা মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য বাণবিদ্ধ অবস্থায় রাজা বাণ নৃত্য করতে থাকেন। তার নাচে শিব তুষ্ট হয়ে বাণকে নিরস্ত করেন। এবং বলেন—তার যে ভক্ত উপবাসী থেকে বাণবিদ্ধ অবস্থায় নৃত্য

করবে সেই-ই শিবের পুত্রত্ব লাভ করবে। সেই থেকেই গাজনোৎসবের অঙ্গ রূপে 'বাণফোঁড়া', কাঁটা-বঁটি-আগুন ঝাঁপ বিষয়গুলি পালিত হয়। বাণ রাজার আত্মনিগ্রহের অনুকরণেই সন্ন্যাসীরা এই প্রথাগুলির মাধ্যমে আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে আরাধ্য দেবতার অনুগ্রহ লাভের প্রথা শুরু হয়।[২৯]

চড়কের মধ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চড়কের মধ্যে যে আত্মনিগ্রহের বিষয়টি রয়েছে অনেকে মনে করেন এটি জৈন ধর্মের প্রভাব কারণ জৈন ধর্মের সাধনাতে আত্মনিগ্রহকে খুবই উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়। জৈন সাধনা অনুযায়ী যদি নানারকম ভাবে শারীরিক নিপীড়ন সহ্য করে সাধনা করা যায় তবে পুণ্য প্রাপ্তি অনিবার্য। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর সেজন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তিনি কোনো প্রকার শারীরিক যত্ন নেবেন না। ঈশ্বর, মানুষ বা পশু দ্বারা কৃত যে কোনো প্রকার কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করে নেবেন এবং দুঃখ প্রদানকারীকে ক্ষমা করে দেবেন। পাশাপাশি তিনি লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়কে সম্পূর্ণরূপে জয় করেছিলেন তাই যে কোনো প্রকার আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্টকে জয় করেছিলেন। যে কোনো প্রকার শারীরিক যন্ত্রণাই তিনি সহ্য করে নিতেন। এমনকি প্রাকৃতিক ভীষণতা বা দুর্যোগ বিপর্যয় কোনো কিছুই তাঁর ঈশ্বর সাধনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।[৩০]

এই তুলনার দ্বারা তিনি দেখিয়েছেন যে ঈশ্বরের পূজা উপলক্ষ্যে উপবাস বা চড়কের নানা রকম শারীরিক আত্মনির্যাতনমূলক রীতিগুলির মধ্যে রয়েছে জৈন ধর্মের প্রভাব। কারও কারও মতে চড়ক উৎসবের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাবও রয়েছে। তিব্বতীরা মালা জপের সুবিধার জন্য ধর্ম চক্র ঘুরিয়ে ধর্মানুষ্ঠানে ধর্ম-চক্র প্রবর্তন করেন। চড়ক উৎসবে চড়কগাছে প্রদক্ষিণ করার বিষয়টিও এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩১]

চড়ক উৎসবের আচরণ রীতিগুলির মধ্যে বেশ কিছু রীতি আছে যেগুলি বিপজ্জনক। সেগুলি জীবন সংশয় অবধি ঘটাতে পারে তাই সেগুলিকে আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। তেমনই একটি রীতি হল 'বাণসন্ন্যাস'। তবে আইন অনুযায়ী বর্তমানে একে নিষিদ্ধ করা হলেও কোথাও কোথাও এখনও এগুলি পালন করা হয়।

ঊনিশ শতকে চড়কের সমারোহের সময় (আনুমানিক ১৮৬৩ বা ১৮৬৫ সাল নাগাদ) ছোটলাট বিডন এক ইস্তাহার জারি করে গাজন বা চড়কের মিছিল সমারোহকে বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেন।[৩২] এরপর থেকে এই প্রথায় সামান্য পরিবর্তন ঘটানো হয়। পিঠে বঁড়শি বেঁধানোর পরিবর্তে গামছা বেঁধে চড়ক গাছে ঘোরার প্রথা চালু হয় তবে কলকাতায় এই আইন আপাত কার্যকরী হলেও বাংলার অন্যত্র চালু ছিল এবং বর্তমানে এরকম বেশ কিছু প্রথা রয়ে গেলেও কিছু প্রথা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। সেরকম দুটি প্রথা হল—'মায়ের পাতা' ও 'কালিকার পাতা'। এগুলি কোথাও আর সেভাবে দেখা যায় না। চড়কের বীভৎসতা দেখে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে পুলিশ বাণ, বঁড়শি বিদ্ধ করাকে বন্ধ করার চেষ্টা করে কিন্তু শহরাঞ্চলে তা বন্ধ করা গেলেও গ্রামাঞ্চলে তা

রোধ করা যায়নি। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আবার নতুন আইন করে প্রথাটিকে নিষিদ্ধ করে প্রথাটিকে বন্ধ করার চেষ্টা করে।[৩৩]

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন লেখকের লেখায় চড়ক উৎসব স্থান পেয়েছে। প্রায় একশ বছর পূর্বে কলকাতা গেজেটের ১৮শ খণ্ড, পৃ: ৬৮ থেকে ৭০তে চড়কের একটা বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৪] Good old days of Hon'ble John Company, Asiatic Journal এও কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় চড়কের বীভৎসতা বর্ণিত হয়েছে। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এরকম কিছু প্রকাশ করেছেন। স্মিথ লিখিত কেরীর জীবনীতে পৃ: ২৫৫-২৫৬-তে চড়কের ভয়াবহ দৃশ্যের চিত্র প্রকাশিত হয়েছিল—দীনেশ কুমার রায় তাঁর *'পল্লীচিত্র'* জাতীয় একাধিক স্মৃতিকথা গ্রন্থে সেকালে চড়কের চিত্র বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাবন্ধিক কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) তাঁর *'হুতোম প্যাঁচার নকশা'*য় (১৮৬৫ খ্রিঃ) চড়কের বিবরণ দিয়েছেন—

> "কলিকাতা শহরের চারিদিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কীর পিট সড় সড় কচ্চে, কামারেরা বান, দেশলকি কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে; সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি, মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেনে ও কাঁসারির আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন"। ... এদিকে চড়কতলায় ... এক একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে, পা নেড়ে ঘুত্তে লাগলো। কেবল "দেপাক দেপাক" শব্দ। কারু সর্ব্বনাশ। কারু পৌষ মাস ! একজনের পিঠ ফুঁড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোকে মজা দেকচেন।"[৩৫] চড়ক। গত সংক্রান্তির দিন মোং কলিকাতায় এমত একপ্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলেই শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। একজন হিন্দু সহীস ও আর একজন স্ত্রী এই দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনো প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিলেও এই দুই দুষ্কর্ম করিল।[৩৬] অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—বহুকালাবধি রাষ্ট্র কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব্ব সাধারণে দৃষ্টান্ত নিমিত্ত করিয়া থাকেন অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট সম্প্রতি তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে অর্থাৎ গত ৩০ চৈত্র নীলের উপবাসের দিবস এ নগরস্থ যত গাজন আছে সে সকল গাজনের সন্ন্যাসীরা প্রথমত প্রতি বৎসর যে প্রকার সং সাজিয়া বান ফুড়িয়া কালীঘাট হইতে আসিতে থাকে সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়া আসিয়াছিল তন্মধ্যে শুনা গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সরকারের গাজনে অনেক সন্ন্যাসী হইয়াছিল সেই গোলযোগে বাবু দিগের বিনা অনুমতিতে দুই জন কপটবেশি ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়া অতিকুৎসিত সং সাজিয়া ঐ দল সবল জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা দেখিয়া পুলিসের আজ্ঞা শাসকেরা এই দুই ব্যক্তিকে বন্ধন করত শ্রীযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের নিকট লইয়া যাইবাতে তাঁহারা তৎকর্ম্মের উচিৎ ফল প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ শুনিলাম তাহার দুই সপ্তাহ মেয়াদের হরিণবাটীতে প্রেরিত হইয়াছে।...[৩৭]

কিছু কিছু চড়ক ছিল জগৎ বিখ্যাত। তেমনি একটি বিখ্যাত চড়ক ছিল হাওড়া জেলার বাইনান গ্রামের 'হটলাগর' শিবের গাজন উৎসবের চড়ক। সেখানে জিভে বাণ ফুঁড়িয়ে বা আগুনের ওপর মাথা নীচু ও পা ওপরে দড়িতে বেঁধে রেখে ঝোলার রীতি এখনও পালন করা হয়। 'সুতোবাণ', 'কাঁটাবাণ' প্রথাও পালন করা হয়।[৩৮] সাঁওতাল পরগনাতেও বৈশাখ মাসে চতা পরব হয় যার সাথে আমাদের চড়ক উৎসবের সাদৃশ্য রয়েছে। কলকাতার বাগুয়া বাজার যা বর্তমানে বাগবাজার নামে পরিচিত সেখানে ষোল চড়কী ছিল কলকাতার সর্বপ্রধান বিখ্যাত চড়ক, যা বর্তমানে যেখানে বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়ি তার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হত। সারাবছর চড়ক গাছটি উদ্যানের বৃহৎ পুষ্করিণীটিতে নিমজ্জিত রাখা হত। কিন্তু রামধন ঘোষের এই চড়কটি ১৮৫৫ খ্রিঃ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।[৩৯] শান্তিপুরে একসাথে বত্রিশজন ঘুরেছিল চড়ক উৎসবে। কলকাতার ভবানীপুর, বেলেঘাটা, বরাহনগর ও নিমতলায়—চার জায়গায় চারটি চড়কডাঙা ছিল।[৪০] তবে এগুলো বর্তমানে নেই। কলকাতার সন্ন্যাসীরা চড়কের দিন ভোরে কালীঘাটে গিয়ে বাণ ফুঁড়িয়ে আসত। অন্যান্য কালীস্থানেও এরকম বাণ ফোঁড়ানোর রীতি ছিল। লেখক অমরেন্দ্রনাথ রায়, হুগলীর কুড়িয়ার বাবু শিবচন্দ্র গুহের বাড়িতে একজন সন্ন্যাসীর জিহ্বা ফোঁড়ানোর দৃশ্যে প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় তাঁর *'বাঙালীর পূজা পার্বণ'* গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।[৪১] তারকেশ্বরে এখনও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ চড়কপূজা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাসহ দুই পরগনাতেই চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসবের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, রাজ্যের বাইরে ভারতের অন্যত্রও চড়কের প্রচলন আছে। যেমন—উড়িষ্যায় চড়কের উৎসব বেশ জাঁকজমকপূর্ণ, একে 'উরাপট' বলে। দক্ষিণ ভারতে যে চড়ক উৎসব হয় তাকে 'চেড্ডুল' বলে। আধুনিক কালের সবথেকে পুরাতন চড়ক সম্পর্কে নিবন্ধ দিয়েছেন ইংল্যান্ড থেকে আগত শ্রীমতি ফ্যানি পার্কস, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। নিবন্ধটিতে তিনি চড়কে অংশগ্রহণকারী সন্ন্যাসীদের পুণ্যলাভের আশায় কষ্ট স্বীকারের বীভৎসরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। 'পুণ্যিপুকুর' নামক পত্রিকায় (১লা বৈশাখ, ১৪১৯, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যায় পৃষ্ঠা ১০-১১-তে বঙ্গানুবাদে তার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। ফ্যানি পার্কস-এর লেখা থেকে জানা যায়—যে ভয়ংকর কষ্টস্বীকার করে সন্ন্যাসী, তার জন্য অসম্ভব ঈশ্বর ভক্তির প্রয়োজন। এই সময় এঁরা প্রচুর পরিমাণে নেশা করে, গাঁজা-আফিম খায়। তিনি লেখায় উল্লেখ করেছেন যে নীচজাতির হিন্দুরা চড়ক পূজার অত্যন্ত ভক্ত। এই পূজা-উৎসবে যোগদানকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তিনি বলেছেন এমন পৈশাচিক ভয়াবহ উৎসব আর কোথাও দেখেননি। এই উৎসবে দুর্ঘটনাও ঘটে। শতকরা তিন-চারজন লোক মারাও যায়। আবার ধনীরা টাকা দিয়ে সন্ন্যাসীদের চড়ক কাঠে চড়কীপাক খাইয়ে নিজেরা পুণ্যার্জন করেন। তৎকালীন চড়কে বাইজীদেরও আগমন ঘটত। তাদের পোশাক, নাচ, গান দেখার জন্য বহু ভদ্র সভ্য হিন্দুর সমাগম হত এই উৎসবে।

সঙ

বাংলাদেশে বহুকাল থেকেই পূজাপার্বণ উপলক্ষ্যে সঙ বের করার প্রথা রয়েছে। নানারকম অঙ্গভঙ্গি, পদক্ষেপ ও নানারকম মুখভঙ্গি সঙের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় এটি হল নাটকীয় ভাব প্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সার্বজনীন মাধ্যম। সঙ দুই প্রকার—নির্বাক সঙ ও নৃত্যগীত মুখর সঙ।[৪২] প্রথমদিকে কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গিসহ শোভাযাত্রা বের হত যা ছিল নির্বাক সঙ। পরে পালানাটকের আঙ্গিকে সঙের প্রচলন হয়। ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সঙ বের হলেও এটা কোন ধর্মীয়গান বা অনুষ্ঠান নয়। ধর্মানুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যম।

সঙের সাথে গাজনের সম্পর্ক নিবিড়। বলা যায় গাজনের একটি অঙ্গ হল সঙ তাই কখনো 'গাজনের সঙ' আবার কখনো 'সঙের গাজন' বলা হয়। চৈত্র বাংলার শিব-গাজনে গঙ্গাস্নানের সময় লোকজন শিব-পার্বতীর বিবাহে শিবের বরযাত্রী, শিব-পার্বতী, নন্দী-ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেত, পশু-পাখি প্রভৃতি সেজে ঢাক-কাঁসি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে এবং তার সাথে নৃত্য করতে করতে সঙযাত্রা বা শোভাযাত্রা বার করে। এই শোভাযাত্রাটি একপ্রকার বীরত্বব্যঞ্জক উন্মাদনার অভিব্যক্তি বলা যায়। বাংলাদেশের বা পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে গাজনের সঙে নারদরূপে সজ্জিত হয়ে ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীরা কিছু বিশেষ বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করে এনে শিব-দুর্গা সাজে সজ্জিত ভক্ত্যার ঝুলিতে ফেলে দেয়। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যে শিব-পার্বতীর এক্তিয়ারে ঐ মাটি সংগৃহীত অঞ্চলগুলি থাকবে তাদের কৃপাদৃষ্টি ঐ অঞ্চলের উপর পড়বে। তাদের সুখ-সমৃদ্ধি প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। বিপদ-আপদেও শিব-পার্বতী তাদের রক্ষা করবেন। চড়ক গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে যে 'সঙ'-এর প্রচলন ছিল সে সম্পর্কে বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "সেকালে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হত। চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের দল বিভিন্ন পথে ঢাক ও কাঁসি বাজিয়ে পুরুত এবং সেইসঙ্গে 'সঙ' বের হত।"[৪৩]

কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলায় নয় বাংলাদেশের গাজন উৎসবেরও অত্যন্ত আবশ্যিক একটি সাংস্কৃতিক অঙ্গ হল সঙ। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তার গ্রন্থ *'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গ'*-তে বলেছেন যে সুদূর তিব্বতেও সঙের প্রচলন রয়েছে, তারা চৈত্রমাসে দেব-দানবের সাজে সজ্জিত হয়ে নৃত্য-গীত সহযোগে কৃত্রিম যুদ্ধ করে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন—

> "পরে ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ হইতে আমাদের চড়ক গাজন প্রভৃতিতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রকাশক নানা প্রকারের 'সঙ' এই সকল জনপ্রিয় পূজা অনুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।"[৪৪]

অনেকে মনে করেন 'সঙ' থেকেই মূলত গাজনের প্রচলন হয়। আদিকাল থেকেই শিব কৃষিদেবতা। তিনি অসামাজিক বেশভূষা পছন্দ করেন তাই ভক্তরা তাকে ভজনা করার সময় কালি মেখে 'সঙ' সাজতো। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ বিষয়ে বলেছেন—

"গৌড়বঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব বিকাশ হইতেছে গত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত বিনোদনের ধারা—'সঙ' (সং)। প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের পোষাক পরিয়া অঙ্গভঙ্গী সহযোগে গান, ছড়া-কাটা প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একটি পরিহাসোজ্জ্বল অনুকৃতিকে "সমাঙ্গ" অর্থাৎ "অনুরূপ অঙ্গ" বলা হইত। এই সংস্কৃত শব্দ হইতে উত্তর ভারতের হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় "সবাগ" (সও আঙ্গ) এবং বাংলার "সবঙ্গ" "লঙ" বা "সঙ"। ছদ্মবেশ অর্থে "সঙ" শব্দ বাংলাদেশে খৃষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে 'জাত' বা 'যাত্রা' অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় এইভাবে পালিত হইত। পরে উনিশের শতকের প্রারম্ভ হইতে আমাদের চড়ক, গাজন প্রভৃতিতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রকাশক নানাপ্রকারের 'সঙ' এই সকল পূজানুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়"।[৪৫]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *'বাংলার লোকসংস্কৃতি'* (১৯৮২) গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৬৬ থেকে ৬৯ তে বলেছেন—

> "পূর্বে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হইত। এই সকল গাজনে দুইটি বালককে হর-গৌরী সাজানো হইত, এই হর-গৌরীর সঙ্গে বহু ব্যক্তি অনেক রকম সং সাজিয়া রঙ্গ ভঙ্গ করিত।"[৪৬]

পশ্চিম রাঢ়বঙ্গে গাজনকেই সঙ বলা হয়। শিব-দুর্গা, নন্দী-ভৃঙ্গীর সাজসজ্জা করে ঢাক-কাঁসির বাদ্য সহযোগে শোভাযাত্রা বের করা হয়। কখনো তা হয় স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য, কখনো হয় উদ্দাম। এর বিশেষ কোনো মুদ্রা বা রীতি নেই। সংগীতবিহীন এই নৃত্যে কেবলমাত্র বাদ্যযন্ত্রের লয় বজায় রেখে সাধারণত ঘুরে ঘুরে করা হয়। এই সঙের নৃত্যে কেবলমাত্র পুরুষরাই নারীর বেশ ও সাজসজ্জা করে নৃত্য করে। মহিলারা কেবলমাত্র দর্শক। বাংলার গাজনে 'সঙ' সাজার রীতিটি আবশ্যক ছিল। তবে যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে তার বৈশিষ্ট্য ও ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন—পূর্বে গাজনের সঙ বলতে শিব-পার্বতী সহ নানা দেব-দেবী, নন্দী-ভৃঙ্গী সহ ভূত-প্রেত সাজার প্রবণতা ছিল কিন্তু বর্তমানে গাজনের সঙের বিষয়বস্তুতে দেখা গিয়েছে আধুনিকতা। দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়েছে সামাজিক প্রভাব। চিন্তাভাবনায় এসেছে বিজ্ঞানসম্মত ধারা। কলকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতির বিষয়ও ছিল জেলে পাড়ার সঙের বিষয়। খিদিরপুরের সঙেও সমাজবিরোধী, দুর্নীতিসহ নানান সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয়কে অবলম্বন করা হয়। তমলুক শহরে গাজন সঙে এরকম নতুন প্রবর্তন হতে দেখা গেছে। এক সময় কলকাতার বিভিন্ন পাড়া থেকে সঙ বের হতো। যেমন—কাঁসারীপাড়া, জেলেপাড়া, খিদিরপুর, চিৎপুর, বাগবাজার, তালতলা, বেলেপুকুর, আহিরীটোলা প্রভৃতি অঞ্চলের সঙের বেশ সুনাম ছিল। কলকাতা শহরেও বাবু কালচারের সময়েই 'সঙ'-এর নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল। পুরাতন শিব-দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবী, ভূত-প্রেতের জায়গায় তাদের শোভাযাত্রায় ঘোড়ার গাড়ির উপরে কৃত্রিম পাহাড়, ময়ুরপঙ্খী নৌকা প্রভৃতি যোগ হয়েছিল। এছাড়া পালকিতে লম্পট মোহান্ত, গোদাপালক প্রভৃতি সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রার শেষাংশ বের হতো।[৪৭] এর পরবর্তীকালে সঙ তামাশার দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কলকাতার জেলে পাড়ার সঙ নানান কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, সামাজিক অন্যায়-অনাচার প্রভৃতি

দিকগুলো ছড়া ও গান সহ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পরিবেশিত হত। কলকাতার জেলেপাড়ার সঙের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল মফঃস্বলের সঙও। দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর ১৩৯১ সালের চৈত্র সংক্রান্তি তে আবার 'জেলেপাড়ার সঙ' বের হয় মধ্য কলকাতার রাস্তায়। কিন্তু ১৯২৯ সালে একেবারেই চিরকালের মতো তা বন্ধ হয়ে যায়। 'কলিকাতা কৈবর্ত সমিতি' দ্বারা আয়োজিত জেলেপাড়ার সঙের শোভাযাত্রা ১৩৯১ বঙ্গাব্দের ৩০শে চৈত্র শনিবার বাঁকা রায় স্ট্রিটে দুপুর দুইটার সময় শেষ আয়োজিত হয়। সেখানে বক্তা ছিলেন তৎকালীন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, তৎকালীন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ।[৪৮] ১৯২০ সালে মীরবাজারপল্লী থেকে খুব বড় একটা শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। দুপুর থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত শোভাযাত্রাটি শহর পরিক্রমা করে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পল্লী থেকেও এরকম শোভাযাত্রা বের হতে থাকে। ১৯৫২ সালে সঙের শেষ এরকম শোভাযাত্রাটি বের হয়।[৪৯]

উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত কলকাতা শহরের বিভিন্ন পল্লীতে পল্লীতে চৈত্র সংক্রান্তির আগে থেকে রাস্তায় রাস্তায় সঙ বের হতো। অন্যান্য পূজা-পার্বণেও সঙ বের হতো। এই সঙেরা ভাষা, গান ও ছড়ার মাধ্যমে অভিনয় করত। বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা, কলকাতা কর্পোরেশনের কাজের নানান অসঙ্গতি, দুর্নীতি, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি, ছোট রায়বাহাদুরের প্রতি কটাক্ষপাত, দেশের মনীষীদের মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিয়োগব্যথা প্রভৃতি ছাড়াও নানান সামাজিক চিন্তাভাবনা প্রভৃতি বিষয় গানগুলিতে প্রকাশ পেতো। গবেষক শ্যামল বেরা মনে করেছেন—

> "গাজন গান বা গাজনতলার গান হল আসলে সঙের গান কিন্তু সঙের গান মানেই গাজনতলার গান নয়। কেননা গাজনতলার গানে শিবকেন্দ্রিক সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হয়। আজ তা ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে আসছে।"[৫০]

সঙ বিষয়টি এতোটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে সে সময়ের চড়ক উৎসবের সন্ন্যাসীদের সঙের শোভাযাত্রার ছবি লণ্ডনের 'ডাইকিন্সন অ্যান্ড কোং' ছাপিয়েছিলেন। এঁকেছিলেন বিদেশী শিল্পী স্যার চার্লস ডয়েল। তাতে বাণবিদ্ধ অবস্থায় সন্ন্যাসীদের নৃত্যরত রূপে চিত্রিত করা হয়েছিল সেই সাথে মাটির পুতুলসহ সঙের শোভাযাত্রার দৃশ্যও আঁকা হয়েছিল। তৎকালীন ইংরেজরাও সঙের মিছিলে অংশগ্রহণ করত।[৫১] শক্তিশালী মাধ্যম হওয়ায় প্রায় একশ বছর আগে কাঁসারী পাড়ার সঙের মিছিলে রঙ্গ, ব্যঙ্গমূলক ছোট ছোট নাটিকা অভিনয় করা হত। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতার জেলেপাড়ার সঙের মিছিলে মোহন গোস্বামী রচিত হোমরুল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'হোমরুল' নামক একটি পথনাটক কলকাতার রাজপথে পরিবেশন করা হয়। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র চুরির বিষয়কে কেন্দ্র করে জেলেপাড়ার সঙ 'বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ' নামে একটি গান করেছিল। ১৯২৪ সালের চিত্তরঞ্জন দাস প্রথম মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হন। সেই ঘটনা অবলম্বনে জেলেপাড়ার সঙ বেরোয়। সেখানে বলা হয়—

'নাশ কর্তে ফি আর দাস
এঁদের দাঁড় করালেন সি. আর. দাশ।'[৫২]

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও খবরে সঙের উল্লেখ সে সময় পাওয়া যায়। 'দি হিন্দু প্যাট্রিয়েট', 'তত্ত্ববোধিনী', 'হাড্রেড ইয়ার্স অব দি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা ১৮৫৭-১৯৫৬', 'ইউনিভার্সিটি অব ক্যালকাটা', 'প্রবাসী', 'দি অমৃতবাজার পত্রিকা', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দি স্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় কলকাতার সঙ গাজন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হত।[৫৩]

সঙ হল এমন একটা বিষয় যা এক সময়ে একদিকে মেদিনীপুরের মানুষকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিত অন্যদিকে রসের সাগরে ভাসিয়ে দিত। মীরবাজারের 'বালকেশ্বর' শিবের গাজন উপলক্ষ্যে বৈশাখীসংক্রান্তির দিন একদল সঙ বেরিয়ে গান গেয়ে নেচে শহর পরিক্রমা করত। রাস্তার উপর তোরণ তৈরি করে অথবা গরুর গাড়িতেই সঙের অভিনয় হত অথচ বর্তমানে এই জনপ্রিয় শিল্পটি চর্চার অভাবে বিস্মৃতির অতলের তলিয়ে যাচ্ছে।

২.৩ গাজন উৎসবের রীতিনীতি

সারা বাংলা জুড়ে গাজন উৎসব পালন হলেও অঞ্চলভেদে আচার পালনে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তবে সামঞ্জস্যই বেশী। নীচে গাজন উৎসবের প্রথার একটি প্রাথমিক রূপ উল্লেখ করা হল—

গাজন উৎসবটিতে মূলত নিম্নবর্গীয় হিন্দু-শ্রেণিসম্প্রদায়ের মানুষ নারী পুরুষ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করে। এরা গাজনের 'ভক্ত্যা' অর্থাৎ আরাধ্য দেবতার ভক্ত। এরা সন্ন্যাসগ্রহণ করে নানা আচার পালন করে। তাই এদের গাজন 'সন্ন্যাসী' বলা হয়। অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন জায়গায় এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হলেও অধিকাংশ জায়গাতে 'সন্ন্যাসী' বলে অভিহিত করা হয়। সন্ন্যাসগ্রহণের মাধ্যমে নিজগোত্র ত্যাগ করে দেবতার গোত্র ধারণ করে। সন্ন্যাসীরা এই সময় কৃচ্ছসাধন করে অন্ততপক্ষে ১০ দিন, কেউ ১৫ দিন, কেউ একমাসও পালন করে থাকে। এটি পালনের উদ্দেশ্য হল নিজেকে পবিত্র করা। ভক্তরা গৈরিক বা শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ও উপবীত ধারণ করে এবং একাহারী হয়। হাতে থাকে তামার বালা। সন্ধ্যার পর আরাধ্য দেবতার মন্ত্রপাঠ করে এবং দেবতার অধিষ্ঠান স্থলে বারবার জয়ধ্বনি দেয়। গান, নাচ সহ পাটপূজা চলতে থাকে। একটি মাঝারি আকারের পরিষ্কার তক্তায় সিঁদুর দিয়ে ঐ দেবতার পাট তৈরি করা হয়। পাটের পূজার জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়।

শিবের গাজন হয় সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তি তে। তবে কোনো কোনো জায়গায় বৈশাখ মাসেও হয়ে থাকে। স্থান ভেদে চড়ক গাজন অনুষ্ঠানের পার্থক্য হয়। শিবের গাজন ও চড়ক উৎসবের ৩টি পর্যায়। যথা—

১) ঘাট সন্ন্যাস

২) নীল ব্রত

৩) চড়ক

ঘাট সন্ন্যাস পর্যায় হল গাজন উৎসব সূচনার পর্যায়। একজন মূলসন্ন্যাসী থাকে আর একজন শেষ সন্ন্যাসী থাকে। ঘাট সন্ন্যাসে এই সন্ন্যাসীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঘাট সন্ন্যাসের দিন মূলসন্ন্যাসীকে নিয়ে অন্যান্য সন্ন্যাসীরা শিবের মন্দিরের সেবায়েতের বাড়িতে ধরনা দেয়। এরপর পূজারির আগমন ঘটে। তিনি এসে ঐ সন্ন্যাসীদের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলে তারা ধরনা ভঙ্গ দিয়ে শিবের মাথার ফুল-বেলপাতা আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করে পূজারির অনুমতি নিয়ে শিবলিঙ্গকে মাথায় নিয়ে ঢাক কাঁসি সহযোগে শিবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে এবং নাচতে নাচতে গ্রাম পরিক্রমা করেন।

১০ দিন, ১৫ দিন কিংবা একমাস ধরেও সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস ধর্ম পালন করে। সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথম দিনে সন্ন্যাসীরা যে ধুতি গামছা পরে তাই-ই ব্রত পালনের শেষ দিন পর্যন্ত পরে থাকে। এরা গলায় সাদা মোটা উপবীত ধারণ করে, হাতে রাখে আশাবারী বা বেতদণ্ড। ঐ কয়দিন নিয়মিত স্নানের পর ঘটে করে জল এনে শিবের মাথায় ঢালে ভক্তরা। এই সময় সন্ন্যাসী ভেদে ভিন্ন আচার পালন করে। যেমন—প্রধানভক্ত্যা ঘট আনে, কোটাল ভক্ত্যা একটা বাঁশের লম্বা দণ্ডের গায়ে লাল গামছা বেঁধে ধ্বজারূপে বহন করে প্রভৃতি। জল ঢালার পর সন্ন্যাসীরা হবিষান্ন (হবিষান্ন—আতপ চাল, আলু, কাঁচকলা, মটর ডাল প্রভৃতি সিদ্ধ ঘি সহযোগে) আহার করে কিন্তু উপবাস থাকে। সন্ধ্যার পর ফলাহার করে। এই সময় তাদের আমিষ আহার ও স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। সংযম যেমন গাজনের সন্ন্যাসীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তেমনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আত্মশুদ্ধি তবে যদিও দিনবদলের সাথে সাথে এতেও তার প্রভাব পড়েছে কিন্তু কিছু কিছু বিষয় একই রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ একটি দেহ শুদ্ধির শ্লোক—

প্রথম মাসের কালে পড়ে গেল নীর।
দ্বিতীয় মাসের কালে একাম শরীর।।
তৃতীয় মাসের কালে রুধিরের গোলা।
চতুর্থ মাসের কালে হাড় মাংস জ্বালা।।
পঞ্চম মাসের কালে পঞ্চফুল ফোটে।
ছয় মাসের কালে প্রাণ হাসি জোটে।।
সপ্তম মাসের কালে সাতেশ্বরী কায়।
অষ্টম মাসের কালে মন পবন জোয়ায়।।
নবম মাসের কালে নব ঘন স্থিতি।
দশমাস দশদিনে ভবে পেলাম স্থিতি।।
জয় জয়কার দিয়ে মা তুলে নিলেন কোলে।
কান্দিয়া আকুল হলাম কোথা এলাম বলে।।[৫৪]

ব্রতপালনের শেষ দিনকে সেবা বলা হয়। কোনো কোনো জায়গায় দুটো মোটা কাঠের সঙ্গে বেশ কিছুটা উচ্চতার আরেকটা কাঠের দণ্ডকে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা থাকে যা থেকে পাটের তৈরি ফাঁস ঝোলানো হয়। একে পাউড়ি বলে। ভক্ত্যারা দণ্ডটি থেকে পাউড়িতে পা দিয়ে মাথা নীচু করে ঝুলতে থাকে। এই অবস্থায় তাকে দোল দেওয়া হয়। একটু দূরে অগ্নিকুণ্ড রাখা হয় এমনভাবে যাতে দোল দেওয়ার সময় অগ্নিকুণ্ড স্পর্শ করে। এই সময় শিবের জয়ধ্বনি দেওয়া হয়।

পর দিন হয় বিরাম বা জাগরণ। ঐ দিন ভক্ত্যারা সারাদিন নির্জলা উপবাস এবং বিনিদ্র রাত্রি কাটায়। রাত্রে নৃত্য-গীতে পালা অভিনয়ের আসর হয়।

এর পর দিন ভক্ত্যারা নাচতে নাচতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। আগে পাশের শিবের মন্দির প্রদক্ষিণ করে, একে মাড়ো ভেটতে যাওয়া বলে। একেবারে শেষে নিজেদের মাড়ো বা মন্দিরে ফিরে আসে।

এরপর হয় আগুন খেলা বা ফুল খেলা। কাঠ কয়লা দিয়ে আগুন ধরিয়ে ভক্ত্যারা ঢাকের তালে তালে নাচতে নাচতে খালি পায়ে আগুনে ঝাঁপ দেয় এবং দুই পা দিয়ে আগুনটি মাড়িয়ে পার হয়ে যায়। একেই বলে আগুন খেলা। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে স্নান সেরে আবার মন্দিরে এসে নূতন বস্ত্র পরে শিবের পায়ে ফুল দিয়ে খাদ্যগ্রহণ করে ব্রত সমাপ্ত করে।

কোনো কোনো স্থানে গাজন উৎসবের শিবকে মন্দিরসংলগ্ন জলাশয়ের মধ্যে রাখা হয়। উৎসবের ১৫-২০ দিন আগে ঢাক, শঙ্খ সহযোগে বাদ্য করতে করতে জল থেকে তুলে এনে মন্দিরে স্থাপন করা হয়। এ সম্পর্কে একটি ধারণার প্রচলন রয়েছে। তা হল—প্রাচীনকালে হিন্দুদের আরাধ্য এই দেবতাকে অহিন্দুদের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হত। এখানে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। বিগ্রহকে তুলে আনার পর উৎসবের প্রতিদিন পঞ্চগব্য দিয়ে পুজো করা হয়। কোনো কোনো জায়গায় উৎসবের দ্বিতীয় দিনে মশাল নাচ হয়। আগে কোথাও কোথাও শ্মশান থেকে মৃতদেহ কুড়িয়ে এনে তা নিয়ে নৃত্য করার রীতির চলন ছিল। বর্ধমানের শোনপলাশী কুড়মুন গ্রামের গাজনোৎসবে সন্ন্যাসীরা রাত্রিবেলা শ্মশান থেকে মড়ার খুলি নিয়ে এসে নৃত্য করেন, খেলা দেখান। কোথাও কোথাও ভক্ত্যারা গভীর রাত্রে শ্মশানে গিয়ে নানা প্রকার আচার পালন করে। গাজন উৎসবের সময় অনেক জায়গায় শিবকে কোনো পাকা ঘরে রাখা হয় না। নারকেল পাতা দিয়ে তিনদিন ঘেরা ও উপরে ছাওয়া সাময়িক ঘর বানিয়ে সেখানে শিবলিঙ্গটিকে রেখে ঐ কয়দিন পুজো করা হয়। বীরভূমের ধর্মগাজনে ধর্মতলা সাজানো হয় ফুলমালা আর মাটির ভাঁড় দিয়ে। অনেক জায়গায় ভক্ত্যাদের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পুকুরে নেমে কাদা পাঁক মাখার প্রথা রয়েছে।

গাজনের অন্যতম লোকাচারগুলি হল—'বেতচালা', 'ঢেঁকিঘোরানো', 'মাথাচালা', 'মানিকচুরি', 'বাণফোঁড়', 'পিঠফোঁড়', 'বঁটিঝাঁপ', 'জিভফোঁড়', 'আগুনঝাঁপ' প্রভৃতি। এছাড়া 'হাকুন্দপড়া', 'হিঁদোলা', 'গাজনভাটা', 'মাড়োঘাটা' গাজনের উৎসবের অঙ্গ।[৫৫] কোথাও কোথাও 'বাণসন্ন্যাস' পালন করা হয়।

একজন সন্ন্যাসীর বাহু বর্শা দিয়ে বেঁধানো হয় এবং অন্য একজন সন্ন্যাসীর হাতের তালুতে, পেটের চামড়ায়, জিহ্বাতে গরম লোহার দণ্ড বিঁধিয়ে সেটা দুই হাত দিয়ে ধরে রেখে সেই অবস্থায় নৃত্য করে। এই সন্ন্যাসীদের 'বাণসন্ন্যাস' বলা হয়। তবে বিশেষভাবে অসমর্থ হলে খুলে ফেলে আর না হলে সন্ধ্যার পর খুলে সেগুলো জলে ফেলে দেয়। সেই সময় শিবের পুজো করা হয়। কখনো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর মাথা নীচে ও পা উপরে করে শিবকে প্রণাম জানানো হয়। একে বলে 'হিঁদোলা'। যেহেতু দুলে দুলে এটি করা হয় তাই 'হিন্দোল' থেকে 'হিঁদোল' কথাটি এসেছে বলে অনুমান করা হয়। একে কখনো আবার 'আগুন সন্ন্যাসী ব্রত'ও বলা হয়। কোথাও কোথাও মাটির উপর দুটি স্তম্ভ ছয় ফুট দূরত্ব রেখে উল্লম্ব ভাবে পোঁতা হয়। তাদের মাথার উপর একটা কাঠের আল রাখা হয় যার ওপর দুটি আট ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দণ্ড থাকে। তার নীচে মাটিতে কয়লার আগুন জ্বালানো হয়। সেখানে পুরোহিত নতজানু হয়ে বসে নানা রকম গন্ধদ্রব্য ঐ আগুনে আহুতি দেয়। একজন সন্ন্যাসী এই সময় লাফিয়ে কাঠের আলটি ধরে দণ্ড দুটির ওপর পা রেখে আগুনটির অপর মাথা ঝুলিয়ে দিয়ে দুলতে থাকে। সেই সময় পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে। আরেকটি প্রথা হল 'বঁড়শি সন্ন্যাস'। একটা খুব বড় লম্বা মোটা গাছের গুঁড়িকে মাটিতে উল্লম্বভাবে পোঁতা হয়। সাধারণত দেবদারু গাছকেই নেওয়া হয়। তারপর বড় লোহার বঁড়শিতে শিরদাঁড়া বিদ্ধ করে ঐ গাছের ওপর লাগানো একটি থেকে দড়ি ঝুলিয়ে তাতে বঁড়শিটি আটকিয়ে সন্ন্যাসীরা শূন্যে পাক খায়। যা অনেকটা চড়কির মতো দেখায়। এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও প্রাণঘাতী একটি প্রথা। আরেক ধরনের আচার আছে। তা হল গায়ের উভয় দিকে চামড়া ফুটো করে সুতো বা সরু বেত ভরে নেয়। এদের 'সূত্রসন্ন্যাসী' বলে। এরা চড়ক গাছে ঘোরে আবার কখনো জ্বলন্ত কাঠ কয়লার ওপর নৃত্য করে। এই সমস্ত কষ্ট স্বীকারের উদ্দেশ্য কখনো নিছকই শিবভক্তি আবার কখনো শিবের কাছে মনস্কামনাপূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে আবার কখনো কেবলমাত্রই আত্ম উপভোগ করা।

সব আচারের প্রচলন সব জায়গাতেই আছে এমন নয় স্থান ভেদে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। প্রথাগুলির ভিন্ন নাম থাকে যথা—

সন্ন্যাসগ্রহণ অনুষ্ঠানের নাম 'ভক্ত কামান'। গাজনের সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগী হয়ে শিব গোত্র ধারণ করে। এই দিন থেকে সন্ন্যাস জীবন যাপন শুরু হয়। এদিন পুরুষরা দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ও মস্তক মুণ্ডন করে, গঙ্গায় স্নান সেরে, শিবের নাম জপ করতে করতে উত্তরীয়, উপবীত, সাদাবস্ত্র ও বেতের দণ্ড বা সাট ধারণ করেন। এই সময় সন্ন্যাসীরা আর চুল, দাড়ি কামায় না। তারা ব্রহ্মচর্য পালন করে। আরেকটি অনুষ্ঠানের নাম হল 'গাজন চিবানো'। ভক্ত্যারা মন্দিরসংলগ্ন জলাশয়ে স্নান সেরে দণ্ডী কাটতে কাটতে শিবের মন্দিরে এসে মন্দির প্রদক্ষিণ করে। একে 'ভক্ত খাটান' বলে। গাজন উৎসবে গাজন তলায় ঘুরে ঘুরে শিবের গান করা হয়। একে বলে 'ফলভাঙা'। শিবলিঙ্গটিকে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়ার নাম 'জল বিন্যাস'। কোথাও কোথাও গাজন উৎসবের আচারের আরেকটি অঙ্গ হল ফুলখেলা। জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়ে সন্ন্যাসীরা লোফালুফি করে। গাজনে 'নীলষষ্ঠী' পালন করা হয়। নীলষষ্ঠীর

দিন সন্ন্যাসীরা সারাদিন উপবাস থাকে। শিবের মাথায় জল ঢেলে বাতি জ্বালায়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে ওই দিন বাবা মহাদেবের পূজায় অংশ নেন। মহিলারাও এমনকি কুমারী মেয়েরাও এই ব্রত পালন করে। অনেক জায়গায় শিবলিঙ্গকে পুজো করে তারপর গ্রামে পরিক্রমা করে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। ওই দিন অনেকে দণ্ডী কাটে। অনেক জায়গায় ধুনো পোড়ানো হয়। রাত্রে নানা রকম নাচ, গান সহ মনোরঞ্জনমূলক অভিনয় অনুষ্ঠান হয়। শোনা যায় রাজা বল্লাল সেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের অনুরক্ত থেকেই চড়কসংক্রান্তি ও নীলাকর অর্থাৎ মহাদেবের পূজাকে একসাথে যুক্ত করেছিলেন। অনুমান করা হয় যেহেতু নীলার্ক শিবের আরেক রূপ যিনি মহিলাদের আরাধ্য দেবতা তাই এই সংযুক্তির পরই গাজনোৎসবে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন।[৫৬]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসবের রীতি-নীতি

চৈত্র মাসের শেষে সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে গাজন উৎসব পালন করা হয়। ২৬শে চৈত্র— বিকেলে গঙ্গায়, পুকুরে বা নদীতে স্নান সেরে ভক্তরা নতুন বস্ত্র পরে উপস্থিত হয় গ্রামের শিবমন্দির বা গাজনতলায়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন বায়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মূল বা প্রধান সন্ন্যাসী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বলশালী ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয় কারণ গাজনোৎসবের চারদিনের যাবতীয় ধকল শরীরিক ও মানসিকভাবে এনাকেই সহ্য করতে হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ 'পুরোহিত মশাই' প্রথমে মূল বা প্রধান সন্ন্যাসীর গলায় গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে দেন। মূলসন্ন্যাসী তার নিজস্ব কৌলিক গোত্র ত্যাগ করে শিবগোত্র গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চারণ করেন "আত্মগোত্র পরিত্যাজ্য। শিব গোত্র পরিধার্য"। যার অর্থ—তিনি শিবকে জানালেন যে নিজের গোত্র ত্যাগ করে শিবের গোত্র ধারণ করলেন। এরপর মূল বা প্রধান সন্ন্যাসী বসেন পুরোহিতের আসনে। উপস্থিত সমস্ত সন্ন্যাসীর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন। মূলসন্ন্যাসীর নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য সকল সন্ন্যাসীগণ বা সন্ন্যাসিনীগণ পূজা অর্চনায় আনুষঙ্গিক কাজ নিষ্ঠাসহকারে পালন করেন। কমপক্ষে পাঁচজন সন্ন্যাসীকে শিবলিঙ্গের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এনারা আশে পাশের গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে হয়ে থাকেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রদেরকেও নির্বাচন করা হয়। আসলে শিবগোত্র ধারণ করার পর সকলে সমগোত্রীয় হন। এঁদের নাম অনুযায়ী আলাদা আলাদা কাজের ভাগ করে দেওয়া হয়। সন্ন্যাসগ্রহণের পর আবার গঙ্গাস্নান করতে হয়। স্নানের পর সকলে 'হর হর ব্যোম ব্যোম' ধ্বনি দিতে দিতে শিব মন্দিরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করেন। এরপর শুরু হয় সন্ন্যাসীদের একে একে বান, ত্রিশূল, বেতাসন ইত্যাদি ধারনের জন্য লোহা, বেতাসন ইত্যাদি শুদ্ধি ও ঢাক, ঢোল, কাঁসি শুদ্ধির পর্ব। এরপর চড়কগাছ খোঁজার পালা। সংক্রান্তির দিন হয় 'চড়ক' উৎসব। প্রতি বছর গাজন উৎসবের শেষে চড়কগাছ ও চড়কগাছের 'খাকুই' দুটি আলাদা পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়। এটি মূলত শাল বা গজারি গাছ (গর্জন গাছ)। সারাবছর এটি পুকুরে ডোবানো থাকে। পুকুরটি সাধারণত মন্দিরসংলগ্ন এলাকায় হয়। সংক্রান্তির আগের দিন ভক্তরা সেটা তুলে এনে তার গায়ে তেল মাখিয়ে সেটা মাটিতে পুঁতে

দেন। একে বলে ‘গাছ জাগানো’। এ থেকেই গাজনের শুরু। এই ‘গাছ জাগানো’ আসলে উর্বরতা কামনার ব্যঞ্জনস্বরূপ। চড়ক গাছের মাথায় খাকুই বসানো হয়। এর উপরে ভর করে চড়কের সন্ন্যাসীরা বৃত্তাকারে শূন্যে পাক খান। আগে সন্ন্যাসীরা পিঠে লোহার বঁড়শি গেঁথে চড়ক গাছের চারদিকে ঘুরত।

২৭শে চৈত্র—ভোরবেলা আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে সঙ যাত্রায় যোগ দেয়। সঙ্গে থাকে ঢাক, কাঁসি সহ নানা বাদ্য। শিবের নামে গর্জন ধ্বনি দিতে দিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে শেষে এসে পৌঁছায় গাজনতলায়। তার পর সেখানে হয় নাচ, গান, অভিনয়।

২৮শে চৈত্র—দুপুর পর্যন্ত সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন গ্রামের গাজনতলা পরিক্রমা করে। এদিন বিকেলে হয় ঝাঁপান উৎসব। যাকে বলা হয় ‘হাট সন্ন্যাস’ কোথাও বলা হয় ‘বানফোঁড়’। এরপর বাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা করে।

২৯শে চৈত্র—নীল ব্রত। একে ‘ধুল সন্ন্যাস’ও বলে, সকালে সন্ন্যাসীরা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে, বিকেলে ‘খেজুর ভাঙা’ হয়। সন্ধ্যায় নীলের বাতিদান হয়। এদিন সন্ন্যাসীরা বেলপাতা খান, তারপর সারারাত ধরে চলে শিবের মাহাত্ম্যমূলক নানা কল্পকাহিনি।

৩০শে চৈত্র—‘আগুন সন্ন্যাস’ পালন করা হয়। ‘মানতচোকানো’, ‘ওজোনভোগ’, ‘দণ্ডীকাটা’ ‘বাতাসালুট’, ‘বুকচিরে রক্তদান’—প্রভৃতি আচরণের মাধ্যমে মানত চোকানো হয়। এরপর প্রসাদ বিতরণ, তারপর সারারাত ধরে চলে গাজনপালা গান। নাচ, গান, বাজনা, হাসি, তামাশা, সমৃদ্ধ সংলাপধর্মী কাহিনি অনুষ্ঠান। যা এক আনন্দ বিনোদনের উপাদান। সারারাত ধরে এই বিনোদন হওয়ার পর হয় ‘আগুন সন্ন্যাস’। তারপর ব্রতীরা গঙ্গায় বা পুকুরে নেমে স্নান করে। মূল সন্ন্যাসী অন্য সন্ন্যাসীদের উত্তরীয় কেটে দেয়। তা পুকুর বা গঙ্গার পাঁকে পুঁতে দিয়ে স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরে আবার নিজস্ব কৌলিক গোত্রে ফিরে যায়। এরপর আমিষ ভোজন করে।

ফলন্ত খেজুর গাছকে পুজো করে পাঁচজন সন্ন্যাসীদের মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ তিনি খেজুর গাছের মাথায় ওঠেন। খালি পায়ে কাঁটাযুক্ত ঐ গাছের ওপর ওঠে প্রথমে তাকে ঘিরে ঘুরতে হয়। পর দিন মূল পূজার সময় সেই গাছ থেকে অঝোরে খেজুর পেড়ে তবেই নীচে নামেন, খেজুর গাছকে এখানে মাতৃরূপে পুজো করা হয় তাই এই অনুষ্ঠানের নাম ‘খেজুর ভাঙা’ আবার কুল গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড ডিঙিয়ে সন্ন্যাসীরা তাপগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম ‘আগুনসন্ন্যাস’।

২.৪ শিব-গাজন ও ধর্ম-গাজন

গাজনকে বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় উৎসব বলা যায়। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনুযায়ী বাংলাদেশে শিবকে কেন্দ্র করে শিবের গাজন, নীলের গাজন, আদ্যের গাজন, ধর্মঠাকুরের গাজন

প্রভৃতি লোক উৎসব পালিত হয়। ধর্মরাজ ঠাকুরকেন্দ্রিক গাজনও বাংলার বহু জায়গায় বিখ্যাত। বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গাতেই এই গাজনগুলো পালিত হয়। এছাড়া আরও কিছু গাজনের প্রচলন রয়েছে, যেমন—বলরামের গাজন, বুড়োরাজের গাজন। এমনকি কোথাও কোথাও মনসা বা সরস্বতীর গাজনেরও প্রচলন রয়েছে। গাজনের আরেক দেবতার নাম কালার্করুদ্র। কোথাও তিনি কালাগ্নি আবার কোথাও রুদ্রদেব নামে পূজিত হন। সংস্কৃতে বলা হয় কালার্করুদ্র পূজা।[৫৭] উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা তাকে কালার্করুদ্র নামেই পুজো করেন। কালার্করুদ্র অর্থে কাল অর্থাৎ মহাকাল। মহাকাল বলতে আবার শিবকে বোঝায়। আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত বান রাজাকে কৃষ্ণ মহাকাল বলে সম্বোধন করেছেন।[৫৮] অর্ক অর্থাৎ সূর্য এবং রুদ্র অর্থাৎ ইন্দ্র বা সংহাররূপী শিব।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শিব পূজার পাশাপাশি ধর্মপূজারও ব্যাপক চলন রয়েছে। জলাকীর্ণ সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে যে ধর্মপূজার প্রচলন হয়েছে তার কারণ এখানে লোকালয় গড়ে ওঠা। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে বর্গী আক্রমণে ভীত মানুষরা জলাজঙ্গলে ভরা সুন্দরবনাঞ্চলের দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে এসেছিল কিন্তু তাদের কৌলিক উপাসনা ছাড়েনি। ধর্মপূজা তাদের সঙ্গেই এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল।

ডোমজাতি বাংলাদেশে বসবাসকালে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করত। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বহিরাক্রমণের ভয়মুক্ত হওয়ার সময় ডোমদের সৈন্য হিসাবে প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তখন তারা কেউ কেউ বাধ্য হয়ে সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হল এবং পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ করে দুর্গমতম অঞ্চলে পালিয়ে গেল, সাথে নিয়ে গেল তাদের কৌলিক দেবতা ও তার পূজার ধারা। সেখানকার অন্যান্য জাতিরা আবার সেই দেবতা ও পূজাকে গ্রহণ করল। এই ভাবেই ধর্মদেবতা এদের হাত ধরে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে ও প্রতিষ্ঠা পায়। তবে ধর্মঠাকুরের পূজা একেবারে প্রথমে ছিল সূর্য পূজা। ক্রমে মানুষ ভুলে গেছে যে এটা আসলে সূর্য পূজা কারণ ক্রমশ জনমানসে এর প্রচার হয় যম পূজারূপে। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবান্বিত হওয়ায় অনেকের ধারণা এটি বুদ্ধ পূজা তাই কোথাও কোথাও বুদ্ধ পূর্ণিমাতে এর পূজা হয়।[৫৯]

ধর্মের পুজো মূলত ডোম সমাজে হয়ে থাকে। ধর্মগাজনে তাদের আধিপত্যই বেশি। কোথাও কোথাও মুসলমানরাও অংশগ্রহণ করে। গৌতমবুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিপক্ষ পরিপূরক রূপে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিকতা আরও বিন্যস্ত ও পরিবর্তিত হয়। যা বঙ্গদেশে খ্রিস্টীয় ৮ম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসারিত হয়।[৬০] তৎকালীন নিম্নবর্গীয় হিন্দুগণের মধ্যে যারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অধিকসংখ্যায় ছিল ডোম শ্রেণি তাই ডোমদের আরাধ্য দেবতা ধর্মঠাকুরের পুজোতে স্বাভাবিক ভাবেই বৌদ্ধদের প্রভাব পড়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকারগণ 'শূন্যপূরাণ'-এর রচনাকাল সম্পর্কে অনুমান করে বলেন এটি রচিত হয়েছিল আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে এবং তারা অনুমান করেন যে এই

'শূন্যপূরাণ' থেকেই ধর্মপূজায় গাজনের সূত্রপাত ঘটেছিল এবং আরও পরবর্তীকালে শিবপূজায় গাজন উৎসবের প্রবেশ ঘটেছিল তাই বর্তমানে গাজন উৎসব পালিত হয় শিব ও ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে।[৬১] তবে শিবের গাজনের কাছে ধর্মের গাজন এখন অনেকটাই নিষ্প্রভ।

'*ধর্মমঙ্গল*' এ রয়েছে রাণী রঞ্জাবতী ধর্মকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টায় গাজন উৎসবের প্রচলন করেছিলেন—

"গাজন লইয়া এল ময়না মন্ডলে
শিরে ধর্মপাদুকা সোনার চতুর্দোলে"[৬২]

গৌড়ে গাজন মেলা বা উৎসবের কথা ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে মানিক গাঙ্গুলির *'ধর্মমঙ্গল'* এ উল্লেখ রয়েছে—

"গায়ে ছিল বাদ্যভান্ড তাতে ছিল কাঠী
কোলাহল কেঁপে গেল গৌড়ের মাটি"[৬৩]

বৌদ্ধ শব্দ 'ধম্ম' বা 'ধরম'। এ থেকেই প্রথমে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলীর কিছু অংশ, বর্ধমান, মেদিনীপুর থেকে শুরু করে পুরুলিয়া, ছোটনাগপুর, সিংভুম-এর বিশাল অঞ্চল তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর বেশ মর্যাদা লাভ করেছিল।

ধর্মের গাজন থেকে শিবের গাজনে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি ডঃ পশুপতি মাহাতো তাঁর 'ধর্মগাজন থেকে শিবগাজন' নামক প্রবন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তা থেকে সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা করা যায় তা হল—ধর্মঠাকুর বা ধর্মগাজন বা শিবগাজনের উদ্ভব ও উত্তরণের পিছনে অনেকাংশেই দায়ী বলা যায় দুটি বিষয়কে—

এক) বাংলায় পাল রাজাদের সময় থেকে যে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল এবং

দুই) তার পরবর্তীকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের যে বিকাশ ঘটেছিল।[৬৪]

বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলা অর্থাৎ রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুরের পূজার খুব বেশি প্রচলন ছিল। পূর্বে কোনো মূর্তি পূজা হত না পরবর্তীকালে কোনো গাছ, পাথর, মাটির থান বা ঢিবি বানিয়ে ধর্মের গাজন গাওয়া হত কিন্তু গত একশ বছরে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুলিয়ার সমস্ত ধর্মঠাকুরের থানে শিবঠাকুরের পূজার প্রচলন হয়েছে। পুরুলিয়ার চুনা গ্রামে এটি প্রথম শুরু হয় ক্রমশ অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় এটিকে মেনে নেয়। গত দুশ বছর ধরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এবং তিনশো বছর ধরে রাজারা শিবকে গুরুত্ব দিয়ে তার পূজা প্রচলনের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। চৈতন্য পরবর্তীকালে দেখা গেল সমাজে একদিকে চৈতন্যদেবের জন্য বৈষ্ণব প্রভাব চলছে আর অন্যদিকে শিবায়ন অর্থাৎ শিবকে কেন্দ্র করে শৈব প্রভাব ঘটছে। যেখানে ধর্মঠাকুরের গাজন হত সেখানে শিবায়ন ঘটতে থাকল। মূর্তিহীন ধর্মপূজার জায়গায় মূর্তি পূজার প্রচলন শুরু হল। আবার এই পরিবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণদের আত্মসম্মানে যেন আঘাত না ঘটায় তাই

ধর্মঠাকুর থেকে শিবের এই বিবর্তনের সময় ব্রাহ্মণরা তাদের অহমবোধ বজায় রাখার জন্য বেশ কিছু রীতি তৈরি করল শিবের গাজনের মধ্যে। ব্রাহ্মণরা দখল করতে লাগল। শিবগাজনের স্নানের সময় যেমন—'তেল হলুদ' দিয়ে সে পুরোহিত পূজা করবেন, 'জাগর হাঁড়ি' আনবেন তিনি ভক্তদের কাঁধে চেপে আসবেন এই অমানবিক রীতির মাধ্যমে নিম্ন সম্প্রদায়ের চোখে নিজেদের উচ্চ সম্প্রদায় ভুক্তরূপে স্থাপন ও আলাদা করার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান এবং এই বিষয়টি রাজার উপস্থিতিতে ঘটানো হত। এই ঘটনা ঘটেছিল ইংরেজ শাসনের পূর্বে ও শাসনাধীন কালে। এখনও কোথাও কোথাও এরকম দেখা যায় সুতরাং ব্রাহ্মণ্যবাদ ইংরেজদের হাত ধরে এবং নতুন জমিদারদের হাত ধরে সমাজে নতুনভাবে প্রবেশ করেছিল। ব্রাহ্মণদের সামগ্রিক ক্ষমতা, দলিতদের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাকে শক্তিশালী হতে না দেওয়ার অন্যতম একটি কৌশল এটি। পশ্চিমবঙ্গে এই কারণেই বৈষ্ণব প্রভাব এত বেশি। বৈষ্ণব প্রভাব কিছুটা পড়েছিল উপজাতি, আধা উপজাতিদের উপরে অর্থাৎ যেখানে বৈষ্ণব প্রভাব ছিল না সেখানেও। রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির মতো সেখানে ধর্মঠাকুরের প্রচলন ছিল সেখানে ধর্মঠাকুরের জায়গায় এক ভৈরব-ভৈরবী মূর্তি। ভৈরব রূপটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মঠাকুরকে মূর্তিরূপ দেওয়া আর ভৈরবীকে আনার উদ্দেশ্য ছিল মাতৃপূজাকে প্রতিষ্ঠা করা। এই ভৈরব-ভৈরবীই ক্রমে রূপান্তরিত হল শিব-পার্বতীতে ফলে ধর্ম-গাজনও রূপান্তরিত হল শিব-গাজনে।

নীলকুঠিয়ালরা যে সমস্ত জায়গায় ছিল বিশেষ করে বর্ধমান, নদীয়া, পুরুলিয়া এবং সুন্দরবন এলাকায় সেখানে ব্রাহ্মণদের পুরোহিত এবং কায়স্থদের কেরানী করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা সেখানে যাওয়ার পর সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তারা শিবের পূজারিরূপে চিহ্নিত হয়, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মানুষ ও উচ্চশ্রেণির দেবতারূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে আর ওই আদিবাসী নিম্নশ্রেণির মানুষ যারা ছিল ধর্মঠাকুরের পূজারি তাদের মতো তাদের দেবতাও ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণির তাই তার পুজোয় শুয়োর বলি, পাঁঠা বলি দেওয়া হত। এই পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত কায়স্থরা সমাজে নিজেদের আধিপত্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদ টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের পুজো করল কিন্তু নিজেদের উচ্চবর্ণের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শুয়োরের বদলে খাসি, পাঁঠা ইত্যাদি বলি দিল এবং ধর্মের পুজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিবের মন্ত্রপাঠ করল। আগে ছিল সম্পূর্ণ অনার্যরীতি যা এখন অধিকাংশ জায়গাতেই ব্রাহ্মণ সেবায়েতগণ দখল করে নিয়েছেন। ক্রমশ ধর্মগাজনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু জায়গায় শুরু হয়েছে ফড়েগিরি। আরেকটি ক্ষেত্র হল—নতুন জমিদার সৃষ্টির সময়। সেই সময়ও দেখা দিয়েছিল এই ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা। সাঁওতাল, নমঃশূদ্র, মাহাতো এরা যে সব জমির মালিক ছিল ১৭৯৩-তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় আর সেই সব জমির মালিক রইল না। তাদের বদলে কলকাতা বা অন্য কোথাও থেকে এসে নতুন জমিদার হয়ে উঠল আর প্রকৃত যে জমির মালিক ছিল সে তার মালিকানাস্বত্ব হারালো এই সময়েই ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠা এবং সামন্ত রাজাদের হাত ধরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পূজা-পার্বণের 'হিন্দু সংস্কাররূপে' পরিবর্তন করেছে তার ফলস্বরূপ ধর্ম-গাজন হয়েছে শিব-গাজন।

ধর্মঠাকুরের উৎস সম্পর্কে পণ্ডিতগণ যথাযথ নিরূপণ করতে পারেননি, অনুমান করা হয় যে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে বৌদ্ধধর্ম রাঢ় অঞ্চলে প্রবেশ করে। এই অঞ্চলকে পালরাজারা নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করতে না পারলেও বার বার এই অঞ্চল আক্রমণ ও এখানে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। পাল রাজত্বের পরে সেন রাজারা এখানে আধিপত্য স্থাপন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন। পূর্বে আর্যসভ্যতা এখানে প্রবেশ করতে না পারার ফলে রাঢ় অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা অর্থাৎ প্রাক্ আর্য ও প্রাক্ দ্রাবিড় জাতি তাদের নিজস্ব লৌকিক সংস্কারেরই পরিপোষক ছিল। ধর্মঠাকুর এদের মধ্যে উদ্ভুত হয়ে পরবর্তীকাল বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[৬৫] বঙ্গদেশের শাসনে অধিষ্ঠিত পালরাজারা হিন্দুব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী হয়েও বৌদ্ধদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বাংলাভূমিতে বৌদ্ধ প্রভাব পড়েছিল। যার প্রবলতায় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব ম্রিয়মান হয়ে পড়লেও লৌকিক দেবতা ধর্মরাজ ঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধ উপাস্য দেবতাদের সমন্বয় ঘটে। আসলে বৌদ্ধদের ধর্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল লোকায়ত সমাজ আর ধর্মরাজ ছিল সেই সমাজেরই দেবতা।

বহু গবেষক মনে করেন রাঢ় অঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার সময় বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু নিম্নশ্রেণির মধ্যে মিশে গিয়েছিল তাদেরই দ্বারস্থ বৌদ্ধ আচরণের বেশ কিছু আচার-রীতি ধর্মঠাকুরের পূজা ও গাজনের পূজাচারে পালিত হয় আবার কারও ধারণা নিম্ন সমাজের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমানোর জন্যই নিম্নসম্প্রদায়েরই কোনো নেতা হয়তো কোনো লোকদেবতার আশ্রয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষদের একত্র করতে চেয়েছিলেন। ধর্মঠাকুর হয়তো এরকমই এক লোকদেবতা। *‘তারকেশ্বর শিবতত্ত্ব’* পুঁথিতে এরকম উল্লেখের আভাষ মেলে।[৬৬] আশুতোষ ভট্টচার্য মনে করেছেন যে পাল-সেন যুগে বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্মবিস্তারের পূর্বে রাঢ় অঞ্চলে আদিম অনার্য জনজাতির বাস ছিল। পাল রাজারা রাজ্য বিস্তারের সময় বার বার রাঢ় অঞ্চল আক্রমণ করে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাঢ়কে তাদের পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। এই পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অন্যদিকে সেন বংশ ছিল হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক। পাল ও সেন এই দুই বংশের সময়েই রাঢ় অঞ্চলে আর্যসংস্কৃতি প্রসারতা পায়।[৬৭] পরবর্তীকালে আগত ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষত বৌদ্ধ বা হিন্দুরা ডোম জাতির লৌকিক দেবতার উপসনাকে সহজে দূরীভূত করতে না পেরে নিজেদের ধর্মের কিছু সাধারণ লক্ষণের সাথে মিলিয়ে দেয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় হর্ষবর্ধনের সময় কনৌজে বুদ্ধপূজা উপলক্ষ্যে চৈত্রমাসে উৎসব হত। বুদ্ধমূর্তিকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে তারপর মহাসমারোহে একশত ফুট উঁচু এক মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হত। সারা চৈত্রমাসব্যাপী এই অনুষ্ঠানে নৃত্য, সংগীত ও বাদ্য সহযোগে নানা আচার পালন করা হত। এতটাই সমারহ হত যে তা ব্রাহ্মণদের কাছে ঈর্ষনীয় ছিল। ক্রমে উৎসবটি বাৎসরিক উৎসবে পর্যবসিত হয়। কালক্রমে তাই-ই গাজন বা গম্ভীরায় পরিণত হয়।[৬৮]

'ধম্ম' শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে। এই ধর্ম হল বৌদ্ধ ধর্ম। অশোকের শিলালিপিতে বুদ্ধের পরিবর্তে 'ধম্ম' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন—অধঃপতিত বৌদ্ধরাই রাঢ় অঞ্চলে ধর্মপূজার প্রবর্তক।[৬৯] *অমরকোষে* বলা হয়েছে, 'সর্বজ্ঞ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ বৌদ্ধদের দ্বিতীয় শরনই ধর্ম-ধর্মং শরনং গচ্ছামি'।[৭০] নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন—

> "ধর্মঠাকুর মূলতঃ ছিলেন প্রাগার্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।"[৭১]

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ধর্মের গাজনের নাচ-গান আর্য ধর্মের অন্তর্গত নয়। এগুলি দ্রাবিড় বা চীন, তিব্বতীয় হতে পারে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধর্মনাথ রাঢ় দেশে স্বয়ং ধর্মঠাকুর হয়ে পূজিত হয়ে আসছেন। নলিনীনাথ দাশগুপ্ত তাঁর *'বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম'*-তে বলেছেন—

> "ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া মানিবার সুসঙ্গত কারণ নাই বলিয়া, নাথ-গুরুগণ যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মতানুবর্তী হইয়াই তাঁহাদের মত ও উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। নাথগণ পরে নিজেদের শৈব বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দু সমাজ-দেহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এখন আর তাঁহাদের সেদিন নাই, সেই যোগ বলে অনিমা, লঘিমা, ব্যাপিত প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য দ্বারা বায়ু মধ্যে সঞ্চলন, জলের উপর গমনাগমন, অগ্নিধারা আনয়ন প্রভৃতি বিস্ময় সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, সে প্রভাবও নাই, কিন্তু সেই ক্ষমতাগুলিরই অক্ষম অনুকরণ গাজনের অনুষ্ঠান"।[৭২]

তিনি একথাও বলেছেন—

> "ধর্মমঙ্গল সাহিত্যের ধর্ম ঠাকুরটি যে কী, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কখনো তিনি যমরাজ, কখনো মহাদেব, কখনো যেন বিষ্ণু, কখনো আবার উপনিষদের নিরাকার ও অব্যয় ব্রহ্ম কখনো সূর্যের এক অনুচর, কখনো বা অন্যকিছু। এই 'অন্যকিছুর' মধ্যে তাঁহার গায়ে শেষ তান্ত্রিক যুগের খানিকটা বৌদ্ধ বৌদ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়, তবে তাহা নিতান্তই স্বভাবিক কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে 'বৌদ্ধ দেবতা' বলিয়া প্রচার করা অসমসাহসের কাজ"।[৭৩]

কালের প্রয়োজনে বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির এক মিলন ঘটেছিল যার ফলস্বরূপ হিন্দু ধর্মে 'গাজন' নামক লোক উৎসবটি শুরু হয় এবং তার মধ্যে জৈন ধর্মেরও বেশ কিছু প্রভাব দেখা যায়। 'গাজনের সন্ন্যাসী' শব্দটি জৈনদের[৭৪] কারণ বৌদ্ধ অপেক্ষা রাঢ় অঞ্চলে জৈনদের গমনাগমন ছিল বেশি। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পেও বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন প্রভাব বেশি।

বিদেশী পর্যটক ম্যানরিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ১৬১০-১৬১৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে চব্বিশ পরগনা নামক জনপদের পতন শুরু হয়েছিল।[৭৫] ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে এসেছে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ও ভয়ংকর মহামারীতে এই অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়েছিল এবং ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীনকালে চন্দ্রকেতুগড়, সাগরদ্বীপ, পাকুড়তলা,

তিলপী, আটঘরা, জটা, কঙ্কনদীঘি, প্রভৃতি অঞ্চল নগর-বন্দর ও সমৃদ্ধশালী ছিল। ঐতিহাসিক যুগ থেকে পালযুগীয় সময়কালে এই অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধ, ধর্মের একটা বলয় তৈরি হয়েছিল। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে বহু মন্দির ও দেব-দেবীর মূর্তি এখানে নির্মিত হয়েছিল সুতরাং চব্বিশ পরগনার প্রতিটি প্রান্তের মন্দির গাত্রে, মুদ্রায়, তাম্রপট্টে, পোড়ামাটির ফলকে ও দেব-দেবীর মূর্তিতে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সাথে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল ইতিহাস খোদিত আছে।

ধর্মের গাজন হল ধর্ম ও নীলাবতীর বিয়েতে তাদের ভক্ত্যাদের উন্মাদনা, কিন্তু কেন এই শুভ অনুষ্ঠানে অশৌচপালন করা হয়? এ প্রসঙ্গে শ্রীসুধাংশু রায় বলেছেন—কোনও এক ফারাও রাজা প্রাচীন মিশর থেকে বিতাড়িত হয়ে সদলবলে এদেশে চলে আসেন। সেই রাজার মৃতদেহ রাজমহল অঞ্চলের পাহাড়ে কোথাও মমি করে রাখা আছে। গাজন সন্ন্যাসীরা আসলে সেই রাজার মৃত্যু দিবসে শৌক পালন করে।[৭৬] তবে এই তথ্যের কোনো সত্য প্রমাণ নেই কিন্তু পরোক্ষে কিছু তথ্য রয়েছে যেমন—রাঢ় অঞ্চল থেকে পাওয়া এ প্রসঙ্গের পাঁচালির দুটি লাইন—

ক. 'কাঠির সন্ধানে যাও সাঁওতাল পরগনে...'[৭৭]
খ. 'সাঁতালি পর্বতে আছে কড়ারের গাছি...'[৭৮]

রাজমহল পাহাড় অঞ্চলকে সাঁওতাল পরগনা বলা হয় এখন। সাঁওতাল পরগনাই স্থানীয় আদিবাসীদের কথায় সাঁতালি পর্বত। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় সা-তা-লি অর্থাৎ রাজগৃহ বা রাজমহল। মৃতদেহ নিয়ে মিশরীয়দের রীতি-নীতির সাথে গাজনের রীতি-নীতির বহু মিল পাওয়া যায় সেই সূত্রেই গাজনের সন্ন্যাসীরা অশৌচ পালন করেন এবং একে মিশরীয় রাজার মৃত্যু দিবসের এক ক্ষীণ ধারার প্রবহমানতা রূপে ধরা যায় তবে এ প্রসঙ্গে আরও অনেক ভিন্নমত রয়েছে।

ধর্মগাজনের উদ্ভব প্রসঙ্গে পুরাতত্ত্ববিদ সুধাংশু কুমার রায় বলেছেন—ধর্ম বা ধম্ম—এই প্রাগৈতিহাসিক শব্দটি এসেছে 'ডো-আহম-রা' নামক মিশরীয় ফারাও রাজাদের মধ্যে একজন জনপ্রিয় ধর্মপ্রাণ রাজার নাম থেকে। এই রাজা 'ডো-অহম-রা' মিশর থেকে বিতাড়িত হয়ে তার অনুগত প্রজাদের নিয়ে সমুদ্র পথে রাঢ় অঞ্চলে চলে আসেন। মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ মমি করে রাজমহল পাহাড়ের এক গুহায় লুকানো ছিল। তাঁর প্রজারা 'ডো-আহম' বা ডোম নামে পরিচিত ছিল। ডো - আহম-রা এর মৃত্যু বার্ষিকী দিবসে 'ডো-আহম' সম্প্রদায় অশৌচ পালন করত, মনের দুঃখ জানাবার জন্য বিকট গর্জন করে অনেক রকমভাবে আত্মনিগ্রহ করত। সেই থেকেই রাঢ়বঙ্গে ধর্মগাজনের অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়।[৭৯]

ধর্মগাজন অনুষ্ঠিত হয় ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে। শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন প্রায় একই রকমের। উভয় গাজনে প্রচুর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রত, সংযম, হবিষান্ন গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য পালন, অশৌচ পালনের মত আচরণ সবই শিবের গাজনের সাথে ধর্মের গাজনে সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয়ক্ষেত্রেই গাজনের শুরুতে স্নান করে উপবীত ধারণ করার রীতি রয়েছে। উভয় গাজনের ক্ষেত্রেই যাদুবিশ্বাস ও তুকতাকের নানা যোগ রয়েছে, আদিমসংস্কারেরও যোগ রয়েছে। ধর্মের পূজায় আদিতে কোনো মূর্তি

ছিল না। গোল, নোড়ার মত লম্বাটে, শালগ্রামের মতো, কাঠের ফসিলের মতো, বা শিবলিঙ্গের মতো নানা আকৃতির শিলা খণ্ডকেই পুজা করা হত। ফসল ফলানো, রোগমুক্তির মানত, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা ভূত ছাড়ানোর মতো আদিম লোকবিশ্বাসের নানা পর্যায় ধর্মদেবতার গাজন পর্বে পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলে ধর্মের গাজনে ধর্মের সঙ্গে নীলাবতীর বিয়ে দেওয়ার রীতির প্রচলন ছিল। ধর্মপুরাণে ধর্মের সঙ্গিনীরূপে নীলাবতীর উল্লেখ আছে। ধর্ম পূজা উত্তরায়ণের ব্রত। বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত কৃষিজীবী মানুষের সার্বজনীন ব্রত পালনের মধ্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাই, অনুমান করা হয় এই পূজার সাথে বৃষ্টি কামনার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ, ধর্মরাজের সাথে মুক্তি দেবীর বিবাহ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান, 'রাতগাজন পরব', বানফোঁড়া, আগুনঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, রাত্রে স্বর্গারোহণ পালাগান শিবগাজন ও ধর্মগাজন উভয়েই রয়েছে। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বলেছেন—

> "শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হল হরকালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু 'গাজন' শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। এই দুই বিবাহই প্রচ্ছন্ন।"

উভয় গাজনেই গাজন উৎসব সূচনার আগে কয়েকদিন ধরে ঢাক বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে দেবতার আবাহন বন্দনা করা হয়। একে 'ঢেমুল' বলে। যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরে ক্ষৌরকর্ম, দীক্ষাগ্রহণ, গঙ্গায় বা পুকুরে স্নান, নতুন বস্ত্র পরিধান, পুরোহিত দ্বারা উপবীতগ্রহণ, বেতের লাঠি গ্রহণ উভয় গাজনেই হয়। ঢাকের বাদ্যি সহযোগে সন্ধ্যায় কণ্টক-শয্যার ওপর ঝাঁপ দেওয়া শিব-গাজন ও ধর্ম-গাজনের অঙ্গ। উভয় গাজনেই গাজনের দিনগুলোতে গাজন সন্ন্যাসীরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিক্রমা করেন। উভয় গাজনেই চড়ক উৎসব হয়। একটা মোটা কাঠের বীমের উপর আরেকটা সরু কাঠকে 'T' এর মতো করে বেঁধে উপরের কাঠের এক প্রান্তে ভক্ত্যার পিঠে মাছের বঁড়শী গাঁথার মতো করে বাঁকানো লোহার রড ফুঁড়িয়ে গামছা দিয়ে বাঁধা হয় এবং অন্য প্রান্তে তার সমতুল্য আরেকজনকে বাঁধা হয় তারপর সেটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। উভয় গাজনেই আগুন সন্ন্যাস হয়। ধর্মরাজ গাজনের একটি বিশেষ ক্রিয়াকলাপ এই আগুন সন্ন্যাস। তবে সাধারণত এটা নিম্নশ্রেণির মধ্যেই দেখা যায়। জমিদারদের নিয়োগ করা ভক্ত্যারা এটি করে থাকে, এই সন্ন্যাসীরা আগুনের উপরে পা দিয়ে চলা-ফেরা করে। ভোর রাতে আগুন সন্ন্যাস হয়।

আসলে শিব-গাজনের সাথে ধর্মের গাজনের এই সাদৃশ্যের বিশেষ কারণ ছিল রাঢ় অঞ্চলে এক সময় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল তাই ধর্মঠাকুরের পূজাবিধি, আচার অনুষ্ঠানে বৌদ্ধপ্রভাব পড়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে শৈবরা বৌদ্ধদের অপসারিত করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে ফলে ধর্মঠাকুরের পূজায় শৈবধর্মের প্রভাব ঘটেছিল। এক সময় রাঢ় অঞ্চলে শিব ও শক্তি সাধনার যথেষ্ট প্রসার ছিল। ধর্মঠাকুরের নিজস্ব কোনো রীতি-নীতি না থাকায় শৈব ধর্মের রীতি-নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। রাঢ় অঞ্চলে শিবের থেকে ধর্মঠাকুর বেশি প্রাচীন। ধর্মঠাকুরের পূজার মধ্যে তার প্রাচীন পূজাবিধি রয়ে গেছে।

শিব-গাজনের সাথে ধর্মের গাজনের সাদৃশ্য যেমন রয়েছে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। ধর্মের গাজনে ঘোড়ার ব্যবহার অপরিহার্য যা শিবের গাজনে নেই। শিব-গাজনে কোনও রথসহ গ্রাম পরিক্রমার অনুষঙ্গ থাকে না। এর তাৎপর্য বিষয়ে আশুতোষ ভট্টচার্য বলেছেন—

"গ্রাম্যলোকের বিশ্বাস যে ধর্মঠাকুর যখন সূর্যদেবতা তখন তিনি আকাশে রথে চড়ে ঘুরে বেড়ান।"[৮০]

ধর্মরাজের গাজনে গ্রামের মানতকারী ভক্ত জনসাধারণ ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে ছোট-বড় নানা ধরনের রঙিন মাটির ঘোড়া উপহার দেয়। এই থেকে বোঝা যায়, ধর্মঠাকুরের ঐতিহ্যের মধ্যে ইসলাম প্রভাবের সমন্বয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বেশ কিছু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় শিবের গাজন হয়। যেমন— শিবগাজনের মন্দির বড়াশীর অম্বুলিঙ্গ—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাচীনতম শিবের গাজনের অন্যতম হল মথুরাপুর থানার বড়াশীর অম্বুলিঙ্গ বা বদরিকানাথ শিবের গাজন। ৫০০-৬০০ বছরের প্রাচীন এই শৈবতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায় বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে। প্রচলিত ধারণা, পূর্বে মন্দির নির্মাণের আগে মন্দিরের নিকটস্থ বকুল গাছ থেকে গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দিত। তার আগে ঐ গাছের তলায় সন্ন্যাসীরা সূর্য পূজা করে পার্শ্বস্থ হালদার পাড়ায় পঞ্চাননের আদেশ গ্রহণ করে পুকুরে স্নান করে। এখানেও গাজন উপলক্ষ্যে মেলা হয়। এই মন্দির সম্পর্কিত প্রচলিত আছে এক সময় বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁ মন্দিরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় গাজন সন্ন্যাসীদের হৈ-হৈ শুনে উৎসুক হয়ে লোক মারফত সন্ন্যাসীদের ঝাঁপের খবর পান তারপর নিজেই সেখানে উপস্থিত হন। ঝাঁপের সত্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বর্শার উপর সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ দিতে বলেন। তখন যিনি মূল সন্ন্যাসী তিনি বাবা অম্বুলিঙ্গকে স্মরণ করলে তার ডাকে অম্বুলিঙ্গ শঙ্খচিলরূপ ধারণ করে মাথার উপর দর্শন দিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার আদেশ দিলে ভক্তরা ঝাঁপ দেন। নবাবের বর্শা ভেঙে যায়। এই থেকেই গ্রামের নাম হয় বড়াশী। অনেকের ধারণা এ গল্প বুজরুকি। এ থেকে বাবা অম্বুলিঙ্গের আরেক নাম বুর্জুকিনাথ।[৮১]

ডায়মণ্ডহারবার থানার বোলসিদ্ধি এক বাক্ (বোল) সিদ্ধ মহাপুরুষের নামে নামকৃত হয়েছে। এখানকার সিদ্বেশ্বর অনাদিলিঙ্গ শিব প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন।[৮২] এখানকার গাজন উৎসবও বিখ্যাত। এখানে সন্ন্যাসীদের দুটি থেকে চোদ্দটি পর্যন্ত বানফোঁড়া বিখ্যাত। সন্ন্যাসীরা শিবের কাছে দুই কোমরে প্রায় দেড় ফুটের লোহার বানের পেছনের অংশ চামড়ায় বিঁধিয়ে সামনের অংশে আগুন জ্বালিয়ে দেন একে 'আগুন বান' বলা হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চৈত্র মাসের শিবের গাজনের অন্যতম জনপ্রিয় হল বাহন চাওড়া বা মন্দির বাজার গ্রামের কেশবেশ্বর শিব মন্দিরের গাজন। রাজা কেশব চৌধুরী ১৭৪৮ সালে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠান করেন, এখানেও গাজন ও চড়কের সময় নানা রকম অনুষ্ঠান হয়। পয়লা বৈশাখে এখানে গোষ্ঠমেলা হয় যা হর ও হরির মিলন ক্ষেত্র।

এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আরও কিছু বিখ্যাত গাজন হল—কাকদ্বীপের মন্মথপুরের বিখ্যাত গাজন, বহড়ুর বসুপাড়ায় ধর্মঠাকুরের গাজন, ফলতা অঞ্চলের মাসুদপুরে ডোম দ্বারা ধর্মরাজের গাজন ও মেলা, ডায়মণ্ডহারবার থানার কুলটিকরী গ্রামে ঐতিহ্যবাহী গাজন ও চড়ক মেলা, বাখরাহাট গ্রামে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে উচ্চবর্ণের মহাদেব ও নিম্নবর্ণের ধর্মরাজের পূজা ও গাজন উৎসব, মল্লিকপুর-বারুইপুর অঞ্চলের মদারহাটের চৈত্র গাজন ও মেলা, সোনারপুর অঞ্চলে গোড়খাড়ার জনপ্রিয় চড়ক, এছাড়াও সুন্দরবনাঞ্চলের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের যোগেশগঞ্জ গ্রামের চৈত্রের শেষে শিবের গাজন বিখ্যাত। যা শুরু হয়েছিল ১৩৬৫ সাল নাগাদ। এখানে বৈশাখ মাসেও ধর্মদেল হয়। কুন্দরালী কল্যাণপুরের চড়ক গাজন ও মেলা প্রাচীন। চৈত্রমাসে হয়। এখানে 'আগুনঝাঁপ' হয়। গোপালগঞ্জের চিনিবাস হালদার গাজন উৎসব বহু প্রাচীন। কৈখালী—গোপালগঞ্জ ও গরানকাটীর বিভিন্ন গ্রামের সন্ন্যাসীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া পশ্চিম বিষ্ণুপুর থানার জয়রামপুর গ্রামের স্বঙ্গেশ্বর শিবমন্দির, সাগরদ্বীপের রূদ্রেশ্বর শিবমন্দির, প্রভৃতি জায়গায় গাজন উৎসব পালিত হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কিছু সাদৃশ্য বহুল ধর্ম-গাজন ও শিব-গাজন এর প্রচলন রয়েছে। যেমন-

চকমানিকের ধর্মঠাকুর—এখানে ধর্মঠাকুর দুটি একটি কষ্টিপাথরের, অন্যটি চারটি পা বিশিষ্ট কূর্মাকৃতির। বিগ্রহ দুটির মাঝে রয়েছে শালগ্রাম শিলা। এছাড়া প্রায় আড়াইফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কালো পাথরের চাঙড়কে শিবলিঙ্গরূপে পুজো করা হয়। এখানে ধর্মরাজের নিত্যপূজা করা হয়। পূজার মন্ত্র সংস্কৃত বিষ্ণুক্ষেত্র কারণ ধর্মরাজ এখানে বিষ্ণুরূপে অধিষ্ঠান করছেন। মন্দিরটি টিনের দু'চাল বিশিষ্ট। চৈত্রমাসে নীলপুজোর আগের দিন এখানে 'ধর্মেরঝাঁপ' হয়। এখানে সাপতাড়া, ভেটকাখালির শশীমণ্ডলের মন্দির, মুচিশার ভৈরবীতলা সহ সাত জায়গা থেকে গাজন আসত তাই এর নাম ছিল সাতকালির গাজন, এখানে 'বাঁটিঝাঁপ' হয়। সেবাইতরা মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

পাঁচাল পাড়ার ধর্মঠাকুর—দেবমূর্তি কূর্মকার বড় বড় তিনটি রূপোর চোখ বিশিষ্ট। বামপাশে সামান্য উঁচু এক নারীরূপী দেবী। উনি ধর্মরাজের স্ত্রী। মন্দিরটি দোচালা বিশিষ্ট। এখানে নিত্যপূজা হয়। সেবাইতরা 'কপালি' সম্প্রদায়ভুক্ত। নীল ষষ্ঠীর আগের দিন এখানে ঝাঁপ হয়। প্রতিষ্ঠাকারী বংশের যারা গাজন সন্ন্যাসী হন তাঁরাই 'বঁটি', ধরার জন্য বস্তা, ঢাক-কাঁসি এনে 'বঁটিঝাঁপ' করেন। ঝাঁপের আগে মন্দির প্রাঙ্গণে ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম দৃশ্য দর্শনীয়। আগে এখানে জমজমাট মেলা হত। মেলা এত সমারোহপূর্ণ ছিল যে এই থেকেই জায়গাটির নাম হয়েছে ধর্মতলা।

পার্বতীগ্রামের ধর্মঠাকুর—ধর্মরাজের মূর্তিটি এখানে অতিক্ষুদ্র কূর্মাকৃতির। মন্দিরটি কাঁচা। সেবাইতরা বর্গক্ষত্রিয় বা বাগদি সম্প্রদায়ভুক্ত। সন্ন্যাসীরা সবাই আশে-পাশের মানুষ হন। নীলের আগের দিন ঝাঁপ হয়। আগে বেশ সমারোহপূর্ণ ছিল এখন কেবলমাত্র নিয়ম পালন হয়।

ব্যাঞ্জন হেড়িয়ায় (৭নং ওয়ার্ড) ধর্মতলা—পূর্বে দু চালা মন্দির ছিল। বর্তমানে অংলকৃত সুসজ্জিত মন্দির। এখানে নিত্য পুজো হয়। সেবাইতরা নাথযোগী ব্রাহ্মণ। শোনা যায় পূর্বে জমির ভোগ

দখলকারীদের বাধ্যতামূলক ছিল গাজন সন্ন্যাসী হওয়া। সমারোহ সহকারে ‘বঁটিঝাঁপ’ হত। বাগানবেড়িয়া, জয়চণ্ডীপুর, বইতা, চকগোপালপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে গাজনের দল আসত। শিবের গাজনের মতো সঙ ও সাজতো। এখনও আসে তবে ছোট দল এবং সঙের দল হয় না। সন্ন্যাসীরা গেরুয়া কাপড় পড়ে ঢাক-কাঁসি সহযোগে মন্দির প্রদক্ষিণ করে ধর্মরাজকে প্রণাম জানায় এই বলে—

‘বাবা বুড়োশিবের চরণে সেবা লাগে মহাদেব, বাবা ধর্মরাজের চরণে সেবা লাগে।’

শিব গাজনেও ঠিক এরকম ভাবেই বলা হয়—

‘বাবা জটাধারীর চরণে সেবা লাগে, বাবা মহাদেবের চরণে সেবা লাগে’

শিব-গাজনের মতো এখানে পুকুরে স্নান করে ‘দণ্ডীকাটা’ ও ‘বঁটিঝাঁপ’ হয় শিব প্রাঙ্গণে। দেবস্থানটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলা একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে।

এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মথুরাপুর থানার গম্ভীরনাদ গ্রামে গাজন ও চড়ক হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর, শাহজাদাপুর ধর্মতলায় গাজন, ঝাঁপ ও মেলা হয়।

উপরোক্ত জায়গাগুলি ছাড়াও আছিপুরের রাজীবপুর গ্রামে, বাখরাহাট অঞ্চলে, মহেশতলা এলাকায় সাপা-রায়পুর (বর্তমান শম্পা—মির্জানগর এলাকায় বাটানগরের উলুডাঙার পণ্ডিত পাড়ায়, পাইকপাড়া শ্যামপুর-সারাঙ্গবাদ অঞ্চলে, আশাগাছিতলা, লুঙ্গী গার্লস হাইস্কুলের পাশে—প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের ছোট বড় মন্দির রয়েছে যেখানে নিত্য পুজো হয়। দেবতা প্রস্তররূপী বা কূর্মাকার বা শিলারূপী। দেবতাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলগুলিতে ‘গাজন’ উৎসব হয়। তাতে মানুষ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন বিকেলে বা রাতে ‘ঝাঁপ’ (‘বটি ঝাঁপ’ বিশেষত) হয়।

পূর্বনিশ্চিন্তপুরে—এখানে ধর্মরাজ প্রায় বাস্তহারা তাই কোনও অনুষ্ঠান হয় না

দুর্গাপুর-মায়াপুর—পূর্বে ধর্মরাজের একটি দেবস্থান ছিল যা এখন লুপ্ত।

অছিপুর এলাকার রাজীবপুর—এই গ্রামে মাটির দেওয়াল ও চারচালের মন্দির কূর্মাকৃতির ধর্মরাজ পূজিত হতেন। আছিপুর, রাজারামপুর, পূজালী প্রভৃতি গ্রাম থেকে গাজন আসত। ঝাঁপ হত সমারোহে। সন্ন্যাসী আসত বর্ধমানে সেবাইত বদল হওয়ায় ধর্মরাজ রাজারামপুরে ঘণ্টেশ্বর শিবমন্দির পূজিত হতেন।

পুজালির ধর্মরাজ—পুজালি শিক্ষানিকেতনের পাশদিয়ে পালপাড়ায় যাওয়ার পথেও ‘ধর্মস্থান’ রয়েছে।

ধর্মনগর ও ধোপাগাছি—ধামনগর—বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাবডিভিশান ও থানা বারুইপুরের অন্তর্গত আদিগঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী গ্রাম ‘ধোপাগাছি—ধামনগর।’

এই জায়গার নামকরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই আসে গ্রামবাংলার পূজিত দেবতা ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ। অনুমান করা যায় যে ধর্মরাজকে কেন্দ্র করে এখানে ধর্মের গাজন, চৈত্র মেলা, ঝাঁপ, চড়ক, দেল, সং, সন্ন্যাস ইত্যাদি হয়েছে। শিব-দুর্গার সঙ সেজে পালাগান হয়েছে।

যমরাজ সেজে বাড়িতে বাড়িতে ঘোরা, গাজন প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে এসেছে। তাই ধর্মরাজ থেকে এই গ্রামের নাম হয়েছে ধামনগর। তবে বর্তমানে মন্দিরটি পুকুরে বিলীন হয়ে গেছে। এখানে বেশকিছু তেল সিঁন্দুর মাখানো বড় বড় কালো মসৃণ পাথর ও নুড়ি দেখা যেত। এখান থেকে একটি খাগরাকৃতির গদা পাওয়া গেছে একে যমদণ্ড বলা হয়।

শিবপুরাণ, সনৎকুমার সংহিতা, ধর্মসংহিতা, বায়বীয় সংহিতা, প্রভৃতি পুরান গ্রন্থে নাচ-গান-বাজনাসহ শিবপূজামূলক মহোৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহোৎসবই নীলপূজা বা গাজন নামে পরিচিত।

২.৫ গাজন উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য

গাজন যুগ যুগ ধরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের জীবনে কেবলমাত্র একটা ধর্মীয় উৎসব রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেনি এখানকার মানুষের জীবনকে নানান ভাবে প্রভাবিত করেছে। সাহিত্য থেকে পেশা সর্বত্রই তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

গাজন বিষয়কে অবলম্বন করে গ্রামে-গঞ্জে বহু ছড়া তৈরি হয়। কখনো সেগুলির রচয়িতার উল্লেখ পাওয়া যায়, কখনো যায় না, অল্পশিক্ষিত রচয়িতার দ্বারা রচিত, কোনোটার লিখিত উল্লেখ থাকে আবার কোনোটা মুখে মুখেই রচিত ও প্রচারিত থেকে যায়। ১২.০৪.১৭ তারিখে লক্ষীকান্তপুরের কেশবেশ্বর মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে গাজন উৎসবের সময় গবেষিকা সেখানকার বাসিন্দা লক্ষীকান্ত শিকারীর থেকে নীচের ছড়াটি সংগ্রহ করেছেন—

শিব নয় শিবানী নয়, শিবের ঠাকুর হরি যায়
হরি বলে নেচে যায়
ফুল ফুল কাঞ্চন ফুল,সেই ফুল তুলব
শিব পূজা করব, বোম বোম।

"চৈত্র মাসে শিব পূজে নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।।
জিহ্বা ফোঁড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক।
অভিমত স্বর্গে যায়, না যায় নরক।।
ত্রেতাযুগে সন্ন্যাস করিল দশানন।
সেই মত অবনীতে করে সর্বজন।।"[৮৩]

আবার খুবই প্রচলিত একটি ছড়া হল-

"নীলের ঘরে দিয়ে বাতি।

জল খাও গো পুত্রবতী।।"

গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে গানের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। গাজনের গান তিন ধরনের হতে দেখা যায়—

(১) শিব-পার্বতী বিবাহকেন্দ্রিক গান। এগুলি সাধারণত পুরাণ বা কাব্যে পরিক্ষিত হয়।

(২) আরেক ধরনের শিব-পার্বতীর গান রয়েছে যেগুলি গাজন উৎসবের বিভিন্ন আচারের সময় গাওয়া হয়।

(৩) গাজনের মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে যে গানগুলি গাওয়া হয় সেগুলিও গাজনের গান। গাজনের গানে থাকে শিব-পার্বতীর প্রাধান্য। এছাড়া শিব-পার্বতী ব্যতীত গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ দেব-দেবীর বন্দনা গানও এতে থাকে। সেগুলিতে থাকে দেবত্বের দিক আবার রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গানও এতে থাকে। সেগুলিতে ধরা দেয় কখনো লোকায়ত জীবনের দিকও অর্থাৎ পৌরাণিক আঙ্গিক থেকে বেরিয়ে এসে লৌকিক রূপের আঙ্গিকেও রাধাকৃষ্ণকে কখনো উপস্থাপন করা হয় এবং সেগুলি খুবই জনপ্রিয়। এছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক প্রভৃতি দিকগুলিও কখনো সরাসরি আবার কখনো রূপকের আঙ্গিকে চিত্রিত হয়ে ওঠে গাজন গানে। কখনো সাম্প্রতিক ঘটনাও অবলম্বন করে গান রচনা করা হয়। গত কয়েক দশকে গ্রামসমীক্ষায় দেখা যায় গাজনকারেরা নিজেদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে গাজনের গানের বিষয়বস্তু করে রূপায়িত করেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিজস্ব সম্পদ 'চৈতে-গাজন'। তাই লোকজীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা পরিস্ফুটন ঘটে এখানকার গাজনগানে।

শিব-পার্বতী চরিত্রকেন্দ্রিক একটি গাজনগান-

(নারদ দুর্গার কাছে শিবের বিষপান করার কথা জানিয়ে বলে)—

কি করো কি করো মামী, বাড়িতে বসিয়া?
বিষ খেয়ে ঢলেছে মামা, গায়ে ধরেছে জ্বালা।
(একথা শুনে দুর্গা বলে)

কি শোনালে, কি শোনালে ভাগ্না মর্মে দিলে ব্যথা
মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু আছে শুনেছে কি কথা?[৮৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রায় সাতের দশকের সময় খোলা আকাশের নীচে, মাঠের মাঝখানে হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, করতাল সহযোগে খালি গলার চেঁচিয়ে গান গেয়েই চড়ক মেলায় মানুষের মন জয় করত। পুরুষরাই মহিলাদের সাজ-গোজ করে মেয়েলি ঢঙ-এ নেচে নেচে গান গাইত। যে গান মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে ধরা থাকত। সেই গানের মাধ্যমে কখনো প্রকাশ পেত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র। আবার তার আড়ালে চটুল অর্থও লুকিয়ে থাকতো। তেমনি একটি গান—

নাম করা হেলো আমি করব জমি চাষ,আর সেই মাটিতে দেব ফসল ফলবে বারো মাস

আরো মাটি ফারাবো, ঘন ঘন চাষ দোবো,

হাল চাইনি উলটে দেব পইচে দেব ঘাস

আরে গরু গরু খেলব মোরা গরু কত সেজেছে, নরম বলে গেড়ে গেচে নতুন বলে সেজেচে

হাল তুই তুলে নে, চারানা দেকে শুনে

হাল চাইনি উলটে দেব পইচে দেব ঘাস[৮৫]

গানগুলির রচনাকার কে সেটিও জানা যায় না।

বাংলার মানুষের জীবনে গাজন উৎসব এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে সময়ে সময়ে তা নানান প্রচলিত কথা বা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন—

১. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট

২. গাজনের নেই ঠিকানা

ডাকা দিয়ে বলে ঢাক বাজা না

৩. গাজনে উঠলে বাপকে বলে শালা

৪. শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই

গাজনের ঘটা

৫. ভরা গাজনে ডাক ছেঁড়া

৬. চড়কে রামনাথ

৭. চড়কে হাসি

৮. চক্ষু চড়কগাছ

৯. কাঁধে কলসী চড়ক পাক

গিন্নী হবার বড় জাঁক

১০. চড়কের ঢাকে কাঠি পড়লে

সন্ন্যাসীর পিঠ চুলকোয়

১১. পেঁড়োয় যাওয়া চড়ক করতে

১২. মাছ খেল মেছো কুমীরে

চড়ক গাছের দোষ

১৩. মরা কাকের আবার চড়কে ভয়

কোন কোন প্রবাদের সৃষ্টিকর্তা কখনো বিখ্যাত লেখকও। যেমন—

১৪. এদিকে দুঃখের দায় মনে, ঝোলে ফাঁসি

বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি—ঈশ্বরগুপ্ত

১৫. 'কি ফল আছে মরা কাকে চড়কেতে তুলতে'—দাশু রায়। এই প্রবাদগুলি এখানকার মানুষের জীবনে নিত্য দিনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে।

গাজন ও চড়ক উৎসবের বিভিন্ন বিষয় ক্রমশ পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন—

বর্তমানে হাওড়ার বিশেষত উলুবেড়িয়ার কালীনগর, গুটি নাগোড়ি, বলরামপুর, সমরুক, পাঁচবেড়িয়া, বীরশিবপুর, রামচন্দ্রপুর, ময়নাপুর প্রভৃতি গ্রাম; আমতা, বাগনান, উদয়নারায়ণপুর, পাঁচলার বেশ কিছু গ্রামে; শ্যামপুরের চাঁপাবাড়, অনন্তপুর, রতনপুর ইত্যাদি গ্রামে সঙের গানের দল রয়েছে। এদের মধ্যে বাড়বেড়িয়া দেশবন্ধু ক্লাব, সমরুক পাইকেন পাড়া গোষ্ঠী, পাঁচবেড়িয়া সবুজ সংঘ, বীরশিবপুর বালক বালিকা সম্প্রদায়, বাড়বাড়িয়া নিউ সেবা সংঘ, গুটি নাগোড়ি সুন্দলপুর বিদ্রোহী সংঘ, সমরুক যুগের যাত্রী প্রভৃতি সংস্থা পেশাদারি সঙ হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে।[৮৬]

০৮.০৪.২০১১-তে 'আজকাল' পত্রিকায় 'গাজনের সঙ সেজেই তৃপ্তি বিনোদদের' শীর্ষক সংবাদটির মাধ্যমে পেশাগতভাবে যারা সঙকে ব্যবহার করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। সংবাদটিতে বলা হয়েছে—

> "চৈত্র মাসের শেষের কটা দিনের জন্য চৈত্রের এই সময় গজনের সঙ বের হতে দেখা যায় এখনও। প্রায় হারিয়ে যেতে বসা এই কৃষ্টিকে এখনও কোনও রকমে ধরে রেখেছেন তাঁদের মতো কিছু মানুষ। এ বছরও বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ি ছেড়ে দূরদূরান্তের গ্রামে। কখনো মাঠে-সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন বিনোদ দাস ও তাঁর সম্প্রদায়। হাটে, আবার কখনো ট্রেনের ভেতরেও ছোট পালা তুলে ধরছেন। পাঁচজনের এই দলে রয়েছে ছোট্ট 'শিব-পার্বতী'। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র পবন দাস সেজেছে শিব। আর তার এক বছরের ছোট বোন শিউলি সেজেছে পার্বতী। দলের প্রধান বিনোদ দাস জানান, 'সারাবছর জমিতে কাজ করি। আর অপেক্ষা করি চৈত্র মাসের জন্য। ফাল্গুন ছাড়িয়ে চৈত্র পড়তেই বাক্সে তুলে রাখা হারমোনিয়াম, ঢোল, পোশাক বের করে প্রস্তুতি শুরু করে দিই।' নিজেদের গ্রাম ছেড়ে এক একদিন এক একদিকে চলে যান তাঁরা। দিনান্তে ৪০০-৫০০ টাকা রোজগার হয়। নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নেন হাসিমুখে। আসলে শুধু টাকা রোজগার নয়, বাংলার কৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে তুলে ধরতে পেরে যে মানসিক তৃপ্তি পান, সেটাই বড় পাওনা তাঁদের কাছে।"

গাজন উৎসবের পিঠফোঁড় বিষয়টিও পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। পিঠফোঁড়েরা শিবের গাজনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এরা সন্ন্যাসীদের মতো রীতি-নীতি পালন করে না। চড়ক গাছ থেকে নেমে অনেকেই মাংস ভক্ষণ করে। এরা সন্ন্যাস নেয় না। তাই এদের সন্ন্যাসী বলা না গেলেও 'ভক্ত্যা' বলা যায়।

বছরের পর বছর ধরে চড়ক উৎসবে চড়ক গাছে উঠে ঘোরা, বঁড়শি দিয়ে পিট ফোঁড়ানো—এগুলি করে চলেন। কেউ কেউ চৈত্রমাসে একই দিনে দু বার পিঠ ফোঁড়েন। আবার কেউ কেউ তারপরেও বৈশাখ মাসে অর্থাৎ বছরে মোট তিনবার পিঠ ফোঁড়েন। এর বিনিময়ে তাদের প্রাপ্তি হয় নতুন গামছা, বস্ত্র, পেটভরা খাবার এবং সামান্য কিছু অর্থ। লোহার তৈরি সূঁচ দিয়ে পিঠফোঁড়েরা পিঠে গেঁথে দেন। একে 'কালবুথ' বলে। বঁড়শির মতো করে পিঠের চামড়ায় এটি আটকানো হয়। এর যন্ত্রণাও অসহ্য। তাই পিঠ ফোঁড়ার যন্ত্রণা ভুলতে এরা আকণ্ঠ মদ্যপান করেন। যার নেশার ঘোরে আত্মনিগ্রহের ঐ যন্ত্রণা উপলব্ধি কম হতে পারে। নেশা কেটে গেলেও পরবর্তী তিন-চারদিন অবধি অসহ্য যন্ত্রণার রেশ থাকে। তখন শুকনো খাবার, ফল ইত্যাদি আহার করেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। পেশাগতভাবে এরা দুলে। এছাড়া মাছ ধরা, কুলো ধামা তৈরি করা এবং পূর্বে পালকি বহনের কাজও এরা করত। নিজস্ব জমির অভাবে অধিকাংশই অন্যের জমিতে পরিশ্রম করে সংসার চালাতে পারে। কিন্তু তবুও 'পিঠফোঁড়া'র কাজ মানুষের মনোরঞ্জনের দাবীতে তাদেরা করতেই হয় তাই অনেক সময় প্রয়োজন না থাকলেও জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য এটি তারা ছাড়তে পারে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের হারমা, গোবর্ধনপুর নিবাসী ৭০ বছর বয়সী মুক্তা মালি এরা 'পিঠ ফোঁড়' হিসেবেই পরিচিত। এদের মতো পিঠফোঁড়েরা গ্রামবাংলায় এখনও চৈত্র সংক্রান্তি র গাজন মেলায় নিজেদের শারীরিক কষ্টের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে চলেছে। বংশ পরম্পরায় 'পিঠফোঁড়' বিষয়টিকেই এরা পেশা হিসাবে গ্রহণ করে এসেছে। পিঠফোঁড় বিষয়টি এতটাই বীভৎস ও বিপজ্জনক যে দুর্ঘটনা ঘটে প্রায়ই। মৃত্যুও ঘটে মাঝেমধ্যে। চড়ক গাছে ঘোরার সময় দুর্ঘটনায় কোনো ভক্ত্যার মৃত্যু হলে মন্দিরের 'ষোড়োসন্ন্যাসী'রা অশৌচ পালন করে এবং উত্তরীয় খোলে না। পশ্চিম মেদিনীপুরের কুমারপুর গ্রামের গাজন মেলাতেই পিঠফোঁড়া খেলা দেখাতে গিয়ে মৃত্যু ঘটেছিল হরিপদ দাসের।

সময়ের সাথে সাথে গাজনপালা পরিবেশন বিষয়টিও একটি পেশায় রুপান্তরিত হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিশেষত সুন্দরবনাঞ্চল গরিব মানুষের দেশ। অধিকাংশ মানুষই এখানে শ্রমজীবী। কৃষিকাজ এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা। পরিবারগুলোর দিনযাপনও অত্যন্ত সাদামাটা। মনোরঞ্জনের জন্য অর্থব্যয় তাদের কাছে বিলাসিতার তুল্য। তবুও কখনো কখনো গতানুগতিক জীবনের মধ্যেও প্রয়োজন হয় মনোরঞ্জনের তাই লোকনাট্যরূপ গাজনপালা তাদের সেই সাধপূরণ করে। পূর্বে গ্রামের মানুষজনকে নিয়ে তৈরি হত দল। তাদের মধ্যে থেকেই হতেন বাদ্যকার থেকে অভিনেতা। দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় হত মহড়া। চৈত্র মাসে অনুষ্টিত হত এই গাজনপালা।

দিনবদলের সাথে সাথে পরিবর্তন আসে। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয় ছোট ছোট গাজন সংস্থা। ক্রমে তৈরি হয় পেশাদারি গাজনদল ও গদিঘর। কাকদ্বীপ, কামারহাট, কুলতলি, রামগঙ্গা, ঘটুগঞ্জ, জয়নগর, ঘটিহারানিয়া প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর পেশাদারি গাজনদল গড়ে উঠেছে। এরা নিজেদের গ্রামে তো বটেই আশে পাশের গ্রামেও এমনকি নিজের জেলা ছেড়ে অন্য জেলাতেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিনয় করে। দলগুলিতে থাকেন কলাকুশলী, বাদ্যকার, আলো ও শব্দ নিয়ন্ত্রক,

দলমালিক, রাঁধুনিসহ গাড়িচালকও। বর্তমানে রয়েছেন পেশাদার পালাকার। এনারা কেউ অন্য পেশার পাশাপাশি সখে এটিকেও পেশা রূপে গ্রহণ করেছেন আবার কেউ সম্পূর্ণরূপে এটিকেই পেশা রূপে গ্রহণ করেছেন। গাজনপালায় গানগুলির রচনা ও সুর এরাই করেন। দলগুলি এদের কাছ থেকে পালা ক্রয় করেন। একটি পালা একটি দলই ক্রয় করতে পারে। দলগুলি প্রতিবছর আলাদা আলাদা পালা ক্রয় ও অভিনয় করেন এবং ইচ্ছামত পালাকারের কাছ থেকে পছন্দ মতো পালা ক্রয় করেন। পেশাদারি দলগুলি পেশাদারি শিক্ষক বা নির্দেশকের দ্বারা অভিনয় রপ্ত করেন। এরা হলেন 'গাজন মাষ্টার'। কেবলমাত্র অভিনয়ই নয়, বিশেষ করে নারী চরিত্রে অভিনয়, নাচের ভঙ্গীমা, দাঁড়ানোর ধরন, কথা বলার ধরন এসবই এখন প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও রয়েছে প্রচার ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপন, প্রচার, ব্যানার, লিফলেট এসবের জন্য বিশেষ সাজসজ্জা, ছবি তোলা প্রভৃতি কাজেও কিছু পেশাদারি মানুষের প্রয়োজন হয়। সুতরাং বর্তমানে পেশাদারি গাজনপালা দল করে হয়ে উঠেছে বহু মানুষের রুজি রোজগারের মাধ্যম।

দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে বিশেষত শিব-পার্বতীকেন্দ্রিক বা কোন পৌরাণিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে গাজনপালা রচিত হওয়ায় এর একদিকে রয়েছে ধর্মভাবনা অন্য দিকে রয়েছে বিনোদন। এছাড়া সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম মাধ্যমও বটে আবার জনমানস গঠনের পাশাপাশি হয় গ্রামোন্নয়নের কাজও। গ্রামের মানুষগুলি অনেক সময় গাজনপালা অনুষ্ঠান করে সেই অর্থ দিয়ে গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও নানান উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। এছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা গঠন ও নীতিমূলক শিক্ষাদান করা হয় এই পালার মাধ্যমে। অনেক সময়েই দলাদলি-ঝগড়া-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-মারামারি-হিংসা-ঈর্ষা প্রভৃতি গ্রাম সমাজকে জীর্ণ করে তোলে। তার সাথে যোগ হয় রাজনৈতিক দলাদলি ফলে গ্রামজীবনের শান্ত নিরুদ্বেগ পরিবেশের সুস্থিতি বিনষ্ট হয়। গ্রামের মানুষদের মধ্যে সেই বিবাদ-বিসংবাদ-দলাদলি-হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে আবার একসাথে মিলিত উৎসব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরীতেও যেমন গাজনের অবদান রয়েছে তেমনি গ্রাম সমাজ গঠন ও উন্নয়নেও তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. প্রদ্যুৎ সরকার, "দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোকসমাজে শিবের গাজন", *সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা*, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা (২য় খণ্ড) (২০১২ জুলাই- ডিসেম্বর): ৩৮২

২. প্রচ্ছদ পরিচিতি, "শিবের বিয়ে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা- ৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ন

৩. প্রচ্ছদ পরিচিতি, "শিবের বিয়ে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা- ৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ঞ

৪. প্রচ্ছদ পরিচিতি, "শিবের বিয়ে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা- ৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ঝ

৫. প্রচ্ছদ পরিচিতি, "শিবের বিয়ে", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা- ৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ড

৬. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, "গাজন নিয়ে দু-এক কথা", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৪৫

৭. ভাস্করব্রত পতি, "গাজন চড়কঃ বাংলার জনপ্রিয় লোক উৎসব", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ২৫

৮. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, "গাজন নিয়ে দু-এক কথা", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৪৫

৯. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা- ৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ৩০৩

১০. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ৩০৭

১১. "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষাঃ শব্দসংগ্রহ", *গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা,* ২য় সংখ্যা (৯ম বর্ষ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, ফাল্গুন-১৩৯৭): ২১

১২. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ৩০২

১৩. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, "গাজন নিয়ে দু-এক কথা", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৪৫

১৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস* (কলকাতা- ৭৩: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২), ৫৮৩

১৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালী জীবনের ছবিঃ বাঙ্গালীর সংস্কৃতি,* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, মে, ২০০৩), ৫১-৫২

১৬. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *শৈব ধর্ম', 'ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট,* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯), ১৪৬

১৭. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, ১৯ বর্ষ, সংখ্যা- ৩ (২০০৭): ৩০৬

১৮. রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* (কলকাতা: কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯), ৩০-৩২

১৯. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *হিন্দু আচার অনুষ্ঠান* (কলকাতা: প্যাপিরাস, পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০১), ১২০-১২১

২০. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, "গাজন নিয়ে দু-এক কথা", পুণ্যিপুকুর, ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৪৫। নিম্নশ্রেণির বিশেষত ডোম, বাগদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষজনেরাই ছিল এই পূজার পূজারী।

২১. বুদ্ধদেব রায়, "গাজন উৎসব ও গান", *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৮১): ৭৬

২২. ডেভিড হার্ডিম্যান, *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১২), ১০২

২৩. সঞ্জয় ঘোষ, "গাজন- বাংলার লোকসংস্কৃতি", *গ্রামোন্নয়ন কথা,* ৩য় সংখ্যা (৩য় বর্ষ, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৩): ৩২

২৪. তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, *বহুরূপে দেবতা তুমি* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, মে, ১৯৯৪), ২০৩

২৫. স্বর্ণাভ বালা, "গাজন ও চড়ক প্রসঙ্গে কিছু কথা", *লৌকিক,* ২য় সংখ্যা (১ম বর্ষ, মাঘ ১৪১২, ২০০৬): ১২৩

২৬. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "আমাদের চড়ক", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৯

২৭. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩ (১৯ বর্ষ,২০০৭): ৩০৪। উগ্রতর সাধনার সাথে আত্মনিগ্রহের সাদৃশ্য পাওয়া যায় যা চড়ক উৎসবের মূলমন্ত্র।

২৮. ঐ

২৯. ভবানী প্রসাদ মজুমদার, "ঢাকের গাজন- কবিতা", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৪

৩০. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা- ৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ৩০৭

৩১. প্রফুল্ল সামন্ত, "সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি", *গ্রামোন্নয়ন কথা,* ৩য় সংখ্যা (৩য় বর্ষ, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৩): ৬

৩২. শিবশংকর ভারতী, *সেকালের পুজোপার্বণ মেলা উৎসব* (কলকাতা: সাহিত্যম, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫), ১৪৭

৩৩. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী, ২য় খণ্ড, (কলকাতা), ৫৪৮-৫৫৬

৩৪. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "আমাদের চড়ক", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৭

৩৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নকশা (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ, ১৪২১), ১-১১

৩৬. সংবাদপত্রে সেকালের মেলা ও উৎসব-জানুয়ারি, কলকাতা পুস্তকমেলা সংখ্যা (২০১০): ২৫

৩৭. সংবাদপত্রে সেকালের মেলা ও উৎসব-জানুয়ারি, কলকাতা পুস্তকমেলা সংখ্যা (২০১০): ২৬

৩৮. আজকাল, ২৩/এপ্রিল/১৯৯৫। 'কাঁটাবান' প্রথায় ১০৮টি সরু লোহার ছাতার শিক দিয়ে সন্ন্যাসীদের সারা শরীরে বিদ্ধ করা হয়।

৩৯. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ৩০৬

৪০. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "আমাদের চড়ক", পুণ্যিপুকুর, ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৯

৪১. অমরেন্দ্রনাথ রায়, *বাঙালীর পূজা-পার্বণ* (কলকাতা: ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), ৮৭-৯০

৪২. "বাঙলার লোকজীবনে সঙের প্রভাব", *শব্দ শাব্দিক,* লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, ৪র্থ সংখ্যা (১০ম বর্ষ, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৯২): ১৫৮। নির্বাক সঙ- কেবলমাত্র সাজসজ্জাযুক্ত, নাচ, গান, সংলাপ বিহীন। সবাক সঙ- সাজসজ্জার সাথে নাচ, গান থাকে। কখনো সংলাপ সমৃদ্ধ অভিনয় হয়।

৪৩. বুদ্ধদেব রায়, "গাজন উৎসব ও গান", *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৮১): ৭৫

৪৪. ঐ

৪৫. "সুন্দরবনের সঙ ও গাজন", *গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা,* ১১শ সংখ্যা (৩য় বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৯২, নভেম্বর ১৯৮৫): ৪৮

৪৬. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা- ৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ৩০৬

৪৭. দীপঙ্কর দাস, "গাজনের অনুষঙ্গে নানা তামাশা, জটিল আচার", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ১৪

৪৮. "সুন্দরবনের সঙ ও গাজন", *গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা,* ১১শ সংখ্যা (৩য় বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৯২, নভেম্বর ১৯৮৫): ৪৮

৪৯. দীপঙ্কর দাস, "গাজনের অনুষঙ্গে নানা তামাশা, জটিল আচার", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ১৪ । গাঁ + জন = গাজন।

৫০. ভাস্করব্রত পতি, "গাজন চড়কঃ বাংলার জনপ্রিয় লোক উৎসব", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ২৭

৫১. বুদ্ধদেব রায়, "গাজন উতসব ও গান", *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৮১): ৭৫

৫২. "বাঙলার লোকজীবনে সঙের প্রভাব", *শব্দ শাব্দিক,* লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, ৪র্থ সংখ্যা (১০ম বর্ষ,পৌষ-ফাল্গুন ১৩৯২): ১৫৯

৫৩. "সুন্দরবনের সঙ ও গাজন", *গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা,* ১১শ সংখ্যা (৩য় বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৯২, নভেম্বর ১৯৮৫): ৪৮

৫৪. আনন্দ নাথ রায়, দীনবন্ধু রায়চৌধুরী ও সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, *ফরিদপুরের ইতিহাস* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ২০০৬), ৪৭১-৪৭২

৫৫. ভাস্করব্রত পতি, "গাজন চড়কঃ বাংলার জনপ্রিয় লোক উৎসব", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ২৭। 'হাকুন্দপড়া' বিষয়টি বর্তমানে শিবের গাজনে দেখা গেলেও এটি মূলত ধর্মগাজনের রীতি।

৫৬. ভাস্করব্রত পতি, "গাজন চড়কঃ বাংলার জনপ্রিয় লোক উৎসব", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ২৬

৫৭. সনৎ কুমার মিত্র, "শিবের চড়ক-গাজন", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা,* বাংলার শিব ও সংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-৩ (১৯ বর্ষ, ২০০৭): ৩০৩। কালার্ক পূজা অর্থাৎ কাল সদৃশ ভীষণ অর্ক বা রুদ্রের পুজো।

৫৮. স্বর্ণাভ বালা, "গাজন ও চড়ক প্রসঙ্গে কিছু কথা", *লৌকিক,* ২য় সংখ্যা (১ম বর্ষ, মাঘ ১৪১২, ২০০৬): ১১৭

৫৯. বাণী দাস, "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ধর্ম্পূজা, পূজারী ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট", *ধৃতি,* লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, ৪র্থ সংকলন (পৌষ-মাঘ ১৪০৪, জানুয়ারি ১৯৯৮): ২১

৬০. সঞ্জয় ঘোষ, "গাজন- বাংলার লোকসংস্কৃতি", *গ্রামোন্নয়ন কথা,* ৩য় সংখ্যা (৩য় বর্ষ, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৩): ২৮

৬১. বুদ্ধদেব রায়, "গাজন উতসব ও গান", *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৮১): ৭৮

৬২. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, "গাজন নিয়ে দু-এক কথা", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ৪৫

৬৩. ঐ

৬৪. "ধর্মগাজন থেকে শিবগাজন", *নকশিকাঁথা,* ১ম সংখ্যা (১ম বর্ষ, ১ম এপ্রিল-৩০ জুন, ২০০৮): ১৮

৬৫. মন্টু দাস, "বাঁকুড়া সংস্কৃতির আদি উপাদান ধর্মঠাকুর", *সুচেতনা,* শারদ সংকলন (সাতাশ বর্ষ, ১৩৮৬) পৃ. ৮

৬৬. "ধর্মকথা", *দামুন্দা কপিশা শিলাবতী,* ২য় সংস্করণ (বাংলা নববর্ষ, ১৪০৯, ১৫ই এপ্রিল, ২০০২): ৩৩

৬৭. বাণী দাস, "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ধর্ম্পূজা, পূজারী ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট", *ধৃতি,* লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, ৪র্থ সংকলন (পৌষ-মাঘ ১৪০৪, জানুয়ারি ১৯৯৮): ১৮

৬৮. বুদ্ধদেব রায়, "গাজন উতসব ও গান", *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৮১): ৭৫

৬৯. "ধর্মকথা", *দামুন্দা কপিশা শিলাবতী,* ২য় সংস্করণ (বাংলা নববর্ষ, ১৪০৯, ১৫ই এপ্রিল, ২০০২): ৩২

৭০. ঐ

৭১. "ধর্মকথা", *দামুন্দা কপিশা শিলাবতী,* ২য় সংস্করণ (বাংলা নববর্ষ, ১৪০৯, ১৫ই এপ্রিল, ২০০২): ৩৩

৭২. ঐ

৭৩. ঐ

৭৪. "ধর্মকথা", *দামুন্দা কপিশা শিলাবতী,* ২য় সংস্করণ (বাংলা নববর্ষ, ১৪০৯, ১৫ই এপ্রিল, ২০০২): ৩৪

৭৫. "বঙ্গ ইতিহাসের অনুসঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর প্রসঙ্গ", *গ্রামীণপুঁথি,* প্রাচীন ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, শারদ সংখ্যা, (৩৪ তম বর্ষ): ১০০

৭৬. "ধর্মগাজন", *নকশিকাঁথা,* ১ম সংখ্যা (১ম বর্ষ, ১ম এপ্রিল-৩০ জুন, ২০০৮): ১৫

৭৭. ঐ

৭৮. ঐ

৭৯. *দামুন্দা কপিশা শিলাবতী*-শক্তি সেনগুপ্ত, ২য় সংস্করণ, বাংলা নববর্ষ, ১৪০৯, ১৫ই এপ্রিল, ২০০২, অন্তরাল বি জি-১১৮, বিধান নগর, কলকাতা-৭০০০৯১, পৃ. ৩২

৮০. "রাঢ বাংলার ধর্মরাজের গাজন", *নকশিকাঁথা,* ১ম সংখ্যা (১ম বর্ষ, ১ম এপ্রিল-৩০ জুন, ২০০৮): ১৪

৮১. "চব্বিশ পরগনার পুতুল ও লৌকিক দেবদেবী", ২৪ পরগনার লোকসংস্কৃতি, প্রথম ভাগ

৮২. ঐ

৮৩. প্রদ্যোত কুমার মাইতি, "গাজন নিয়ে দু-এক কথা", *পুণ্যিপুকুর,* ১ম সংখ্যা, চড়ক ও গাজন সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ২য় বর্ষ, ১৪১৯): ১৮

৮৪. সাক্ষাৎকারঃ লক্ষীকান্ত শিকারীর (৪৫),লক্ষীকান্তপুরের কেশবেশ্বর মন্দির সংলগ্ন অঞ্চল, ১২.০৪.১৭, দুপুর ৩টে নাগাদ।

৮৫. ঐ

৮৬. "অবহেলিত সঙের গান", *গ্রামীণপুঁথি,* ১ম সংখ্যা, শারদ সংখ্যা (১৫ বর্ষ, ১৪০৩, ১৯৯৬): ১১

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা লোকনাট্য ও গাজনপালা: বিষয় বৈচিত্র্য ও কালান্তর

৩.১ বাংলা লোকনাট্য ও গাজন

'লোকনাট্য' শব্দটি লোক প্রচলিত বা লোক সমাজ দ্বারা উদ্ভুত নয় 'লোক' এবং 'নাট্য' দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'লোকনাট্য' শব্দটির উৎপত্তি। 'লোক' বলতে গ্রামাঞ্চলের সেই দরিদ্র কৃষিজীবী শ্রমজীবী সাধাসিধে মানুষগুলোকে বোঝায় যাদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে ও ঐতিহ্যানুসারে দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি সমভাবে যুগ যুগ ধরে বজায় রয়েছে। বিশিষ্ট নাট্যকার শম্ভু মিত্র এ সম্পর্কে বলেছেন—

> "...নাটক আর অভিনয়ের যুগ্ম মিলন হলে পরেই তবে সেটাকে নাট্যকলা বলা হয়।"[১]

এ প্রসঙ্গে নাটকের কথা আসে। নাটক সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেছেন—

> "....রঙ্গভূমিতে অভিনয় দ্বারা যে কার্যের প্রদর্শন হইয়া থাকে, তাহাকে নাটক কহে।"[২]

আর লোকনাট্য সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাট্যধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।"[৩]

তবে পরিশীলিত জগতের সাথে সাথে লোকনাট্যও লিখিত আকার নিয়েছে।

লোকনাট্যের সাথে মিশে আছে আঞ্চলিক নৃত্য-গীত এবং অভিনয়। এ প্রসঙ্গে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন—

> "...যা আসরে নৃত্য-গীতের মধ্য দিয়ে অভিনীত হয় তাই লোকনাট্য।"[৪]

লোকনাট্যগুলি যেহেতু গ্রামের মানুষের দ্বারা, তাদেরই জীবনকেন্দ্রিক ঘটনাকে সম্বল করে তৈরি হয় তাই গ্রামের মানুষগুলির অন্ধ বিশ্বাস, মিথ, রিচ্যুয়াল এর মধ্যে মিশে থাকে। নির্মলেন্দু ভৌমিক এ প্রসঙ্গে নির্দেশ করেছেন—

> "কোনো লোকগোষ্ঠীর সংহতি জ্ঞাপক, Myth, Ritual জীবনচর্চার সকলদিক যখন তাদের অভিনয় ও সংলাপে প্রতিফলিত হয়, তখন তা লোকনাট্য হয়।"[৫]

সুতরাং বিশিষ্টজনের মতামত থেকে লোকনাট্যের যে সংজ্ঞা আমরা পাই তা মোটামুটি এরকম—গ্রামীণ লোকসমাজ দ্বারা লোকভাষায় সহজ, সরল ভাবে মুখে মুখে প্রচারিত বা লিখিত এবং গ্রামীণ শ্রমজীবী দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষগুলি দ্বারা সেগুলি অভিনীত হয়ে গ্রামের মানুষগুলির সামনেই নৃত্য-গীত-বাদ্য সহযোগে পরিবেশিত হয়। যার চরিত্র সংখ্যা স্বল্প, বিষয় পৌরাণিক বা মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জীবনের ঘটনা। তার মধ্যে কখনো মিশে থাকে লোকশিক্ষা। সেই শিল্পকলা যা গ্রামীণ লোকজীবন ও লোকমননকে প্রভাবিত করে তাকেই 'লোকনাট্য' বলে।

বাংলায় লোকনাট্যের উদ্ভব

'লোক' অর্থাৎ মানুষ আর 'নাট্য' অর্থাৎ নাটক। তাই 'লোকনাট্য' বিষয়টির দুটি মূল উপাদান হল—'মানুষ' এবং 'নাটক'। গ্রাম্যসমাজে যে নাট্যধর্মী রচনাগুলি মানুষের জীবনের কথা বলে তাই হল লোকনাট্য। অনেক সময় এগুলি লেখা না হয়ে কেবলমাত্র মুখে মুখেই রচিত ও প্রচারিত হয়। যে কোনো সাহিত্যের একটা ইতিহাস থাকে। তেমনি বাংলা নাটকের ইতিহাস শুরু হয় আনুমানিক ঊনিশ শতক থেকে। এই বাংলা নাটকগুলির ভাবনা ছিল ইউরোপীয় ধাঁচের। বাংলায় অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডির সাথে চরিত্রাভিনয় আমরা দেখতে পাই ঊনিশ শতক থেকেই। পরিবেশনার দিকে চোখ রাখলে দেখতে পারি ইউরোপীয় ধাঁচ থেকে নাটকের ভাবনা সরে যায় তাই সেই অর্থে বলা যায় বাংলা নাটকের শুরু ঊনিশ শতক থেকে বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের শুরু থেকে। আসলে বাংলা ভাষার প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত, যার উপভাষাগুলোর অপভ্রংশের মধ্যে অন্যতম হল মাগধী ও পূর্ব মাগধী। তার থেকে জাত ভাষাগুলো হল—অহমিয়া, ওড়িয়া, বাংলা, মণিপুরী প্রভৃতি। যে কোনো ভাষার মধ্যে তার উৎস ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সেদিক থেকে বাংলা ভাষার সংস্কৃতিচর্চার জগৎ হল সংস্কৃত ভাষা।

চর্যাপদ থেকে শুরু করলে *'বুদ্ধ-নাটক'* উল্লেখ করা প্রয়োজন। *'বুদ্ধ-নাটক'* থেকেই বাংলা নাটকের সূচনা ধরা হয়। কারণ এই নামটিতে 'নাটক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃত অভিধানে 'নাটক' শব্দটা ছিল। রূপকের শব্দটিই হল 'নাটক'। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা 'নাটক' বিষয়টি ইউরোপীয় থিয়েটার থেকে পাইনি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থ *চর্যাপদেই* নাটকের উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া আর্যাসপ্তসতী ছন্দে লেখা *'আর্যাসপ্তসতী'*। একে যদি প্রাকৃতে লেখা হত তাহলে গাঁথা বলা যেত। 'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'-র আঙ্গিকের দিকে নজর রাখলে দেখা যায় *'গীতগোবিন্দে'* যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান রয়েছে তবে নাটক অভিনয়ের কথা সেখানে নেই। তুলনামূলকভাবে জয়দেব বড়ু চন্ডীদাসের সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বিশেষত রসশাস্ত্রে বেশ দখল ছিল। জয়দেবের *'গীতগোবিন্দ'* অপভ্রংশে লেখা আর বড়ু তার *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'* লিখেছেন সাধারণ কথ্য ভাষায়। এতে প্রায় সাতটি রূপক পাওয়া যায় বেশ কিছু জায়গা চরিত্রধর্মী এবং চরিত্রগুলি সংলাপধর্মী। এ বিষয়ে বিমলেন্দু হালদার মন্তব্য করেছেন-

> "মধ্যযুগীয় বাঙালীর নাট্যমনস্কতায় আভাষ মেলে *'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'* কাব্যে। সেটি যথেষ্ট নাট্যগুণ সমৃদ্ধ হলেও ত অভিনীত হত কিনা সে বিষয়ে জানা যায়নি"।[৬]

তবে কাব্যগুণে *গীতগোবিন্দ* এগিয়ে থাকতে পারে। দুটি ক্ষেত্রেই ভাগবৎ থেকে মূল পৌরাণিক উপাদান ও প্রচলিত লৌকিক উপাদান নিয়ে এগুলো রচিত হয়েছে। এ দুটিই ছিল শ্রব্য কাব্য। সংস্কৃত রস সম্মত যা কিছু তা সবই হল কাব্য।

আরেক জনের কথা এ সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার তিনি হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই একাধিকবার কৃষ্ণলীলা কাহিনি অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন। নগরসংকীর্ত্তনের

জন্য শ্রীচৈতন্যদেব নগরযাত্রা করেন।[৭] একে বলা হত 'চৈতন্যযাত্রা'। 'চৈতন্যযাত্রা'-কে বলা হয় গ্রামীণ যাত্রা। একে অনেকে নাটক বলেছেন যদিও কিছু কিছু মানুষ এতে আপত্তি তোলেন। পরে এর থেকে 'চৈতন্য' শব্দটি বাদ হয়ে যায় কেবল 'যাত্রা' বা 'গমন' অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। দেববিগ্রহ নিয়ে বা দেবতার উদ্দেশ্যে তার ভক্তদলের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শোভাযাত্রাই হল 'যাত্রা'। পরবর্তীকালে যাত্রার সাথে 'পালা' বিষয়টি যোগ হয়। 'পালা' শব্দটি পর্ব বা পর্যায় অর্থে ব্যবহার হয়। পালা শব্দটির অর্থ হল অংশ অর্থাৎ দীর্ঘ কোন কিছুর অংশ হল পালা। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'পালাপার্বণ' থেকে সংক্ষেপে পালা শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। পালাপার্বণ হল কোনো পূজা বা উৎসব উপলক্ষ্যে হওয়া নৃত্য-গীত-অভিনয়। বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদ নির্ভর আখ্যান হল 'কীর্ত্তন'। যথা—লীলাকীর্ত্তন, বৈষ্ণবদের কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হল পালাকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন, নামসংকীর্ত্তন। পালাকীর্ত্তন, নামসংকীর্ত্তন এবং একমাত্র পরিবেশনার সাথে যুক্ত হল লীলাকীর্ত্তন। লীলাকীর্ত্তনের মধ্যেই নয়টি রস এবং নাট্যশাস্ত্রের সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটা শুরু করেন শ্রীচৈতন্যদেব এবং তার শিষ্যরা। পরবর্তীকালের শিষ্যরা আজও তা বহন করে চলেছেন। যদিও এটা মুখে মুখে প্রচারিত এবং একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে তবুও একে নাটক বলা যায় না।

মধ্যযগীয় বাংলা সাহিত্যের আরেকটি বিষয় পাওয়া যায় তা হল নাটমন্দির প্রাঙ্গণে যে নাট্যগীত এর প্রচলন ছিল তা নাটগীত এর অন্তর্ভুক্ত। 'কথকতা'গুলো পরবর্তীকালে কিছু লিখিত হওয়ায় তার লিখিত নজির পাওয়া যায়। এগুলোকে নৃত্য ও গীত এর দিক থেকে কিছু আলাদা করা যায়। আর বাচিক বা সংলাপধর্মী হলে কিছু আলাদা করা যায়। যেহেতু 'কথকতা'র মধ্যে শরীরধর্মীতা নেই তাই এটা নাট্যধর্মী নয়।

'পাঁচালি' হিসেবে যেগুলোকে চিহ্নিত করা যায় তা দৃশ্য কাব্য নয় শ্রব্য কাব্য। কেউ কেউ মনে করেন বাংলা লোকনাট্যের উদ্ভব হয়েছে পাঁচালি থেকে। পাঁচালির দুটি প্রধান উপাদান হল—ছড়া ও গান। অনুমান করা হয় যে, ছড়া অংশটিই হয়ত পরবর্তীকালে সংলাপে পরিণত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে অন্তত তিন ধরনের রূপক থাকে। মূল অভিনেতা বা নট থাকেন আর তাকে সাহায্য করার জন্য থাকে দল বা দোহার। বাকিরূপগুলো হল চরিত্রাভিনয় অর্থাৎ যত লোক থাকবে তারা চরিত্র পিছু অভিনেতা। প্রথমদিকে পাঁচালির গায়েন ছিলেন একজন, তার সঙ্গে থাকতো দোহার সেই সাথে বাদ্যকার ও হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, ও নানান বাদ্য।

মধ্যযুগে ধর্মান্তরিতকরণ হওয়ার সময়ে বৈষ্ণব ঘরানাও একধরনের ঈশ্বর বিশ্বাসী ধারণা ও রুচিতে পরিণত হয়। পদাবলী, পাঁচালি যেমন সবার জন্য তেমনি আরেক ধরনের পরিবেশনা যা ধর্ম, বর্ণ ও রুচিতে সবার কাছে পৌঁছায় তা হল মঙ্গলগীতি। কিন্তু যতক্ষণ না সেটি লেখা হয়েছে সংস্কৃত ধারণা অনুযায়ী এই কাব্য ছিল মূলত শ্রব্যকাব্য। পরবর্তীকালে এগুলো লেখা হয়। পাঁচালিকেও সে অর্থে কাব্য বলা যায়। পাঁচালিগুলো একেবারেই সাধারণ মানুষের জন্য। 'লীলাকীর্তন' দ্বারা পাঁচালিগুলো প্রভাবিত হয়েছে। 'লীলাকীর্তন' এতই জনপ্রিয় ছিল যে পাঁচালির আঙ্গিককে গ্রহণ করে

উপাদানগুলোকে তার সাথে যোগ করে দেয়। যা 'গীতিকা' হিসেবে পরিচিত হয়। এটাকে ধর্মীয় বলা যায় না কারণ এতে নরনারীর প্রেম-প্রণয় মুখ্য হয়ে ওঠে। এর আঙ্গিকের মধ্যে পাঁচালি ও লীলাকীর্ত্তন এর অনুকরণ করে তার সাথে উপাদানগুলো যোগ করা হয়।

> "মধ্যযুগে বাঙালীর যাবতীয় জীবনে যে সমষ্টিগত আবেগ উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তার প্রকাশ ঘটেছিল সে যুগের কাব্য কবিতাতে এবং অল্প পরিমাণে দুর্বল নাট্যঙ্কুরের প্রাণস্পন্দনে। তখনো হয়ত সচেতনভাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে নাট্যকলার যথার্থ অনুশীলন কিংবা প্রয়োগ ঘটেনি। কিন্তু সঙ, গাজন, পাঁচালি, তর্জা, পালাগান, কীর্তন, কবি, টপ্পা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই প্রভৃতির মধ্যদিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুতির একটা আভাস সূচিত হচ্ছিল।"[৮]

তুর্কি আক্রমণের ফলে বিপুল পরিমাণ ধর্মান্তরিত মানুষ সৃষ্টি হয়। ফলে আরবি ফারসী ভাষার সাথে বাংলা ভাষা মিশে নতুন এক ভাষা সাহিত্য তৈরি হয় তাকে 'কিস্‌সা' সাহিত্য' বলে।

জাতীয়তাবাদী চিন্তার ফলে থিয়েটার এর ক্ষেত্রেও লৌকিক ধারাবাহিক রীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে প্রচলিত যাত্রাকে সংস্কার করা হয়। নিম্নরুচি, আদিরসাত্মিক এবং নিম্নমানের বিষয় বৈশিষ্ট্য—এইগুলোকে চিহ্নিত করে যাত্রাকে পূর্ণ সংশোধন করা হয়। যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয় তা হল—

১) নতুন নতুন স্ক্রিপ্ট লেখা হয়।

২) মনোরঞ্জনমূলক পোশাক ও প্রসাধনের ব্যবহার।

৩) কাহিনির দৈর্ঘ্য কমিয়ে অঙ্ক শুরু হল।

৪) প্রায় সব ক্ষেত্রেই একটু চড়া বা উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হল। নব্য কলকাতা গড়ে ওঠার সাথে সাথে যেমন কবিগান তৈরি হয় তেমনি তৈরি হয় যাত্রা (চিৎপুর)। যাত্রা হল নব্য কলকাতার আধুনিক স্বতন্ত্র আঙ্গিক। চৈতন্যর সময় লীলাকীর্ত্তন যেভাবে হত, পাঁচালি ও গীতিকা যেভাবে হত তারই ধারাবাহিকতা এখানে দেখা যায়। মূলগায়ক সেখানে একজন, বাকিরা দোহার ও বাদ্যকার। ওলাবিবি, মনসার ভাসান প্রভৃতি গীতিনাট্যের মধ্যে এরকম লক্ষিত হয়। সুতরাং 'বুদ্ধনাটক' থেকে বর্তমানের যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা যে কোন পরিবেশনাকেই বাংলা নাটকের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। তবে রিচ্যুয়াল ও নাটকের সম্পর্ক সবক্ষেত্রে নেই। স্যেকুলার পারফরমেন্স এর ক্ষেত্রেই রিচুয়াল আর নাটকের পার্থক্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লীলাকীর্ত্তনগুলো রিচ্যুয়ালিস্টিক আর চৈতন্যধর্মীয়গুলোতে বিশেষ রিচ্যুয়াল থাকে না তবে কোনও লোকনাট্যের ক্ষেত্রে শুরুতে বা শেষে কিংবা মাঝে পালা তোলার মাধ্যমে রিচ্যুয়াল থাকে। যেমন—গাজন, আলকাপ, গম্ভীরা প্রভৃতি।

নাট্যকলা কোনো একটি বিশেষ শিল্পকলা নয়। এটি একাধিক শিল্পকলার সমষ্টি। নৃত্য, গীত, বাদ্য, সাহিত্য, সংলাপ, অভিনয়ের সংমিশ্রণ যার উদ্ভাবনা ও বিকাশের অন্তরালে লুকিয়ে আছে আদিম অধিবাসীদের জীবনচর্চার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আধারগুলি তাই লোকনাট্যের উদ্ভব প্রসঙ্গে আদিম

নাট্যকলা স্ফূরণের ভিন্ন দিকগুলি উল্লেখ আবশ্যক। আসলে এই দিকগুলির উপর ভিত্তি করেই নাট্যের মৌলিক উপাদানগুলি গড়ে উঠেছিল। সেদিন হয়ত পূর্ণাঙ্গরূপে নাটকের আবির্ভাব ঘটেনি কিন্তু মানুষের জীবন ও মননচর্চা নানা দিকের মধ্য দিয়ে ক্রমশ এই নাট্যকলা নৃত্য-গীত-অভিনয়-চরিত্র-সংলাপ মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লোকনাট্যরূপে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করেছে।

লোকনাট্য গ্রামীণ মানুষের কাছে বিনোদনের অন্যতম উপাদান। লোকনাট্যের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যথা— লোকনাট্য গ্রামীণ মানুষের জীবনের কথা বলে। গ্রামের মানুষের ভাষার মতো এর প্রয়োগও সহজ, সরল আঞ্চলিক ভাষাতেই হয়। এগুলি আঞ্চলিক পটভূমিতে গড়ে ওঠে এবং এর মধ্যে ঐতিহ্যের সন্ধান মেলে। এগুলি সাধারণত অলিখিত হয়। মৌলিক বা মৌখিক ভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এর প্রচলন হয় তবে বর্তমানে লিখিত আকারেও পাওয়া যায়। লোকনাট্যের মধ্যে নাচ, গান, সংলাপ থাকে। গানের আধিক্য যথেষ্ট। লোকনাট্যের চরিত্র সংখ্যা স্বল্প। লোকনাট্যের বিষয়গুলি সাধারণত ধর্মকেন্দ্রিক হয় তবে বর্তমানে সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিককে কেন্দ্র করে কাহিনি রচিত হয়। অনেক কাহিনি তে শিক্ষামূলক জনসচেতনা লক্ষ্য করা যায়। নারী চরিত্রগুলি সাধারণত পুরুষেরাই অভিনয় করে থাকেন। তারাই নারীর সাজসজ্জা অলঙ্কার পরে নারীকণ্ঠে ও অঙ্গ-ভঙ্গি করে চরিত্রগুলি দর্শক মনে ফুটিয়ে তোলেন। অধিকাংশ শিল্পীরাই হন গ্রামের মানুষ এবং গ্রামাঞ্চলেই এর জনপ্রিয়তা বেশি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন উৎসব পূজাকে কেন্দ্র করে মেলা, উৎসব প্রাঙ্গণ—এই সমস্ত জায়গায় লোকনাট্যের আসর বসে। লোকনাট্য পরিবেশিত হয় সাধারণত খোলা জায়গায়। যার চারিদিকে দর্শক ঘিরে বসতে পারে। লোকনাট্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল চড়ামাত্রা। অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের মাত্রা, আবেগপ্রবণতা সাজসজ্জা সব ক্ষেত্রেই এই চড়ামাত্রা লক্ষ্য করা যায়।

গাজন এর নাট্যাভিনয়

‘গাজন’ বিশেষ কোন লোকসংগীত নয়, এটি একটি লোকায়ত সংগীত। বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে এর সূচনা হলেও বর্তমানে এটি গ্রামীণ লোকনাটকে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কেবলমাত্র ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে গাজন বর্তমানে লোকগান ও লোকনাট্যে পরিণত হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গরিব মানুষের বাস। বিশেষত গ্রামাঞ্চলগুলিতে শ্রমজীবী মানুষের বাস। এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি ও লোকউৎসবের প্রধান অঙ্গ জুড়ে রয়েছে চৈত্রমাসের শিবের গাজন। এটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। শস্যদেবতা শিব এবং ধরিত্রী দেবী পার্বতীর বিবাহ মিলনে পুরাতন বছরের শেষ ও নতুন বছরের সূচনায় আগামী দিনগুলোর স্বাচ্ছন্দ্য, প্রচুর শস্যোৎপাদন ও সুস্থতার কামনার মধ্য দিয়ে আদিম ভারতবর্ষের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কারের ধারা বজায় রয়েছে এই গাজন উৎসবে। বর্ষশেষে আমন ধান ঘরে তোলার পর কৃষিপ্রধান

বাঙালি আজও মেতে ওঠেন গাজন উৎসবে, যার ধারক ও বাহক গ্রামের সাদাসিধে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষগুলি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দরিদ্র মানুষগুলির সাধ থাকলেও উচ্চমানের বিনোদন ব্যবস্থার সাধ্য নেই। বিনোদন তাদের কাছে বিলাসবস্তু। তবুও নিজেদের কাজের ফাঁকে অবসরে নিত্যদিনের একঘেয়েমি দূর করতে প্রচলিত ছিল ঠাকুর-দেবতা-ধর্মগুরু-স্বর্গ-নরক—এ জাতীয় ভাবনা চিন্তা সংস্কার। তারই প্রভাব রয়েছে শিব যাত্রা গাজনের মধ্যে। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে গাজনগান, নাচ, অভিনয় সহজ সরল সাদামাটা মানুষগুলোর কাছে হয়ে উঠেছে বিনোদনের বস্তু।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ বা লোকসংস্কৃতি হিসেবে গাজনগান বেশ প্রচলিত গ্রামীণ বিনোদন। এর একদিকে ধর্মীয় প্রভাব ও অন্যদিকে রয়েছে বিনোদন। পাশাপাশি বেশ আকর্ষণীয় রসাত্মক আবেদনও রয়েছে। নাচ-গান-কথপোকথনের মাধ্যমে এর একদিকে রয়েছে উৎসব অন্যদিকে কাহিনির রসাস্বাদন তাই গাজন কেবল পুজোৎসবের অনুষ্ঠান নয়, অভিনয় জগতেরও এক ধারা-এক বিশেষ লোকনাট্য।

গাজনের নায়ক নায়িকাসহ অন্যান্য চরিত্র, সহকর্মী, বাদ্যকার ও অন্যান্য কর্মী সমস্ত সদস্যগণ সাধারণত হন গ্রামের প্রতিনিধি। দর্শকগণও সাধারণত গ্রামীণ মানুষ কারণ গ্রামাঞ্চলেই এটি বেশি জনপ্রিয় তাই বিষয়বস্তুও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মানুষগুলোর জীবনের কথা বলে। অনেক সময় গ্রামের কোন ঘটনাই এর বিষয় হয়ে ওঠে। দর্শকদের সামনে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ আতিশয্য থাকে না। এর ভাষা সহজ সরল গ্রাম্য মানুষেরই ভাষা। মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়। তার মাধ্যম হিসেবে গ্রাম্য চটুল শব্দের প্রয়োগ ও অতিরঞ্জিত অঙ্গ-ভঙ্গি করা হয়। সেই কারণেই হোক বা সহজ সাবলীলতা বজায় রাখার কারণেই হোক গাজনের কাহিনির নারী চরিত্রগুলিতে সাধারণত পুরুষেরাই অভিনয় করে থাকেন। নারীর মতো পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন, কেশবিন্যাস করে নারী কণ্ঠ অনুকরণ এবং নারীসুলভ অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে পুরুষরাই এই চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন। আগে গানগুলো মুখে মুখেই রচিত হত এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে ঘটনা অনুযায়ী আসরেই সংলাপ রচিত হত তবে বর্তমানে পেশাদার গাজনকাররা পালা রচনা করেন এবং সেগুলি গাজন দল ক্রয় করে। প্রতি বছর আলাদা আলাদা গান রচনা ও উপস্থাপনা করা হয়।

গাজন পরিবেশনের স্থান সাধারণত গ্রামের মন্দির প্রাঙ্গণ বা মন্দির সংলগ্ন কোনো স্থান অর্থাৎ গাজনতলা। চারদিক খোলা জায়গায় যেমন আর সব লোকনাট্যের আসর বসে তেমনি গাজনেরও আসর বসে। লোকনাট্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যগুলি গাজন বহন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। আধুনিকতার সাথে সাথে সমস্ত বিষয়ের সাথে গাজনেরও কিছু পরিবর্তন এসেছে তবুও আজও এটি দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম একটি জনপ্রিয় লোকনাট্য।

৩.২ গাজনপালার বিষয় বৈচিত্র্য

লোকনাট্যরূপ গাজনপালাকে নিরীক্ষণ করলে তার বিষয় বৈচিত্র্যে নানান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—গাজনপালা মূলত ছিল দেব-দেবীকেন্দ্রিক কিন্তু বর্তমানে পেশাদারি দলগুলি যে গাজনপালা পরিবেশন করে তাতে দেব-দেবী অপেক্ষা মানুষের বিশেষত গ্রাম্য মানুষের বর্তমান জীবনের কাহিনি বেশি প্রাধান্য পায়। কাহিনির নামকরণেও তার প্রকাশ পাওয়া যায়। ভাষায় থাকে সেখানকার আঞ্চলিক প্রভাব। সংলাপে থাকে ঐ অঞ্চলের মানসিকতা ও চিন্তা ভাবনার প্রকাশ। পালা পরিবেশনের মাঝে নাম প্রকাশে থাকে বিশেষ কৌশল ও ভঙ্গি। রয়েছে ভনিতায় পালাকারের নাম প্রকাশের কৌশল। এছাড়া সঙ্গীত ও নৃত্যের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংলাপ অপেক্ষা সঙ্গীতের প্রাধান্য থাকে বেশি। নৃত্যে রয়েছে নিজস্ব ভঙ্গীমা। ক্ষেত্রসমীক্ষায় ২০১৭ সালে মুকুন্দপুরে অনুষ্ঠিত চারটি দলের পরিবেশনাকে বিশ্লেষণ করলে গাজনপালার এই বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হবে। ঐ চারটি দল হল—

১। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ

পরিবেশনের তারিখ : ৮।১১।২০১৭

স্থান : দাসপাড়া, মুকুন্দপুর

২। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা

পরিবেশনের তারিখ : ১৪। ১২। ২০১৭

স্থান : সূর্যশিখা, খুদিরাবাদ

৩। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা

পরিবেশনের তারিখ : ১৭। ১২। ২০১৭

স্থান : সূর্যশিখা, খুদিরাবাদ

৪। নাট্য মন্দির গাজনতীর্থ :

পরিবেশনের তারিখ : ১৯। ১২। ২০১৭

স্থান : সূর্যশিখা, খুদিরাবাদ

লোকনাট্যের কাহিনির ধরন দুই রকম হয়। যথা—

১। ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনি যা সহজেই দর্শকদের প্রভাবিত করতে পারে এবং ২। লোকজীবনের ঘটনা নির্ভরশীল কাহিনি যার সাথে সহজেই দর্শক নিজেদের একাত্ম করতে পারে। প্রতিটি পরিবেশনার প্রথম কাহিনি বা ছকটির চরিত্র সাধারণত নির্মিত হয় পৌরাণিক চরিত্র দ্বারা। যথা—রাজা,

রানী, ঠাকুর (সাধারণত শিব, দুর্গা) এদের নিয়ে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম নিবেদন—দীপ, রাজা (শারীরিকভাবে অনুপস্থিত), সেনাপতি, প্রদীপ, মহাদেব। দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম নিবেদন—রাজা, রানী, ভিখারি (রাজার বন্ধু চন্দ্রশেখর), রাজপুত্র নিবিড়, রাজকন্যা, মহাদেব। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পরিবেশনের প্রথম নিবেদন—রানী শঙ্খমালা, রাজকুমার প্রত্যুষ, ঋষিবর, শিউলি, শিউলির মা, মোগলি, সামু ও মহাদেব।

পরিবেশনের দ্বিতীয় নিবেদনের ছকটি সাধারণত ধর্মীয় আঙ্গিকে হয়। এই ছকটিকে রাধা কৃষ্ণ ছকও বলা হয়। উক্ত ক্ষেত্রসমীক্ষায় আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের দ্বিতীয় নিবেদন রাধা, কৃষ্ণ ও পৃথিবী দ্বারা নির্মিত কাহিনি। দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় নিবেদন রাধাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণ ও আয়ান ঘোষের ভালোবাসার কাহিনি। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পরিবেশনের দ্বিতীয় নিবেদনের নাম ছিল 'আঁচলে বাঁধা আলো'। বিষয় ছিল পুত্র কৃষ্ণের প্রতি মাতা যশোদার সন্তান বাৎসল্য। নাট্যমন্দির গাজন তীর্থ দলের দ্বিতীয় ছকটি ছিল রাধার অহংকারকে কেন্দ্র করে রাধা, কৃষ্ণ ও জৈমুনি চরিত্র দ্বারা নির্মিত কাহিনি 'অহংকারী রাধা'।

তৃতীয় ছকটি থেকে লোকজীবনের কাহিনি নির্ভর ঘটনা পরিবেশন হয়। যথা—আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় নিবেদন ছিল বৌদির আদেশে নায়কের মধু আনতে যাওয়া এবং নায়িকার সাথে ভুল বোঝাবুঝি। দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় নিবেদন ছিল বহুমূত্র রোগ ও তার চিকিৎসা বিষয়কেন্দ্রিক নায়ক, নায়িকা ও নায়কের ভাতৃবধূ চরিত্রগুলি নিয়ে গঠিত কাহিনি। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পরিবেশনের তৃতীয় নিবেদনেরও চরিত্র ছিল নায়ক নায়িকা ও নায়কের ভাতৃবধূ দ্বারা নির্মিত কাহিনি। নাট্যমন্দির গাজন তীর্থ দলের তৃতীয় ছকটিতে সরকারি কাজ সুতিখাল কাটাকে কেন্দ্র করে নায়ক, তার ভাতৃবধূ ও নায়িকার মধ্যে কাহিনি রচিত হয়েছে।

এছাড়া বাকি ছকগুলিতে দেখা যায় গ্রামের মানুষের জীবনকেন্দ্রিক সামাজিক, পারিবারিক বা রোমান্টিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত কাহিনি। পালার শেষে কখনো তা হয় মিলনান্তক আবার কখনো বিয়োগান্তক। কখনো সম্পূর্ণ হাস্যরসে ভরা আবার কখনো হাস্যরসবিহীন আবার কখনো স্বল্প কৌতুক মিশ্রিত কখনো বা দুঃখের মোড়কেই থাকে কৌতুকের ছোঁয়া। যথা—আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দল এর চতুর্থ ছকটি একটি মিলনান্তক পারিবারিক কাহিনি, পঞ্চম ছকটি হাস্যরস ও করুণরস মিশ্রিত একটি সামাজিক-পারিবারিক মিলনান্তক কাহিনি, ষষ্ঠ ছক ছকটি হাস্যরস ও দুঃখ আবেগের প্রাধান্য মিশ্রিত রোমান্টিক মিলনান্তক কাহিনি। দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের নিবেদনের চতুর্থ ছকটি বিয়োগান্তক পারিবারিক কাহিনি নির্মিত, পঞ্চম ছকটি হাস্যরস নির্মিত একটি সামাজিক মিলনান্তক কাহিনি, ষষ্ঠ ছকটি হাস্যরস ও দুঃখ আবেগের প্রাধান্য মিশ্রিত মিলনান্তক একটি পারিবারিক কাহিনি, সপ্তম ছকটি আবেগ, হাস্যরস ও দুঃখ মিশ্রিত মিলনান্তক পারিবারিক কাহিনি এবং অষ্টম বা সর্বশেষ ছকটি হাস্যরস বর্জিত পারিবারিক বিয়োগান্তক কাহিনি তবে রোমান্টিকতা স্থান পেয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার নিবেদনের চতুর্থ ছকটি একটি স্বল্প হাস্যরস মিশ্রিত মিলনান্তক

সামাজিক-পারিবারিক কাহিনি, পঞ্চম ছকটি হাস্যরস দ্বারা নির্মিত সামাজিক মিলনান্তক কাহিনি, ষষ্ঠ ছকটি হাস্য ও করুণ রস মিশ্রিত রোমান্টিক-সামাজিক মিলনান্তক কাহিনি, সপ্তম বা সর্বশেষ ছকটি একটি মিলনান্তক পারিবারিক-রোমান্টিক কাহিনি। নাট্যমন্দির গাজন তীর্থ-র নিবেদনের চতুর্থ ছকটি হাস্য ও করুণ রস মিশ্রিত পারিবারিক বিয়োগান্তক কাহিনি এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ছকগুলি হাস্যরস নির্মিত মিলনান্তক পারিবারিক কাহিনি।

গাজনপালার নামকরণ

এক একটি দল ৭ থেকে ৮ টি করে ছক পরিবেশন করে। প্রথম ও দ্বিতীয় ছকটির নামকরণ করা হয়। নিবেদনের পূর্বে সেই নাম ঘোষণাও করা হয় আর সামগ্রিকভাবে পালা নিবেদনের জন্য একটি নামকরণ করা হয়। কখনো সেটি ঐ দুটি (প্রথম ও দ্বিতীয়) ছকের মধ্যে কোনো একটির নাম হতে পারে, আবার কখনো ঐ দুটি ছক (প্রথম ও দ্বিতীয়) ব্যতীত অন্য যেকোনো একটি ছকের নাম অনুসারেও পালার নামকরণ হতে পারে। যথা—০৮। ১২। ২০১৭ তারিখে মুকুন্দপুরের দাসপাড়ায় আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলটির অনুষ্ঠানের পালার নাম এবং প্রথম নিবেদনের নাম ছিল ‘কর্মের শেষ পর্বে ভালোবেসে কি পেলাম’।[৯] ২য় নিবেদনের নাম ছিল ‘পৃথিবী আজও কাঁদে’[১০] এবং ৩য় নিবেদনের নাম ছিল ‘স্বামী যাচ্ছে জেলে’[১১]।

১৪। ১২। ২০১৭ তারিখে মুকুন্দপুরের খুদিরাবাদে সূর্যশিখা ক্লাবে আয়োজিত নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয় বার্তা দলের প্রথম নিবেদনের নাম ছিল ‘ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত’।[১২] দ্বিতীয় নিবেদনের নাম ছিল ‘অয়নের শয়নকক্ষ’।[১৩] পালার নাম এবং ৮ম বা শেষ নিবেদনের নাম ছিল ‘মৃত্যু শয্যায় বিয়ের বাসর’।[১৪]

১৭। ১২। ২০১৭ তারিখে ঐ স্থানেই আয়োজিত শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার প্রথম নিবেদনের পালার নাম ছিল ‘মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম’[১৫] এবং দ্বিতীয় নিবেদনের নাম ছিল ‘আঁচলে বাঁধা আলো’।[১৬]

২৩। ১২। ২০১৭ তারিখে ঐ স্থানে নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম নিবেদন এবং পালার নাম ছিল ‘রক্ত পিপাসু কালো ছায়া’[১৭] এবং দ্বিতীয় নিবেদনের নাম ছিল ‘অহংকারী রাধা’।[১৮] ।

গাজনপালার ছকের সূচনা ও সমাপ্তির দৃশ্য

পেশাদারি গাজনপালার ছকগুলির যেভাবে সূচনা হয় তাতে দৃশ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন—

খুবই প্রচলিত একটি সূচনার দৃশ্য হল শিল্পী অন্ধকারে প্রবেশ করেন তারপর মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে এবং অভিনেতা অভিনয় শুরু করেন। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকের সূচনায় নাম ঘোষণার সময় অভিনেতা অন্ধকারে প্রবেশ করেন এবং সপ্তম ছকের সূচনায় শিল্পীরা অন্ধকারে প্রবেশ করে সংলাপ শুরু করেন। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকের সূচনায় অন্ধকারে প্রবেশ করে আয়ান ও রাধারানী মঞ্চে নিদ্রা যাচ্ছেন এই দৃশ্য দিয়ে ছকটি শুরু হয়। ঐ দলের পঞ্চম ছকের সূচনায় অভিনেতা অন্ধকারে প্রবেশ করেন তারপর গান শুরু করেন।

ছকের সূচনার আরেকটি প্রচলিত দৃশ্য হল শিল্পী গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করেন। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের সূচনার দৃশ্যে ৬.০৪ মিনিট থেকে ৬.৩৬ মিনিট পর্যন্ত গানের প্রথম অংশ মঞ্চের পিছন থেকে শিল্পী করেন তারপর ৬.৩৭ মিনিট নাগাদ তিনি গান করতে করতে মঞ্চে প্রবেশ করেন।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয় বার্তা দলের তৃতীয় ছকের সূচনার দৃশ্যে নায়ক মঞ্চের পিছনে গান শুরু করেন এবং গান করাকালীন মঞ্চে প্রবেশ করে নাচ, গান এবং সংলাপ দিয়ে ছকটি শুরু করেন।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকেও সূচনায় মঞ্চের পিছন থেকে নায়ক গান করেন তারপর মঞ্চে প্রবেশ করে নৃত্য করেন ও সংলাপ শুরু করে্ন। ঐ দলের ষষ্ঠ ছকের সূচনার দৃশ্যে নায়ক আকাশ গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করেন তারপর একা সংলাপ বলেন বেশ কিছুক্ষণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং সপ্তম ছকের সূচনায় হ্যান্ডেল মঞ্চে প্রবেশ করে প্রথমে গান গায় তারপর একাই সংলাপ বলেন।

নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকের সূচনার দৃশ্যে মঞ্চের পিছন থেকে গান চলাকালীন অভিনেতাগণ মঞ্চে প্রবেশ করেন তারপর মঞ্চ প্রণাম করেন এবং গান গেয়ে পালা শুরু করেন। ঐ দলের তৃতীয় ছকের সূচনায় প্রথমে নায়ক মঞ্চে প্রবেশ করেন তখন মাইক্রোফোনে সমস্যা হয়। এরপর অভিনয় বন্ধ করেন, সমস্যার সমাধান হলে দ্বিতীয়বার মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই গান ও নৃত্য শুরু করেন। ঐ দলের চতুর্থ ছকের সূচনার দৃশ্যে হরি একা মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথমে গান করেন তারপর শুরু হয় সংলাপ। পঞ্চম ছকের সূচনায় দেখা যায় শিল্পীর মঞ্চ প্রণাম তারপর গান এবং একার সংলাপ দিয়ে ছকটি শুরু হয়। ষষ্ঠ ছকের সূচনার দৃশ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনেতা একাই গান করেন তারপর সংলাপ বলেন এবং সপ্তম ছকে একা দিদিমা মঞ্চে প্রবেশ করে প্রথমে গান তারপর সংলাপ বলেন সূচনায়।

এছাড়া আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছক এবং নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয় বার্তা দলের ষষ্ঠ ছক—এগুলির সূচনার দৃশ্যে গানের ব্যবহার রয়েছে।

কখনো কখনো ছকের সূচনায় অভিনেতা একা দর্শকদের উদ্দেশ্যে সংলাপ বলেন বা অভিনেতাগন পরস্পর সংলাপ বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ করেন। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ

দলের দ্বিতীয় ছকের সূচনা হয়েছে রাধারানীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কান্না ও সংলাপ এর মধ্য দিয়ে। অষ্টম ছকের সূচনায় অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করে সংলাপ শুরু করেন। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকের সূচনায় বৃদ্ধ-মঞ্চে প্রবেশ করে সংলাপ শুরু করেন। অষ্টম ছকের সূচনা হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংলাপ দিয়ে। নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা দলের দ্বিতীয় ছকটির শুরুর দৃশ্যে কৃষ্ণ মঞ্চে একা দাঁড়িয়ে থাকে তারপর সংলাপ শুরু করে।

আবার কখনো অভিনেতা কেবলমাত্র নৃত্যের মাধ্যমে মঞ্চে প্রবেশ করেন। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকের সূচনায় নায়ক নৃত্যের মাধ্যমে মঞ্চে প্রবেশ করেন। অধিকাংশ দলের তৃতীয় ছকের সূচনায় এই দৃশ্যই দেখা যায়।

এছাড়াও অন্যরকমভাবেও ছকের সূচনা হয় তবে এটা খুবই কম। যেমন- সূচনা- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকের সূচনাতে শ্বশ্রুমাতাকে টানতে টানতে পুত্র ও পুত্রবধূ মঞ্চে নিয়ে প্রবেশ করেন। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকের সূচনায় দেখা যায় মঞ্চের পিছন থেকে গান চলাকালীন চরিত্ররা মঞ্চে প্রবেশ মঞ্চে করেছেন। তারপর মঞ্চে রাখা প্রদীপ একজন অভিনেতা সরিয়ে রেখে ওড়না ঢেকে শায়িত হন এবং তৃতীয় অভিনেতা সংলাপের মাধ্যমে মঞ্চে প্রবেশ করেন। পঞ্চম ছকের সূচনায় বাখারি হেলে দুলে নৃত্যের ভঙ্গিতে মঞ্চে প্রবেশ করে প্রথমে গান করেন তারপর একাই দীর্ঘক্ষণ সংলাপ বলে অভিনয় করেন।

এতক্ষণ ছকের শুরুর সূচনার দৃশ্য আলোচনা করা হল। এবার ছকের সমাপ্তির দৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ছকের সমাপ্তির দৃশ্য নানা রকম ভাবে হয়। নিম্নে উল্লিখিত দল চারটির পরিবেশিত ছকগুলির সমাপ্তি দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হল। যথা—

খুবই প্রচলিত একটি সমাপ্তি দৃশ্য হল নায়ক নায়িকা বা কোন অভিনেতার গান এর দৃশ্য। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছক ও ষষ্ঠ ছক, নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছক ও ষষ্ঠ ছক, শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছক, চতুর্থ ছক, পঞ্চম ছক ও সপ্তম ছক এবং নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকটির শেষ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার নৃত্য ও গান হয়ে ছকটির সমাপ্তি হতে দেখা যায়। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকের সমাপ্তি দৃশ্যে স্বামী স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে গান করেন। সপ্তম ছকের সমাপ্তি দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রী গান করেন। অষ্টম ছকের সমাপ্তি দৃশ্যে দুই ভাই গান করে এবং ছক শেষ হয়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকের সমাপ্তিতে পুরুষ চরিত্রাভিনেতা গান করেন। পঞ্চম ছকের সমাপ্তি দৃশ্যে স্বামী গান করেন, স্ত্রী তার পা জড়িয়ে ধরে বসে থাকেন। নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকটির শেষ দৃশ্যে রাধা, কৃষ্ণ, জৈমুনি একসাথে গান করেন। তৃতীয় ছকের সমাপ্তি দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা-নায়কের ভাতৃবধূ একসাথে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কখনো কখনো কোন অভিনেতার চিৎকার দিয়ে ছকের সমাপ্তি ঘটানো হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের সমাপ্তিতে পুত্র 'বাবা' বলে দীর্ঘ চিৎকার করে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকের সমাপ্তিতে গান শেষে নায়ক নায়িকার নাম ধরে চিৎকার করে।

কখনো কখনো ছক শেষে সকল অভিনেতাগণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের অষ্টম ছকের সমাপ্তি দৃশ্যে সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয় এবং তারপর সকলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। সপ্তম ছকের অন্তিমে বৃদ্ধের গান শেষ হয় তার পুত্র ও পুত্রবধূ দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

কখনো কখনো সংলাপের মাধ্যমে পালার নাম জানিয়ে সমাপ্ত করা হয়। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকের সমাপ্তিতে রানী শঙ্খমালা খলনায়ক নিজপুত্রকে হত্যা করে সংলাপের মাধ্যমে পালার নাম জানিয়েছেন। নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকটির শেষ দৃশ্যে সংলাপ বলে দৃশ্যর সমাপ্ত ঘটানো হয় যার মধ্যে পালার নামের উল্লেখ করা হয়।

এছাড়াও নানা রকম ভাবে ছক শেষ করা হয়। যেমন—

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকের সমাপ্তিতে মঞ্চে সকলে দাঁড়িয়ে মহাদেবের পায়ে অঞ্জলি দেয়। দ্বিতীয় ছকের শেষ দৃশ্যে রাধা-কৃষ্ণ যুগলমূর্তি রূপে দাঁড়ায়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকের সমাপ্তি দৃশ্যে খলনায়ককে বধ করে রানী অট্টহাস্য করেন। দ্বিতীয় ছক শেষে কৃষ্ণের পায়ের কাছে আয়ান ও রাধা কর জোড়ে বসেন। নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকটির শেষ দৃশ্যে গান শেষে সঞ্জয় ও মনি হরিকে চলে যেতে বাধা দেয় তারপর তিনজনের ক্রন্দনের মাধ্যমে ছকটি শেষ হয়। ষষ্ঠ ছকের শেষ দৃশ্যে সকলে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে সমবেত সঙ্গীত করেন।

গাজনপালার সংলাপ

লোকনাটকগুলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সংলাপ। গ্রামের মানুষের দ্বারা গ্রামের মানুষের জন্যই এটি সৃষ্টি হয়, তাই লোকনাটকের সংলাপ হয় সহজ সরল যা গ্রামের মানুষের কাছে সহজবোধ্য। এটি মুখে মুখে রচিত হয় তাই কখনো এর লিখিতরূপ মেলে না।

সৃজনাত্মক পরিবর্তন সম্ভাবনা লোকনাট্যের অন্যতম নাটকীয় উপাদান। একে বলা যায় তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন বা আশু রচনা। লোকনাট্যের সংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করে নেওয়া হয় বলে একে অনির্দিষ্ট বলা যায় তাই সংলাপ হল লোকনাট্যের সব থেকে জীবন্ত অংশ। যারা মনে করেন লোকসংস্কৃতি কেবলমাত্র অতীতের বস্তু তাদের সেই ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করে বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ Y.Sokolov একটি উক্তি করেছেন—

"Folklore is an echo of the past but at the same time it is also the vigorous voice of the present."

গাজনপালার সংলাপও একই রকম। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একেবারেই গ্রাম্যকথ্য ভাষায় পালাকার এটি রচনা করেন। আসলে সেই অর্থে যেহেতু এর কোন লিখিতরূপ পাওয়া যায় না তাই সংলাপগুলি লিখিত হয় না। পালাকারদের সাথে এ বিষয়ে কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায় যে কোনো একজন পালাকার যখন কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে কাহিনি রচনা করতে চান তখন প্রথমে তিনি মনের মধ্যে পুরো বিষয়টি সাজিয়ে নেন। মহড়ার সময় ঐ কাহিনিতে যে যে অভিনেতা থাকেন তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। অভিনেতারা নিজেরাই সংলাপ তৈরি করে নেন মুখে মুখে। বিখ্যাত গাজনশিল্পী অশ্বিনী নাইয়া জানিয়েছেন তিনি গানগুলি আগে তৈরি করে নেন। গানগুলিকে তিনি লিখিত রূপ দেন তারপর মহড়ার সময় পুরো ঘটনা ও বিষয়টি শিল্পীদের বুঝিয়ে দেন। মুখে মুখে তৈরি হয়ে যায় সংলাপ। বার বার মহড়ায় শিল্পীদের মনে সংলাপগুলি দৃঢ় হয়ে যায়। একই দলের একই পালা ভিন্ন জায়গায় পরিবেশন দেখলে বোঝা যায় সংলাপে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। যদি কখনো অভিনেতা অভিনয় চলাকালীন কোন সংলাপ ভুলে যান তখন তার সহ অভিনেতা এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাকে সংলাপটি মনে করিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করেন।

লোকনাট্যের ভাষা মূলত যে অঞ্চলের লোকনাট্য সেখানকার কথ্য ভাষায় হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনপালার সংলাপের ভাষা এখানকার কথ্য চলিত ভাষায় পরিবেশিত হয়। তবে প্রতিটি দলের পরিবেশনের প্রথম ও দ্বিতীয় ছকে শুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে রাজকন্যা বলেন—"আহা! কী অপরূপ শোভা। সরজু নদীর কুলে কত রঙের মনোরম লোভা"। দ্বিতীয় ছকে আয়ান বলেন —"ওগো অন্তর্যামী ভগবান, তুমি তো ভক্তের ভগবান। তবে কেন ঠাকুর, বার বার শূন্য করে ভক্তের এ জীবন ঠাকুর, পরের পত্নীর উপর এতই যখন তোমার স্বপ্ন ঠাকুর, গ্রহণ করো ভগবান, গ্রহণ করো বিরহী আয়ানের সামান্যতম অর্ঘ্য"। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে রাজকুমার প্রত্যুষ তার মা রানী শঙ্খমালার উদ্দেশ্যে বলে— "ওগো আমার গর্ভধারী জননী, দু হাত ভরে মোর মস্তকে করো আশীর্বাদ। তব আশীর্বাদে আমি যেন বিচার পাই।" দ্বিতীয় ছকে কাকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলে —"অশেষ করুণা তব, অসীম করুণা তব শিহরি তাই অভিশাপ হতে মুক্ত করো তুমি। লহো গো প্রনাম শিহরি।" নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে সরমা তার সন্তানকে বলে —"ওরে খুকুমনি তুই যে আমার নয়নের মনি। তোকে ছাড়া আমি যে দিশাহারা।" দ্বিতীয় ছকে রাধারানী বলেন —"ভগবান আর কারও নহে।"

প্রতিটি দলের পরিবেশনের প্রথম ও দ্বিতীয় ছকের সংলাপ হয় সাধু ভাষায়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে রাজকন্যা প্রকৃতির রূপ দেখে স্বগোতক্তি করে বলেন — "দুকুলে নানা প্রজাতির গাছগাছালি। আজ এই রূপালি মন হয় উথালি পাথালি। কুলু কুলু উজানের স্রোত, সানন্দে আজ ভরিব কলস।" ঐ ছকেই শয়তানরূপী খলনায়ক বলে—"মনের আবেশ যে লুকায় আসিয়াছে সেই সুসময়"। ঐ দলের দ্বিতীয় ছকে রাধারানী শ্রীকৃষ্ণকে বলেন —"কৃষ্ণ প্রেমের গুণে

অগ্নিতে দগ্ধ হয়নি ভক্ত প্রহ্লাদ, ঠিক তেমন শত শত চাবুকের আঘাতে ভুলিবনা, ভুলিবনা আমি মোর প্রাণের দেবতারে।” শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে ঋষিবর বলেন –“ধন্য মাতা তব বিচার, প্রত্যূষে অন্ধ হয়ে করিলে অবিচার? রানী শঙ্খমালা তব পুত্র বলো দিকি তব স্পর্শ করি সত্য কথা বলিতে। তাহলে আমি জানিব মিথ্যাবাদী, আমি মিথ্যাভাষী।” ঐ দলের দ্বিতীয় ছকে যশোদা মাতা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন –“আমি নন্দ রাজার পত্নী। নাম মোর যশোদা। বহু তপস্যার ফলে পাইয়াছি শিশুকে। ওরে মোর নয়নের মণি আঁচলে বাধা আলো, প্রদীপ হয়ে জ্বলবি রে তুই করবি সবার ভালো।” নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে জৈমুনি বলেন –“আমার নয়ন দুখানি উপরে তোমাকে করিব দান।”

তবে এর ব্যতিক্রম ও ঘটে। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পরিবেশনের প্রথম ছকের সংলাপের ভাষায় সাধু ভাষা ব্যবহার না হয়ে চলিত ভাষার ব্যবহার হয়েছে। সেখানে চন্দনা বলেছে – “ধর্ম ছিল বলীয়ান, নারী শক্তিতে দানবকুল হয়েছিল ধ্বংস তাই নারী সমাজ আজ জাগ্রত। পাপ করলে পাপের হবে মরণ।”

এরপর শুভঙ্কর বলে—“শ্মশানে পুড়েছে আমার দেহ, কেঁদেছে কত আপনজন

নিঃশ্বাস আজই গেছে উড়ে, আত্মার হয়না মরন”।

লোকনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিক প্রভাব। তার উচ্চারণেও থাকে আঞ্চলিক প্রভাব। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে- ঘুরতিছি (ঘুরছি), পঞ্চম ছকে- নি (নেই), কেমড়ে (কামড়িয়ে), নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে- হ্যারা (হ্যাঁ রে), গোইলের (গোয়ালের), যেকান-সেকান (যেখানে-সেখানে), লজ্জায়তে (লজ্জায়), নি (না),কোরোনি>কোরোনা, কত্তে (করতে), এরম (এরকম), দেচে (দিয়েছে), বাঁচাতি (বাঁচাতে), পোস্কার (পরিস্কার), বেড়িচি (বেড়েছে), এট্টু (একটু) প্রভৃতি আঞ্চলিক উচ্চারণ ঘটেছে।

সংলাপের মধ্যে অনেক সময় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে চুনি লংকা (ঝাল লংকা), নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে - ভক্ষা (ফাঁকা), কোচে (ছোটকে সম্বোধন), চতুর্থ ছকে- ভস করে (হঠাৎ), দাবা (বারান্দা), শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে- ফেরে (চেলা হওয়া), ঢেপন (মার), ছানি (মেয়ে) পঞ্চম ছকে- মদ্দ(পুরুষ), মেছেলে(মহিলা), ফস্কা মারা (খারাপ হওয়া), পিটের চাল (পিঠের উপর), চোপরায়(উচু স্বরে কথা বলা), আঁচিয়ে (মুখ ধুয়ে), নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পরিবেশনের পঞ্চম ছকে - থুয়ে(রেখে), কল(ব্যাপার), নোনো(শিশু), সুঁই(সূচ), ষষ্ঠ ছকে- ছ্যাদ্দ(শ্রাদ্ধ), চোকে নেবা (অন্ধ), মাইরি(সত্যি), ফাঁক (ফাঁকা), ঝাড়া (শৌচ করা) প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

তৃতীয় ছকের শহুরে শিক্ষিতা নায়িকার সংলাপে ছোট ছোট ইংরাজী বাক্য ও শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়িকা মধুর সংলাপে ছোট ছোট

শব্দ ও বাক্যে ইংরাজী ভাষার প্রয়োগ হয়েছে এরকম- “My name is Madhu”, “Idiot”। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে নায়িকার সংলাপে যে ধরনের ছোট ছোট শব্দ ও বাক্যে ইংরাজী ভাষার প্রয়োগ হয়েছে-“Stupid”, “Don’t mind”, “Oh! My God”। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে নায়িকা ময়নার সংলাপে ছোট ছোট শব্দ ও বাক্যে ইংরাজী ভাষার প্রয়োগ হয়েছে- “Welcome-more welcome-most welcome .My name is Moyna.”, ‘Yes’, ‘Any Problem?’, ‘Who are you?’, ‘Who is this?’, ‘What is the matter?’, ‘Uncultured back dated’, “Oh! My God”, “…to the point answer…”, “Oh! No”, “No never”, “Yes”, “What do you mean?”, “Who are you?”, “You are k G?”, “I say please stop her”

সংলাপের মধ্যে অশালীন শব্দ এমনকি গালির প্রয়োগও হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে স্ত্রী সগর্বে জানায় তাকে একডাকে সকলে চেনে কারণ সে নাকি ‘ভাতার মারে’। অষ্টম ছকে তিশার স্বামী তিশাকে বলে—“শালি তোর বাপ সে তো অকালেই পটল তুলেছে আর তোর যে দু ভাই শালা ...তুই হলি একটা রাস্তার মে বে-জন্মা”। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে অঞ্চল প্রধান লিচুকে বলে—“তিন লাক কি, পয়োজন পললে চার লাক পোঁদে আমি ঢুকিই দোব”। ঐ ছকেই গুয়ে পুলিশ লিচুর স্বামীকে বলে —“শালা নিজে হোঁদল কুতকুতের বাচ্চা”। ঐ দলের সপ্তম ছকে বৃদ্ধ তার স্ত্রীকে হিন্দী ভাষা জানা প্রসঙ্গে বলে—“আমি হিন্দীর গু মাড়িয়ে এইচি।” শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে গোবিন্দ তার দিদিমনিকে বলে—“উনি মদ খেয়ে এসে পেচ্ছাপ করে শুয়েছিল আমি ঠ্যাং ধরে টেনে হিড় হিড় করে এনে গুদোম ঘরে ঢুকিই দিলুম।” পঞ্চম ছকে তপন বাখারিকে বলে —“এই শুয়োরের বাচ্চা মারের ভয় থাকে টাকা ফেরত দে।” বাখারি তার নাতি চেটোকে বলে—“তবে গো শুয়োরের বাচ্চা ... শুয়ারের বাচ্চা শালা শুয়ারের নাতি।” ঐ দলের ষষ্ঠ ছকে ঝিলিকের এক প্রেমিক ঝিলিককে বলে—“শালা রেন্ডি, শালা ছেলেখাকী, কত ছেলের মাতা খেইচি এরকম ,শালা মানুষখাকী।” শেষ ছকে শাঁখা ব্যপারি হ্যান্ডেলকে বলে—“এ-ই মূর্খের বাচ্চা, এখনতো ... মাগো করবে?”

সংলাপ কখনো কখনো দ্বৈত অর্থবোধকরূপে প্রয়োগ করা হয়। যথা- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে বিয়ের আগে হবু শ্বাশুড়ির সাথে এক রাত কাটানোর কারণস্বরূপ হবু জামাই বলে—“এখন অফিস আদালতে গেলে চেক করে নেয়। এয়ারপোর্ট দমদমে গেলে সারা অল বডি চেক করে নেয়। সে যার সাথে সারাজীবন সংসার করবে তার গোড়ার খবর নেবে সেটাই তো স্বাভাবিক”।

ঐ ছকেই পিয়ার বাবা ও হবু জামাই এর কথপোকথন হয় এরকম —

বাবা-“ও বাবা, পড়াশোনা কতধূর?”

পাত্র—“পড়াশোনা? ঐ এগারো ক্লাস থেকে এক কেলাস নীচে”।

বাবা—“নীচে থেকো বাবা। ঐ বেশি ওপরে উঠলে হাত পা ভেঙে যেতে পারে”।

বাবা—“তা চাষ বাস কতধূর?”

পাত্র—“ও পাট নাই”

বাবা—“ও পাট নাই। সরু সরু চাল। আমার মেয়ে থাকবে ভালো, খাবে ভালো”।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচু অঞ্চল প্রধানকে দেখে বলে—“কি ব্যাপার প্রধান সাহেব আপনি?”

প্রধান সাহেব বলে—“আমি দেবো।” ‘দোবো’ শব্দটি এখানে দ্ব্যর্থক।

সংলাপের মধ্যে প্রায়শই ঘটনাক্রমে মহান ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ উল্লেখ সংলাপের একটা ধরন বলা যায়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্ঠম ছকে তিশাকে হত্যা করার পর অনুতপ্ত স্বামী তার মাকে দোষারোপ করে বলে— “.... আজ তোমাদের মতন মেয়েদের গর্ভে আমাদের মতন শয়তানদের জন্ম হবে না তো হবে মহান পুরুষ মহান ব্যক্তিদের জন্ম? হবে বিবেকানন্দের জন্ম? হবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম?” নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পরিবেশনের চতুর্থ ছকে হরি সঞ্জয়কে বলে—‘মালা দেয় শহীদদের গলায়, কবিদের গলায়। এ প্রসঙ্গে সে বিনয়, বাদল, দীনেশ, সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এদের উল্লেখ করে।”

বিভিন্ন দলের ছকের সংলাপের মধ্যে সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। অর্থাৎ একই ধরনের সংলাপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে পিয়ার বাবা হবু জামাইকে মারার জন্যে প্রথমে শাবল আনতে বলে। এর সাথে সাদৃশ্য মেলে নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে যখন লিচুর ঘরের খাটের নীচ থেকে অঞ্চল প্রধানকে পাওয়ার পর লিচুর স্বামী লিচুকে বলে-লিচুর স্বামী—“ ... এই বাড়ির ভেতর থেকে শাবলটা নিয়ায় এর মাতা আজ টুকরো টুকরো কোরে দোব।” আবার আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্ঠম ছকে তিশার শ্বাশুড়ি জপ করার সময় বলে —“হরে কৃষ্ঞ হরে কৃষ্ঞ, কৃষ্ঞ কৃষ্ঞ হরে হরে/কার কাছে চাইলি জীবন ভিক্ষারে?” সেরকমই সংলাপ দেখা যায় নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে যখন প্রধান সাহেব বলে —“কিষ্ট কিষ্ট হরে হরে/এবার গুরু যাব প্রাণে মরে।” নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে পাপিয়ার বাবা বিচ্ছিরি বচ্চনের সাথে পাপিয়ার বিয়ে দিতে চায়। বিনিময়ে যা যা দেবে তার হিসাব বলে—“আমার চারটে জাহাজ, তিনটা প্লেন, ছটা টেন, আটটা টোটো, নটা লরি, তিনটে সাইকেল, আমি সব তোমার নামে লিকে দেব।” এর সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে যখন ঝিলিকের সাথে পার্কে দেখা করতে এসে তার দুই প্রেম্‌িক পরস্পর রেষারেষি করে যে কথপোকথন। সেখানে একজন বলে—তার মাটি কাটা লরি, একটা টোটো গাড়ি ছিল এবং অপরজন বলে—সে একটা লাক্সারি বাস, আঠারোটা পাঞ্জাব লরি, ষোলটা টোটো গাড়ি, আটটা মোটর ভ্যান, আটটা সাইকেল সব বেচে দিয়েছে ঝিলিকের জন্য। আরেকটি সাদৃশ্য দেখা যায় শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে যখন ভিখারি বাথরুমে যাবে বলে মঞ্চ ত্যাগ করার সময় স্বর টেনে বলে—“টা---টা”।

এবং নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ ও লিচুর প্রথম সাক্ষাতের পর গুয়ে পুলিশ চলে যাবার সময় লিচু ও গুয়েপুলিশ পরস্পরকে জানায়—"টা-টা"।

কখনো কখনো সংলাপ হয় ইঙ্গিতপূর্ণ। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে নায়কের বোতলের জল নায়িকা ফেলে দেওয়ায় নায়ক তাকে ভরে দিতে বলে। নায়িকা তাকে বলে টিউকল থেকে ভরে নিতে। তখন নায়ক তাকে বলে—"এ জল সে জল নয় সোনা।" ঐ ছকেই নায়ক নায়কার ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ হয় এই রকম—

নায়িকা—"এ ইডিয়েট তুই কি আমায় সেই বকনে বাচুর পেয়েছিস?"

নায়ক—"আর আষাঢ় মাসে যখন মাঠে জল জমে ঐ বকনে বাচুরগুলো ল্যাজ তুলে ছোটে আর এঁড়েগুলো কি করে জানো ম্যাডাম?'

নায়িকা—"কি করে?"

নায়ক—"শিং মেরে বাঁধ ভাঙে....."

পরবর্তী অংশে নায়ক তার বৌদিকে বলে—"দুটো বোতল ভরে নে হন হন করে আসতিচি আর ম্যাডাম পথের মাঝখানে আটকে ঐ দুটো বোতলের মাল সব ফেলে দিয়েচে"। এই শুনে বউদি নায়িকাকে বলে—অ্যাঁ এই যে মে-ছেলে তুমি আমার কোচের মাল ফেলে দিয়েচ?" এখানে মাল হল বোতলের জিনিস, মে-ছেলে অর্থে যুবতী বা নায়িকাকে সম্বোধন করা হয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে নায়ক 'ডেঙ্গুমশা' নিজের নামের অর্থ ও কারণ জানিয়ে বলে—"আমি ডেঙ্গু" ... নাম্বার ওয়ান।" নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের অষ্টম ছকে ভাগ্নী সুস্মিতা মামাকে পেয়ে খুশি হয়ে বলে তাদের হেব্বি জমবে। তখন মামা বলে—"তোমায় নিয়ে জমানোর জন্যই তো আমি এসেছি। তোমায় নিয়ে এমন জমিয়ে দোব না! পুরো তেলের পিঠে বসিয়ে দোব।" শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে গোবিন্দ তার দিদিমণিকে পরকীয়া প্রেমিক সম্পর্কে বলে—"মেডাম ও শুধু তোমার ঘুম কেড়েছে? তোমার এমন জিনিস কেড়ে নেবে হাজার ওয়াটের হ্যালোজেন মেরেও জিনিস তুমি খুঁজে পাবে না। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে হবু বউকে টেষ্ট করে দেখতে চায় চেটো। তাই তার সাথে ঘটক বাখারির কথপোকথন হয় এরকম—

চেটো— এখন যে কোন জিনিস টেস্ট করে খাওয়া ভালো।

বাখারি— সব টেস্ট করে। এটা টেস্ট করবেনে?

চেটো— তা মাটি না টেস্ট করে ধান ফেলা উচিত না। ভালো ফসল হবে না। শুধু ওড়া হবে ওড়া।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে প্রধান সাহেব লিচুকে বলে—"ঐ তো মরে যাবার আগে একটা খালি খেলে যাব। শুধু একটু উলু উলু আর একটু খুলু খুলু।" আবার লিচুর ঘরে ধরা পরে গিয়ে গুয়েপুলিশ বলে—"এ বাবা। না—না হাগিনি আমি ঘরের ভেতর স্বচ্ছ ভারত করতিচিলুম।"

অনেক সময় না বাচক বাক্য হ্যাঁ বাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচু তার স্বামীকে বলে—".... দুটো হুলো বেড়াল ঘরের ভেতরে ঢুকে অত জ্বালাতন কত্তেচে না গো, আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না।" শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে ভৃত্য গোবিন্দ দিদিমণির কাছে বলে—"আমাকে একটা কিনে দেবে না? আমি কানে বাঁধব।" এখানে বাক্যটি 'কিনে দেবে' অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পরিবেশনের তৃতীয় ছকে চৈতালি ফোকেকে বলে—"চেঁচকো না আমি ঠেলে ঠেলে ঠেলে ঠেলে সুতি খাল কেটেছি।" ঐ দলের চতুর্থ ছকে সঞ্জয়ের শাশুড়ি—"আমার স্বামী কার না উপকার করেনে?" অর্থাৎ সে সকলের উপকার করেছিল।

সংলাপ কখনো ত্রুটিপূর্ণও হয়। যথা— সংলাপের মধ্যে কখনো কখনো গুরুচন্ডালি দোষ ঘটে। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ বলে—

> "...আমি হলাম গুয়ে পুলিশ। হ্যাঁ তবে গুয়ে পুলিশ বলে আমাকে কিন্তু অসম্মান করবেন না। আমাকে ভদ্র ভাষায় বলিবেন পাইখানা পুলিশ..."।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পরিবেশনের তৃতীয় ছকটিতে জৈমুনির সংলাপে একাধিক গুরুচণ্ডালি দোষ দেখা যায়। সেগুলি হল-- "আমার ধ্যান ভঙ্গ করিল" (সাধু), "কিসের লাগি আসিয়াছ এই জৈমুনির সম্মুখে" (সাধু), "আজ আমি ঘৃন্য" (সাধু), "ভগবানের চরণ দর্শন করতে পারে" (চলিত), "এর চেয়ে কিছু চাইনা" (চলিত), "আমি দেব...কোন উপকারে লাগিনি" (চলিত)," এ সুযোগ এসেছে আমি হারাব না" (চলিত), "আমার নয়ন দুখানি উপরে তোমাকে করিব দান" (সাধু), "আমার খালি হৃদয়টা ভরে দিলে ঠাকুর" (চলিত), "এত দিনের সাধন ভজন সিদ্ধিলাভ হয়েছে ঠাকুর" (চলিত)।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্ঠম ছকে নির্যাতিতা গৃহবধূ তিশা কাঁদতে কাঁদতে জানায় তার মা বাবা বিয়ে দিয়েছিল। অথচ সে কোনোদিন সুখ পায়নি, কেবল যন্ত্রণা পেয়েছে। তাই বৃথা এ জীবন সে রাখতে চায় না। হয় সে বিষ খাবে, নাহলে গলায় দড়ি দেবে, না হলে আত্মহত্যা করবে। এটি বিষ খাওয়া ও গলায় দড়ি দেওয়া বিষয় দুটিই আত্মহত্যা। ঐ ছকেই তিশার স্বামী তিশার দুই ভাই সম্পর্কে বলে—".... আর তোর যে দুভাই সালা একজন তো চোখেই দেখতে পায় না আরেকজন কানা অন্ধ।" কানা ও অন্ধ একই বিষয়।

গাজনপালার সংলাপের ভাষা

মানুষের ভাবপ্রকাশক মাধ্যম হল ভাষা। ভিন্ন শব্দ একত্রিত করে অর্থময় বাক্যে ভাষার মাধ্যমে এই ভাব প্রকাশ করা হয়। প্রয়োজন ও বাস্তবতা অনুসারে ভিন্ন স্তরের উপাদানের মাধ্যমে চলে তার ভাব প্রকাশ। ভাষা ব্যাকরণ বা তত্ত্ব নির্ভর নয়। ভৌগোলিক কারণে বাচনের সবচেয়ে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে

আর সেই পরিবর্তন যখন সামান্য হয় তখন তা পরিণত হয় উপভাষায় এবং পরিবর্তন যখন অনেক হয় তখন তা হয় ভাষা।

সামাজিক স্তরের মানুষ যদি একটি স্থানে কম-বেশি সমভাষা ব্যবহার করে তবে উপভাষা তৈরি হয়। এক উপভাষা অঞ্চল থেকে আরেক উপভাষা অঞ্চলে গেলে দেখা যায় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বাচন।

উপভাষাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১. শিষ্টভাষা

২. লোকভাষা

৩. জনভাষা[১৯]

লোকভাষাই হল লোকসাহিত্যের ভিত। গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক আবেগের প্রকাশ এই ভাষা। সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের পরিশীলিতরূপ হলেও লোকসাহিত্য প্রাথমিকভাবে শ্রোতার কাছে সংপ্রেষণের জন্য মৌখিকভাষা ব্যবহার করে। লোকনাটকগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভাষা। বিশেষ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর একেবারেই অকৃত্রিম কথ্যভাষায় লোকনাটকগুলি রচিত হয় ফলে লোকনাটকের মাধ্যমে তার স্থানীয় অঞ্চলের লোকভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় অকৃত্রিম ভাবে পাওয়া যায়।

লোকভাষা সম্পর্কে অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষ্য—

> "লোকভাষা হলো বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা কৌমজনের ভাষা—যা নানা কারণেই ক্রম ক্ষয়িষ্ণু।"[২০]

এ সম্পর্কে আশিস কুমার দে-র অভিমত-

> "লোকভাষা হল বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং তা ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ... লোকভাষা আঞ্চলিক উপভাষার (রিজিওনাল ডায়ালেক্ট) প্রকারভেদ।"[২১]

সুভাষচন্দ্র রায় চৌধুরীর বক্তব্য-

> "একই ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত গ্রাম্যজীবন নির্ভর লোকসমাজের ব্যবহৃত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ভাষাকে লোকভাষারূপে গণ্য করা যায়।"[২২]

পবিত্র সরকার তার 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন—

> "লোকভাষা কোন বিশেষ অঞ্চলের উপভাষা নয়। নাগরিক ভাষার সঙ্গে বাংলার ক্ষেত্রে মান্য মার্জিত কলকাতার বা শহরের 'শিষ্ট' ভাষার সঙ্গে বিরোধে যে-ভাষা গ্রাম্য বলে চিহ্নিত হতে পারে তা-ই লোকভাষা। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান একে কখনও-কখনো rural languageও বলা হয়। যা থেকে rural linguistics কথাটি তৈরি হয়েছে।"[২৩]

এ সম্পর্কে অরুণ ঘোষ ব্যখ্যা দিয়েছে-

> "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্যের সামান্যীকরণের নাম যদি লোকভাষা দিই, তাহলে হয়ত খুব একটা ভুল হবে না। এই লোকভাষা গ্রামাঞ্চল বা শহরাঞ্চলের হতে পারে"[২৪]

পবিত্র সরকার এও বলেছেন—১৯৬৪তে লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (লস এঞ্জেলস) সমাজভাষাবিজ্ঞানের সেমিনারে হেনরি হেনিগসোয়ালড Hoenigswald ১৯৭১) যখন প্রথম লোকভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করার প্রস্তাব তুলে একটি প্রবন্ধ পড়েন, তখন থেকেই পরিভাষা বিষয়ক একটি সমস্যা তৈরি হয়ে যায়। পশ্চিমদেশে লোকভাষা বলতে সাধারণভাবে বোঝায় গোঁয়ো ভাষা, অর্থাৎ যে-ভাষা নাগরিক, মার্জিত বা স্ট্যান্ডার্ড নয়। এরপর তিনি ঐ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "হেনিগসোয়ালড—কথিত folk linguistics কথাটির বাংলা হিসেবে আমরা লৌকিক ভাষাতত্ত্ব কথাটিকেই গ্রহণ করছি।"[২৫]

এই কারণে যে, এর সঙ্গে শহর-গ্রাম বিরোধে বিষয়টিকে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত নয়। লৌকিক ভাষাতত্ত্ব হল ভাষা সম্বন্ধে লোকসাধারণের 'বিশ্বাস' এর গ্রন্থণ। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা শুরু হওয়ার আগে, প্রাক্‌বৈজ্ঞানিক ধারণার পর্বে ভাষা সংক্রান্ত যে সব বিশ্বাস লোকসাধারণ পোষণ করে এসেছে, কিংবা এখনও জীবনভাবনার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তিবিচারহীন মানসিকতা বহনকারী লোকসাধারণ ভাষা বিষয়ে যে সব বিশ্বাস পোষন করে থাকে—তারই গুচ্ছ নিয়ে তৈরি লোকভাষাতত্ত্ব।[২৬]

তবে লোকভাষা কিন্তু আঞ্চলিক উপভাষার প্রকারভেদ নয়, স্বতন্ত্ররূপ, উপভাষা লোকভাষাকেই অঙ্গীভূত করে। সেখানেই তার প্রসার, বৃদ্ধি ও শ্রী। প্রতিটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্কৃতি জন্ম দেয় লোকভাষার। অঞ্চল ভেদে লোকভাষাও স্বতন্ত্র হয়। লোকভাষা সামাজিক উপভাষার একটি ভাগ কোনো বিশেষগোষ্ঠী বা কৌম জাতির নিরক্ষর মানুষের ভৌগোলিক সংলগ্ন সংস্কৃতিজাত শব্দে ভাবপ্রকাশ রীতি। এই রীতি লোকজীবনের নিজস্ব সৃষ্টি, যুগ যুগ ধরে ঐতিহ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যবহৃত। স্থান-কাল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে। লোকভাষা লোকের মুখের প্রচলিত ভাষা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের রূপে প্রতিফলিত, ব্যাকরণের শাসন মুক্ত।

লোকভাষার বৈশিষ্ট্য

অ) গ্রামজীবনে ব্যবহার হয়।

আ) স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন থাকে।

ই) সামাজিক স্তরের পার্থক্যে নতুন লোকভাষা সৃষ্টি হয়।

ঈ) বিশ্বাস-সংস্কারের সাথে যুক্ত থাকে এই ভাষা। লোকসমাজে ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাসে প্রকল্প শব্দ নির্মাণ করে।

উ) কথ্য উপভাষার যে অংশে লৌকিক বাক্‌ভঙ্গির ঐতিহ্যগত ছাঁচ রয়েছে সে অংশটা লোকভাষা।

ঊ) লোকভাষা বক্তার ইচ্ছাধীন নয়।

ঋ) লোকভাষা গ্রাম শহর নির্বিশেষে একটি ভাষাগোষ্ঠীর সামগ্রিকরূপ।

৯) প্রাচীন ঐতিহ্যগত হলেও লোকভাষা সমকালের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রয়োগকালে এটি সমকালীন জীবনের সমান্তরাল।

লোকনাটকগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভাষা। বিশেষ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর একেবারেই অকৃত্রিম কথ্যভাষায় লোকনাটকগুলি রচিত হয় ফলে লোকনাটকের মাধ্যমে তার স্থানীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার বা লোকভাষার পরিচয় পাওয়া যায় সুতরাং লোকনাট্যের সংলাপে ঐ অঞ্চলের ভাষাতাত্ত্বিক প্রকাশ অনেকটা অকৃত্রিম ভাবে পাওয়া যায়। লোকনাট্যের সংলাপগুলি যেহেতু সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত নরনারীর বাচনিক আত্মপ্রকাশ তাই তার সংলাপের ভাষায় সামাজিক স্তরান্তরের ছাপ পড়াটাই স্বাভাবিক। লোকনাট্যের সংলাপগুলিকে সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকেও বিচার করা দরকার। যেহেতু এই গাজনপালাগুলির উদ্ভব দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তাই এর সংলাপের ভাষা আলোচনা করতে গেলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষাতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সাপেক্ষে গাজনপালার সংলাপের ভাষা-

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনকে যে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় সেগুলি হল—

ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন

১) ন ও ল কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন করে। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে - গুয়েপুলিশ—"বুটের খোসা, শুকনো নোংকার খোসা বেরিইচে"। লংকার > নোংকার। প্রধান সাহেব—"নাত বউ বলচে, দাদু গো এতো বিষ্টি হচ্চে গে লাবোনি, ছোট ঘর আমি খাটের উপরে থাকি তুমি খাটের নীচে থাকো"। নাবোনি> লাবোনি।

৩) ক্রিয়ানিষেধে 'না' স্থলে 'নি' র সম্প্রসারিত ব্যবহার হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে - বৃদ্ধা—"তা আমাদের চোকের সামনে বৌমার পনাম কললি আর বুড়ো বাপের এটটা শেষ পনাম কত্তে পাললিনি?" পারলিনা > পাললিনি

৪) ঘটমান বর্তমান যা অতীতে 'ছ' বিভক্তির বদলে 'তেছ' বিভক্তির ব্যবহার হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে- বাবা—"...দার্জিলিং পাহাড় জ্বলতেছে, শোশ্মানের চিতা জ্বলতেছে এবার আমার সোংসারে আগুন জ্বলবে"। জ্বলছে> জ্বলতেছে

৫) কখনো কখনো 'তেছ' 'তিছ' হয়ে যায়। যথা—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার ছকে রয়েছে- রতন কাকা—"ফের শুনতিছি"

৬) 'ছিল' পরিবর্তিত হয়ে 'ছেল' বা 'ছ্যালো' হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে- গুয়েপুলিশ—"পোদান ঘরের ভেতর ইট গাঁতছেল"। গাঁতছিল > গাঁতছেল।

৭) কখনো কখনো আনুনাসিক আকার 'অ্যাঁ' হয়ে যায়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে- গোবর্ধন—"গ্রামগঞ্জে জ্বলবে আলো আসবে টিউকল, ব্যাকারদের চাকরি দোব হাঁসপাতালের ফল"। হাসপাতাল > হাঁসপাতাল।

৮) 'ইয়ে' সংকচিত হয়ে 'এ' হয়ে যায়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে- গুয়েপুলিশ—"...সাধারণ মানুষের জন্য দুটাকা করে চাল দিচ্চে সেই চাল খে মানুষ কোতায় হাগবে তার জন্য পায়কানা দিচ্চে"। খেয়ে > খে।

৯) 'ইয়া' এর উচ্চারণ 'অ্যা' হয়ে যায়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে- লিচুর স্বামী—"ওর বউ চলে গেচে বলে ও আমার জীবনটা শেষ করতে অ্যায়চে"। এইয়েচে > অ্যায়চে।

১০) স্বরসঙ্গতিতে অধিকরণে ও সম্বন্ধে 'এ' এর জায়গায় 'ই' এবং 'এর' এর জায়গায় 'ইর' হয়। যথা-

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ছকে রয়েছে- খনা—"ধার দেনা করে এনিচি"। এনেচি > এনিচি

দাদা—"ভাসুরির খন্তির বারি ঝাড়বে?"। ভাসুরের > ভাসুরির

১২) ক্রিয়াপদের 'আ', 'ই' স্থানে অভিশ্রুতি দ্বারা এ হয়ে যায়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে- খনার স্বামী-"লি-লি-লি-লি- কি করতেছে?" করিতেছে > করতেছে।

খ) রূপতত্ত্ব

১) কর্ম সম্পাদনে এক বচনে 'রে' বিভক্তি হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকে রয়েছে- বড় ছেলে—"আমি তোরে অভিশাপ কচ্চি, তোর সারা গায়ে দাদ, হাজা, চুলকানি, একজিমা ভত্তি হয়ে যাবে"। তোকে > তোরে।

গ) বাক্যতত্ত্ব

ধ্বনিগত পরিবর্তন- চার ধরনের। যথা- ১) ধ্বনির আগম, ২) ধ্বনির লোপ ৩) ধনির রূপান্তর এবং ৪) ধ্বনির স্থানান্তর

১) ধ্বনির আগম–

ক) আদি স্বরাগম যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- গুয়েপুলিশ—“...সেই সোন্তান যকন পাইমারী ইস্কুলে যাচ্চে তকন তাকে হাওয়া দাওয়া পোশাক সব ফি দিচ্চে”। স্কুলে > ইস্কুলে

খ) মধ্য স্বরাগম যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- গুয়ে পুলিশ—(গানে) “রাত্তিরে ঘুম আসেনা এবার বুঝি যাব মরে।” রাত্রে > রাত্তিরে

গ) অন্ত্য স্বরাগম যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- হ্যান্ডেলের বউ—“না আমি ও শাঁখা পরবনি”। পরবনা > পরবনি

২) ধ্বনির লোপ—

ক) আদি স্বরলোপ- ঐ চারটি দলের পরিবেশনে কোথাও ত্রুটি পাওয়া যায় নি।

খ) মধ্য স্বরলোপ যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের রয়েছে- সন্ন্যাসী—এই বার তোর বোর ধরে আমি খাব”। বউ এর > বোর

গ) অন্ত্য স্বরলোপ যথা—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলে রয়েছে – নায়কের ভাতৃবধূ—“আজকে তোর ওই পোচা খালে নে গে ডুবিয়ে ফেলব”। নিয়ে > নে, গিয়ে > গে।

ঘ) আদি ব্যঞ্জনলোপ যথা—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- খনার স্বামী—“পতম মাসের মাইনে দোব না”। প্রথম > পতম

ঙ) মধ্য ব্যঞ্জনলোপ যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- গুয়ে পুলিশ—“আমার তালে ছেড়ে দিবি তো?” তাহলে > তালে।

চ) অন্ত ব্যঞ্জনলোপ – যথা—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- গোয়াল > গোল , দেয়াল > দেল, পরিস্কার > পোস্কার

৩) ধ্বনির রূপান্তর

ক) অ > অ্যা হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে-পাপিয়ার বাবা—“আরে ভহরির হাতে কপি খেলে ন্যায় মন প্রাণ একবারে ঠান্ডা হয়ে যাবে”। নয় > ন্যায়।

খ) এ > অ্যা হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- নায়িকা—“দ্যাখ তোদের মতন ছেলেদের চিনতে মোটেও বাকি নেই”। দেখ > দ্যাখ

গ) আ > এ হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- বড় ভাই ছোট ভাইকে—“তোর বউদির পায়ের আঙুল কেমড়ে ধর”। কামড়ে > কেমড়ে।

ঘ) এ > ই হয়। যথা—

নিউ নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- নায়কের বৌদি—“যেই হাঁকি মেরিচি”। হাঁকি মেরেচে > হাঁকি মেরিচি।

ঙ) ঋ > ই হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- বৃদ্ধ বাবা—“এই খোকা যে মা তার সন্তানের জন্য গর্ভযন্তনা সহ্য করে এই পিথিবির আলো বাতাস দেখালো ... নিজের মাকে তুই মারতে পারলি খোকা?” পৃথিবীর > পিথিবির

চ) ও > উ হয়। যথা—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- ছোটভাই—“...থাকতে পারবুনি”। পারবোনা > পারবুনি।

জ) ল > ন এবং ন > ল হয়। যথা—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- হ্যান্ডেলের বৌ—“তা লাবতে গিয়ে তো পড়িচি”। নামতে > লাবতে

ঝ) স বা শ > ছ হয়। যথা—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- ছোটভাই-(গানে)—“আমি তিন দিনেতে করব ছ্যাদ্দ মালসার ভাত খাব না”। শ্রাদ্ধ > ছ্যাদ্দ

সমীভবন

প্রগত সমীভবন হয়। যথা—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- গোবিন্দ—“এই মে রা ইজ্জত বিক্কিরি করে সোস্তা দামে হাটে”। বিক্রি > বিক্কিরি।

পরাগত সমীভবন হয়। যথা—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- হ্যান্ডেল-(গানে)— "...তোর একটা ঠ্যাং খোঁড়া কোদ্দোব কি করবে তোর বাপ?"। করেদোব >কোদ্দোব।

অনন্য সমীভবন হয়। যথা—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- গোবিন্দ—"ওই তো বেশিদিন হয়নি পনেরোদিন হল উনি মদ খেয়ে এসে পেচ্ছাপ করে শুয়েছিল আমি ঠ্যাং ধরে টেনে এনে গুদোম ঘরে ঢুকিই দিলুম"। প্রস্বাব > পেচ্ছাপ।

বিষমীভবন ঘটে। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- গোবর্ধন-(গানে)—"তবু আমি কাটি যে ঘর,সবাই করে দিলো পর শরীলের উত্তেজনা একটুও থামেনা"-শরীরের > শরীলের

ঘোষীভবন ঘটে। যথা—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- মনির মা—" আমার স্বামী কার না উবগার করেনে"। উপকার > উবগার

অঘোষীভবন ঘটে। যথা—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- ছোটভাই—"ফোস্কা উটেগেচে ... আজগেরে"। আজকেরে > আজগেরে

অল্পপ্রাণীভবন ঘটে। যথা—

খ > ক হয়। যেমন—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- বড় বউ(গানে)—"স্মরনেতে প্রানে লেকা রবে"। লেখা > লেকা

ছ > চ হয়। যেমন—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- হাবলদার-" কি মদু আচে?"। আছে > আচে

থ > ত হয়। যেমন—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- গুয়ে পুলিশ—"জেলে ঢোকাবো কোনো কতা নয়"। কথা > কতা

ফ > প হয়। যেমন—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- পাপিয়ার বাবা ভজহরিকে-"আমার সঙ্গের টিপিনটা বানিয়ে দে"। টিফিন > টিপিন

ঝ > জ হয়। যেমন—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- গুয়েপুলিশ—"মাজে মাজে পুঁইশাকের খাড়া বেরিইচে"। মাঝে মাঝে > মাজে মাজে

ধ > দ হয়। যেমন—

আদি শিবশক্তি গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- নায়িকা—"মাই নেম ইস মদু"। মধু > মদু

ভ > ব হয়। যেমন—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- কমিটির লোক—"এর এতো বড় টাকার লোব যে কটা টাকার বিনিময়ে নিজের মাকে মেরে ফেলে দিতে পারে মাদাম!"। লোভ > লোব

নাসিক্যভবন ঘটে। যথা—

আদি শিবশক্তি গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- খলনায়ক—"ভালোবাসা ছেড়ে যায় সুখের বাঁসা"। সুখের বাসা > সুখের বাঁসা

স্বতোনাসিক্যভবন ঘটে। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- গোবর্ধন—"গ্রামগঞ্জে জ্বলবে আলো আসবে টিউকল,ব্যকারদের চাকঋ দেব হাঁসপাতালের ফল"। হাসপাতাল > হাঁসপাতাল।

মূর্ধণ্যীভবন ঘটে। যথা—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- বাখারি—"যে পুত্র   দেকতেচে সে বমি করে বাড়ি আসটেচে"। আসতেছে > আসটেচে

রেফ > বর্ণদ্বিত্ব হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- গোবর্ধন-" এ নাত বউ এক কাজ কর- আমার দুমরে নে ঐ গত্তে আবার ঢুইকে দে"। গর্তে > গত্তে

ব্যঞ্জন বর্গান্তর হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- নায়কের বৌদি—"ওরে দিদিমনির থেকে বড় ডাক্তাররে, বিনে খরচে চিকিচ্ছে করাবে,এ সুযোগ ছাড়লে হবে না" চিকিৎসা > চিকিচ্ছে

শব্দ সংকোচন হয়। যথা—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- হ্যান্ডেলের বউ—"শুন আমার দেরী হইচে, তুমি তাতাড়ি দিয়ে দাও তো"। তাড়াতাড়ি > তাতাড়ি

রফলার সরলীকরণ হয়। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- মেজ ছেলে—"পয়োজনে কামড়াব"। প্রয়োজন > পয়োজন

ধ্বনির স্থানান্তর

বিপর্যাস ঘটে। যথা—

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলে রয়েছে- নায়ক নায়িকাকে—"আমার মাল কি হল? ও পিচাশিনী"। পিশাচিনী > পিচাশিনী

অপিনিহিতি ঘটে। যথা—

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- ছোটভাই—"... চোকে আঙুল ঢুইকে দেবে"। ঢুকিয়ে > ঢুইকে > ঢুকে

ক্রিয়াপদিক বৈচিত্র্য

ক্রিয়ার ঘটমান বর্তমানে : তেচে , তোচো, তেচেন এরকম হয়। যেমন-

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- হাবলদার—"কোতায় আসতিচি"। আসছি > আসতিচিঁ

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- ছোটভাই—"কোতায় রাকতেচে"। রাখছে > রাকতেচে

শিষ্ট চলিতে উত্তম পুরুষের ভবিষ্যত কাল গঠনে ভবিষ্যত নির্ধারক 'ব' এর পর 'না', 'নি' তে এবং ভবিষ্যত নির্ধারকের গায়ে 'উ' যুক্ত হয়। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- খনার স্বামী—"...টাকা দুবুনি"। দেবনা > দুবুনি

প্রথম পুরুষের নঞর্থক বর্তমান কালের ক্ষেত্রে 'ধাতু + এ' র সঙ্গে 'নি' যোগ হয়। সেই 'নি', 'নে'তে রূপান্তরিত হয় এখানে। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- মনির মা—"আমার স্বামী কার না উবগার করেনে"। করেনি > করেনে

তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের নঞর্থক ভবিষ্যতকাল গঠিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'না' এর বদলে 'নি' হয়। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- হাবলদার—"বুইতে পারিনি"। পারিনা > পারিনি

তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীতে তুচ্ছার্থক 'স' ব্যবহৃত হয় শিষ্ট বাংলায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'স' অনুপস্থিত থাকে। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলে রয়েছে- খনা—অ"......জোগাড় করিচি"। করেছিস > করিচি

চলিত বাংলায় 'দেখা' ক্রিয়াপদ যখন যৌগিক ক্রিয়ার একটি অংশে পরিনত হয় তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় 'দেখি' এর জায়গায় 'দেন' হয়। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলে রয়েছে- হ্যান্ডেল—"কেন বলদেন?"। বলদেখি > বলদেন।

সংলাপের মধ্যে তুলনার ব্যবহার:

উক্ত চারটি দলের পরিবেশনায় সংলাপের মধ্যে তুলনার ব্যবহার বিষয়টি বেশ কয়েকটি ছকে লক্ষ্য করা যায়। নানা রকম ভাবে এটি ঘটে-

কোনো ব্যক্তির সাথে কোন বস্তুকে তুলনা করে সংলাপ প্রয়োগ করা। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়ক যখন নায়িকা মধুর কাছে মধু চায় তখন নায়িকা তাকে ভুল বোঝে। সে ভাবে যুবক কু-ইঙ্গিত করছে। তাই রেগে গিয়ে বলে- "মারব রাসকেল দেব মুক চিরে।" তখন নায়ক তার উত্তরে নায়িকার রাগের মাত্রাকে ইঙ্গিত করে বলে— "ওরে হাইবোল্টেজ শটে জ্বালা ধরে।" আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে যখন পাত্র বিয়ের আগে পাত্রীর মায়ের সাথে এক রাত এক ঘরে কাটিয়ে তার চরিত্র যাচাই করে নিতে চায় এবং জানায় এতে সে বুঝবে যে তার মেয়ের চরিত্রও ঠিক আছে কিনা। কারণস্বরূপ পাত্রীকে ডালিমের সাথে তুলনা করে বলে—"ডালিম গাছে লাগলে পোকা, ডালিম হয় দরকচা।" আবার কখনো তাকে ননীর সাথে তুলনা করে বলে— "ননীর ডেলা না গলালে হয় না গাওয়া ঘি।"

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে যখন ভাতৃবধূ দেওরকে এক রাতে দশবার বাইরে (প্রস্রাব করতে) যেতে দেখে চিন্তিত হয়ে বলতে চায় এতে তার শরীর খারাপ ও দুর্বল হয়ে যাবে তখন তাকে ব্যাটারির সাথে তুলনা করে বলে—"এতো বড়ো ছেলে এক রাতে যদি দশবার বাইরে যায় তা তার কি থাকে? এই কচ্চে, ব্যাটারি পুরো সাদা হয়ে গেচে।" ঐ ছকেই যুবক তার বৌদিকে বলে— "বৌদি, একটা গাড়ীর যদি পাঁচ টোন মাল নিমাবার ক্ষমতা থাকে তা সে গাড়ীই যদি দশ টোন মাল চাবানো যায়, গাড়ীটার কি অবস্থা হবে?" নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে যখন পুত্র ও পুত্রবধূর অবহেলায় অবহেলিত বাবা অভিমান করে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে সংসার, বাবা-মা, স্বামী এগুলির গুরুত্ব বোঝায় তখন বৃদ্ধ বলে—"ওগো বউমা নূপুরের দাম হাজার টাকা তার স্থান হল পায়ে, সিদূরের দাম একটাকা কিন্তু তার স্থান হল কপালে কারণ ওটা যে স্বামীর দেওয়া সিঁদুর। ওগো বউমা যে নিমের মতন তিতকুটে জ্ঞান দেয় সে কিন্তু প্রকৃত বন্ধু। ইতিহাস সাক্ষী আছে। নিমে কখনো পোকা হয়না কিন্তু মিষ্টিতে প্রতিদিন পোকা ধরে। ওরে খোকা যে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৃত মানুষকে স্মরণ করা হয়। সেই মোমবাতি নিভিয়ে কিন্তু জন্মদিন পালন করা হয়। মানুষ সোজা পথে চলতে চায়না রে খোকা কিন্তু বাঁকা পথের প্রতি সবাইয়ের আগ্রহ। ওই জন্যই তো, ওই জন্যই তো যারা মদ বিক্কিরি করে তাদের কখনো গ্রামে-গ্রামে ঝুঁকতে হয়না কিন্তু যারা দুধ বিক্কিরি করে তাদের গ্রামে-গ্রামে ঝুঁকতে হয়। আমরা যকন দুধওলার কাচ তে দুধ নি তকন তাকে সর্বদাই বলি 'ওগো দাদা তোমার দুধে জল মেশানো নেই তো?' কিন্তু মদে? আমরা নিজেরাই জল মিশিয়ে খাই। ওরে খোকা আজ পর্যন্ত মানুষকে অতটুকুই বুঝলাম যাকে জানোয়ার বললে সে খুব রেগে যায় আবার সিংহ বললে সে খুব খুশি হয়। তাবলে মানুষ কি মানুষ?"

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে প্রেমের প্রগাঢ়তার মেয়াদ বেশি হয় না একথা বোঝাতে ভৃত্য গোবিন্দ তার দিদিমণি ও তার প্রেমিক ওয়াংচুকে উদ্দেশ্য করে বলে যে বাল্বের ভোল্টেজ বেশি থাকলে সে বাল্ব কেটে যাবে। ঐ ছকেই সুন্দরী মেয়ের সাথে প্রেম করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া ব্যক্তিকে ভিখারি বোঝাতে চায় যে মেয়েটির চাহিদা ও লোভ অনেক। তাকে আরও সর্বস্বান্ত করে তবে সে ছাড়বে তাই সে বলে—"তালে এর কোলেস্টেরল তো পোচুর গভীররে। ও কোলেস্টেরল ভত্তি হয়নি। তোর টাকের চুল কটা দিয়ে তবে তো পূরণ হবে।"

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে ফেঙ্গিকে টেস্ট করে বিধ্বস্ত ভাবে ঘর থেকে চেটো ও ফেঙ্গি বেরিয়ে আসার পর ফেঙ্গির দিদিমা লিচু তাদের অবস্থা দেখে ফেঙ্গিকে বাল্বের সাথে তুলনা করে বলে—"বাল্ব দেকিচি? বাল্ব? ওরে মা বেশি ভোল্টেজ আসলে ফোটাশ করে ফেটে যাবে আর দম থাকবে না।" তখন চেটো নিজেকে হ্যালোজেনের সাথে তুলনা করে বলে—"হ্যালোজেন আচে, ফোটাশ করে টেনে নেবো।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে ভৃত্য ও পালক হরিকাকা পুত্রসম সঞ্জয়কে তার স্ত্রী মনিকে উদ্দেশ্যে বলতে যায়-"এমন চুম্বক আনলি ঘরে লোহায় ছাড়ায় জং।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে লোনের অফিসার টাকা চেয়ে আদায় করতে না পেরে খনাকে শাস্তির ইঙ্গিত দিয়ে বলে— "ওরে বাবা কি যে করি/ শেষে পয়সা কড়ি"। অফিসার— "চার্জ না দিলে ব্যাটারি/পড়বে সেল পিঠে পড়বে বাড়ি"। এরপর বুঝিয়ে বলে— "যখন নতুন ব্যাটারি কিনে আনা হয় সেই ব্যাটারি বসিয়ে রাখলে সেই ব্যাটারির সেল বসে যায়। সেই সেল বসা ব্যাটারি যদি জল পাল্টে আর সেল পাল্টে যখন চার্জে বসানো হয়। তখন ঐ ব্যাটারি গড় গড় করে চলে।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে মৃত বাবার সোনার কলমের অংশীদারিত্ব নিয়ে দুই ভাই ও তাদের দুই বউ এর মধ্যে বাকবিতন্ডার সময় ভ্রাতৃবধূ তার ভাসুরকে অপমানজনক কথা বলায় ছোট ভাই দাদাকে বলে—"দাদা, সাপের গায়ে পা দিলে সাপ তো ছোবল মারবেই।" ঐ ছকেই ঝগড়ার সময় ভ্রাতৃবধূ মন্দোদরীর কণ্ঠস্বরের তীব্রতা নিয়ে তার ভাসুর বলে— "রাস্তায় এক একটা মটর গাড়ি খুব শব্দ হয়। সেগুলোর আসলে সাইলেন্সার পাইপ ফাটা। ভাই ও যা বউ এনেছে সেই সাইলেন্সার"।

গাজনপালার সংলাপের মধ্যে ছন্দের ব্যবহার

গাজনপালার সংলাপের মধ্যে কবিতা, ছড়ার ব্যবহার যেমন সংলাপকে আকর্ষণীয় করে তোলে তেমনি সংলাপের মধ্যে ছন্দের ব্যবহার করেও সংলাপকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। কখনো তা একক

সংলাপেই লক্ষ্য করা যায় আবার কখনো কথোপকথনের মধ্যে অন্ত্য মিল সংলাপকে শ্রোতা ও দর্শক মনে আকর্ষণীয় করে তোলার কাজে ব্যবহার করেন পালাকার। যেমন—

ছকের নাম ঘোষণা করার সময়ও কখনো কখনো ছন্দের ব্যবহার হয়। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে পালা শুরুর আগে পালার নাম ঘোষণায় এরকম ভাবে ছন্দের ব্যবহার হয়েছে —

"মরছে মানুষ মরছে দেহ

নিঃশ্বাস ছাড়েনি মায়া

প্রতিশোধের আশায় আজও

'রক্ত পিপাসু কালো ছায়া'।"

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে গোবিন্দ কেচে কেচে জামার দাগ তুলতে না পেরে দিদিমনিকে বলে—গোবিন্দ—"...আমরা কি দাগ দেখিনি? কত রকমের দাগ আচে—কলার দাগ, কচুর দাগ, পানের দাগ, পিচের দাগ, বিভিন্ন রকমের দাগ আচে। এ কি দাগ গো?..."

ঐ দলের সপ্তম ছকের শুরুতে নায়ক হ্যান্ডেল নিজের পরিচয় কথা বলতে গিয়ে বলে—

"এক ছোবলেই পড়ে গেল সাড়া

কেউ দেকেচো? একটা হরিণের চারটে হাঁড়া?

পারবে না দেকতে। আমি ইল্লা

এক ছোবলেই হয়েযাই গিল্লা।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে সঞ্জয় সম্পর্কে ভৃত্য হরিকাকা বলে—

হরি—"যেমন তেমন বাবু বউয়ের কাচে কাবু।"

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের অষ্টম ছকে মাতঙ্গিনীর স্বামী সন্ন্যাসীর কাছে পরিচয় জানতে চাইলে সে বলে

সন্ন্যাসী— "না ঘর হ্যায় না ঠিকানা

নীচে জমিন উপরে আশমা"

কখনো দুজনের কথোপকথনও ছন্দে হয়। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাদের কথপোকথন হয় এরকম—

নায়ক মশা (ডেঙ্গু)— "তুই ভালো আমি ভালো। শালা মদনের বেটা ভালো না। তুমি ময়না?"

ময়না— “yes”

মশা— “একবালতি দাও না!”

ময়না— “any problem?”

মশা— “কে বললে?”

ময়না— “Who are you?”

মশা— “সাইকেল ভেঙে ফেলিচি”

ময়না— “Who is this?”

মশা— “সরকার এত বাতরুম দিয়েচে। বাইরে করিনা হিস।”

ময়না— “What is the matter?”

মশা— “কোতায় পাব ভাঙা গিটার?”

আবার পরবর্তী কথোপকথন—

মশা— “তোমায় ধরে নিয়ে যাব ঘরে”

ময়না— “মানে?”

মশা— “প্যাকেটটা নেব ভরে”

গাজনপালার সংলাপে কবিতার ব্যবহার

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বর্তমান পেশাদারি দলগুলি যে সব নিবেদন করেন সেগুলির অধিকাংশেরই পালাকার গ্রামের মানুষ হলেও সাহিত্য, সঙ্গীত বিষয়ে সারাবছর যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হন তাই তাদের রচনায় যেমন সাহিত্যগুণের প্রকাশ মেলে তেমনি সমকালীন আধুনিকতার ছোঁয়াও পাওয়া যায়।

কবিতা সেই রকমই একটি আঙ্গিক যা এই পালা রচনার অন্যতম বিষয়। নামকেন্দ্রিক কবিতা রচনা ঘোষণার সময় পালাকে দর্শকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে। আবার সংলাপের মাঝে মাঝে শ্লোক, কবিতা, ছড়ার ব্যবহার সংলাপকে দর্শক মনে মনোগ্রাহী করে তুলতে সাহায্য করে।

সংলাপের মধ্যেকার কবিতা কখনো হয় রচয়িতার সম্পূর্ণ স্বরচিত আবার কখনো কোন কবিতা বা ছড়াকেই হুবহু ব্যবহার করা হয় কাহিনির সাথে সামঞ্জস্য রেখে। কখনো আবার কোনও জনপ্রিয় কবিতা বা ছড়াকে আংশিক অনুকরণ করা হয় আবার কখনো জনপ্রিয় কোন কবিতা বা

ছড়াকে পুরোটাই ব্যবহার করা হয়। উক্ত দলগুলির পরিবেশনের মধ্যে কবিতার ব্যবহার আলোচনা করা হল।

পালার নামকে কেন্দ্র করে কবিতার মাধ্যমে দর্শকদের কাছে সেটি প্রয়োগ করা হয় কখনো ঘোষণার সময়, কখনো ছকের শুরুতে, কখনো সংলাপের মাঝে অভিনয় চলাকালীন আবার কখনো অভিনয় শেষে। যেমন—

পালার শুরুতে ঘোষণার সময়- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম নিবেদন—

"জীবনের রঙ্গমঞ্চে শুধু অভিনয় করে গেলাম
'কর্মের শেষ পর্বে ভালোবেসে কি পেলাম'।"

দ্বিতীয় নিবেদন (শুরুতে ঘোষণা)— "সত্যের সারথি অনাদির আদি
প্রেম ডোরে রাধা বাঁধে
সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ ধরে —
'পৃথিবী আজও কাঁদে'।"

তৃতীয় নিবেদন— "সত্য সমাজ চেয়ে দেখো আজ
অসহায়ের চিতা জ্বলে —
নির্মম ঘায়ে বধূ হত্যার দায়ে
'স্বামী যাচ্ছে জেলে'।"

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ছকের মাঝে পালার নাম এবং নামকেন্দ্রিক কবিতার ব্যবহার হয়েছে। যথা-

শয়তান— "রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয়, বহুদিন অভুক্ত
তব তাজা রক্ত, 'ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত'।"

শয়তান — "বৃথাই আস্ফালন, রণ রণাঙ্গনে
বিথীকা বিজনে অবিরাম অবিরত"

(ছকের একেবারে শেষ সংলাপ) "মরমে মর্মিত, প্রতিহিংসায় দণ্ডিত
'ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত'।"

ঐ দলের অষ্টম বা শেষ নিবেদনের নাম- 'মৃত্যু শয্যায় বিয়ের বাসর'। ছকটির প্রায় শেষ অংশে সন্ন্যাসীর সংলাপের মধ্যে উল্লেখ করা হয়— "তোমার মাকে ভালোবেসে বন্ধ হল সদর
না জেনে প্রাণ কেড়ে নিল মৃত্যু শয্যায় বিয়ের বাসর"।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম নিবেদনের আগে ঘোষণার শেষে এবং ছক অভিনয় শুরুর পূর্বে গান হয়, গান চলাকালীন চরিত্ররা মঞ্চে প্রবেশ করে, গানটির মধ্যেই পালার নাম উল্লেখ করা হয়- 'মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম'

সাধু বেশী শয়তান
কৌশলেতে যায় প্রান
অত্যাচারী প্রতিশোধে তার
'মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম' (৩বার)
কতকাল গেছে ঝরে
পাপীর অত্যাচারে"

পালার শেষ দৃশ্যে রাণীর সংলাপের মধ্যে কবিতার মাধ্যমে পালার নাম উল্লেখ করা হয়—

"পুত্রকে জন্ম দিয়ে কি চেয়েছি কি যে পেলাম
দুষ্ট দমন রাজ্য শাসনে মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম"।

প্রথম পর্বের শেষে এবং দ্বিতীয় পর্বের শুরুর আগে ঘোষণার মধ্যে কবিতার মাধ্যমে পালার নাম উল্লেখ করা হয়- "সন্তানকে জন্ম দিয়ে কি চেয়েছি কি যে পেলাম

দুষ্ট দমন রাজ্যশাসনে তাই —
'মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম'।"

দ্বিতীয় নিবেদনের শুরুতে যশোদা কৃষ্ণকে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে, তার সংলাপের মধ্যেই কবিতার মাধ্যমে পালার নাম উল্লেখ করা হয়- "ওরে মোর নয়নের মণি

'আঁচলে বাঁধা আলো'
প্রদীপ হয়ে জ্বলবিরে তুই
করবি সবার ভালো।"

নাট্যমন্দির গাজন তীর্থ দলের প্রথম নিবেদনে পালা অভিনয় শুরুর আগে ঘোষণার সময় এবং পালার শেষ দৃশ্যে মঞ্চের পিছন থেকে কবিতার মাধ্যমে পালার নাম উল্লেখ করা হয়-

"মরছে মানুষ মরছে দেহ
নিঃশ্বাস ছাড়েনি মায়া
প্রতিশোধের আশায় আজও
'রক্ত পিপাসু কালো ছায়া'।"

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পালাটির নাম- 'ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত'। ছকের মাঝে সংলাপের মাধ্যমে পালার নাম উল্লেখ করা হয় শয়তানরূপী খলনায়কের সংলাপে এইভাবে-—"রক্ত, মৃত্যুকে

করিয়া পদদলিত, রক্তের নেশায় হইয়াছি উন্মত্ত, মনে কি পড়ে? পঁচিশ বছর আগে, কত তাচ্ছিল্য বাক্য, মরমে মর্মিত, প্রতিহিংসায় দগ্ধিত, ‘ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত’।”

শয়তান—“রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত হৃদয়, বহুদিন অভুক্ত
তব তাজা রক্ত, ‘ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত’।”

শয়তান— “বৃথাই আস্ফালন, রণ রণাঙ্গনে
বিথীকা বিজনে অবিরাম অবিরত”।

এবং একেবারে শেষ সংলাপে- মরমে মর্মিত, প্রতিহিংসায় দগ্ধিত
‘ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত’।”

গাজনপালায় ভণিতা প্রয়োগ

কাব্য কবিতা বা গানের শেষে রচয়িতা কৌশলে নিজের নামটি সুন্দরভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন। এই কৌশলটিকেই ভণিতা বলা হয়। যেমন—বৈষ্ণব পদাবলির খুব প্রচলিত একটি রীতি এটি।

লোকনাট্য গাজনপালাতেও ভণিতা প্রকাশের রীতির বহুল প্রচলন রয়েছে। ছকের মধ্যে কোনো এক সময় কৌশলে নিজের নাম প্রকাশ করেন পালাকার। তবে এমন নয় যে একেবারে অন্তিমে তা প্রকাশ পায়। গানের মাধ্যমে ভণিতায় পালাকারের নামপ্রকাশ গাজনপালার খুবই প্রচলিত রীতি। নামের আগে ‘মাস্টার’, ‘ডাক্তার’ ‘কবি’ বিশেষণগুলি কখনো কখনো যুক্ত হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বর্তমানে কয়েকজন জনপ্রিয় পালাকার হলেন নরেশ অধিকারী, প্রফুল্ল সরদার, রামকৃষ্ণ বৈদ্য, ডাক্তার জগন্নাথ গায়েন, অশ্বিনী নাইয়া প্রমুখ। যেভাবে এনারা এনাদের রচনায় ভণিতা ব্যবহার করেছেন উক্ত দলগুলির পরিবেশনা আলোচনায় তা বিশ্লেষণ করা হল। যথা—

অনেক সময় রচনাকারগণ ভণিতায় নিজেদের নামের আগে পেশাগত বিষয়টি ‘ডাক্তার’, ‘মাষ্টার’ প্রভৃতি উল্লেখ করেন। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়িকা মধু নামের যুবতী খরা অঞ্চলে সার্ভে করতে এসেছে। নায়ক মধুর সন্ধানে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ ও ভুল-বোঝাবুঝি হয়। অবশেষে সমস্যার সমাধান হওয়ার পর নায়কের ভাতৃবধূ এবং নায়িকার গানের মাধ্যমে ভণিতা প্রকাশ পেয়েছে।

ভাতৃবধূ— “ডাক্তার জগন্নাথ কয় সবই হল বোঝার ভুলে”[২৭]

মধু— “তাই ক্ষমা করো বৌদি আমি যাব চলে।”

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে জগন্নাথ মাখালের মেয়ের প্রেমিক একটা শর্তে বিয়েতে রাজি হবে বলে। সেটি হল- বিয়ের আগে সে তার হবু শ্বশ্রুমাতার সাথে এক রাত কাটাতে চায়। এতে

সে তার হবু স্ত্রীর চরিত্র বুঝতে পারবে। জগন্নাথের স্ত্রী একথা শুনে প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়। তখন মাতা ও কন্যার গানের মাঝে ভণিতা প্রকাশ—

কন্যা — মাস্টার পফুল্ল (প্রফুল্ল) বলে এসব কথা ভালো লাগে না”[২৮]

মাতা — “আমারে যা ঢোকাচ্ছিস আর ঢোকাস না।”

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে শহুরে যুবতী নায়িকা গ্রামে সরকারি কাজে এসেছে। নায়ক গ্রামের অশিক্ষিত যুবক ‘ইউরিন’ নিয়ে যাচ্ছিল মধুমেহ রোগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য। পথে নায়িকার সাথে দেখা, ভুল-বোঝাবুঝি এবং পরিচয় পাওয়ার পর লজ্জিত নায়ক ক্ষমা চেয়ে গান ও সংলাপের মাঝে ভণিতা প্রকাশ হয়েছে—

নায়ক— “ডাক্তার জগন্নাথ গায়েনে বলে” (গান)[২৯]

নায়িকা— “কি বলে?” (সংলাপ)

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্টম ছকে তিশার উপর বধূ নির্যাতনের ফলে তার মৃত্যুর পর তার ভাইরা কাঁদতে কাঁদতে জনগণের উদ্দেশ্যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বলে—

“কবি নরেশ ভেবে বলে[৩০]
কেউ কোরোনা এ ভুল মেয়ের ঘরে
এমনি যাবে অকালে।” (নরেশ অধিকারী)

অনেক সময় গীতিকার ভণিতায় নিজের নামের সাথে ছকের কাহিনিকারের নামও উল্লেখ করেন। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকে রাধা আয়ানকে লুকিয়ে কৃষ্ণের কাছে আসার অপরাধে আয়ান রাধারাণীকে কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করে কিন্তু রাধা পরপত্নী তাই কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেন না। যদিও রাধারানী মহালক্ষ্মী এবং কৃষ্ণ অংশে তার জন্ম। একথা জানিয়ে একেবারে শেষ অংশে গানে গানে কথোপকথনের সময় কৃষ্ণের বক্তব্যে ভণিতা প্রকাশ পেয়েছে —

কৃষ্ণ—“কৃষ্ণ অংশে জন্ম তোমার, তুমি মহালক্ষ্মী
স্বপন গায়েনের বাণী, অশ্বিনীর কাহিনি [৩১]
তুমি স্বপ্নে গড়া মোর প্রতিমা
নানা চাইনা চাইনা তোমার প্রেমের পত্নী
ফিরায়ে নাও কেঁদো না।”

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে পুত্রবধূ শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি তাচ্ছিল্যকারী। সে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তার শ্বশ্রুপিতার কণ্ঠে গানের মাঝে ভণিতা প্রকাশ পেয়েছে।

পুত্রবধূ– "যা ইচ্ছে তাই করব আছে বডি ফিটনেস"

শ্বশুরপিতা– "গেছো বাদুর তাল পাতার খাবে আঁটি সমেত"

পুত্রবধূ– "মহাদেবের গল্পে গাঁথা জগন্নাথের গান"[৩২]

ভণিতায় কখনো গীতিকার নামের সাথে পদবীও উল্লেখ করেন। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচুর ঘরে রাত্রি বেলায় স্বামী ফিরে এলে প্রধান সাহেব ও গুয়েপুলিশ তার হাতে ধরা পড়ে যায়। তখন স্বামী ও তাদের সঙ্গে কথোপকথনে ভণিতা প্রকাশ হয় –

গুয়ে পুলিশ– "গোলা যাচ্ছে শুকিয়ে দাদা

জল দেনা একটু খাব।"

স্বামী–"এ...ই – অশ্বিনী নায়েরে বলে[৩৩]

সহজে কি ছেড়ে দেব ?"

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকে রাধা আয়ানকে লুকিয়ে কৃষ্ণের কাছে আসার অপরাধে আয়ান রাধারাণীকে কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করে কিন্তু কৃষ্ণ পরপত্নীকে গ্রহণ করেন না। যদিও রাধারানী মহালক্ষ্মী এবং কৃষ্ণ অংশে তার জন্ম। একথা জানিয়ে একেবারে শেষ অংশে গানে গানে কথোপকথনের সময় কৃষ্ণের বক্তব্যে ভণিতা প্রকাশ পেয়েছে –

কৃষ্ণ– "কৃষ্ণ অংশে জন্ম তোমার, তুমি মহালক্ষ্মী

স্বপন গায়েনের বাণী, অশ্বিনীর কাহিনি [৩৪]

তুমি স্বপ্নে গড়া মোর প্রতিমা"

তবে অধিকাংশ সময়েই পদবিহীন কেবলমাত্র নামই ভণিতায় উল্লেখ থাকে। যেমন–

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের শেষ অংশে সম্পত্তির লোভে পিতার উপর অত্যাচার করে যে ভুল করেছে তা উপলব্ধি হওয়ার পর পুত্র পিতার কাছে ক্ষমা চায়। তখন ভণিতা প্রয়োগ হয়েছে –

পুত্র– "বাবা ভুল করেছি ক্ষমা করো তোমারি ছেলে

সব ভুলে নাওনা টেনে অশ্বিনী বলে।"[৩৫]

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে শ্মশানের উদ্বোধনের দিন প্রথম মৃতদেহের বাড়ির লোকের জন্য অর্থ পুরস্কার আছে, সেই লোভে কনিষ্ঠ পুত্র মাকে হত্যা করে শ্মশানে নিয়ে এলে শ্মশান কমিটির লোক মৃতদেহের প্রমাণপত্র দেখতে চায় এবং পুত্র সেটি দেখাতে অপারক হওয়ায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে আসে। এই দৃশ্যে কমিটির লোকের গানের মধ্যে ভণিতা প্রকাশ পায়–

কমিটির লোক— "সে ফাঁকে করে দিলি তুই মেরে

ধরে নে শাস্তি দাও—অশ্বিনী বলে[৩৬]

আশা করে চাষা মরে, তাই তো লোকে বলে।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে গানে— দিদিমা—"রামকৃষ্ণ লেখে গান, গেল আমার মান।"[৩৭]

কখনো কোনো গীতিকার নিজেই ঐ দলের একজন অভিনেতা হয়ে থাকেন। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচুর ঘরে রাত্রি বেলায় স্বামী ফিরে এলে প্রধান সাহেব ও গুয়েপুলিশ তার স্বামীর হাতে ধরা পড়ে যায়। তখন স্বামী ও তাদের সঙ্গে কথপোকথনের মধ্যে ভণিতা প্রকাশ পায়—

গুয়ে পুলিশ— "গোলা যাচ্ছে শুকিয়ে দাদা

জল দেনা একটু খাব।"

স্বামী — "এ...ই— অশ্বিনী নায়েরে বলে[৩৮]

সহজে কি ছেড়ে দেব ?"

ঐ দলেরই একজন অন্যতম অভিনেতা হলেন অশ্বিনী নাইয়া ।

আবার কখনো গীতিকার ঐ ছকেই কোনো একটি চরিত্রে অভিনয় করেন এবং তিনি মঞ্চে উপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য অভিনেতা গানের মাধ্যমে তার নামটি উল্লেখ করেছেন এমনও হয়ে থাকে। যেমন-

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে শ্মশানের উদ্বোধনের দিন প্রথমে মৃতদেহ আসলে টাকা পুরস্কার আছে সেই লোভে কনিষ্ঠ পুত্র তার মাকে হত্যা করে শ্মশানে নিয়ে এলে কমিটির লোক মৃতদেহের প্রমাণপত্র দেখতে চায়। দেখাতে না পারায় তারা আসল বিষয়টি বুঝে যায়। তখন পুলিশ গ্রেপ্তার করার জন্যে আসে। কমিটির লোকের গানের মধ্যে ভণিতা প্রকাশ পায় —

কমিটির লোক— "সে ফাঁকে করে দিলি তুই মেরে

ধরে নে শাস্তি দাও—অশ্বিনী বলে[৩৯]

আশা করে চাষা মরে, তাই তো লোকে বলে।"

কনিষ্ঠ পুত্রের চরিত্রে অশ্বিনী নাইয়ার নিজেই অভিনয় করেছিলেন।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের অষ্টম ছকে মামা, ভাগ্নি সুস্মিতাকে বিয়ে করতে চাইলে গানের মধ্যে তার বক্তব্যে ভণিতা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে—

মামা—"আজকে রাতে—তোমার সাথে

হবে বিয়ে—মালা বদল করে”

সুস্মিতা— অশ্বিনী ভেবে দেখি গানে বলে[৪০]

মামার সাথে ভাগ্নির এ কাজ হয় কি করে?”

মামা চরিত্রটির অভিনেতা অশ্বিনী কুমার নাইয়া নিজেই।

কখনো অভিনেতা নিজেই ঐ গানের গীতিকার। সে ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ভণিতায় নিজের নামের উল্লেখ করেন। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকে আয়ানকে লুকিয়ে কৃষ্ণের কাছে আসার অপরাধে আয়ান রাধারাণীকে কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করে কিন্তু রাধা পরপত্নী তাই কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেন না। যদিও রাধারানী মহালক্ষী এবং কৃষ্ণ অংশে তার জন্ম। একথা জানিয়ে ছকের একেবারে শেষ অংশে গানে গানে কথোপকথনের সময় কৃষ্ণের বক্তব্যে ভণিতা প্রকাশ পেয়েছে —

কৃষ্ণ—“কৃষ্ণ অংশে জন্ম তোমার, তুমি মহালক্ষী

স্বপন গায়েনের বাণী, অশ্বিনীর কাহিনি [৪১]

তুমি স্বপ্নে গড়া মোর প্রতিমা।”

এখানে কৃষ্ণ চরিত্রে অশ্বিনী নাইয়া নিজেই অভিনয় করেছেন।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে ভৃত্য ভজহরিকে ভুল বোঝে পাপিয়া ও তার বাবা। তারা মনে করে ভৃত্য ছদ্মবেশে তার মেয়ের সর্বনাশ করেছে। তখন বাবু ও ভজহরির গানে গানে ভণিতা প্রকাশ হয়েছে। এখানে ভজহরির চরিত্রটিতে অভিনেতা অশ্বিনী নাইয়া নিজেই অভিনয় করেছেন।

বাবু— “আরে ভৃত্য হয়ে বেইজ্জতি কললি কিভাবে ?

ভজহরি— আর পাপ কললে ভুগতে হবে অশ্বিনী বলে।”[৪২]

কখনো আবার গীতিকার নিজে অভিনেতা হলেও অন্য দলে তার গান ব্যবহার হয় এবং সেখানে ভনিতায় তার নাম উল্লেখ করা হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে স্বামী-স্ত্রীর উপরে অত্যাচার আর করবে না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে—

“অশ্বিনে বলে এই গানের ছলে[৪৩]

কোনোদিন আমি তোকে নারে

ভুল হয়েছে।”

২০১৭ সালে অশ্বিনী কুমার নাইয়া যখন দিগ্বিজয়ী গাজন সংস্থায় অভিনয় করেছেন তখন একই স্থানে কয়েক দিনের ব্যবধানে অন্য একটি দল— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ। তাদের পরিবেশনায় ওনারই গান ব্যবহার করেছেন। ভণিতায় তার প্রকাশ রয়েছে।

অনেক রচনাকার রয়েছেন যারা কেবল মাত্র রচক রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব থাকায় স্বামীর মনে সন্তান আকাঙ্ক্ষা এবং 'বাবা' ডাক শোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে স্ত্রীকে বলে তার বাবা মারা গেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে মৃতদেহের সামনে 'বাবা' বলে ডাকে। মৃতদেহটিতে আসলে তার স্বামী সাদা কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল। এইভাবে তার স্বামী 'বাবা' ডাক শোনার আকাঙ্ক্ষা মেটায়। এতে স্ত্রী লজ্জিত হয় কিন্তু এরকম করার কারণ প্রথমে সে বুঝতে না পেরে স্বামীকে 'বে-আক্কেলে' বলে। সেই সময় তাদের গানে গানে কথপোকথনে ভণিতা প্রকাশ পেয়েছে—

স্বামী— "আমার কতই দিনের কত আশা শুনব বাবা ডাক"

স্ত্রী— "চালাকের ছানা খেয়ে কাটছো বড় ফাঁক।"

স্বামী—"আরে প্রফুল্ল তাই লেখে বড়ই বি আক্কেলে"[৪৪]

স্ত্রী— "আরে বি আক্কেলে হয়ে তুমি লাজের মাতা খেলে।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের দ্বিতীয় ছকে পালার 'ফিনিশিং গানে'। যেখানে মুখ্য তিনটি চরিত্র— রাধা, কৃষ্ণ ও জৈমুনি একসাথে গেয়েছে। সেখানে ভণিতায় রচনাকারের নাম প্রকাশ পেয়েছে—

"রামকৃষ্ণ লেখে গান[৪৫]

বিধির বিধান

কর্ম গুণেই পাবে ফল।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকের প্রায় শেষ অংশে এসে ভাতৃবধূ চরিত্রটির গানের মধ্যে দিয়ে রচনাকারের নাম প্রকাশ পেয়েছে—

"রামকৃষ্ণ লিকছে গান[৪৬]

কর্ম করে বাঁচাও প্রাণ।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের প্রায় শেষ অংশে সঞ্জয়ের স্ত্রী মণির গানের মধ্যে ভণিতায় রচনাকারের নাম প্রকাশ পেয়েছে —

"রামকৃষ্ণ লিখছে গানে[৪৭]

এ যে আমার ভাগ্য ফল।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকের মাঝে যখন মৃত বাবার কলমের দখল নিয়ে দুই ভাই ও তাদের দুই বউয়ের মধ্যে ঝগড়া তুমুল পর্যায়ে পৌঁছায় তখন ছোট বউ মন্দোদরীকে তার ভাসুর গানের মাধ্যমে যে বক্তব্য রেখেছে তার মধ্যেই ভণিতায় রচনাকারের নাম প্রকাশ পেয়েছে-

ভাসুর— "বউ মা ছিঃ ছিঃ ছিঃ

লোকে শুনে বলবে কি ?

রামকৃষ্ণ গানে লেখে এটাই স্বামীর বাড়ি।"[৪৮]

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে — দিদিমা—"রামকৃষ্ণ লেখে গান, গেল আমার মান।"[৪৯]

এই রামকৃষ্ণ মহাশয় কেবলমাত্র একজন গাজনপালাকাররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গাজনপালার সঙ্গীত

লোকনাটকের প্রথমাবস্থায় সংলাপের জন্ম হয়নি। জন্ম হয়েছিল নৃত্য ও সঙ্গীতের। পরে গানের ফাঁকে ফাঁকে সংলাপের সংযোজন হলেও সংলাপের অনেকাংশ জুড়েই থাকে গান তাই লোকনাট্যে গানের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গানগুলোকে পালার অনুরূপ বলা যায়। শিব পূজাকে কেন্দ্র করে বাংলার মানুষ রচনা করত গাজনগান। শিব-দূর্গার বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে সামাজিক নানা অব্যবস্থা ও দুর্নীতিকে উপলক্ষ্য করে রসালো ভঙ্গিতে চটকদারি ভাষায় এবং মনোরঞ্জনকারী সুরে মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হত এই গান। পূজা উৎসবকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া গাজনগানের সর্বত্র বিষয়রূপে আচার অনুষ্ঠান যুক্ত থাকে এমন নয়। তার সাথে যুক্ত থাকে আঞ্চলিক, ভৌগোলিক পরিবেশ, লোকাচার, সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক দিক ও ধর্মীয় সংস্কার। চড়ক ও গাজনের সময় বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে যে সব সংগীত পরিবেশিত হত তার অধিকাংশই হর-পার্বতী, শ্রীবৎস্য উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয়ক প্রাচীন পালাগান থেকে তুলে আনা হত। গাজনের গানগুলিতে জীবনের সংগ্রাম, বঞ্চনা, অসংগতি, ক্ষোভ, বেদনা ও তিক্ততার প্রকাশ ঘটে সরলভাবে। গানগুলির গঠন হয় সাধাসিধে আর থাকে ছন্দের বৈচিত্র্য। 'বাংলার লোকবাদ্য' গ্রন্থে -আবদুল ওয়াহাব লোকগান সম্পর্কে বলেছেন—

"লোকগীতির সুর, কথা ও ধ্বনির মধ্যে লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-প্রথা, অনুষ্ঠান এবং জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মিশে আছে ওতপ্রোত ভাবে।"[৫০]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জনজীবনের দারিদ্র্য বঞ্চনা ও যন্ত্রনাকে কেন্দ্র করে কৃষিজীবী মানুষেরা সৃষ্টি করে এসেছেন গাজনগান যা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নশ্রেণির মানুষের লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পল্লী কবিরা বিশেষত গ্রামের কৃষিজীবী শ্রমজীবী নিরক্ষর বা অল্প-স্বাক্ষরিত মানুষজন এই সমস্ত গানের সৃষ্টিকর্তা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যিনি রচনা করেন তিনিই সুর সংযোগ করেন আবার তিনিই হয়তো গান করেন। তবে মুখে মুখে রচিত এই গানগুলি কয়েক বছর পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। গানগুলির বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় লোকজীবন থেকে। লোকজীবনের ছোট ছোট দুঃখ–সুখ, আশা-আনন্দ, নিরাশা-হতাশার আর্তিই এই গানগুলির ভাবময়রূপ। সেখানে পাওয়া যায় সূক্ষ্ম রসের সাথে স্থুলরসের ভাবনা ও জীবনের ছবি। কখনো একক ভাবে কখনো দ্বৈত বা দলবদ্ধ ভাবে এই গানগুলি পরিবেশন করা হয়। রচয়িতা কে সে সবের খবর কেউ রাখে না কারণ

এই গানগুলির সৃষ্টি–ব্যাপ্তি-প্রচার-প্রসার সবই ঘটে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। এর আবেদন কখনো কখনো ব্যক্তিগত অনুভূতির জগতে কখনো বা আপন পরিবার বা সমাজ বেষ্টনীর সীমাবদ্ধ অঙ্গনে। অনির্বচনীয় কথা, স্থুলহাস্যরস অথচ ভাব গভীরতায়পূর্ণ গানগুলি কখনো নিজস্ব সুর আবার কখনো বিখ্যাত জনপ্রিয় কোন গানের অনুকরণীয় সুরের মাধুর্যে, কখনো সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর অঞ্চলে এমনকি নিজের জেলা পেরিয়ে অন্য জেলা বা রাজ্যেও উপনীত হয়।

বর্তমানে পেশাদারি গাজন দলগুলির পরিবেশনের মাঝে যে সমস্ত গান ব্যবহার হয় তার আঙ্গিকগত বিন্যাস হয় এরকম—একেবারে শুরুতে থাকে ‘বন্দনাগান’। এই গানের বিষয় হল দলের আরাধ্য দেবতাকে বন্দনা এবং দর্শকবৃন্দকে আহ্বান ও প্রণাম জানানো। এই গানের প্রতিটি স্তবকের সুর ও ছন্দ আলাদা হয়। এরপর প্রথম ছক পরিবেশন হয়, তারপর হয় ‘করাচ গান’। প্রথম ছকের শেষে যেহেতু দুষ্টের দমন করা হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দুর্গার অসুরবধের অনুকরণে হয়ে থাকে তাই ‘করাচ গানে’র ধরন হয় অসুর বধের পর দেবতাদেরকে তুষ্ট করার জন্য স্বর্গের অপ্সরা কিন্নরীদের গানের অনুকরণে। এর বিষয়রূপে থাকে প্রকৃতি, প্রেম প্রভৃতি। এরপর বাকি ছকগুলি পরিবেশন করা হয়। প্রতিটি ছকের মধ্যে থাকে গান। সংলাপের মাঝে মাঝেই গান থাকে। কখনো তা হয় বিষয়কেন্দ্রিক কখনো একেবারেই বিষয়বহির্ভূত। ছকের মধ্যে শুরুতে যে গান থাকে তাকে বলে ‘মুখ গান’। কখনো তা একেবারেই শুরুতে হয় কখনো তা কিছুক্ষণ সংলাপ অভিনয়ের পর ব্যবহার হয়। ছকের মধ্যবর্তী অংশে বিষয়কেন্দ্রিক একাধিক অভিনেতার সংলাপ ও গান পরিবেশন হয় যা বেশ দীর্ঘ। একে বলে ‘মুখ্য গান’। এই গানের সময় চরিত্র গুলি কখনো সবাই একই সুরে গান গায় আবার কখনো প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের সুর বজায় রেখে গান গায় এবং ছকের একেবারে শেষে সমাপ্তি অনুযায়ী বিরহ বা মিলনান্তক গান করা হয় সেটাকে বলা হয় ‘শেষের গান’। নীচে শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার ২০১৭-২০১৮ সালের পরিবেশনকে উদাহরণরূপে উল্লেখ করা হল—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ‘বন্দনা গান’-

শিল্পতীর্থ গাজন গানে গাইতে এসেছি গান

এরাতে আমরা গাইব গান

শিল্পতীর্থ গাজন গানে গাইতে এসেছি গান

(বাদ্য...)

শিশির কণা ঝরে যাবে
নতুন সূর্য উঠবে
মিঠে সুরে সানাই বাজবে
মনে মনে মিলবে
এখানে ভিড়ের মাঝে সবার মাঝে

শিল্পতীর্থ বিরাজকরে
চ্যালেঞ্জ নয় চমক দিয়ে চাইব শুধু ছুটি
শিল্পতীর্থ গাজন গানে গাইতে এসেছি গান
(বাদ্য...)

এখনো মাটিতে লেগে আছে দেখো শত সবুজের রং
এ মাটির বুকে গোরাদের হানার সেই বারুদের গন্ধ
মুখোমুখি তাই বিনয় বাদল দীনেশের সংগ্রাম
বীরের মৃত্যু নিয়ে বেঁচে আছে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম
(বাদ্য...)

সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল
যতই আসুক দিক না বিপদ হাওয়া হয় প্রতিকুল
এক হাতে বাজে অগ্নিবীণা কণ্ঠে গীতাঞ্জলি
হাজার সূর্য চোখের তারায় আমরা যে পথ চলি
সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল
(বাদ্য...)

জাগো ওগো আজ...
আমাদের প্রতিবাদ রক্তে লেখা
লাল হয়ে লেখা আছে দেওয়ালের গায়
শুরু হবে সত্যের সংগ্রাম
এরপর ঘোষণা শুরু হয়। তারপর পালার নামকেন্দ্রিক গান হয়—
সাধুবেশী শয়তান কৌশলেতে গায় গান অত্যাচারী শয়তানতার
'মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম' (৩বার)
কত কাল গেছে ঝরে পাপীর অত্যাচারে
সাধুবেশী শয়তান
এরপর শুরু হয় প্রথম ছকের অভিনয়। এই ছকের শেষে শয়তানরূপী রাজকুমার প্রত্যূষকে রানী শঙ্খমালা দুর্গার অসুর বধের অনুকরণে বধ করার পর হয় 'করাচ গান'।

'করাচ গান'-

খুশির আলো শুধু জ্বলে
রঙের মাতন লাগল বনে
রাশি রাশি ফুলে ফুলে

ছম ছম ছম ছম নূপূর বাজে

খুশির আলো শুধু জ্বলে

(বাদ্য...)

হায় সজনী দখিন হাওয়ায় ছড়ায় কলতান

মর্ম্মরিয়া আসে ছুটে নবীন কিশলয়

কোকিলের কলতান ভরে দেয় মন প্রান

মধুর ধ্বনি ঐ তোলে বোম বোম বোম

বোম বোম শংকর

জীবনমালা কথামালাপ্রভুর করুনায়

মানবজীবন ধন্য হোক দয়ায়

পথচারী নিধনে শান্তি আসুক জীবনে

ভরূক শান্তি শতদলে

রঙের মাতণ লাগল বনে

রাশি রাশি ফুলে ফুলে

ছম ছম ছম ছম নুপূর বাজে

বোম বোম বোম বোম শংকর

এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় ছক অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণ ছক ‘আচলে বাঁধা আলো’।

‘মুখ গান’-

শুরুতেই যশোদা মঞ্চে প্রবেশ করে সামান্য সংলাপের পরেই গান করেন। সেই গান তার সন্তান শিশু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে— ‘এক ফালি চাঁদ

আকাশ হয়ে নামা এলি তুই কোলে

হাজার তারারা হার মানাছে

মা এর আঁচল তলে

শিখা হয়ে জ্বলবি রে তুই

আমার প্রাণের দীপে

যতই দুঃখ আসে আসুক

রাখব বুকে তোকে

চোখের পলে পলে

এক ফালি চাঁদতলে......

লা লা লা লা.......’

এরপর মঞ্চে কাকাসুর প্রবেশ করে এবং সেই শিশুকে বধ করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপ দর্শন করিয়ে তাকে বলেন শিশু হত্যা মহাপাপ। সেই পাপ করলে কাকাসুর এরও মৃত্যু হবে। একথা শুনে কাকাসুর হেসে তার পরিচয় জানতে চায়। এরপর শুরু হয় 'বড়ি গান'।

মুখ্যগান –

শ্রীকৃষ্ণ গান গায়— 'আমি আঁধারের বুকে আলো জ্বালি

আলোর দিশারি
দর্পচূর্ণ করি দর্পহারী
দর্পচূর্ণ করি দর্পহারী আমি শহরি
আমি আঁধারের... দিশারি '
কাকাসুর (সংলাপ)— "হা-হা-হা-হা-(হাসি) আলোর দিশারি! দর্পহারী! আমার পথে বাধা! এই অস্ত্রাঘাতে তোর উন্নত শির করিব নিধন"।

(যশোদার প্রবেশ) যশোদা—"না, কে তুমি? কেন আসিয়াছ মোর শিশুকে করিতে হত্যা? বলো কি বা অপরাধ করিয়াছে মোর শিশু? কেন কেড়ে নেবে তার প্রাণ? বলো তুমি কেন আসিয়াছ? (শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে) একি? আসিয়াছ সম্মুখে শিহরি? তব চরন ধরি, রক্ষা করো মোর শিশুর প্রাণ। রক্ষা করো ভগবান তুমি দয়া করো।"

যশোদা(গান) – 'বিপদে রক্ষা করো ওগো কৃপাধারী

অত্যাচারীর বিনাশ করো তুমি সর্বধারী

কাকাসুর- মায়াবলে বলীয়ান আমি কাকাসুর

শিশুবধ করি পাইব প্রচুর

শ্রীকৃষ্ণ- ভক্ত ধারীতে আমি কত রূপ ধরি'

যশোদা (সংলাপ)— 'ওগো ভক্তের ভগবান'

শ্রীকৃষ্ণ (গান)- 'দর্পচূর্ণ করি দর্পহারী

দর্পচূর্ণ করি আমি শিহরী

আমি আধারের বুকে আলো জ্বালি

আলোর দিশারি '

কাকাসুর (সংলাপ)—"আরে শিহরী তোর সব বাধা করি প্রতিহত। এই অস্ত্রাঘাতে করিব নিধন"।

এরপর কাকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে মারতে উদ্যত হলে তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। কাকাসুর ভয় পায়। শ্রীকৃষ্ণ তাকে কাকরূপ থেকে মুক্তি দেয়। কাকাসুর সব বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানায়। এরপর যশোদার আগমন হয়।

যশোদা (সংলাপ)—"আমি মাতা তুই আমার পুত্র হোস। আয় বক্ষে আয় পুত্র আয়।"

শ্রীকৃষ্ণ (গান)— ' ধন্য মাতা তুমি বিদিত ভুবনে

জননী সার্থক সন্তান পালনে

যশোদা (গান)-অবতাররূপে তুমি এলে মায়ের কোলে

সেই পরশ রাখি মায়ের আঁচল তলে'

শ্রীকৃষ্ণ (গান)-'নন্দ লেখে অমর কথা কাহিনি '

যশোদা (সংলাপ)—"ওরে মোর সেই পুত্র"

শ্রীকৃষ্ণ-(গান)— 'দর্পচূর্ণ করি দর্পহারী

দর্প চূর্ণ করি আমি দিশারি

আমি আঁধারের বুকে আলো জ্বালি

আলোর দিশারি'

এখানেই ছকটি শেষ হয়। এই ছকে আলাদা করে কোনো 'শেষের গান' নেই। তবে এরকম ছকের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ গানেই সমাপ্তি অংশে 'শেষের গান' থাকে। যেমন- এরপরের ছক অর্থাৎ তৃতীয় ছকে নায়ক ডেঙ্গু ও নায়িকা ময়নার মধ্যে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটে গিয়ে প্রেম নিবেদন করে এবং গান গায়—

ডেঙ্গু— 'এ মণ শুধু তুই তুই করে

ছুঁই ছুঁই করে
তুই তুই করে
এ মন চোরাবালি ছুঁই ছুঁই করে
তুই তুই করে ছুঁই ছুঁই করে
হয়েছে তুই যে আমার
হয়েছে তুই অপেরার
প্রেমের জলে হাবুডুবু হাবুডুবু খাই
দুজনে মিলে হাবুডুবু খাই
দুজনে মিলে হাবুডুবু খাই ভালোবেসে যাই

প্রেমের জলে ভেসে-ভেসে, ভেসে-ভেসে যাই’

ময়না- ‘দেখা যাবে যা হবার হবে

আমি পারছি না তো আর

এ মন নেব তাজা করে নেব

যা যা করতে বাকিআর’

ডেঙ্গু-   ‘হয়েছে তুই যে আমার

হয়েছে এই অপেরার

প্রেমের জল... হাবুডুবু খাই... দুজনে মিলে...’

ষষ্ঠ ছকের শেষে ঝিলিক তার মায়ের মত্যু খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তখন আকাশ জানতে পারে ঝিলিকের প্রেম প্রত্যাখ্যানের আসল কারণ। আবার সে ঝিলিককে ফিরে পেতে চায়। অনুতপ্ত ঝিলিকের গান দিয়ে ছকটি শেষ হয়।

ছক মধ্যস্থ গানগুলি কখনো পালাকারের নিজস্ব সৃষ্টি আবার কখনো অনুকরণ করা হয়। এই অনুকরণ কেবলমাত্র সুর হতে পারে বা কথা হতে পারে। কখনো সম্পূর্ণ ভাবে জনপ্রিয় কোন বাংলা বা হিন্দী এমনকি ভোজপুরী ভাষার গানকেও ব্যবহার করা হয়। গান বা সুরের ধরন লক্ষ্য করলে দেখা যায় এতে লোকগানের সুর ব্যবহারের বেশ প্রচলন রয়েছে। ঘটনা প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহারও হয়ে থাকে। হিন্দী ও বাংলা চলচ্চিত্রের গানের ব্যবহার বা অনুকরণ করে ব্যবহার খুবই প্রচলিত। গানের মাধ্যমে কখনো চরিত্ররা নিজের পরিচয় দান করে, কখনো কোনো বক্তব্য প্রকাশ করে যা সংলাপের অনুরূপ। আবার কখনো দুজন বা তারও অধিক চরিত্রের কথপোকথনের মাধ্যম হয় গান। গানের অর্থ হয় সহজ সরল আবার কখনো দ্ব্যর্থবোধক, কখনো ব্যঙ্গাত্মক বা বক্রোক্তিমূলক। গানের মধ্যেই কখনো দেওয়া হয় সামাজিক বার্তা কখনো প্রকাশ পায় জনপ্রিয় কোন প্রবাদ। নীচে কিছু গানের উল্লেখ করে উদাহরণস্বরূপ দেখানো হল—

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার সপ্তম ছকে হ্যান্ডেলের বউ গান করে— ‘এমন মধুর সন্ধ্যায়

একা কি থাকা যায়

খুঁজে নাও ডেকে নাও

এই সাথী কে

আহারো আহারো আহা মন

আহারো

মন যাকে চায় আহা আহা’[৫১]

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ফিনিশিং গান—

‘আমায় তুমি কোনোদিন

কোরো নাকো ক্ষোমা

অভিশাপ দিও আমায়

মৃত্যু যেন হয় মা

তোমরা সবাই আমায় নিয়ে

দাও না ধরে শাস্তি

হাসতে হাসতে মায়ের জন্য

নেব গোলায়(গলায়) ফাঁসি

শোশ্মানেতে মুখাগ্নি করে

দিও মায়েরে (মাকে অর্থে) শান্তি

মা... মাগো....মা'[৫২]

এখানে গানের সুরের অনুকরণ করা হয়েছে। 'তোমরা সবাই' কথাটি দর্শকদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। 'দাও না ফিরিয়ে' বাক্যটিতে হ্যাঁ বাচক অর্থ বোঝাতে না বাচকের ব্যবহার হয়েছে। যেমন-

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকের 'মুখ গান'—

'তবু আমি কাটি যে ঘর,

সবাই করে দিল পর

শরীলের উত্তেজনা একটুও থামেনা

এটা আধবুড়ি বিধবা বুঝলো না'[৫৩]

এখানে গানটিতে মূল গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে গুয়েপুলিশ গায়—

'বন্ধ ঘরে তুমি আমি

বাকি সবাই ঘুমিয়ে

একন দুজন যেতে পারি

যত সীমা ছাড়িয়ে '

এখানেও গানটিতে মূল গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকের 'মুখ গান'- ভজহরি—

'এখন আমি কি যে করি

ঘুমিয়ে পড়েছ তুমি

পায়ের জুতো পড়িয়ে দেব

ডাকব না আর দিদিমনি

এখন একটু পাশে বসি

তোমায় বড় ভালোবাসি

সে তো পারিনা

মনের কথা চেপে রাখি

তোমায় বড় ভালোবাসি'[৫৪]

এখানেও গানটিতে মূল গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে 'শেষের গান'—

'আমায় তুমি কোনোদিন

কোরো নাকো ক্ষমা

অভিশাপ দিও আমায়

মৃত্যু যেন হয় মা

তোমরা সবাই আমায় নিয়ে

দাও না ধরে শাস্তি

হাসতে হাসতে মায়ের জন্য

নেব গলায় ফাঁসি

শশ্মানেতে মুখাগ্নি করে

দিও মায়েরে (মাকে অর্থে) শান্তি

মা... মাগো....মা'[৫৫]

এখানেও গানটিতে মূলগানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে। 'তোমরা সবাই' কথাটি দর্শকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'দাও না ফিরিয়ে' বাক্যটিতে হ্যাঁ বাচক অর্থ বোঝাতে না বাচকের ব্যবহার হয়েছে।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে 'মুখ্য গান'

স্ত্রী গেয়েছে—

'আরে শোনো বলি ওগো স্বামী

আরে কেনো করো রাগারাগি

আরে তুমি মরে চলে গেলে

কার কাছে থাকব আমি'

স্বামী—

'আমার সামনে থেকে চলে যা

চ্যালেঞ্জ করছি তোকে করব বিধবা

মনে..রাখিস..আমার.. কথা'[৫৬]

গানটিতে মূল গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে ‘মুখ্য গান’

সন্ন্যাসী—

‘আজকে রাতে-
তোমার সাথে হবে বিয়ে মালা বদল করে’

সুস্মিতা—

‘অশ্বিনী ভেবে দেখি গানে বলে
মামার সাথে ভাগ্নির এ কাজ হয় কি করে’

সন্ন্যাসী—

‘মামার সাথে সব হয়েছে বাকি আছে কি
কত দেখবে আমার কাছে প্রমান আছে
বিয়ে হবে ঠাকুর মশাই আসবে এখুনি
সবাই মিলে দাওনা একটু উলুধ্বনি’

সুস্মিতা—

‘সর্বনাশ কোরোনা ছেড়ে দাও মামা
আমার জন্য কাঁদছে ঘরে বাবা আর মা’

সন্ন্যাসী—

‘পাল্কী এলে....
পাল্কী এলে বসবে কোলে
নাচব আমি দুটি বাহুতুলে’[৫৭]

এবং বক্তব্য—গানে গানে কথপোকথনের মাধ্যমে হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে ‘শেষের গান’ সন্ন্যাসী—

‘ও আমার মাতঙ্গিনী
যাওয়ার বেলা কেঁদো নাগো তুমি
শশ্মানে নিয়ে গিয়ে
আমার চিতা জ্বেলো তুমি
ও আমার মাতঙ্গিনী..’[৫৮]

এখানেও গানটিতে বাংলা দেশাত্মবোধক একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এর সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের অষ্ঠম ছকে ছোট ছেলে—

'দেরী কেন করছিস তুই
ধর বাবা চেপে
এই ফাঁকে মা টার
দিই টিপে মেরে
মা গো মা মধু নাম
নেব কাঁধে করে
নিয়ে যাব তোমায় আসল মাটির ঘরে'[৫৯]

গানটিতে মূল গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে 'মুখ গান'- অঞ্চল প্রধান মঞ্চে প্রবেশ করে গান গায়—
'তবু আমি কাটি যে ঘর, সবাই করে দিল পর
শরীলের উত্তেজনা একটুও থামেনা
এটা আধবুড়ি বিধবা বুঝলো না'[৬০]

এখানেও গানটিতে বাংলা প্রচলিত একটি লোকগান এর সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকে 'মুখ্য গান' কৃষ্ণ—

'নানা চাই না তোমার
প্রেমের পত্নী
ফিরায়ে দাও কেঁদো না তুমি
প্রিয়া অভিমানী ভুল করেছ তুমি
পরে আশা কেন মনে থাকছে স্বামী
নানা চাই না তোমার প্রেমের পত্নী
ফিরায়ে দাও কেঁদো না তুমি'[৬১]

এখানেও গানটিতে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রচলিত একটি আধুনিক গান এর সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার ষষ্ট ছকের 'মুখ গান' অংশে ভিখারি গান গায়—

'আমার মনে বলে মাগো
আচে ভগবান
দশটাকা বিশটাকা দেমা-'[৬২]

এখানেও গানটিতে বাংলা সুপ্রচলিত একটি শ্যামাসঙ্গীত এর সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে হরি—

'মানুষ যদি হয়ে থাকি দেব এদের বুকে মাটি
পরবে কথা হলে বাসি,পরে কিন্তু লাভের মিষ্টি,

বেকার কাজে সময় ব্যয়,

অসম্মানে অর্থ ব্যয়, বউ এর কথায় ওঠে বসে

এদের কি আসে যায়'[৬৩]

এখানেও গানটিতে বাংলা সুপ্রচলিত একটি জীবনমুখী গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নাট্যমিন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে ছোট ভাই—

'আমি তিন দিনেতে করব ছ্যাদ্দ

মালসার ভাত খাব না

আমি মাছ মাংস ভালোবাসি

বউ ছাড়া চলি না '

এখানেও গানটিতে বাংলা সুপ্রচলিত একটি কীর্ত্তন গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নাট্যমিন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকের 'মুখ গান' অংশে দিদিমা—

'আমার সোনা নাতনি রে

ও তুই কোথায় গেলি রে

দিনে রাতে আমি তোরে খুঁইজা মরি রে'

এখানেও গানটিতে বাংলা গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নাট্যমিন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে 'মুখ গান' অংশে বড় ভাই—

''বাবা মা মরলে পরে

কর্ম করো ভালো করে

পাবে যে সুফল

যেমন কর্ম করবে দাদা তেমন পাবে ফল'[৬৪]

এখানেও গানটিতে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি জনপ্রিয় গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নাট্যমিন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে চৌকিদার—

'সারা রাতটা উ—করে কাটালি

ভোর রাত্রে চাবি খুলে তালা লাগালি

হায় লা লা লা লা লা'[৬৫]'

এখানে গানটিতে বাংলা সাম্প্রতিককালের চলচ্চিত্রের একটি গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে চৌকিদার—

'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও

উল্টো পালটা মারছো লাথি

খুঁড়ি দিদি তুমি দেকছি

আসরটাকে করবে মাটি'[৬৬]

এখানে গানটিতে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে নাতজামাই—

'ও আমি ঘটি বাটি কাঁথা কম্বল

ও দাদা বালিশ নিয়েছি বগলে

দিদিমার জ্বালায় আমি আছি জঙ্গলে'

এখানে গানটিতে বাংলা গানের সুরকে অনুকরণ করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে 'মুখ্য গানে'র অংশে সন্ন্যাসী তার পুরনো প্রেমিকার সংসারে এসে উপস্থিত হয়। প্রেমিকা তাকে বারণ করলে সে গান-গায়—

'তোমার গাছে উঠে নারকেল পেড়ে

বসে আমি ছাড়াবো

জল গুলো ফেলে দিয়ে

শাঁস তুলে খাব।'

এখানে গানটির অর্থ বক্রোক্তিমূলক।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে 'মুখ্য গানে'র অংশে

সন্ন্যাসী—

'তোমার মিটারের তার কেটে গুম মেরে চালাব

ডায়রেক্ট লাইন দিয়ে ডুমগুলো ফাটাব'

মাতঙ্গিনী—

'স্বামী সন্তান নিয়ে আমি বেশ সুখে আছি

আমার ঘরে এসে তুমি কোরোনা অশান্তি'

সন্ন্যাসী—

'তোমার গাছে উঠে নারকেল পেড়ে বসে আমি ছাড়াব

জলগুলো ফেলে দিয়ে শাঁস তুলে খাব'

মাতঙ্গিনীর মেয়ে সুস্মিতাকে দেখে গান গায়-

সন্ন্যাসী— 'এত বড় মে কবে হল? এইবার আমার ফাটা ঢোলে বোল উঠবে ভালো বড় মে—কবে হল—'

এখানেও গানটির অর্থ বক্রোক্তিমূলক।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার তৃতীয় ছকে নায়ক গান করে—

'নাম আমার ডেঙ্গু মশা
নতুন বউ আমার নেশা
বোউদি কেন বিয়ে করেনি
ঘরে বসে চুপটি করে ঘুরছে দেখ প্যান্ট পরে
বিয়ে করেনে'

এখানেও গানটির মাধ্যমে চরিত্র তার পরিচয় প্রদান করেছে।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্টম ছকে 'মুখ্য গানে'র অংশে

ছোট ভাই—

'ও বাবুরা.. আ...
দু-চার পয়সা দওগো হাতে হাতে
পথে নেমে হাত পেতেছি
ভিক্ষার কারণে'

বড় ভাই—

'তোমাদের ওই কানাগলি
নামিয়ে দেবে মোদের গলায় দড়ি
তোমরা আমার মাতা পিতা
দিও না ফিরিয়ে
ও বাবুরা...'

ছোট ভাই—

'আছেন যত মায়ের জাতি
সন্তান ভেবে কিছু দেবে নাকি
দশের লাঠি একের বোঝা
পারে না সইতে
ও বাবুরা....'

গানের মধ্যে অন্য গানের সুর অনুকরণ করা হয়েছে। এখানে একটি প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার হয়েছে তা হল- 'দশের লাঠি একের বোঝা পারে না সইতে'।

নাট্যমিন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে 'মুখ্য গানে'র অংশে

নাতজামাই—'দিয়েছি সার জল ধরেছে কচিফল'

টুনি—‘হিটারে ফুটেছে দিয়েছি মোটা চাল’

দিদিমা—‘কললি এসব কি লোকে বলবে ছি ছি ছি’

হাবলদার—

‘ধেততেরিকা ধেততেরিকা কেন বোঝো না
দুদিন পরে তোমার নাতনি হবে নোনোর মা’

নাতজামাই—‘টুনির প্রেমে পড়ে দিয়েছি মনটা’

হাবলদার—‘আর ফাঁকা ঘর পেয়ে শালা বাজাচ্ছে ঘন্টা’

টুনি—‘ভালোবাসার একনাম সাধেরই জীবন’

হাবলদার—‘আর এই বয়েসে হলে মা যাবে তোর জীবন’

দিদিমা—‘সাপের গায়ে দিলে পা মারবে ছোবল’

নাতজামাই—‘হুল ফুটিয়ে গোলাপে হয়েছি পাগোল’

হাবলদার—‘আরে বাদুরেতে খেয়েচে নিয়েচে কচি তাল’

দিদিমা—‘রামকৃষ্ণ লেখে গান গেল আমার মান’

এখানে গানের মধ্যে রূপকার্থ ভাষার ব্যবহার হয়েছে।

নাট্যমিন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে

হাবলদার টুনিকে দেখে গান গায়—

‘সাধের লাউ বানাইলি......
‘সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগি
লাউ এর আগা খাইলাম ডগাগো খাইলাম
লাউ দিয়ে বানাইলাম ডুগডুগি’

এখানে বাংলা একটি জনপ্রিয় লোকগানকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে খনার স্বামী—

‘তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব
ছেড়ে দোব না
ছেড়ে দিলে এমন জিনিস আরতো পাবুনি
তোমায় বক্ষমাঝে রাখব
ছেড়ে দোব না’

এখানেও বাংলা একটি জনপ্রিয় লোকগানকে ব্যবহার করা হয়েছে। গানের ভাষায় ‘ছেড়ে দোব না’, ‘আরতো পাবুনি’, ‘এমন জিনিস’—এই শব্দগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। বাকি সব একই রকম আছে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে সুবল—

‘পুরানো সেই দিনের কথা
ভুলবে কিরে হায় ও সে
চোখের দেখা প্রাণের কথা
সে কি ভোলা যায়’

এখানে বহু প্রচলিত একটি রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে ‘মুখ্য গান’ অংশে

বিচ্চিরি বচ্চন—

‘ওরে মনের ব্লাকি নয় টিভিতে কালার লাগালি রিমিক্স কাওয়ালি’
‘আরে রিমোট দিয়ে প্রেমের নতুন চ্যানেল দেখালি...’
‘এ বিজলি...
ঝুমকো লাগালি প্রেমের বিজলি কি রানী
তোকে দেখে গাইছে এ মন
রিমিক্স কাওয়ালি—
রিমিক্স কাওয়ালি প্রেমের রিমিক্স কাওয়ালি’

এখানে সাম্প্রতিককালের বাংলা চলচ্চিত্রের একটি গানর ব্যবহার হয়েছে।[৬৭]

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের অষ্ঠম ছকে ‘মুখ গান’ অংশে

সন্ন্যাসী—

‘সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা’

এখানে বহু প্রচলিত একটি রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার হয়েছে।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে ‘মুখ গান’ অংশে

নায়ক-

‘এতদিন ভাবছি কবে তোমার দেখা পাই
ছিল চানস জিরো পার্সেন্ট তোমার বেকার জীবনটাই
ছিল না ঝিন চ্যাকাচ্যাক সুট বুট আর টাই
তোমার এই টাচ লেগে আজ হয়েছি হাই ফাই

মাই লাভ ইউ আর মাই লাভ
দিওয়ানা তোমার প্রেমে এনেছি গোলাপ
ইটস এ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লাভ লাভ লাভ'[৬৮]

এখানে সাম্প্রতিককালের বাংলা চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার হয়েছে।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে

জামাই—

'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়
নিরাশার পাখি দু হাত বাড়ায়
খুঁজে নিয়ে মন, নির্জনে কোন
কি আর করে তখন
স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখে মন'।[৬৯]

এখানে বাংলা একটি জীবনমুখী গানের ব্যবহার হয়েছে।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে 'মুখ গান'—

"ভোলামনের দুনিয়াটা
চিনতে পারলামনা রে ভোলামন
আপন আপন করি যারে
আপন আপন গো
আপন আপন করি যারে
আপন কোন জন চিনলাম না
ভোলামনের দুনিয়াটা
চিনতে পারলামনারে ভোলামন"।

(কান্না মিশ্রিত)—

"ভাই বলো পুত্র বলো
কেউ নয় আমার আপন হইল গো
যারে আমি আপন ভাবি
যারে আমি আপন গো
আপন কোন জন চিনলাম না
ভোলামনের দুনিয়াটা
চিনতে পারলামনা রে ভোলামন"

এখানে বাংলা লোকগানের ব্যবহার করা হয়েছে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে খনা—

"আমার আতা গাছেতে
তোতা পাখি বাসা করেচে"

এখানে বাংলা ছড়াকে ব্যবহার করা হয়েছে গানের আকারে।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে 'মুখ গান'—"ম্যায় হু ডন"[৭০]

এখানে হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঐ ছকেরই 'শেষের গান'—

'চাহে তুঝে রাত দিন,
জিনা নেহি তেরে বিন
তুমকো সারি রাত মে,
ছোড়েঙ্গে সারি দুনিয়া
তেরে লিয়ে'[৭১]

এখানেও হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার তৃতীয় ছকের 'মুখ গান' অংশে মঞ্চের পিছন থেকে নায়ক গায়—"নীলে নীলে অম্বর পর...'

মূল গান—

'নীলে নীলে অম্বর পর চাঁদ যব আয়ে
'প্যার বারসায়ে হামকো তারসায়ে
না কোয়ি সাথি হ না কোয়ি প্রেমী
প্যায়ার দিল কি বুঝা যায়ে'[৭২]

এখানেও হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে ভজহরি—

'আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না
ইস্তানবুলে গিয়ে গোটা শহর ঘুরে
শিখেছি নতুন এই রান্না
আমি শেষে ভজহরি মান্না'[৭৩]

এখানেও বাংলা চলচ্চিত্রের একটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকের গান—'তেরে নাম...'[৭৪]

এখানেও হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার তৃতীয় ছকে ভাতৃবধূ গান গায় —“পরান যায় জ্বলিয়া রে”[৭৫]

এখানেও সাম্প্রতিককালের বাংলা চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার চতুর্থ ছকের ‘মুখ গান’ অংশে গোবিন্দ গায়—

‘কেউ হতে চায় ডাক্তার
কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার
কেউ হতে চায় ব্যবসায়ী
কেউ হয় ব্যারিস্টার
কেউ চায় বেচতে রূপের রূপের বাহার চুলের ফ্যাশন
আমি ভবঘুরেই হব এটাই আমার অ্যাম্বিশন’[৭৬]

এখানেও বাংলা একটি জীবমুখী গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার পঞ্চম ছকের ‘মুখ গান’ অংশে বাখারি গায়—

‘চলতে চলতে
মেরা এ গীত ইয়াদ রাখনা
কভি আলবিদা না কাহেনা
কভি আলবিদা না কাহেনা’[৭৭]

এখানেও হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার পঞ্চম ছকে লিচু গায় —

‘ম্যায় দিল জিগর সে গুজরি হ্যায়
এক লেড়কি ইধার সে গুজরি হ্যায়
গোরে গোরে গালোওয়ালি
কালে কালে বালোওয়ালি
বেহকি বেহকি চালওয়ালি
মাস্তি শোলাহ সালোওয়ালি
দিওয়ানা কার কে গায়ি
ও রাব্বা হো হো হো
ও রাব্বা হো হো হো’[৭৮]

এখানেও হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার ঐ ছকেই বাখারি গায়—

'তুমহে আপনা বানানে কি কাসম
খায়ি হ্যায় খায়ি হ্যায়
তেরি আঁখমে চাহাত হি নাজার
আয়ি হ্যায় আয়ি হ্যায়'[৭৯]

এখানেও হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার ষষ্ঠ ছকে ঝিলিক গায়—

'আমি না পারি সইতে না পারি বইতে
বোঝাই বলো কোন ভাষাতে
আমি বোঝাই বলো কোন ভাষাতে
আমার মন, হায় হায় মন
লাগল প্রেমের জ্বালাতে'[৮০]

এখানে একটি বাংলা লোকগানের সুরকে অনুকরণ করে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার সপ্তম ছকে

'ম্যায় কালে হ্যায় তো কা হুয়া দিল ওয়ালে হ্যায়
আ তেরে তেরে তেরে চাহনেওয়ালে হ্যায়'[৮১]

এখানেও হিন্দি চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার করা হয়েছে যদিও গানটির ব্যবহার এখানে প্রসঙ্গ বহির্ভূত।

নাট্যমিন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতে অফিসার-

'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়
নিরাশার পাখি দুহাত বাড়ায়
খুঁজে নিয়ে মন নির্জনে কোন
কি আর করে তখন
স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন,স্বপ্ন দেখে মন'[৮২]

এখানেও বাংলা একটি জীবমুখী গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

খনার স্বামী—

'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব
ছেড়ে দোব না
ছেড়ে দিলে এমন জিনিস আরতো পাবুনি
তোমায় বক্ষমাঝে রাখব
ছেড়ে দোব না'

এখানেও বাংলা একটি লোকগানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঐ ছকে খনা ও তার স্বামীর দ্বৈত গান—

স্বামী- "তুমি নয় নাই কাছে আসলে
আমায় নাইবা ভালোবাসলে
তাই বলে আমি কেন আসব না
আমি কেন কাছে আসব না"

খনা—

"মেঘে মোর আকাশটা ঢাকল
চাঁদ নয় আড়লেই থাকল
নদী কেন মরবে না জোয়ারে
সেই দেখে আমি কেন বাঁচব না"[৮৩]

এখানেও একটি বাংলা গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাট্যমিন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে 'শেষের গানে'

স্বামী—

"কথা দিলাম
তুমি আমি যুগে যুগে থাকব সাথে"

টুনি—

"ফুলেতে যেমন গন্ধ থাকে
তুমি আমি এমনি ভাবে যুগে যুগে থাকব সাথে
কথা দিলাম"[৮৪]

এখানেও বাংলা চলচ্চিত্রের একটি গানকে ব্যবহার করা হয়েছে।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে 'মুখ্য গান' অংশে

স্ত্রী—

"আরে শোনো বলি ওগো স্বামী
আরে কেনো করো রাগারাগি
আরে তুমি মরে চলে গেলে
কার কাছে থাকব আমি"

স্বামী—

"আমার সামনে থেকে চলে যা

চ্যালেঞ্জ করছি তোকে করব বিধবা

মনে..রাখিস..আমার.. কথা”

ডাক্তার—

“বাবা মা দিয়েছে হাতে তুলে

কেন দুবেলা মারিস ধরে”

স্ত্রী—

“আরে থাকতে দেয় না আমার বাড়ি

কি করে সংসার করি”

স্বামী—

“আশ্বিনে বলে এই গানের ছলে

কোনোদিন তোকে আমি মারব নারে

ভুল হয়েছে.. দে ক্ষমা করে..”[৮৫]

এখানেও বাংলা জনপ্রিয় একটি গানের সুরকে ব্যবহার করা হয়েছে।

জীবনের মূল্যবোধ গড়ে ওঠে সাধু ভাবনায়। সে ভাবনা গড়ে তোলে জীবন ও সমাজের মূল্যবোধ। লোক কবিরা সমাজকে সুস্থ, সবল ও মানবিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করবার জন্য রচনা করেন লোককাহিনি, লোককথা, লোকনাট্য, লোকসংগীত প্রভৃতি ধাঁধা-প্রবাদ-ধর্মকথা। সবই সাধুভাবনা সঞ্জাত, সবই সমাজ কল্যাণকামী। গাজনগান ও তার ব্যতিক্রম নয়।

গাজনে নৃত্যের উৎস ও প্রয়োগ

চর্যাপদের ১৭ সংখ্যক চর্যায় রয়েছে—

‘নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী

বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই’।

এ থেকে তদকালীন উৎসব অনুষ্ঠানে নাট্যগীতির প্রচলন যে ছিল এবং সেখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করত তা বোঝা যায়।[৮৬] বাংলার লোকজীবনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উৎসবে আনন্দে নৃত্যের প্রচলন ছিল[৮৭]। নৃত্যের উদ্ভব ও বিকাশের জন্য মূলত যে তিনটি উপলক্ষ্য রয়েছে তা হল—ক. ভাব বিনিময়ের জন্য অঙ্গভঙ্গির ক্রমবিবর্তন, খ. ধর্ম ও যাদুসংকারের অভিব্যক্তি এবং গ. বিভিন্ন ধরনের উৎসব ও অনুষ্ঠান।[৮৮]

প্রথমাবস্থায় আদিম গুহাবাসী মানুষ শিকার পাবার উদ্দেশ্যে বা অপদেবতার হাত থেকে বাঁচার আশায় নানা রকম যাদু প্রক্রিয়া অনুশীলন করত। পরবর্তীকালে তারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের থেকে আত্মরক্ষার

জন্য ও ভালো শস্য উৎপাদনের আশায় শত্রুবধ, শিকার প্রভৃতি অনুকরণ করত যাকে নৃত্যের প্রথম পর্যায় বলা যায়। স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর ক্রমে তাদের জীবনে দেব-দেবীর আবির্ভাব হয়। সেই দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে সূচনা হয় পূজা উৎসবের। যার মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল ঐ দেব-দেবীকে নিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য যোগে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাতে ক্রমে যুক্ত হয় সংলাপ ও কাহিনি। জন্ম হয় লোকনাট্যের। শোভযাত্রাটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর সেখানে লোকনাট্যটি অনুষ্ঠিত হত। দেবালয় পরিণত হত রঙ্গালয়ে। সেখানে ভক্তরাই হয়ে উঠত অভিনেতা।

প্রাথমিক প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে খাদ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে আদিম মানুষের কাছে প্রথম আরাধ্য দেবতা ছিল সূর্য। পরবর্তীকালে সূর্যের প্রতীকরূপে তারা শিবমূর্তিকে পুজো করে। শিবকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রা নির্মাণ করে। ক্রমে সঙ্গীত ও নাট্যের সূচনা হয় তাই শিব একদিকে যেমন শস্য দেবতা অন্যদিকে তেমন নৃত্য ও নাটকেরও দেবতা। সেজন্য তার নাম— নটরাজ, নটনাথ, আদিনট, নটেশ, মহানট প্রভৃতি।

দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় উপকুল সুন্দরবন অঞ্চল বিশেষত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের মানুষের কাছে বর্ষশেষের গাজন উৎসব তৈরি হয় শিবকে কেন্দ্র করে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয় গাজন উৎসব ও গাজনগান। পুরাতন কৃষিবর্ষের সমাপ্তি ও নতুন কৃষিবর্ষের সূচনা লগ্নে হয় এই উৎসব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ, কুলপি, মন্দিরবাজার, উস্থি, ডায়মন্ডহারবার, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী বিশেষত কৃষিনির্ভর নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষ যেমন—কামার, কুমোর, জেলে, বাগদি, কাওড়া, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এদের জীবনে বিশেষ উচ্চ মানের বিনোদন ব্যবস্থা অসম্ভব হলেও মনের গভীরে সংস্কৃতিচর্চার ইচ্ছা থাকে প্রবল তাই এই গাজন উৎসবের একদিকে রয়েছে বিনোদন অন্যদিকে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস। তার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চাও মিশে রয়েছে এই গাজন উৎসবের সাথে। এর আরেকটি বিশেষ অঙ্গ হল শোভাযাত্রা। নৃত্য যার বিশেষ আকর্ষণীয় একটি বিষয়। বাঁকুড়ার রাঢ় অঞ্চলের গাজনে শিবঠাকুরকে মাথায় করে মন্দির থেকে বার করে নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। নবদ্বীপে রাত্রিবেলায় সুসজ্জিত চতুর্দোলায় শিবকে নিয়ে ঢাক, কাঁসি সহযোগে নৃত্যের তালে তালে ভক্তরা শোভাযাত্রা করেন। নবদ্বীপের অধিবাসীদের মতে এই গাজন মানুষের নৃত্য নয় এটি আসলে শিবেরই নৃত্য কারণ কৈলাসপতি শিবকে নাচানোর সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই। শিব নিজেই নাচেন তাই তার ভক্তরা নাচে। কেবলমাত্র সন্ন্যাসীরাই নন, সন্ন্যাস বহির্ভূত মানুষ ও দর্শনার্থীরাও এই নাচে অংশ নেন। দূর-দূরান্ত থেকে ওই নৃত্য দেখার জন্য বহু লোক সমাগম হয়। এখানকার মানুষের বিশ্বাস-গাজনে সন্ন্যাস না নিয়েও যদি শিবের সাথে নাচে অংশ নেওয়া যায় তাহলে দেহান্তে কৈলাসে শিবভক্তরূপে অনন্তকাল স্থিতি হবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও গাজন উৎসবে শিব দুর্গার সং সেজে ঢাক, কাঁসি সহযোগে নাচতে নাচতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়।

বর্তমানে বিগত ২০-২৫ বছরে বেশ কিছু পেশাদারি স্থায়ি গাজনদল গড়ে উঠেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঐ সমস্ত অঞ্চলে যারা সারাবছরই বিভিন্ন পূজা, উৎসব, মেলা উপলক্ষে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গাজনপালার অভিনয় করে থাকে। কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলেই নয়, খোদ কলকাতার বুকে বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নিম্ন সম্প্রদায় ভিত্তিক অঞ্চলগুলিতেও সারাবছরই রমরমিয়ে চলে এই বিনোদন।

স্বভাবকবি প্রভাবিত সংলাপ রচনার ফলে গাজনপালার মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রাধান্য থাকে বেশি। যেহেতু সম্পূর্ণরূপে পুরুষ দ্বারা গঠিত, পরিচালিত, অভিনীত হয় এই লোকনাট্যের দলগুলি তাই এর নর্তকীরাও সকলেই হয় পুরুষ। নারীবেশে লাস্য নৃত্যও পুরুষরাই পরিবেশন করেন। এদের প্রথাগত প্রশিক্ষণ কেউই দেয় না। শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রতিভায় তা গড়ে ওঠে।

কাহিনির চরিত্র ও ধরন অনুযায়ী সেই চরিত্রে কোন্ শিল্পী অভিনয় করবেন তা নির্বাচন করে দল। সেই শিল্পী আবার কাহিনির ধরন ও চরিত্র অনুযায়ী নাচের ধরন প্রাথমিক ভাবে নিজে ঠিক করেন। মহড়ার সময় অন্যরা তা দেখে মতামত প্রকাশের মাধ্যমে সঠিকটাকে নির্বাচন করেন। কাহিনিতে চরিত্র ও ঘটনা অনুযায়ী সমবেত বা একক নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

প্রথম ছকের বিষয় যেহেতু অন্যান্য ছকের থেকে একেবারেই আলাদা তাই এর নাচের ধরনও অন্যান্য ছকের থেকে আলাদা। চরিত্রগুলিতে সাধারণত রাজা, রানী, রাজকন্যা, অশুভ শক্তি পৌরাণিক চরিত্র থাকে তাই তাদের নাচেও সেরকম বিশেষত্ব দেখা যায় যা অন্যান্য ছকের নৃত্য অপেক্ষা অনেক বেশী পরিশীলিত, মার্জিত। পৌরাণিক এই পালাগুলিতে নায়িকা বা কোন নারী চরিত্রের নাচের ধরন অন্যান্য পালা (বিশেষত সামাজিক পালাগুলির) থেকে একেবারেই আলাদা। যেমন—নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে রাজকুমারীর নৃত্য। সমবেত নৃত্য অংশেও অন্যান্য পালার তুলনায় এই পৌরাণিক পালায় নাচের ধরন একেবারেই আলাদা। যেমন— নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে রাজপুত্রের জন্মদিনে রাজা, রানী ও রাজপুত্র নিবিড় একসাথে নৃত্য করার দৃশ্য লক্ষণীয়।

তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ছকের মধ্যবর্তী ‘করাচ গানে’র সাথে সবসময় সমবেত নৃত্যই হয়ে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় ছকের মধ্যবর্তী ‘করাচ গানে’র সাথে যে নৃত্য পরিবেশন হয় তাতে ধ্রূপদী নৃত্যের ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ছকের কাহিনিতে যেহেতু অশুভ শক্তির বিনাশ করা হয় তাই করাচ গানের উদ্দেশ্য হল অসুর বধের পর স্বর্গে যেমন আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেখানে দেবতাদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে ঊর্বশী কিন্নরীরা যেমন নৃত্য পরিবেশন করে তেমনি এখানেও অশুভ শক্তি, আত্মা, শয়তান বা খলনায়কের বিনাশের পর নর্তকীরা দর্শকদের কাছে আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে এই নৃত্য পরিবেশন করেন। তাই তাদের পোশাকে, সাজ-প্রসাধনে অলংকারে ও নৃত্য কৌশলে ধ্রূপদী প্রভাব লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় ছক অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ ছকে নৃত্য বিষয়টি প্রায় থাকে না বললেই চলে। মঞ্চে কৃষ্ণ বা রাধা একা ঘুরে ঘুরে গান গায় আবার কখনো মঞ্চে কৃষ্ণ বা রাধা একা দাঁড়িয়ে গান গায়। কেবল গানের তালে তালে হাতের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। কখনো কৃষ্ণ মঞ্চে স্থিরভাবে গান করে আর রাধিকা তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের দ্বিতীয় ছকটি হল রাধা কৃষ্ণের ছক। এখানে গানের সময় নৃত্য বিশেষ থাকে না। কেবলমাত্র হাত সঞ্চালনের ব্যবহার হয়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকটি রাধা কৃষ্ণের ছক তাই এখানে নৃত্য নেই। কৃষ্ণ এখানে মঞ্চে একজায়গাতেই ঘুরে ঘুরে গান গায়।

তৃতীয় ছকে নৃত্য থাকে সবথেকে বেশি। ছকের ঘটনা ও কাহিনির উত্তেজনা অপেক্ষা নাচের প্রাধান্য বেশি থাকে। গানের চড়া সুরের সাথে চড়া যন্ত্রানুসঙ্গীত ও চড়া আলোর ঝলকানি তার সাথে উদ্দাম নৃত্য এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই নাচের ধরন পুরোপুরি বাণিজ্যিক। প্রচলিত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এই ছকের নায়ক নায়িকার নাচের ধরনে। নায়কের নাচের মধ্যে নায়ক সুলভ এবং নায়িকার নাচের মধ্যে শারীরিক আবেদন অতিরিক্ত প্রকাশ পায়। তৃতীয় ব্যক্তি বা নায়কের ভাতৃবধূ চরিত্রটির নাচের মধ্যেও অতিরঞ্জিত অঙ্গভঙ্গি সুলভ উদ্দামতা প্রকাশ পায়। তৃতীয় ছকের শেষে মিলনান্তক দৃশ্যে সব সময় নায়ক নায়িকার সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকটি হল সামাজিক ছক। এর মধ্যে নাচের একটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নায়ক-নায়িকার গানের সাথে চড়া সুর, যন্ত্রসঙ্গীত চড়া আলো, ঝলকানি, তার সাথে উদ্দাম নৃত্য হয় এবং নায়িকার অঙ্গ-ভঙ্গিতে অনেকটাই শারীরিক আবেদনমূলক নৃত্য হয়। নায়কের নাচের সাথে প্রচলিত চলচ্চিত্রের নায়ক সুলভ নৃত্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের পালায় সব সময় যে পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নাচের ব্যবহার হয় এমন নয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়ক গরমের কষ্ট প্রকাশ করছে কিন্তু সেই সময় নায়িকা শারীরিক আবেদনমূলক নৃত্য করছে।

আবার নাচের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মৌখিক অভিব্যক্তি। কিন্তু গাজনপালায় অঙ্গ সঞ্চালনের পাশাপাশি মৌখিক অভিব্যক্তি হয় না বললেই চলে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়িকার ভূমিকা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। যথা- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকটিও একটি সামাজিক ছক। এখানেও নাচের মধ্যে উদ্দামতা রয়েছে কিন্তু মৌখিক অভিব্যক্তি নেই। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকেও নায়িকা মঞ্চে প্রবেশ করে উদ্দাম নৃত্য পরিবেশন করে তবে সেখানেও নায়িকার মৌখিক কোনো অভিব্যক্তি নেই। নায়ক মঞ্চে প্রবেশ করে যে বিশেষ ভঙ্গিতে নৃত্য করে তা সমস্ত তৃতীয় ছকের নায়কের নাচের সাথে সাদৃশ্য মেলে। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে যন্ত্রানুসঙ্গীতের সাথে নায়কের নৃত্য এই ধরনেরই হয়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকটিতে 'শেষের গানে'র সাথে নায়ক নায়িকার উদ্দাম নৃত্য এবং শেষ দৃশ্যে তাদের মিল দেখা যায়।

এরপর বাকি ছকগুলির সবগুলিতেই কমবেশি নৃত্য থাকে। যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ছকের কাহিনিতে কমেডি বা ট্রাজেডির উপর। ঘটনা এবং চরিত্রের ধরন ও বয়সের প্রভাব নাচের ধরনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন কমেডি অংশের নাচে কমেডি ভাব প্রকাশ পায়। ট্রাজেডি অংশের নাচে ট্রাজেডি ভাব প্রকাশ পায়। তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কখনো কখনো কথপোকথনের মাঝে হঠাৎই প্রসঙ্গ বহির্ভূত ভাবে গানের প্রয়োগ হয় এবং তার সাথে চরিত্রদের উদ্দাম নৃত্য করতে দেখা যায়। কখনো হয়ত দৃশ্যে চরিত্রের দুঃখ প্রকাশ পায় এবং পরক্ষণেই তার উদ্দাম নৃত্যে দুঃখের আঁচই পাওয়া যায় না। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকটিতে নায়িকা দুঃখে থাকলেও পরিস্থিতির প্রভাব সেখানে পাওয়া যায় না। যেমন এখানে পাপিয়ার বাবা পাপিয়াকে চড় মারে কিন্তু পরক্ষণেই বিচ্ছিরি বচ্চন প্রবেশ করে গান গায়। চড়ের প্রভাব আর বিন্দু মাত্র থাকে না নায়িকা গানের সাথে নাচতে থাকে। আবার ঐ দলের তৃতীয় ছকটিতে কথপোকথনের মাঝে হঠাৎই প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে গানের সাথে নায়ক-নায়িকার উদ্দাম নৃত্য প্রকাশ পেয়েছে।

অনেক সময় দৃশ্যে কমেডি তৈরির উদ্দেশ্যে বয়স্ক চরিত্রদেরকে দিয়েও নাচের ব্যবহার হয়। সেক্ষেত্রে নাচের ধরন মৃদু। আবার একই ধরনের নাচের মধ্যে চরিত্র অনুযায়ী তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে রাজা-রানী, রাজকন্যা ও রাজপুত্র হাত ধরে নাচের ধরন আর পারিবারিক ছকে উচ্চবিত্ত বাবা মেয়ের হাত ধরে নাচের ধরনের সাথে নিম্নবিত্ত পরিবারের স্বামী স্ত্রীর হাত ধরে নাচের ধরন প্রতিটিরই মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

গাজনপালাগুলিতে নৃত্য বিষয়টির জন্য চরিত্র বা বয়স বা পরিস্থিতি কোনো বিষয় নয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে সন্তান দ্বারা অবহেলিত বৃদ্ধ বাবা প্রবেশ করে এবং গানের সাথে সাথে নৃত্য করে। আবার শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে বয়স্ক চরিত্রদের নাচের ধরন মৃদু কখনো তারা মঞ্চে বসে বসেই নৃত্য করে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনপালার নাচে একটা নিজস্ব ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমানে যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনপালা তার নিজস্ব অঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য জেলা অঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে তাই তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন শিল্পীরা। তাই তাদের নাচের মধ্যে কখনো পাশ্চাত্য নাচের অনুকরণ চোখে পড়ে আবার কখনো সাঁওতাল নৃত্যের আঙ্গিকও চোখে পড়ে। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকটিতে বাবা ও মেয়ের হাত ধরে গান ও নাচ। গানের মঞ্চ এবং আলো চড়া নয়। আলোর নকশা ব্যবহার হয়েছে। নাচের ধরনে পাশ্চাত্য প্রভাব পাওয়া যায়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকটিতে মোগলির নাচে সাঁওতাল নাচের ধরন বা লোকনৃত্যের প্রভাব রয়েছে।

গাজনপালার নাচের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হল শারীরিক আবেদনের প্রাচুর্যতা। বিশেষত তৃতীয় ছকে এটি অতি মাত্রায় চোখে পড়ে। সেখানে নায়ক-নায়িকা উভয়ের চরিত্রেই শারীরিক আবেদনের মাত্রা থাকে যথেচ্ছ। এই ছকে নায়িকাকে আকর্ষণীয় পোশাকে মঞ্চে উপস্থাপিত

করা হয়। তার নাচের মধ্যেও শারীরিক আবেদনমূলক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ খুব বেশি থাকে। নায়ক নায়িকার যৌথ নৃত্যেও এই বিষয়টিই দর্শকদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা দেখা যায়।

নৃত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মৌখিক অভিব্যক্তির প্রকাশ। শিল্পী যখন মুখ দিয়ে গান গায়, পা দিয়ে তাল রক্ষা করে, হাত দিয়ে অর্থ প্রকাশ করে আর চোখ দিয়ে ভাব প্রকাশ করে তখনই তা হয়ে ওঠে নৃত্য। সুতরাং মৌখিক অভিব্যক্তির প্রকাশ নৃত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয় কিন্তু গাজনপালার মধ্যে নাচের সবকটি গুণ থাকলেও নাচের সময় মৌখিক অভিব্যক্তি থাকে না বললেই চলে কিন্তু ওই অভিনেতারাই পরক্ষণেই যখন সংলাপ বলে অভিনয় করে তখন তাদের মৌখিক অভিব্যক্তি যথেষ্ট থাকে বরং অধিকাংশ সময়ই অতিরিক্ত অভিব্যক্তির প্রকাশ গাজনপালার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

নৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মৌখিক অভিব্যক্তি। কিন্তু গাজনপালায় অঙ্গ সঞ্চালনের পাশাপাশি মৌখিক অভিব্যক্তি হয় না বললেই চলে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়িকার ভূমিকা লক্ষ্য করলেই তা দেখা যায়।

সর্বোপরি এটাও বলা যায় যে কখনো কখনো অল্পস্বল্প নাচের প্রয়োগ হয় আবার কখনো নাচহীন কেবলমাত্র গানও হয়। যেমন— শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে হ্যান্ডেলের বউ মঞ্চে প্রবেশ করে। গান গায় একা মঞ্চে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ‘‘এমন মধুর সন্ধ্যায়... আহা—আহা’ আবার শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে শিল্পী গান করে কেবলমাত্র হাত সঞ্চালনের মাধ্যমে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে রতন কাকা চরিত্রটি নতুন কাজ পাওয়ার আনন্দে গান গায়- ‘ম্যায় কালে হ্যায় তো ... বালে হ্যায়’ —এখানে গানের সাথে নৃত্য নেই চরিত্রটি মঞ্চে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একা গান করে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে ভিখারি গান গায় কোটো ও ঢাকনা করতাল এর মতো ঠুকে ঠুকে। কোন রকম নৃত্য নেই। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে বাখারি গান গায়, লিচু বসে থাকে কিন্তু নৃত্য নেই এখানে।

পারফর্মিং আর্টের জনপ্রিয়তার ক্ষমতা সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি। পারফর্মিং আর্ট ভাষা সর্বস্ব নয়, আবার ভাষার অধীনও নয়। এটা কখনো কখনো ভাষা নিরপেক্ষ একটা বিষয়। ভাষার মতো এটা বলা বা শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গণসংযোগে এটা অনেক বেশী দুস্তর। পারফর্মিং আর্টের মধ্যে থিয়েটার জাতীয় অনুষ্ঠান এবং নৃত্যের গণসংযোগ ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি কারণ এরা একই সঙ্গে দর্শন ও শ্রবণের অভিমুখী। এদের মধ্যে দৃশ্যময়তা এতই প্রবল যে এরা ভাষার সীমা ছাড়িয়ে চলার ক্ষমতা রাখে। মৌন আবেদন ভাষায় তর্জমা করলে তা পৌঁছবে মুষ্টিমেয় ভাষা রসিক মনের কাছে কিন্তু ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে নৃত্য ও অভিনয়ের দ্বারস্থ হলে তা অনেক বেশি মানুষের

কাছে পৌঁছায়। গাজনপালার বিবিধ পারফরমেন্সের মাঝে মাঝে ভাষাহীন কিছু অংশ থাকে। নৃত্য তারই একটি আবেদন। দর্শকদের সাথে পরিবেশনের সেতুবন্ধন তৈরিতে তার গুরুত্ব যথেষ্ট।

৩.৩ বিষয়ানুগ বিভাজন

লোকনাট্যের বিষয় নিয়ে ভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ ভিন্ন মত দেন যেমন—অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে লোকনাট্যের বিষয় সম্পূর্ণরূপে গ্রামজীবন। পুরাণ বা মহাকাব্যের স্থান নেই।[৮৯] অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তীর মতে লোকনাট্য হল গ্রামীণ সমাজ নিজেদের কল্পনায় পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনিকে নির্মাণ করে নেয় আবার অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে লোকনাটক হল দুটিবিষয়ের সংমিশ্র যথা—মিথ ও কাস্টমস।[৯০]

গাজনপালা কাহিনির বিষয় মূলত ছিল দেব-দেবীকেন্দ্রিক। কালক্রমে তাতে যুক্ত হয়েছে মানব-মানবী প্রেম, বিরহ, নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয় বা দৈনন্দিন জীবনের ছবি। বর্তমানে তা যেন দক্ষিণাঞ্চলের সাধারণ মানুষেরই জীবনালেখ্য। লোকনাট্যরূপে গাজনপালার মধ্যে যেমন পাওয়া যায় পৌরাণিক কাহিনি তেমনি জানা যায় কৃষ্ণকথা। আবার বাস্তবিক সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানা যায় তাই লোকনাট্যরূপে গাজনপালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তার প্রকৃতি হিসেবে যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল গাজনপালা কাহিনির বিষয়।

পরিবেশিত কাহিনিগুলিকে নিরীক্ষণ করলে বিষয়রূপে মূলত যেগুলি ধরা দেয়—

অ) প্রেম বা ভালোবাসাকেন্দ্রিক কাহিনি- এগুলি আবার দুই রকম হয়। যথা—অতৃপ্ত ভালোবাসার কাহিনি এবং মিলনান্তক কাহিনি।

আ) পারিবারিক কাহিনি- পরিবারকেন্দ্রিক ভিন্ন কাহিনি। যেমন—বাবা মায়ের প্রতি সন্তানের অবহেলার গল্প, পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাই ভাই দ্বন্দ্ব, স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি ঝগড়া বা মনোমালিন্য প্রভৃতি।

ই) সামাজিক কোনো বিষয়- এই ধরনের পালায় সাধারণত জনসচেতনতা বা জনশিক্ষা কিংবা জন বার্তা দেওয়া হয়।

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে পাওয়া দলগুলির পরিবেশিত গাজনপালা কাহিনির বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ

প্রথম ছক: শ্রেণি বৈষম্য প্রেম এবং ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ নিতে চায় অতৃপ্ত আত্মা।

দ্বিতীয় ছক: কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য রাধা ও পৃথিবীর কলহ শেষে মীমাংসা।

তৃতীয় ছক: গ্রামের অশিক্ষিত যুবক ও শহরের শিক্ষিত যুবতীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং প্রেম।

চতুর্থ ছক: বাবা মা যে সন্তানের জন্য নিজেদের সমস্ত ত্যাগ করে সেই সন্তানরাই বাবা মায়ের উপর নির্যাতন করে সম্পত্তির জন্য।

পঞ্চম ছক: বন্ধ্যাত্বের কারণে নারীকে সমাজচ্যুত হতে হয়। অন্যদের মতো স্বামীও প্রথমে তাকে ভুল বোঝে এবং শেষে স্ত্রীর মনের কষ্ট অনুভব করে অন্যায় করেছে বুঝতে পারে।

ষষ্ঠ ছক: নায়িকার প্রেমিক তার হবু শাশুড়িমায়ের চরিত্র যাচাই করে বোঝে তার চরিত্রের দোষ আছে। আসলে মেয়ের চরিত্র কেমন বোঝার জন্যই সে এই পরীক্ষা করেছে। তার ধারণা যে, মায়ের চরিত্রের উপর মেয়ের চরিত্র নির্ভর করে। পরে তার সেই ধারণা বদলায়।

সপ্তম ছক: স্বামী নিষ্কর্মা, নেশাখোর। কর্মঠ স্ত্রীর উপর তবুও সে অত্যাচার করে। পরে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে।

অষ্টম ছক: বিষয় বধূ নির্যাতন। ছেলেকে পুত্রবধূর উপর নির্যাতন করতে প্ররোচিত করার অপরাধে মায়ের জেল হয়। অবশেষে পুত্র তার ভুল বুঝতে পারে এবং অন্যদের প্ররোচিত হতে নিষেধ করে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা

প্রথম ছক: রাজার কাছে ভিখারি খাবার চাওয়ায় রাজা তাকে তাড়িয়ে দেয়। ক্ষুধার জ্বালায় সে খাবার কেড়ে খেতে চাইলে রাজা তাকে হত্যা করে। এর পর তার অতৃপ্ত আত্মা একে একে রাজার পরিবারের সকলকে হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতে চায়।

দ্বিতীয় ছক: কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য রাধা গোপনে কৃষ্ণের কাছে যায়। সেকথা জানতে পেরে রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ রাধারাণীকে চাবুক দিয়ে প্রহার এবং কৃষ্ণের পায়ে তাকে অর্পণ করে। কৃষ্ণ জানায় যদিও রাধার কৃষ্ণ অংশে জন্ম তবুও এজন্মে সে পরস্ত্রী তাই কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করতে অপারক।

তৃতীয় ছক: দেওরের মধুমেহ রোগ হয়েছে সন্দেহ হওয়ায় ভাতৃবধূ তাকে 'ইউরিন' পরীক্ষা করতে পাঠায়। গ্রামের অশিক্ষিত যুবক ও শহরের শিক্ষিত যুবতীর এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝি ও শেষে প্রেম।

চতুর্থ ছক: বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব নেওয়া নিয়ে তিন ছেলের মধ্যে ঠেলাঠেলি। তারা হয় 'ভাগের বাবা-মা'। এমনকি তাদের সন্তান তাদেরকে মেরে শ্মশানে দিয়ে অর্থ রোজগারেরও চেষ্টা করে। শেষে সন্তান নিজের ভুল বুঝতে পারে।

পঞ্চম ছক: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে তার প্রচার ও নারীর চরিত্রহীনতা এবং শেষে নিজের ভুল উপলব্ধি করা।

ষষ্ঠ ছক: যে পুরাতন ভৃত্য প্রতিনিয়ত অবহেলিত, অপমানিত হয় দুঃসময়ে সেই রক্ষা করে। কাহিনি শেষে বাড়ির মালিক বোঝে সবাইকে সম্মান দেওয়া উচিৎ।

সপ্তম ছক: বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্যে পুত্র ও পুত্রবধূ উদাসীন। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যস্ত সন্তান তাদের অপমান, অবহেলা করে। অবশেষে তারা নিজেরদের ভুল বুঝতে পেরে বাবা মায়ের কাছে মার্জনা চায়।

অষ্টম ছক: মাতঙ্গিনীর সংসারে তার প্রাক্তন প্রেমিক উপস্থিত হয়ে সুখের সংসার ভেঙ্গে দেবে মনে হয়। মাতঙ্গিনীর স্বামী তাকে হত্যা করে। অবশেষে জানা যায় সে সর্বনাশ নয় বরং উপকার করতেই এসেছিল।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা

প্রথম ছক: রাজকুমার চরিত্রহীন, ধর্ষক একথা মহারাণীকে জানালে সে অবিশ্বাস করে। মিথ্যা অভিযোগ ভেবে অভিযোগকারীকে দণ্ড দেয়। পরে নিজ চক্ষে তার প্রমাণ পেয়ে মহারানী নিজে হাতে রাজকুমারকে হত্যা করে দুষ্টের দমন করে।

দ্বিতীয় ছক: অভিশপ্ত কাকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে গিয়ে তার ঈশ্বররূপ দর্শন করে, তার স্পর্শে শাপ মুক্ত হয়। এই ছকটিতে রাধা চরিত্র অনুপস্থিত।

তৃতীয় ছক: দেওর গ্রামের অশিক্ষিত যুবক। বৌদির আদেশে সে দাদার জন্য রক্ত আনতে যায়। পথে শহরের শিক্ষিতা যুবতীর সাথে দেখা, ভুল বোঝাবুঝি ও শেষে প্রেম।

চতুর্থ ছক: স্বামী চাকরিসূত্রে দূরে থাকায় স্ত্রী পরকীয়া করে এবং শেষে নিজের ভুল বুঝতে পারে।

পঞ্চম ছক: বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর রক্ত পরীক্ষা করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা নিয়েই কাহিনি।

ষষ্ঠ ছক: নায়িকাকে বহু পুরুষের সাথে সম্পর্কে যুক্ত রূপে দেখানো হলেও শেষে দেখা যায় বিষয়টি ভুল। প্রয়োজনে সে বাধ্য হয়েছে এ কাজ করতে। অবশেষে নায়ক নায়িকার মিল।

সপ্তম ছক: চাকরিসূত্রে বাইরে থাকা স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করে। অবশেষে তার ভুল ভাঙে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দল

প্রথম ছক: সরমার প্রাক্তন প্রেমিক ফিরে এসে তার স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। বিশ বছর পর সরমার সন্তানকেও হত্যা করতে চায়। তখন সরমার মৃত স্বামীর অতৃপ্ত আত্মা ফিরে আসে এবং প্রতিশোধ নিতে অপরাধীকে হত্যা করে। পরিবেশনার প্রথম ছক হলেও এখানে কোনো পৌরাণিক চরিত্র নেই।

দ্বিতীয় ছক : রাধা মনে করে কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে তার একার। কৃষ্ণ জৈমুনি দ্বারা প্রমাণ করে যে কৃষ্ণ সবার। যে বড় ভক্ত হয় কৃষ্ণ তারই হয়।

তৃতীয় ছক: সরকারি কাজ সুতি খাল কাটাকে কেন্দ্র করে গ্রামের যুবক ও শহরের যুবতীর প্রেম। কাহিনির মাধ্যমে সরকারি কাজের প্রশংসা করা হয়েছে।

চতুর্থ ছক: সুবল তার মৃত শ্বশুরের (যে গুন্ডা ছিল) মাল্যদানের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করে অথচ টাকার অভাবে চিকিৎসা না পেয়ে তার একমাত্র বোন মারা যায়। শেষে সে বুঝতে পারে যে মৃত মানুষের জন্য টাকা খরচ না করে যে মানুষ বাঁচতে পারে তার জন্য টাকা খরচ করা উচিত।

পঞ্চম ছক: স্বামী নেশাখোর, অকর্মণ্য, অলস। স্বামীর সংসারের দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীনতা, স্ত্রীর প্রতি অবহেলা সত্ত্বেও স্ত্রী কষ্ট ও পরিশ্রম করে সংসার চালায়। অবশেষে স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পারে। তখন স্বামী-স্ত্রীর মিল ঘটে। কাহিনির মাধ্যমে বেশ কয়েকটি জনসচেতনমূলক বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ ছক: উচ্চশিক্ষিত বাবার মৃত্যুর পর তার সামান্য সম্পত্তি নিয়ে ভাই-ভাই দ্বন্দ্ব বাধে যার মধ্য দিয়ে তাদের অত্যন্ত নীচ মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। অবশেষে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। তখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিল ঘটে।

সপ্তম ছক: নাতনি পালিয়ে বিয়ে করার অপরাধে দিদিমার সাথে মনোমালিন্য এবং অবশেষে মিল। কাহিনির মাধ্যমে নাবালক বিয়ে ও অল্প বয়সে সন্তান হওয়া অনুচিত সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে।

৩.৪ জনসচেতনতা ও লোকশিক্ষার উপাদান

লোকনাট্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল জনসচেতনতা বা লোকশিক্ষা। কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা বার্তা দর্শক মনে শিক্ষা বা সচেতনতা বোধ জাগায়।

বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জনপ্রিয় গাজনপালার মধ্যে যে সমস্ত ছক পরিবেশন করা হয় তার অধিকাংশ কাহিনির মধ্যে থাকে সামাজিকবার্তা যা দর্শক মনে সচেতনতা বোধ জাগ্রত করে। সেটা কখনো হয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক, কখনো আইনকেন্দ্রিক, কখনো পারিবারিক সচেতনতা। আবার সরকারি কোনও বার্তাও গাজনের কাহিনি র মাধ্যমে গ্রামের এই নিরক্ষর বা স্বল্প সাক্ষর, শহর থেকে বহুদূরে বসবাসকারী আধুনিক যোগাযোগ বা সংযোগ মাধ্যম বিহীন মানুষগুলির কাছে সহজেই তুলে ধরা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী অক্ষরবিহীন আধুনিক মাধ্যম থেকে দূরে বসবাসকারী মানুষগুলির কাছে সহজেই কোনও বার্তা বা সচেতনতা পৌঁছে দেওয়ার এ এক অপরিহার্য মাধ্যম। এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রবণ মাধ্যম হওয়ায় মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছনোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি বিষয় হল এটি পর্দার দৃশ্য নয়। দর্শকের সামনেই যেহেতু অভিনয়

হয় সেহেতু দর্শক নিজেকে অনেক বেশি এর সাথে একাত্ম করতে পারে ফলে যে বার্তা সে পায় সেটা অনেক বেশি তার কাছে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

উক্ত দলের পালাগুলিতে কোন কোন সচেতনবার্তা ও লোকশিক্ষা ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করব। কখনো কখনো দর্শকগণ সরকারি আইন কানুন এর বার্তা পান কাহিনির মাধ্যমে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে ঘটনা ক্রমে জানা যায় যে বাবার সম্পত্তির অংশীদার পুত্র এবং মেয়েও। সরকারি খাতায় সেই নিয়মের উল্লেখ রয়েছে। সেকথা জানিয়ে গানের মাধ্যমে মেয়ে বলে-

"বাবার কিছু থাকলে পরে পাবয়ে পুত্র মেয়ে
এ কথা বারে বারে সর খাতায় বলে।"

ঐ ছকেই বাবা চরিত্রটি জানায় সে সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে কারণ কিছুদিন আগে সরকার ঘোষণা করেছিল যে দু বিঘে বা তিন বিঘে জায়গা ছাড়া বাকি জায়গা থাকলে তা বেনামি করে দেওয়া হবে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকের নায়িকা শিক্ষিতা শহুরে। সে জানায় সে গ্রামে এসেছে কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রচারের জন্যে। নায়কের ভাতৃবধূ কন্যাশ্রী সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে—"তোমরা জানো না? কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রচার মানে শোনো যে সব স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে তারা স্কুল থেকে টাকা পাচ্ছে, আরও নানা রকম সাহায্য পাচ্চে।" ঐ দলের পঞ্চম ছকে গুয়েপুলিশ হাত জোড় করে দর্শকমণ্ডলীকে স্বচ্ছ ভারত গড়ার, নির্মল বাংলা গড়ার এবং গাছ লাগিয়ে প্রাণ বাঁচানোর অনুরোধ জানায়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকের নায়ক ফোকে তার বৌদিকে জানায় যে সরকারি ১০০ দিনের কাজের টাকা সরকার যখন পাঠাবে তখন ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে এসে যাবে। ঐ ছকেই ভাতৃবধূ চরিত্রটির গানের মাধ্যমে রচনাকার জনগণকে বার্তা দিয়েছেন কর্ম করে প্রাণ বাঁচানোর এবং পাশাপাশি সরকারি ১০০ দিনের কাজের কথা জানিয়েছেন। ঐ দলের সপ্তম ছকে চৌকিদার জানায় সরকারি মতে ১৪ বছরে বিয়ে অনুচিত এবং হাবিলদার জানায় নাবালক বিয়ে আইন বিরূদ্ধ। পঞ্চম ছকে লোনের অফিসার খনার স্বামীকে জানায় যে যদি সে লোনের টাকা শোধ না করে তবে তার সমস্ত জায়গা জমি সরকারের কাছে নিলাম হয়ে যাবে। সেই সাথে বন্ধন লোন কি, তাতে সুবিধেই বা কি সে সম্পর্কে সংলাপের মাধ্যমে এও জানানো হয়।

কখনো কখনো সরকার বা সরকারি কাজের প্রশংসা করা হয় জনগণের কাছে কাহিনির মাধ্যমে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকের নায়িকা মধু সরকারি কাজে গ্রামে খরা অঞ্চলে 'সার্ভে' করতে আসে। তার কথা শোনার পর নায়কের ভাতৃবধূ সরকারের বিশেষ প্রশংসা করে। সপ্তম ছকে মমতা ব্যানার্জির প্রশংসা এবং নারীকল্যাণ সমিতি গঠনের প্রশংসা জানিয়ে স্ত্রী চরিত্রটি বলে—"মমতা আমাদের অনেক সহযোগিতা করছে। গেরামে গেরামে আমাদের সমিতি করে দেচে।" নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকের নায়িকা এ সম্পর্কে আরও তথ্য জানিয়ে বলে—"তেষট্টিটি দেশে ৫৭২টি প্রকল্প নিয়ে পতিযোগিতা হয়েছিল। সেই পতিযোগিতার মধ্যে থেকে

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।” এর পর গানের মাধ্যমে জানায় যে—“পাঁচশ বাহান্নটি প্রকল্প নিয়ে/কন্যাশ্রী শিক্ষাশ্রী পেল রাজ্য গিয়ে।” সেই সাথে সরকারি কাজে নিযুক্ত হয়েছে গুয়ে পুলিশ। সে সরকারের প্রশংসা করে। পঞ্চম ছকে অঞ্চল প্রধান মদখোর লোককে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছে বলার মাধ্যমে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিষ মদ খেয়ে প্রাণ হারানো পরিবারকে অর্থ সাহায্য দেওয়ার ঘটনা এবং অঞ্চল প্রধানের বক্তব্যের মাধ্যমে আয়লা বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে পঞ্চায়েত থেকে ঘর দেওয়া হয়েছিল, বার্ধক্য ভাতাও দেওয়া হয়েছিল খবর জানা যায়। সপ্তম ছকে বৃদ্ধ বাবার সংলাপ থেকে জানা যায় আয়লার ঝড়ের কারণে সরকার ৩৫ কেজি করে চাল দিচ্ছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার তৃতীয় ছকে নায়ক মশা রক্তের সন্ধানে যায় নায়িকা ময়নার সাথে দেখা হয়। কথোপকথনের মাঝে মশা জানায় সে বাইরে হিস করেনা কারণ সরকার থেকে এত বাথরুম করে দিয়েছে যে আর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকের নায়ক ফোকে তার বৌদির বক্তব্যের প্রত্যুত্তর রূপে সরকারের প্রশংসা করে বলে—“সরকারি কাজে নিযুক্ত উপর আমলারা সবাই চোর নয় অমানুষ নয়। যদি সবাই চোর বা অমানুষ হত তাহলে গ্রামবাংলার এত উন্নয়ন হত না” এবং গ্রামবাংলার যা যা উন্নয়ন হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে বলে—প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, স্কুল, টিউবওয়েল, শৌচাগার এবং ভারত সরকার ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করেছে সাধারণ মানুষের জন্যে।

কখনো কখনো জনগণকে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা হয় কাহিনির মাধ্যমে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকের নায়িকা মধু যে কোনো জল না খেয়ে বোতলের জল খাওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যসচেতনতা প্রকাশ করেছে এবং দর্শকমণ্ডলীকে সেই বার্তা জানিয়ে সচেতন করেছে। অষ্টম ছকটির বিষয় পণপ্রথা। তিশা নামের বধূটি পণের দাবিতে শ্বাশুড়ি ও স্বামীর অত্যাচারে প্রাণ হারায়। তার মৃত্যুর পর রচনাকার তার দুই ভাইয়ের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে দিয়েছেন—“কবি নরেশ ভেবে বলে/ কেউ কোরোনা এ ভুল মেয়ের ঘরে/ এমনি যাবে অকালে।” নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকটিতে দেওরের ঘনঘন বাথরুম যাওয়া দেখে তার ভাতৃবধূ বুঝতে পারে যে তার মধুমেহ রোগ হয়েছে। গ্রামের অশিক্ষিতা মহিলা হয়েও সে দেওরকে সচেতন করে। ইউরিন পরীক্ষা করতে পাঠায় এবং ডাক্তার দেখাতে বলে। সাথে এও বলে যে— “এই সব রোগ যদি চেপে রাখে দুদিন পরে অবস্থা খারাপ... তা বলে কইচি একটা বোতল নেবে, ভালো করে ভত্তি করবে আর সোজা চলে যাবে ডাক্তারখানায়।”— এ এক প্রচার। মধুমেহ সম্পর্কে জনসচেতন বার্তাও বলা যায়। চতুর্থ ছকে কনিষ্ঠ পুত্র মায়ের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে আসে। সেখানে শ্মশান কমিটি মরণোত্তর প্রমানপত্র দেখতে চায়। দেখাতে অপারগ হওয়ায় পুলিশ আসে। জনগণকে সচেতন করানো হয়েছে যে কেউ মারা গেলে দাহ করার পূর্বে ডাক্তারের কাছ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট নেওয়া জরুরি। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার পঞ্চম ছকে বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করা উচিত। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই পালা ঘটনা পরবেশিত হয়েছে। চতুর্থ ছকে ভৃত্য ভজহরির মাধ্যমে

রচনাকার দর্শকবৃন্দকে সামাজিকবার্তা দিয়েছেন। ভজহরি তার দিদিমণিকে বলেছে— “মায়ের দুধের বিকল্প নেই।” নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে দেওর ও বৌদির কথোপকথনে কোতিলে খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করার কথা জানানো হয়েছে। সপ্তম ছকে হাবিলদারের সংলাপে জানানো হয় যে অল্পবয়সে মা হওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

লোকশিক্ষা প্রদান গাজনপালার অন্যতম উদ্দেশ্য। কাহিনির পরতে পরতে তার নজির মেলে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্টম ছকটির বিষয় পণপ্রথা। তিশা নামের বধূটি পণের দাবিতে শ্বাশুড়ি ও স্বামীর অত্যাচারে প্রাণ হারায়। তার মৃত্যুর পর রচনাকার তার দুই ভাইয়ের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে দিয়েছেন—

“কবি নরেশ ভেবে বলে/ কেউ কোরোনা এ ভুল/ মেয়ের ঘরে/ এমনি যাবে অকালে।”

পণের জন্যে অত্যাচারিত হয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পর তার স্বামী নিজের ভুল বুঝতে পেরে পুলিশের কাছে নিজেই আত্মসমর্পণ করে। মায়ের প্ররোচনায় সে যে ভুল করেছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে সচেতন করে তারা যেন কখনো কারোর কথায় প্ররোচিত হয়ে এই ভুল না করে। তাই গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তার বক্তব্যে সেই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে প্রায় দেড় মিনিটের একার সংলাপে। সে বলে—

> “ওগো মা, ওগো মমতাময়ী মা, পারলো না, পারলোনা তোমার টাকা, পয়সা, বাড়ি, গাড়ি কিছুই আমাকে আটকাতে পারলোনা। আমি জানি আমি যা ভুল করেছি আমার মৃত্যুই অনিবার্য। শুধু সন্তানের জন্ম দিলে মা হওয়া যায়না গো, যে মা নিজের সন্তানকে দিয়ে নিজের পুত্রবধূকে হত্যা করে, সে রাক্ষুসী। আজ তোমাদের মতোন মায়েদের গর্ভে আমাদের মতোন শয়তানদের জন্ম হবে না তো হবে মহান পুরুষ, মহান ব্যক্তিদের জন্ম? হবে বিবেকানন্দের জন্ম? হবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম? না মা না, তোমাদের মতোন মায়ের গর্ভে শয়তানদেরই জন্ম হবে। আমি এই সভ্য সমাজের মানুষকে বুঝিয়ে দিতে চাই—ওগো সভ্য সমাজের মানুষ চেয়ে দেখো, আজ অসহায়ের চিতা জ্বলে। বধূ হত্যার দায়ে স্বামী যাচ্ছে জেলে। না না আমি যা ভুল করেছি আমার মায়ের কথা শুনে, এ ভুল আর তোমরা কোরোনা, এ ভুল তোমরা কেউ করোনা এই ধরিত্রীর মাঝে।”

সপ্তম ছকটির মাধ্যমে স্ত্রীর উপর স্বামীর অত্যাচার করা অনুচিত এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো সমস্যা হলে পাঁচ কান না করে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়াই উচিত। স্বামী চরিত্রটি শেষ অংশে ‘ফিনিশিং গানে’ তাই স্ত্রীর উপর অত্যাচার করার অনুশোচনায় অনুতপ্ত হয়ে বলে—

“যদি ভুল করে থাকি/ ক্ষমা করো গো...”

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকটির শেষ দৃশ্যে ‘ফিনিশিং গানে’ বাবা মাকে ভালোবাসলে তবেই ভগবান খুশি হয় এ কথা বৃদ্ধের গানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে—

“যতই যাও না মন্দির মসজিদ/ যতই ঘোরো তীর্থস্থান/ বাবা মাকে না বাসলে ভালো/ হয় না খুশি ভগবান।”

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার দ্বিতীয় ছকে কাকাসুর শিশুকে হত্যা করতে এলে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে তাকে বলে—শিশুহত্যা ও শিশুপাচার মহাপাপ। তৃতীয় ছকের বিষয়ের মাধ্যমে রক্তদানের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা জানানো হয়েছে। নায়ক ডেঙ্গু নায়িকা ময়নাকে রক্তদান করতে বলে এবং ময়নার সংলাপের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে যে রক্তের প্রয়োজনে রক্তদান শিবির করা হয় এবং রক্তের প্রয়োজন হলে ব্লাডব্যাঙ্কে যেতে হবে। ষষ্ঠ ছকে ভিখারি অপর দুই ব্যক্তিকে অনুরোধ জানায় সচেতন হওয়ার জন্য। ঐ দুই ব্যক্তি এখানে জনগণের প্রতিরূপ। ভিখারি নিজেও সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে তাই সে বলে এরকম মেয়ে থেকে দূরে থাকতে নইলে মায়ের সাথে ভাইদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে সর্বস্বান্ত হতে হবে তার মতো। সপ্তম ছকে হ্যাণ্ডেল তার স্ত্রীকে প্রথমে সন্দেহ করে নিজের পরে ভুল বুঝতে পারে। তখন শাঁখা ব্যাপারীর সংলাপের মাধ্যমে প্রতিটা মানুষের উপর বিশ্বাস রাখার বার্তা দেওয়া হয় জনগণকে। সাথে বলা হয় সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে তাই স্ত্রীকে সন্দেহ না করে বিশ্বাস করা উচিত, ভালোবাসা উচিত। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে দিদিমার অল্পবয়সে বিয়ে এবং বিধবা হওয়ার ঘটনার মাধ্যমে অল্প বয়সে বিয়ে না দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয় জনগণকে। দ্বিতীয় ছকে রচনাকার এই নিজের ভণিতার মাধ্যমে কর্মগুণে ফল পাওয়া যায়—বিষয়কেন্দ্রিক এই বার্তা জনগণকে দিয়েছেন। পঞ্চম ছকে খনার একাধিক সন্তান এবং তাদের নিয়ে তার যে নাস্তানাবুদ অবস্থা তা থেকে ‘ছোট পরিবার সুখী পরিবার’ অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণের বার্তা জনগণকে দেওয়া হয়েছে। সপ্তম ছকে দিদিমা বলে আর কিছুদিন পর বিয়ে করলে তার নাতনি আর নাতজামাইকে আর ঝুপড়িতে থাকতে হতো না অর্থাৎ আগে স্বাবলম্বী হয়ে তার পর বিয়ে করা উচিত- এই বার্তা দেওয়া হয়। পঞ্চম ছকে গ্রুপ লোনের সভাপতি ও খনার কথোকথনে জনগণকে নেশামুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। মেয়েদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে প্রয়োজনে এ দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে। মদ, গাঁজা, সাট্টা, জুয়া বন্ধ করতে হবে।

এখানকার মানুষ বিগত প্রায় কয়েক দশক ধরে গাজনগানের চর্চা করে চলেছেন কারণ এই চর্চায় আছে সমাজের ও ব্যক্তির মঙ্গলচিন্তা, সাধুভাবনা। গাজনপালাগুলি নির্মিত হয় গ্রামের অনাড়ম্বর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এক স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির দ্বারা। গ্রামের নিম্নশ্রেণির কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষগুলো তাদের মনের কথা স্বতঃফূর্তভাবে নির্মিত করে এই গাজনপালার মধ্যে। যা পরিবেশিত হয় পূজা-পার্বণ, আনন্দ-উৎসব উপলক্ষ্যে। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যথা-বেদনার ছবি অকপট অকৃত্রিম স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এই গাজনপালার ছোটো ছোটো কাহিনিগুলির মধ্যে দিয়ে।

গাজনপালা রচয়িতারা এসব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন তাই কখনো বাবা-মা-সন্তান, কখনো স্বামী-স্ত্রী, কখনো ভাই-বোন এদের মাধ্যমে কখনো দ্বন্দ্ব, কখনো নিছকই কথপোকথনের মধ্য দিয়ে অসাধারণভাবে বুঝিয়ে দেন এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। স্থূল হাস্যরসসিক্ত সংগীতবহুল এই কাহিনিগুলি গ্রামের মানুষের জীবনের ক্লান্তি দূর করে যে মানসিক আনন্দ দান করে তা থেকে তাদের

বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়। তাদের মনকে কলুষমুক্ত করে নীতিশিক্ষার মাধ্যমে আত্মচেতনার বিকাশ ঘটায়।

সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় নৈরাজ্য, দুর্নীতি, অমানবিকতা, ঐতিহ্যবিরোধী শিক্ষা আজ তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনীতির দান। গ্রামের সুস্থতা, সরলতা অনেকখানি আজ বিলীন। গাজনপালার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সে সহজভাবে সমাজকে শিক্ষা দেয়। দর্শকবৃন্দ জানতে পারে না কখন সে বিরাট কোনো দর্শন বা মতবাদ শিক্ষা করে ফেলেছে। খুব সহজভাবেই সে জনমত গঠন করতে পার তাই গাজনপালার মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার ধারাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ মানুষের কাছে গাজনপালা আজও অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকমাধ্যম। শুধু বিনোদন নয়, লোকশিক্ষার একটি বলিষ্ঠ ও সচেতন ধারা যে গাজনপালার মধ্যে প্রবহমান তা ছোটো ছোটো ছকগুলির মূল বক্তব্যটি লক্ষ্য করলেই দেখা যায়।

৩.৫ গাজনপালার বিষয় বিবর্তন

লোকনাট্যের বিষয় ছিল মূলত পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনিকে কেন্দ্র করে নির্মিত ঘটনা। লোকনাটক হল দুটিবিষয়ের সংমিশ্রণ। যথা—মিথ ও প্রথাগত বিষয় আর পালা সম্পর্কে দেবব্রত নস্কর তার 'চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেব-দেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বলেছেন-

"মানুষের দৈববিশ্বাস, ভক্তি, সামাজিক সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতির কথা লোকায়ত পালাগানের মধ্যে নিহিত থাকায় পালাগানগুলি এই অঞ্চলের লোক সমাজের আর্য-সমাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় পাটের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সম্পদ হিসাবে পরিগনিত হয়।"[৯১]

লোকনাট্যরূপ গাজনপালার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। অতীতে যখন একেবারেই পেশাদারি গাজনদলের আবির্ভাব ঘটেনি বা সেভাবে প্রচলন হয়নি তখনও গাজনপালা কাহিনির বিষয় ও চরিত্রগুলি মূলত ছিল দেব-দেবীকেন্দ্রিক। কালক্রমে তাতে যুক্ত হয়েছে মানব-মানবী প্রেম, বিরহ, নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয় বা দৈনন্দিন জীবনের ছবি। বর্তমানে তা যেন দক্ষিণাঞ্চলের সাধারণ মানুষেরই জীবনালেখ্য। বর্তমানে লোকনাট্যরূপে গাজনপালার মধ্যে যেমন পাওয়া যায় পৌরাণিক কাহিনি তেমনি জানা যায় কৃষ্ণকথা। আবার বাস্তবিক সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানা যায়। আসলে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে দর্শক জনরুচির প্রধান্য পেয়েছে গাজনপালার বিষয়বস্তুতে।

যখন থেকে গাজনপালার বিষয়ের মধ্যে মানবিক কাহিনির সংযোজন ঘটেছে তখন থেকেই সেই কাহিনির বিষয় হয়েছে পরিশীলিত সমাজের বাইরের কোনো এক জগতের জীবনযাত্রা, চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের জনপ্রিয় গাজনপালার মধ্যে কাহিনির বিষয়ও সেইরকম। বর্তমানে লোকনাট্যরূপ গাজনপালার সংলাপ একেবারেই আঞ্চলিক গ্রাম্যভাষায় ব্যবহার হয়

কিন্তু বিষয়বস্তুতে ভাবনার প্রাধান্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির পাশাপাশি সামাজিক সূচক ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-ভাবনায় বদল ঘটেছে এবং গাজনপালার মধ্যে সেই ভাবনার প্রয়োগও পরিশীলিত হয়ে ওঠেছে। এখন মানুষের জীবনকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনাই এখানে মুখ্য বিষয়। অপরিশোধিত, অমার্জিত, সাধারণ মানুষের মর্জি অনুযায়ী মূলত সৃষ্টি হয় পালা সাহিত্যগুলি। রচিত হয় গ্রামেরই কোনো সাধারণ মানুষ দ্বারা তাই তার মূলে থাকে গ্রাম্য সম মনন বা সমরুচি। আসলে জনমানুষের কথা তাদের মতো করেই এখানে প্রকাশ পায় কেবল সময়ের সাথে সাথে বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত দলগুলিতে বর্তমান সমাজের যে চিত্র ধরা পড়েছে তা এখানে আলোচিত হল।

বর্তমান গাজনপালার ছকগুলি যেন সমাজেরই দর্পণ

> "সাহিত্যের অন্যতম প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা সমাজদর্পণ বা সমাজ-চিত্র। কোন স্থান ও কালের সমাজজীবনে যে উত্থান-পতন, যে দ্বন্দ্ব-সন্ধি ঘটে, যে হাসি-কান্না দেখা দেয়, যে প্রেম-বিরহ বা আনন্দ বেদনা জাগে, যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়, তার স্থায়ী দর্পণ হল তখনকার সেই স্থানের সাহিত্য। অতএব সেই সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শৈল্পিক, দার্শনিক অবস্থা প্রভৃতির একমাত্র পরিচায়ক হল তার সাহিত্য।"- গিরীন্দ্রনাথ দাস[১২]

লোকনাট্যগুলি যেহেতু গ্রামের খুব সাধারণ মানুষ দ্বারা রচিত হয় এবং তার শ্রোতা ও দর্শকরাও অধিকাংশই গ্রামের সাধারণ শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষ তাই কিছুটা দর্শকরুচির কথা মাথায় রেখে আর অনেকটা পালাকারের স্বভাবের কারণে বর্তমানে এর বিষয়বস্তুর মধ্যে গ্রামের সমাজ জীবনের নানা বাস্তবরূপ প্রকাশ পায়। সমাজে এখনও এমন কিছু মানসিকতার নজির মেলে যা অসমীচীন আবার এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পায় যা আপতিক ভাবে জানা সম্ভব নয়। এমন কিছু মানবিকতার নজির মেলে যা শহুরে মানুষের মধ্যে হয়ত ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এই কারণে লোকনাট্যকে গ্রাম সমাজের প্রতিরূপ বলা যেতে পারে আর লোকনাট্যরূপে গাজনপালার ছকগুলিও যেন সেই সমাজেরই দর্পণ। যার পরতে পরতে প্রকাশ পায় সমাজের নানান ভালো-খারাপ বাস্তব চিত্র। সেরকমই বর্তমান সময়ের সমাজের কিছু ভালো দিক প্রতিফলিত হয়েছে উক্ত ছকগুলির কাহিনি তে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে দিদির পনের টাকা জোগাড় করার জন্য প্রতিবন্ধী ছোট ভাই রক্ত দান করতে চাইলে প্রতিবন্ধী বড় ভাই তাকে বাধা দেয়। প্রয়োজনে সে ভিক্ষা করবে কিন্তু ভাইকে রক্ত দিতে দেবে না। তাকে সে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। ছোটভাই বলে, সে নিজে মরে গেলে কিছু আসে যায় না কিন্তু দাদা মরে গেলে তাকে পথ দেখানোর কেউ থাকবে না। এখানে পালাকার দেখিয়েছেন অসহায় আর্থিক সহায় সম্বলহীন মানুষ হলেও আত্মিক সম্পর্কের গভীরতা তাদের অনেক বেশি। অষ্টম ছকে ভাইরা গরিব হওয়ায় মৃত দিদির কাজ করার জন্য পুলিশ তাদের হাতে কিছু টাকা দেয়। পুলিশের মানবিক রূপ প্রকাশ করেছেন পালাকার। পরিবর্তে ভাইরা পুলিশকে প্রণাম করতে

যায়। এর মধ্যে দিয়ে গ্রাম্য, নিরক্ষর, অর্থিকভাবে দুর্বল সমাজেও শিক্ষা ও সহবত যথেষ্ট রয়েছে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আবার তিশা হত্যায় অপরাধী শাশুড়ি পুলিশকে ঘুষ দিতে চাইলে সে জানায় সান্যালবাবু ঘুষের টাকায় হাত দেয় না। সে চায় অপরাধীর সাজা। যাতে এই বাংলার মানুষ কোনোদিন কোনো পুত্রবধূর ওপর নির্যাতন করার সাহস না পায়। পঞ্চম ছকের কাহিনিতে একজন নারীর বন্ধ্যাত্বের কারণে অমঙ্গলসূচকরূপে কলঙ্কিত হয়ে সমাজ বিচ্যুত হয়ে থাকতে হয়েছে। কেবলমাত্র ভালো দিকই নয় তার পাশাপাশি সমাজের অন্ধকারময় দিকও প্রতিফলিত হয়েছে উক্ত ছকগুলির কাহিনিতে।

পালাগুলির বিষয়ের মধ্যে বর্তমান সমাজের খারাপ দিকটিকেও তুলে ধরেছেন পালাকার। যেমন- এই আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকটিতে অকর্মণ্য অলস স্বামী তার স্ত্রীকে ভাটায় কাজ করতে যেতে বলে। স্ত্রী জানতে চায় সে বাড়িতে কি করবে? স্বামী বলে বন্ধুবান্ধব আসবে একসাথে মদ খাবে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে ভাতৃবধূ চরিত্রের বক্তব্যের মধ্যে গ্রামবাংলার দুরাবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। সে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে— "যেতায় সেতায় দিদিগো ইট তুলে নেচে। বর্ষাকালে দিদিগো ভালো শাড়ি পরে ফাঁকায় বার হবার কলনি।"

অর্থবান ব্যক্তি সমাজে কদর পায় তার প্রকাশ ঘটেছে ছকের বিষয়ের মধ্যে। যেমন- এই বিষয়টি নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের প্রথমাংশে অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। হরি (বাড়ির চাকর) বলেছে—"এই বাড়ির বউমনি হল হত্তাকত্তা। যা করবে বউমনির খরচা।" এই উক্তির মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে বউমনির অর্থের কারণে সংসারে আধিপত্য ঘটেছে এবং অর্থের কারণেই তার কাছে পুরুষতন্ত্রও আত্মসমর্পণ করেছে তাই তার স্বামী তাকে বলে—"না—না—না—না মনি, তুমি রেগে যেও না। তুমি রেগে গেলে আমার ভয় লাগছে অথচ পরক্ষণেই সে ভৃত্য হরিকে ধমক দিয়ে তার শ্বশুরকে 'ইনসাল্ট' করতে বারণ করেছে তাই সব দেখে হরি সঞ্জয় প্রসঙ্গে বলেছে—"যেমন তেমন বাবু বউয়ের কাছে কাবু।" এরপর সঞ্জয় হরিকে দু হাজার টাকা দেয় মালা আনার জন্যে কারণ তার মৃত দুশ্চরিত্রবান শ্বশুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাল্যদানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এক শ্রেণির মানুষের অর্থের অপচয় করার মানসিকতা দেখিয়েছেন পালাকার। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে খনা অফিসারকে জানায় লোনের টাকা নিয়ে তার স্বামী মদ খেয়েছে, জুয়া খেলেছে। সেকথা শুনে লোনের সভাপতি বলে, "সমাজ থেকে মদ-গাঁজা-সাট্টা-জুয়া বন্ধ করতে হবে"। তখন খনার স্বামী বলে—"শালা—মদ-গাঁজা-সাট্টা বন্ধ করবে! যা এমন জগত চলছে জীবনে পারবে না।"

এ ছাড়াও বর্তমান সমাজের কিছু বাস্তবচিত্র ধরা দিয়েছে পালাকারের লেখনীতে। যেমন- এই আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকটিতে ব্রাহ্মণের বাৎসরিক আয়ের হিসেব দেওয়া হয়েছে। সে বছরে ৮০টা বিয়ে পড়ায়, তাতে ৮০ হাজার টাকা, ৫০টা শ্রাদ্ধ করে ৫০ হাজার টাকা, এছাড়া ফল-মূল কাপোড়-চোপড় ইত্যাদি নিয়ে ৪-৫ কুইন্টাল হবে। আবার ঐ ছকেই ছোট ভাইকে বড় ভাই

বলে ভিক্ষা করে তাদের পনেরোশ টাকা হয়েছে এখনো পাঁচশ টাকা বাকি আছে। অর্থাৎ পণের মোট পরিমাণ দু হাজার টাকা (২০১৭ সালে)। এ জন্যে একজন গৃহবধূকে প্রাণ হারাতে হয়। আদি দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে বাবা তার ছেলের পরিস্থিতি উল্লেখের মাধ্যমে আয়লার ঝড় এবং পরবর্তী সরকারি অনুদানের উল্লেখ করে জানায় যে পঁয়ত্রিশ কেজি করে চাল তার পুত্র পায় আবার এই আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকটিতে গুয়ে পুলিশ লিচুকে দেখে জিজ্ঞাসা করে—

"একেনটায় কি কত্তেচ?"

লিচু উত্তর দেয়—

"এমনি ঘুত্তে এসচিলাম"।

সেকথা শুনে গুয়েপুলিশ বলে—

"তুমি এট্টা মে পুত্র ফাঁকা জায়গায় ঘুত্তে এয়েচ?"

এ থেকে স্পষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি এমন মেয়েদের ফাঁকা জায়গায় ঘুরতে যাওয়া এতটাই নিরাপত্তাহীন যে একজন চৌকিদারও এ কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে মন্দোদরীর সংলাপ থেকে জানা যায় ৪-৫ লাখ টাকা করে জায়গার কাটা। (২০১৭-২০১৮ সাল নাগাদ)। সপ্তম ছকে দিদিমা জানায় তার স্বামী খুব অল্প বয়সেই মারা গেছে। সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কাঁকড়ার গর্তে হাত না গলিয়ে সাপের গর্তে হাত গলিয়ে দিয়েছিল। তখন সাপে কামড়েছিল। এর মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া গেছে। আবার হাবলদার দিদিমার কাছে জানতে চায় সে আর বিয়ে করেছে কিনা। মন্দিরা জানায়—

"স্বামী মরে গেছে আর বিয়ে হয় কখনও?"

এরপর মন্দিরার নাতজামাই গাঁজা খেয়ে শুয়ে থাকে। হাবলদার ও মন্দিরা তাকে ধরতে যাওয়ার সময় হাবলদার দিদিমাকে আগে যেতে বলে—

"আগে জনগণ, লাস্টে পোশাসন।"

দিদিমা বলে—

"না! ওটা ভুল কথা। আগে পোশাসন তারপরে জনগণ"

তখন হাবলদার বলে—

"না— আট-দশটা মাডার হয়ে যাবে তারপরে পোশাসন যাবে। গে দেকে আসবে কতটা রক্ত পড়েচে।"

এই সংলাপের মাধ্যমে প্রশাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণাকে ব্যক্ত করা হয়েছে। আবার হাবলদার মন্দিরার নাতজামাইকে ধরে ফেলে কিন্তু যেই দেখে সে বিড়ি খাচ্ছে অমনি ধরার বদলে

তার কাছে বিড়ি চায়। নাতজামাই বিড়ি দিলে সরাসরি না নিয়ে অন্যদিকে ফিরে হাত পিছনে দিয়ে নেয় এবং বলে—“পুলিশ সামন থেকে কোনো জিনিস নেবে না, পিছন থেকে”। পুলিশের ঘুষ খাওয়া এবং বাঁ হাতের মাধ্যমে আড়াল থেকে খাওয়াকে রূপক হিসেবে এখানে ব্যবহার হয়েছে তার পর সে অপরাধীর সাথে বসেই গাঁজা নিয়ে খায়। আবার একই ভাবে অন্যদিকে ফিরে পিছনে হাত বাঁকিয়ে ফেরত দেয় তার পর অপরাধীর সাথে বসেই খোশ গল্প করে। এরপর অপরাধীকে (নাত জামাইকে) মারার বদলে যে ধরতে পাঠিয়েছিল তাকেই (দিদিমাকে) লাঠি দিয়ে মারে এবং বলে, ভুল করে তাকে মেরেছে।

বর্তমান সমাজের নানান চিত্র

> “মানুষ তার বাস্তব কর্মধারাকে যতখানি জীবনের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হবে তত তার স্থায়ী মূল্য বাড়বে। আর যত তার অবাস্তব বা সাজানো কথা নিয়ে ফানুস উড়ানোর উৎসাহ নেবে, ততই তা দিনে দিনে দ্রুত ক্ষীন থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।” —গিরীন্দ্রনাথ দাস[৯৩]

গাজনপালার পরতে পরতে ধরা পড়েছে বর্তমান সমাজের নানা চিত্র। নিম্নে তারই উল্লেখ করা হল- এই আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকটিতে ডাক্তার জানায়—ডাক্তার হওয়ার সময় তারা প্রতিজ্ঞা করে গরিব রুগীর সেবা করবে কিন্তু ডাক্তারি করার সময় তারা টাকা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। স্ত্রী বলে ডাক্তারকে মেরে স্বামী তাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এক শ্রেণির মানুষের বিরূদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছ। আদি দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে অঞ্চল প্রধান আয়লার উল্লেখ করে বলে সে আয়লা অঞ্চলের মানুষের জন্য ঘর দিয়েছে, বার্ধক্য ভাতা দিয়েছে। তবু মানুষ বলছে যে গোবর্ধন অঞ্চলের প্রধান কোনো কাজ করছে না। সপ্তম ছকে বৃদ্ধ বাবার সংলাপ দিয়ে ছক শুরু। সেই সংলাপের প্রথমেই সে সংসারে আগুন জ্বলার প্রসঙ্গে পাহাড়ের অশান্তিকের উল্লেখ করে বলে—“আগুন জ্বলছে—দার্জিলিং পাহাড় জ্বলতেচে, শ্মশানের চিতা জ্বলতেচে, এবার আমার সংসারে আগুন জ্বলবে।” এই ইঙ্গিত সালের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বর্তমান সমাজের সংকুচিত মানসিকতার প্রকাশ পায় বিষয়বস্তুতে। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে দাদাবাবু যখন ফোনে গোবিন্দকে বলে তার দিদিমণি যেদিন ভালো হবে সেদিন সে বাড়িতে ফিরবে। তখন গোবিন্দ বলে—‘ও মে’ছেলে আর ভালো হবে? যা জিন্সের প্যান পরা ধরেচে! ও আর ভালো হবে নে”। ঐ দলের তৃতীয় ছকে নায়ক ডেঙ্গুমশা মেয়েদের সম্পর্কে বলে—“যেভাবে মেয়েরা জিন্স প্যান করা আরম্ভ করেচে, সায়া কোম্পানীর মাতায় হাত। দুদিন পরে দেকবি ছেলেরা সায়া পরে ঘুরছে, মেয়েরা জিন্সের প্যান”। এই আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকটিতে পিয়াকে নায়ক বিয়ে করতে অরাজি হলে তাকে জানায় বিয়ে না করলে সমাজে সে

কলঙ্কিতরূপে বিবেচিত হবে। সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। সারাজীবন অবিবাহিতা থাকতে হবে। এতে গ্রামীণ সামাজিক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে ফেঙ্গির হবু বর তাকে বিয়ের আগে টেস্ট করে দেখে নিয়েছে। আসলে ব্লাডটেস্ট করেছে কিন্তু ফেঙ্গির দিদিমা তা না বুঝে হায় হায় করে বলে যা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য সে আর বস্তিতে মুখ দেখাতে পারবে না।

কর্মচারীদের দুর্নীতির প্রকাশ ঘটেছে। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে লোনের অফিসারের বক্তব্যে সামাজিক কর্মচারীদের দুরাবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। সে জানিয়েছে সে যখনি অফিসে আসে দেখে সভাপতি অফিসে নেই। তারপর জানা যায় দুমাস আগে অফিসার যে টাকা দিয়ে ছিল তা দিয়ে সভাপতি স্বামীর মুদিখানার দোকানের মাল তুলে দিয়েছে আর ভাইকে অটো কিনে দিয়েছে আবার কর্মচারীদের ঘুষ খাওয়ার দিকটি প্রকট হয় যখন খনা বলে—"কত ঘুষ খাবে খাও না, খেয়ে ভুঁড়ি ফুইলে ঘোরো না...."। ঐ দলের সপ্তম ছকে দিদিমার কোমর বাঁকা হওয়ায় হাবলদার তাকে মন্দিরা না বলে 'ব্যাঁকাদি' সম্বোধন করে। গ্রামের খুবই পরিচিত বিষয়। ঐ ছকেই আবার সমাজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যায় করলে সমাজের মানুষ তা মেনে নেবে না, শাস্তি দেবে এবং তার গুরুত্বও যথেষ্ট তাই সুবলকে সরমা বলেছে—"তবে শুনে রাখ, এই সমাজের আদালতে পাবি তুই সাজা"। চতুর্থ ছকে শ্বশুরের মৃত্যুদিনে বউ সঞ্জয়কে দায়িত্ব দিয়েছে মাল্যদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করার। চুল্লু ব্যাপারি তপন, হাতকাটা মদন, পকেটমার লালু, বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি। এরাই তার শ্বশুরের প্রিয়বন্ধু ছিল। কারণ তার শ্বশুর চুরি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, করেছে। এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক দুরাবস্থার চিত্র উঠে এসেছে। সমাজের একজন দুশ্চরিত্রের মৃত্যুর পর তাকে মাল্যদান করা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই চিত্রটির মাধ্যমে ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে পালাকার বিষয়টিকে দেখিয়েছেন। এছাড়াও সমাজের নানান দিক প্রস্ফুটিত হয় পালাকারের রচনায়।

গাজনপালায় রীতি, নীতি, আদব-কায়দা, আন্তরিকতার প্রকাশ

গাজনপালা লোকনাট্যের জন্ম যেহেতু কোনো অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠীর অন্তঃস্থল থেকে, যার অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর বা স্বল্প-স্বাক্ষরিত, দরিদ্র ও সামাজিকভাবে নিম্নশ্রেণিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাই গাজনপালার মধ্যে সেই জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, সংস্কার, ঐতিহ্য এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে অরবিন্দ পোদ্দারের একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়-

"এই বাস্তব জীবনটাই কবিমনের ভাবনা-কল্পনার রসে রূপান্তরিত হয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও আবেগের অন্তরালে সিদ্ধাচর্যগণ অন্য কোন অপ্রত্যক্ষ কথা বোঝাতে চেয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেজন্য তাঁদের জীবনকেই আশ্রয় করতে হয়েছে, সেই সত্যটা অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ তাদের মনের আনাগোনা কোথায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এখানেই গোপন রয়েছে। আর বাস্তব জীবন থেকে উপমা-রূপক ও চিত্র গ্রহণ

করা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে, কাদের হয়ে তারা কথা বলছেন, কাদের তাঁরা তাঁদের কথা বোঝাতে চাইছেন। এই জনসমষ্টি যে তৎকালীন সমাজের বৃহত্তর অংশ—বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নিম্নবর্ণসমূহ এবং বর্ণাশ্রমের বাইরের অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জনসমষ্টি তা সহজেই অনুমান করা চলে। নইলে তাদের জীবনের সহিত সম্পর্কিত উপমাদি ও চিত্র আহরিত হতো না”।[১৪]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় রচিত, প্রচলিত গাজনপালাগুলির মধ্য দিয়ে তাই সে অঞ্চলের জনজাতির জীবনকেন্দ্রিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ধরা দেয় দর্শকদের কাছে। এই পালার ছোট ছোট ছকের সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ঘটনার মধ্য দিয়ে এখানকার আঞ্চলিক ও জনজাতির বিভিন্ন দিক, যেমন- রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, খাদ্য, সামাজিকতা, ঘরোয়া টোটকা, চিকিৎসা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

উক্ত দলগুলির পরিবেশিত পালা বিশ্লেষণে সেগুলি উল্লেখ করা হল—

অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত মানুষের প্রতি আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা এখানকার মানুষের স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট্য। তার প্রকাশ ঘটেছে গাজনপালার কাহিনিতে। যথা- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়ক গ্রামের অশিক্ষিত যুবক, নায়িকা শিক্ষিতা শহুরে যুবতী। খরা অঞ্চলে সার্ভে করতে এসে মধু নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি শেষে প্রকৃত বিষয়টি বোধগম্য হওয়ার পর নায়কের ভাতৃবধূ নায়িকাকে তেলো কাঁকড়ার টক দিয়ে আতিথেয়তা করতে চায়। গ্রাম্য সারল্য ও আন্তরিকতা এবং এই অঞ্চলে তেলো কাঁকড়ার প্রচলন আছে তার প্রকাশ ঘটেছ। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের অষ্টম ছকে নায়ক হ্যান্ডেল শাঁখা ব্যাপারির সাথে ভুল বোঝাবুঝি মিটে গেলে ব্যাপারিকে বলে — “ওদা থেকে যাও গো” আবার তাদের বাড়িতে খেয়ে যেতেও বলে। এতে আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার প্রকাশ ঘটেছে । আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে পিয়াকে নায়ক বিয়ে করতে অরাজি জানিয়ে চলে যেতে চায়। পিয়া জানে এ কারণে তাকে সারাজীবন অবিবাহিতা এবং একঘরে হয়ে থাকতে হবে। তবুও সে নায়ককে আপ্যায়ন করে চলে যাওয়ার আগে সামান্য জলখাবার খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানায়।

এই অঞ্চলের গ্রামীণ রীতিরও প্রকাশ ঘটেছে পালা কাহিনিতে। যথা- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকটিতে লিচু রাতেও বাইরে শৌচ কাজ করে পুকুরে স্নান করে তবে বাড়ি ফিরবে বলে। এটি একটি গ্রামীণ রীতি। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে বাবা মারা যাওয়ার পর ভাই তার দাদাকে বলে—‘আমি মাছ মাংস ভালোবাসি বউ ছাড়া চলি না’। হিন্দুমতে পিতা মাতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ হওয়ার আগে নিরামিষ সাত্ত্বিক জীবনযাত্রা পালন কর্তব্য। দাদার উক্তিতে জানা যায় আগে ঐ এলাকার হিন্দু মানুষ পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর ৩০ দিন এই নিয়ম পালন করতো, তার পর শ্রাদ্ধ-শান্তি ঘটত। এখন মাত্র ১২ দিন নিয়ম পালিত হয়। তার পর শ্রাদ্ধ-শান্তি। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে বড় দাদা জানায় সে চৈতন্যমতে কাজ করবে। এখানকার রীতির প্রকাশ ঘটেছে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে জামাইকে শ্বশুর ‘তুই’ সম্বোধন করে বলে— “তোর শ্বাশুড়ি আমায় মেরেছে”। গ্রামাঞ্চলে এটি বেশ প্রচলিত।

এই অঞ্চলে বেশ কিছু টোটকা সুপ্রচলিত। যে সমস্ত টোটকা বা ঘরোয়া চিকিৎসাও কখনো কখনো প্রকাশ পায় গাজনপালা কাহিনিতে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লে স্বামী তার ভাইকে নির্দেশ দেয় জ্ঞান ফেরানোর জন্যে পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরতে। এটি গ্রামীণ একটি চিকিৎসা। ঐ দলের সপ্তম ছকে জামাই ডাক্তারের কাছে এসে জানায় তার শ্বশুর বিষ খেয়েছে। শুনে ডাক্তার বলে ফটকিরি গুলে খাইয়ে দিতে। এটিও একটি ঘরোয়া টোটকা বা চিকিৎসা। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে মন্দোদরীর স্বামী তার নাম উচ্চারণ সঠিক করতে না পেরে বলে মদ্দাদরী। তাই স্ত্রী বলে সকালে ঘুম থেকে উঠে খেজুর পাতা দিয়ে জিভ চাঁচতে। এটিও আরেকটি ঘরোয়া টোটকা। ঐ দলের প্রথম ছকে নায়ক ফোকে, নায়িকা চৈতালি ও ফোকের বৌদির আলোচনা থেকে জানা যায় এই অঞ্চলের মানুষের গরমে শরীর ঠাণ্ডা করতে কোতিলে খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। ঘটনাক্রমে হিসেবও বলে দেওয়া হয়েছে—ফোকে বলে সকাল বেলায় এক কিলো বাতাসার সাথে পাঁচশ ভুষি ও পঞ্চাশ কোতিলে শরীর ঠাণ্ডা করবে। এই অঞ্চলে শরীর ঠান্ডা রাখার এটি একটি ঘরোয়া উপায়।

গাজনপালায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শ্রেণিবৈষম্যের প্রকাশ

প্রাচীনকাল থেকেই লোকনাটক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন দেয়। লোকনাট্যে কোনো সাম্প্রদায়িক বিভেদ নেই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই লোকনাট্য রচনা ও অভিনয়ে অংশ নেন। বনবিবি বা বোলান পূজা-উৎসবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বনবিবির পূজায় যেমন- উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন তেমন বোলান নাটকেও শিব, কৃষ্ণ, ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গ, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনির পাশাপাশি হজরত মহম্মদের বন্দনা গানও পরিবেশিত হয়। গাজনপালা নামক লোকনাট্যেও এই সাম্প্রদায়িকতার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন—সাধারণত হিন্দুবর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষের উৎসব হয়েও খুদিরাবাদ অঞ্চলে একমাসব্যপী এই গাজনপালা আয়োজনের মূল আয়োজক রাজুভাই বর্ণগত ভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। দলের অভিনেতাও মুসলিম। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পরিবেশনের সূচনায় 'বন্দনা গান'টির প্রথম স্তবকে রয়েছে।–

(গান) রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

আশমানে সব বেড়িয়েছে যে আশমানি তারি

রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

বাদ্য...

কবি নজরুল মানুষ ছিলেন তিনি মহান

দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে নেতাজী ক্ষুদিরাম

তোমার মূর্তি নিয়ে ফুল দিয়ে করছে সবাই পুজো।

যদি বেঁচে থাকো সুভাষ তুমি একবার ফিরে এসো।

সরস্বতীর গান আজ গাইব আমি গান

হিন্দু-মুসলমান সে নাম করি প্রণাম।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে এই 'বন্দনা গান' হয়। গানটির প্রথম স্তবকে মুসলমান সম্প্রদায়ের সেরা পরব ঈদের উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে। ক্রমে দেশপ্রেমিকদের উল্লেখ করে হিন্দু দেবী সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়কে এক করে দেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির নিদর্শনের পাশাপাশি শ্রেণিবৈষম্যও পরিলক্ষিত হয়। পালার ঘটনার মধ্যে এই শ্রেণিবৈষম্যের প্রকাশ ঘটে বারে বারে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে রাজকন্যা আশা গরিব যুবক দীপকে ভালোবেসে গৃহত্যাগী পর্যন্ত হতে রাজি কারণ তার বাবা তাদের এই অসামঞ্জস্য ভালোবাসা মেনে নিতে অরাজি। দীপ নাপিতপুত্র হওয়ায় সে আশার পরিকল্পনায় ভয় পায়, অরাজি হয় অতএব রাজার আদেশে ভালোবাসার অপরাধে নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি ও দরিদ্র যুবক দীপকে সেনাপতির হাতে প্রাণ হারাতে হয়। ঐ দলের পঞ্চম ছকে ঝগড়ার সময় স্ত্রী গায়েন বংশের মেয়ে হওয়ায় বড়াই করে তখন স্বামী বলে সেও সরদার বংশের ছেলে। দুজনেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের তপসিলি জাতির প্রতিনিধি। তার মধ্যেও যে আবার শ্রেণিবিভাজন রয়েছে এখানে তা স্পষ্ট। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকটিতে লিচুর ঘর থেকে অঞ্চল প্রধানকে লিচুর স্বামী ধরে ফেলায় অঞ্চল প্রধান জানায় সেখানে সে গুয়ে পুলিশকে ধরার জন্য এসেছে। সেই কথার মাঝে সে জানায় গুয়ে পুলিশকে স্বচ্ছ ভারত ডিউটিটা দিয়েছিল দুটো কারণে। ভালো পুত্র হিসেবে পরিচিত থাকার জন্য এবং অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির মানুষ হওয়ার। ঐ দলের ষষ্ঠ ছকে পাপিয়ার বাবা পাপিয়ার সাথে ভজহরিকে বিয়ে দিতে চাইলে ভজহরি অরাজি হয়। সে বলে—"না বাবু, আপনার কথা আমি রাখতে পারলাম না কারণ আমি চাকর, ছোটজাত, ছোটগাছ।" উক্ত সংলাপগুলিতে ভজহরিকে পাপিয়া 'চাকর' সম্বোধন করেছে। যথা— "আমাদের বাড়ির সেই চাকর আমার জুতোটা নিয়ে গেছে পালিশ করতে", "চাকরটা এখনও আসেনি।" শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকের দ্বিতীয় পর্বে আদিবাসী সমাজেও রয়েছে শ্রেণিবৈষম্য ও অর্থনৈতিক দূরত্ব তাই সামু মোগলিকে বলে—"আর সর্দারের বেটি আছিস। মোর বাপ গরিব বলে মোদের এ প্রেম কোনোদিন মেনে লেবেক নাই"। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে পুরাতন ভৃত্য হরি প্রসঙ্গে মনি তার স্বামী সঞ্জয়কে বলে—"তোমাকে বার বার বলেছি না পায়ের জুতোকে পায়ে রাখবে মাথায় তোলার চেষ্টা করবে না"। সঞ্জয় তার বাড়ির পুরাতন ভৃত্য হরিকাকাকে যেসব সম্বোধন করে সেগুলো হল—'খেঁকশিয়ালের বাচ্চা', 'ব্রহ্মদত্যির বাচ্চা'। তার কণ্ঠস্বরের মধ্যেও তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পায়। এমনকি হরি তার কাছে কিছু টাকা

চাওয়ায় সঞ্জয় তাকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে চায়। এছাড়া হরি তার মালিকের উদ্দেশ্যে বলে—"এই হল ভদ্দর লোকেদের আচার ব্যবহার। এদের কাজের সময় হরি, বিপদের সময় হরি, আর খাবার সময় খেতে দেবে শুকনো মুড়ি" এবং ছকের প্রায় শেষ অংশে বডি গানের পরে সঞ্জয় মণিকে বলে ভোঁতা শাবল আনতে যেটা দিয়ে হরিকে সে ভোল্ট করে দেবে। এরপর হরিকে সে চড়ও মারতে যায়।

মেয়েদের সামাজিক সম্মান

পেশাদারি গাজন দলগুলিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ করার কোনো স্থান নেই অর্থাৎ দলের সকল সদস্যই হন পুরুষ। আসলে পেশাদারি গাজনদলের কর্মী ও শিল্পীদের সারাবছরের জীবনযাত্রা বেশ কঠিন। প্রতিদিন যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া, সেখানে স্নান, খাওয়া, মাঝরাত পর্যন্ত পালা অভিনয় করে বাকিরাত্রি তাঁবুর মধ্যে বা খোলা জায়গাতেই কাটানো, পরদিন আবার নতুন জায়গায় যাওয়া। রাতের পর রাত জাগা এবং দলে একাধিক পুরুষ থাকেন—এই সমস্ত নানা কারনের জন্যই হয়ত আজও গাজনদলগুলিতে কোনো নারী অংশগ্রহণ করেন না অথচ গাজনপালা কাহিনির পরতে পরতে নারীর সুখ-দুঃখের কথা রয়েছে। পালাগুলির রচনাকার যেমন পুরুষ তেমনি সেই চরিত্রগুলিতে অভিনয় করা ব্যক্তিগুলিও সকলেই পুরুষ। পালাকারদের রচনার বিষয়টিও বেশ প্রকট ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

পালাকাহিনিতে কখনো নারীকে দেখানো হয়েছে দুর্বল, অসহায়রূপে আবার কখনো তাদের প্রতি অসম্মানজনক মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্টম ছকে তিশা চরিত্রটি এক গৃহবধূর, যার উপর নির্যাতনই এই ছকের বিষয়। তার স্বামী তাকে বলে—"আরে, ঐ শালি যদি করবি চালাকি পরে বুঝবি জ্বালাটা কি"। এরপর বলে- "বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের বরপণের টাকাটা নিয়ে এসেছিস? আনিসনি না? আরে কিভাবে আনবি? শালি তোর বাপ সে তো অকালেই পটল তুলেছে। আর তোর যে দু ভাই-শালা একজন তো চোখেই দেখতে পায়না এরেকজন কানা অন্ধ। আরে একজন তো খোঁড়াও শুনেছি। ওরা কেউ টাকা আনবে না কেন জানিস? তুই হলি একটা রাস্তার মে- বেজন্মা। আরে শালি তোদের মতোন মে নিয়ে না ফূর্তি করা যায় রে, সংসার করা যায় না।"

আবার পাশাপাশি তার শ্বাশুড়িকে একজন কর্তৃত্ববান অত্যাচারী নারী রূপেই দেখানো হয়েছে। যার জন্য তিশাকে প্রাণ হারাতে হয়। যথা- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকটিতে পুত্র ও পুত্রবধূর অবহেলা ও জীবনযাত্রার ধরন প্রভৃতির কারণরূপে বৃদ্ধ সবকিছুর জন্য তার স্ত্রীকে দায়ী করে। সবই তার 'পেটের দোষ', 'আঁটের গণ্ডগোল', 'ভাত ভুঁড়ির ডিস্টার্ব' ইত্যাদি বলে দোষারোপ করে এবং এর জন্য তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিতে যায়। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে

বাখারি মেয়ে না বলে ‘মে ছেলে’ সম্বোধন করে। ঐ দলের সপ্তম ছকে হ্যন্ডেলের বউকে শাঁখা ব্যাপারি জানায় যে তার মতো আরও অনেককেই তার মতো ‘মে-ছেলেকে’ শাঁখা পরিয়ে আসতে হচ্ছে। সে এখানে মেয়েদের উদ্দেশ্যে ‘মে-ছেলে’ সম্বোধন করে। ষষ্ঠ ছকে আকাশ ঝিলিককে বলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। মায়ের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে গেলে মোড়ল মশাই তার ইজ্জতের বিনিময়ে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল। এছাড়া এই ছকে দেখনো হয়েছে যে নারী প্রয়োজনে খারাপ কাজ করতে বাধ্য হয় অনেক সময়। যেমন ঝিলিক তার মায়ের চিকিৎসার টাকা জোগাড় করার জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে প্রেমের অভিনয় করেছে। ঝিলিকের প্রেমিক যখন জানতে পারে যে ভিখারির বর্তমানে এই অবস্থার জন্য সে দায়ী তখন ঝিলিকের কাছে এরকম করার কারণ জানতে না চেয়ে তাকে অশ্রাব্য গালি দেয় এভাবে—“শালা রেন্ডি, শালা ছেলে খাকী, কত ছেলের মাথা খেইচি এরকম, শালা মানুষ খাকী....”। এর পর ‘থুঃ’ ‘থুঃ’ করে তার দিকে থুথু ছুঁড়ে দিয়ে তার প্রতি ঘৃন্যতা প্রকাশ করে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে মনির বিধবা মায়ের সাজগোজ, শাড়ি, হাতাহীন ব্লাউজ দেখে ভৃত্য হরি উপহাস করে বলে—“দিদির তো পা শোশ্মানে দেচে আর দিদি গায় দেচে বগল কাটা”। এরপর ব্যাঙ্গাত্মক হাসি হাসে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকটিতে শিক্ষিতা আধুনিকা নারী সম্পর্কে গ্রামের অশিক্ষিত যুবক এই সব মন্তব্যগুলি করেছে—“মেয়েরা হতে চায় ছেলে, তাই ওড়না দিয়েছে ফেলে। এরা কানে পরে না দুল, এদের মাথায় আওড়া চুল” আবার “এদের দেকলে টেনশন লাগে হায়”, “জানিনে এরা কখন লুঙ্গি পড়তে যায়”। ঐ দলের পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ লিচুকে দেখে জিজ্ঞাসা করে এ “কেনটায় কি কত্তেচ”? লিচু জানায় “...এমনি ঘুত্তে এসচিলাম”। তখন গুয়ে পুলিশ বলে “তুমি এট্টা মে-ছেলে ফাঁকা জায়গায় ঘুত্তে এয়েচ?” অর্থাৎ ফাঁকা জায়গায় ঘুরতে যাওয়া মেয়েদের অনুচিত।

আবার কখনো নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে পুরুষের থেকেও অগ্রসর রূপে। যদিও তার পিছনে কখনো পালাকারের নিজস্ব মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে আবার কখনো রাজনৈতিক প্ররোচনা কাজ করেছে। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের অষ্টম ছকটিতে স্বামী তার স্ত্রীকে বলে থানায় ফোন করে বলতে যে তিরিশ লক্ষ টাকা ডাকাতি হয়ে গেছে। এত টাকা ডাকাতির খবর সে নিজে না জানিয়ে স্ত্রীকে বলেছে অর্থাৎ স্ত্রীকে গুরুত্ব দিয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে রানী রাজ্যের পরিচালক। একজন নারী হয়ে সেইই দুষ্টের দমন করে। ঐ দলের তৃতীয় ছকে ডেঙ্গুমশা ময়নার সাথে যা ব্যবহার করেছে তার জন্য নায়কের ভাতৃবধূ ডেঙ্গুকে ময়নার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলে। সেই সাথে ভয় দেখায় যে মেয়েদের পক্ষে এখন আইন। মেয়েটি থানায় গেলে তাদের দুজনকেই মারবে এবং জেলে ঢুকিয়ে দেবে। চতুর্থ ছকে ঝিলিক ছদ্মবেশি হোটেল ম্যানেজার। আসলে সে সি.আই.ডি অফিসার তানিয়া দত্ত। কোনো পুরুষকে না দেখিয়ে একজন মহিলাকেই এভাবে দেখানো হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে সুবল শুভঙ্করকে হত্যা করার ২০ বছর পর তার কন্যা চন্দনাকে হত্যা করতে এলে চন্দনা বলে—“... ধর্ম ছিল বলীয়ান। নারী শক্তিতে দানবকুল

হয়েছিল ধ্বংস। তাই নারী সমাজ আজ জাগ্রত। পাপ করলে পাপের হবে মরণ"। ঐ দলের চতুর্থ ছকটিতে মনির বাবার প্রচুর অর্থ থাকায় তার স্বামী সব সময় তাকে এত গুরুত্ব দেয় এবং ভয় পায় যে ভৃত্য হরি বলে—"এই বাড়ির বউমনি হল হত্তাকত্তা। যা করবে বউমনির খরচা।" তাই সে পরে বলে—"যেমন তেমন বাবু বউয়ের কাছে কাবু"। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে শাঁখা ব্যাপারি হ্যান্ডেলের কাছে জানতে চায়- "সংসার সুখে হয় কার জন্য? হ্যান্ডেল উত্তর দেয়— "রমণীর গুণে"। তখন শাঁখা বেপারী বলে- "আর সেই রমণীকে সন্দেহ কললে সংসার তো রসাতলে চলে যাবে রে ভাই। এখনো বলচি সন্দেহ করিস না। বউকে ভালোবাসবি।"

আবার কখনো নারী এবং তার পোষাক, চরিত্র সম্পর্কে প্রথমে খারাপ সামাজিক মনোভাব প্রকাশ পেলেও শেষ পর্যন্ত পালাকার তাকেই সম্মান জানিয়েছেন তার যোগ্যতা, শিক্ষার মানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকটিতে নায়িকা একজন শিক্ষিতা, গ্রামে সে খরা অঞ্চলে সার্ভে করতে গেছে। নায়কের ভাতৃবধূ তাকে 'ওলাউটো' পর্যন্ত বলে। শহরের মেয়ে বলে অবজ্ঞা করে কিন্তু সেই মানুষই তার শিক্ষাগত যোগ্যতা জানার পর তাকে 'ম্যাডাম' সম্বোধন জানায়। এখানে ছকের নায়ককে গ্রামের অশিক্ষিত যুবকরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। নায়িকাই নায়ককে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছে এবং সর্বোপরি তার হাত ধরেই নায়ক শহরে গিয়ে স্বাক্ষর হওয়ার পরিকল্পনা করেছে অর্থাৎ পালাকার সমস্ত দিক থেকে এই ছকে একজন পুরুষ অপেক্ষা একজন নারীকে অনেক বেশি এগিয়ে রেখেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐ দলের ষষ্ঠ ছকটিতে হবু জামাই বিয়ের আগে তার হবু স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করবে জানায় এবং সেকথা বলতে গিয়ে মেয়েদের 'ননীর' সাথে তুলনা করে বলে—"ননীর ডেলা না গলালে হয়না গাওয়া ঘি"। পাত্রী পিয়ার মা এই ছকে একজন স্কুল শিক্ষিকা অথচ শেষ পর্যন্ত তার চরিত্রের অস্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে। তবে একেবারে শেষে পিয়াকেই এবং তার সৎ চরিত্রকেই গুরুত্ব দিয়েছেন পালাকার। সপ্তম ছকে এই ছকে স্ত্রীর উপরে নেশাখোর, অকর্মণ্য স্বামীর অত্যাচারকে অন্যায়রূপে তুলে ধরেছেন পালাকার। স্বামী তার স্ত্রীকে জোর করে ভাটায় কাজ করতে পাঠাতে চায় সেই প্রসঙ্গে 'মেয়েমানুষ' এই শব্দের প্রয়োগে মেয়েদের প্রতি অসম্মান প্রকাশ পেয়েছে। স্ত্রী ভাটায় কাজ করতে অরাজি হলে স্বামী তাকে চড় মারে। এখানে বর্তমান সরকার একজন নারী প্রতিনিধি তার কথা উল্লেখ করেছেন পালাকার। এই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীরূপে পালাকার নারীকে দেখিয়েছেন। তাই সে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছে—"ও দিদিগো, আমরা কি কলিযুগে পুরুষদের কাছে পিছিয়ে থাকবো নাকি অ্যা?" শেষ পর্যন্ত স্বামী তার কাছে ভুল করার জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

উক্ত ছকে পালাকার প্রথমে মেয়েদের প্রতি অবহেলা দেখালেও শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি সম্মানই দেখিয়েছেন। যথা- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকটিতে নায়িকার আধুনিক পোশাক দেখে নায়ক নানা রকম মন্তব্য করে। যেমন—আজকলকার মেয়েরা একটা করে ছোট ছোট ডেস পরচে আর রাস্তাঘাটের ছেলেরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ধরে খাচ্চে" আবার "মেয়েরা হতে চায় ছেলে, তাই

ওড়না দিয়েছে ফেলে''। এই ছকটাতেও নায়ক একজন গ্রামের অশিক্ষিত যুবক কিন্তু নায়িকা শিক্ষিতা। 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের জন্যে সে গ্রামে এসে যুবকের সাথে পরিচিত হয়। প্রথমে তাকে নায়ক ও তার ভাতৃবধূ কটু কথা বললেও তার পরিচয় জানার পর তাকে 'দিদিমনি', 'ম্যাডাম' ইত্যাদি সম্মানজনক সম্বোধন করে এবং নায়ককে সুস্থ করার উদ্দেশ্যে নায়িকা তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। পালাকার এখানেও সবদিক থেকে নায়ক অপেক্ষা নায়িকাকে এগিয়ে রেখেছেন। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে খনার স্বামী লোনের অফিসারকে 'তুমি' সম্বোধন করেছে কিন্তু স্ত্রীকে 'তুই' সম্বোধন করেছে। খনার স্বামী তাকে বলে খালের ধারে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রহার করবে। মঞ্চে সিঁড়ির উপর থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দেয়। এই ছকে লোনের সভাপতি একজন নারী। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকটিতে নায়িকাকে দেখে নায়ক ও তার বৌদির মধ্যে কথপোকথন হয় এরকম - নায়ক—''আচ্চা ভাতৃবধূ তুই বল মেয়েদের কি পল্লে মানায়?''

বৌদি—''কেন শাড়ী, সায়া, ব্লাউজপল্লে মানায়''

নায়ক—''তা সে সব কিচু মেয়েটার মদ্দ্যে আচে? ও তো সব খুলে ফেলে দিয়েচে। একটা করে ছোট ড্রেস পরচে আর রাস্তাঘাটে ছেলেরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ধরে খাচ্চে''। নায়িকার পোশাক দেখে নায়কের ঐ মন্তব্যকে সমর্থন করে তার ভাতৃবধূ অথচ তার অধিকাংশ সংলাপ বলার সময় অসম্ভব গা দুলিয়ে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে আর শেষ পর্যন্ত জানা যায় নায়িকা শিক্ষিতা, সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাজের জন্য সে গ্রামে এসেছে এবং ছকের শেষাংশে সে নায়ককে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করে রোগমুক্ত করানোর প্রতিশ্রুতি দেয় তখন নায়কের ভাতৃবধূ তাকে 'দিদিমনি' সম্ভোধন করে। নায়ক তাকে 'মেডাম' সম্বোধন করে সুতরাং মেয়েদের প্রতি অসম্মান দেখালেও শেষ অবধি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টাই করেছেন পালাকার।

গাজন কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, সংলাপ, অভিনয়ের দ্বারা নির্মিত গাজনপালাগুলি লোকনাট্যও। একসময় যা ছিল ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে একটি মনোরঞ্জনমূলক অংশ বর্তমানে তা রূপান্তরিত হয়েছে সম্পূর্ণ একটি পেশায়। সময়ের সাথে সাথে তার বিষয় বৈচিত্র্যে নানান পরিবর্তন দেখা দিলেও গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাস, মিথ, রিচুয়াল দ্বারা মূলত মৌখিকভাবে রচিত নাট্যধর্মী এই গাজনপালাগুলি আজও লোকনাট্যের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বহন করে চলেছে। তবে পরিবর্তনও ঘটেছে। একসময়ে কেবলমাত্র দেব-দেবী নির্ভর রচিত গাজনপালা কাহিনিতে বর্তমানে ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক নানা বিষয় নির্ভর কাহিনি। গাজনপালাগুলির গানের কথায়-সুরে দেখা দিয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। পালাগুলির নামকরণে, সংলাপের ধরনে, নৃত্যভঙ্গিমায় যেমন পাওয়া যায় আধুনিকতার প্রভাব তেমনি সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিকতার স্পষ্টরূপ ধরা দেয়। যা লোকনাট্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এছাড়া বর্তমানে গাজনপালাগুলিকে ঐ অঞ্চলের সমাজের দর্পণরূপে প্রতিপন্ন করা যায়। পালাগুলির বিষয়ে, কাহিনির পরতে পরতে ধরা দেয় স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, মানসিকতা তাই গাজনপালাগুলি

কেবলমাত্র এখানকার লোকনাট্য নয় এগুলিকে এখানকার মানুষের অন্দরের এমনকি অন্তরের প্রতিরূপ বলা যায়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. শম্ভু মিত্র, *কাকে বলে নাট্যকলা* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, মে ১৯৯৩), ১০

২. নগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ (নবমভাগ)* (কলকাতা: ১৯৮৮), ৭১৩

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *উত্তরবাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য* (কলকাতা: চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৮৩), ৩১

৪. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯১), ২৬৫

৫. নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'জনজীবন সংহত গোষ্ঠী ও বাংলার লোকনাট্য'। *লোকশ্রুতি*, সংকলন সংখ্যা, (ডিসেম্বর ১৯৮৬): ৫০

৬. বিমেলেন্দু হালদার, *দক্ষিণ ২৪ পরগণা যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা (প্রথম খণ্ড)* (সোনারপুর: প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০১১), ২৪

৭. ঐ। 'চৈতন্যযাত্রায়' চৈতন্যদেব নাচ, গানের দল নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হরিনাম সংকীর্ত্তন করতেন।

৮. বিমেলেন্দু হালদার, *দক্ষিণ ২৪ পরগণা যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা (প্রথম খণ্ড)* (সোনারপুর: প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০১১), ২৭

৯. রচনা ও সুর : মহাদেব শিকারী, নির্দেশক: মাস্টার নরেশ অধিকারী, গাজন সম্রাট প্রফুল্ল সরদার

১০. রচনা: নরেশ অধিকারী, সুর: নরেশ অধিকারী, নির্দেশনা: প্রফুল্ল সরকার

১১. রচনা ও সুর: মাষ্টার নরেশ অধিকারী, নির্দেশনা: প্রফুল্ল সরদার

১২. রচনা: ড. জগন্নাথ গায়েন, নির্দেশনা: অশ্বিনী নাইয়া

১৩. রচনা, নির্দেশনা ও অভিনয়: অশ্বিনী নাইয়া

১৪. রচনা, নির্দেশনা ও অভিনয়: অশ্বিনী নাইয়া।

১৫. রচনা: নন্দলাল, সুর: মিঠুন ও স্বপন।

১৬. রচনা: নবীন হালদার, সুর: স্বপন

১৭. রচনা: রামকৃষ্ণ বৈদ্য, নির্দেশনা, সম্পাদনা ও অভিনয়: সমীর হালদার।

১৮. রচনা: রামকৃষ্ণ বৈদ্য, সুর: শম্ভু নস্কর ।

১৯. "লোকভাষ", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* 'উত্তরাধিকার' বিশেষ সংখ্যা। বর্ষ-৩, সংখ্যা-১, (বৈশাখ/আষাঢ় ১৩৯৭, এপ্রিল-জুন ১৯৯০): ৪২। শিষ্টভাষা- শিক্ষিত, শহুরে, উচ্চ ও মধ্যবিত্তের বাচন ভাষা। লোকভাষা- বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য মানুষের ভাষা, জনভাষা- শিষ্টভাষা ও লোকভাষার মাঝের জনভাষা।

২০. "লোকভাষা কি কেন?", *বলাকা,* বাঙালির লোকসাহিত্য সংখ্যা, সংখ্যা-৩৬ (বর্ষ-২৭, ফেব্রুয়ারি ২০১৮): ৩০

২১. ঐ

২২. ঐ

২৩. পবিত্র সরকার, *লোক ভাষা লোকসংস্কৃতি* (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড), ১৩৭ । Rural language অর্থাৎ লোকভাষা এবং অর্থাৎ Rural linguistics গ্রামীণ ভাষাবিজ্ঞান বা গ্রামীণ ভাষাতত্ত্ব।

২৪. "লোকভাষা কি কেন?", *বলাকা,* বাঙালির লোকসাহিত্য সংখ্যা, সংখ্যা-৩৬ (বর্ষ-২৭, ফেব্রুয়ারি ২০১৮): ৩

২৫. ঐ

২৬. পবিত্র সরকার, *লোক ভাষা লোকসংস্কৃতি* (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড), ১৩৭

২৭. পালা ও গানের রচয়িতা জগন্নাথ গায়েন।

২৮. পালা ও গানের রচয়িতা প্রফুল্ল সর্দার।

২৯. পালা ও গানের রচয়িতা জগন্নাথ গায়েন।

৩০. পালা ও গানের রচয়িতা নরেশ অধিকারী।

৩১. পালা ও গানের সংলাপ ও বাণী স্বপন গায়েন রচিত, কাহিনিকার অশ্বিনী নাইয়া।

৩২. পালাকার মহাদেব শিকারি ও গীতিকার জগন্নাথ গায়েন।

৩৩.	পালা ও গানের রচয়িতা অশ্বিনী নাইয়া।

৩৪.	বাণী স্বপন গায়েন রচিত ও কাহিনি কার অশ্বিনী নাইয়া।

৩৫.	পালা ও গানের রচয়িতা অশ্বিনী নাইয়া।

৩৬.	পালা ও গানের রচয়িতা অশ্বিনী নাইয়া।

৩৭.	গানের রচয়িতা রামকৃষ্ণ বৈদ্য।

৩৮.	পালা ও গানের রচয়িতা অশ্বিনী নাইয়া।

৩৯.	পালা ও গানের রচয়িতা অশ্বিনী নাইয়া।

৪০.	পালা ও গানের রচয়িতা অশ্বিনী নাইয়া।

৪১.	বাণীকার স্বপন গায়েন ও কাহিনি কার অশ্বিনী নাইয়া।

৪২.	পালা ও গানের রচয়িতা অশ্বিনী নাইয়া।

৪৩.	পালা ও গানের রচয়িতা অশ্বিনী নাইয়া।

৪৪.	পালাকার প্রফুল্ল সর্দার।

৪৫.	গীতিকার রামকৃষ্ণ বৈদ্য।

৪৬.	গানের রচয়িতা রামকৃষ্ণ বৈদ্য।

৪৭.	গান রচয়িতা রামকৃষ্ণ বৈদ্য।

৪৮.	পালা ও গানের রচয়িতা রামকৃষ্ণ বৈদ্য।

৪৯.	গানের রচয়িতা রামকৃষ্ণ বৈদ্য।

৫০.	আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলার লোকবাদ্য* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬), ৮৩

৫১.	গান, কথা ও সুর পালাকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

৫২.	মূল সুরের গান—“ভুল সবই ভুল...”, ছবি–‘অতল জলের আহ্বান’ (১৯৬২), গায়িকা—সুজাতা চক্রবর্তী

৫৩. মূল গানটি হল –'নামিলে ডোবাখানা...' , ছবি–নতুন জীবন (১৯৬৫) , গায়িকা–সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

৫৪. মূল সুর–'হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা', গায়ক–মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ছবি–স্ত্রী (১৯৭২)

৫৫. মূল সুর–"ভুল সবই ভুল.....", গায়িকা–সুজাতা চক্রবর্তী, ছবি–'অতল জলের আহ্বান' (১৯৬২)

৫৬. মূল গান–"আরে শোনো মন বলি তোমায়", গায়ক–রাহুলদেব বর্মন (১৯৭৭)

৫৭. মূলসুরের গান–"পরদেশিয়া..." (হিন্দী), গায়ক-গায়িকা–লতা মঙ্গেশকর, কিশোর কুমার, ছবি–মিষ্টার নটোবর লাল (১৯৭৯)

৫৮. মূলগান–"ও আমার দেশের মাটি

৫৯. মূল গান–'হামে আর জিনেকি চাহাৎ না হোগি' (হিন্দী),গায়ক-গায়িকা–কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, ছবি–আগর তুম না হোতে (১৯৮৩,

৬০. মূলগান–'নামিলে ডোবাখানা.....'

৬১. মুল সুরের গান –'যদি কানে কানে কিছু বলে বধুঁয়া', গায়িকা–আশা ভোঁসলে, ছবি–জীবন রহস্য (১৯৭৪)

৬২. মূল সুর–'আমার সাধ না মিটিল', সুরকার–কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

৬৩. মূল গান- 'সারে জাঁহা সে আচ্ছা' (১৯৯৩), গীতিকার ও সুরকার- নচিকেতা চক্রবর্তী

৬৪. মূল গান- 'মানুষ খুন হলে পরে মানুষই তার বিচার করে', গায়ক- মান্না দে, চলচ্চিত্র- চরদিনের

৬৫. মূল গান- 'রিমিক্স কাওয়ালি', গায়ক- নাকাশ আজিজ ও নেহা কক্কর, চলচ্চিত্র- বিন্দাস

গায়ক–মান্না দে

৬৬. মূল গান–'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও...', গায়ক–মান্না দে, চলচ্চিত্র–সন্ন্যাসী রাজা (১৯৭৫)

৬৭. গায়ক- নাকাশ আজিজ ও নেহা কক্কর, চলচ্চিত্র- বিন্দাস

৬৮. গায়ক–জিত গাঙ্গুলি, মোনালি ঠাকুর, চলচ্চিত্র–হান্ড্রড পারসেন্ট লাভ (২০১২)

৬৯. গীতিকার, সুরকার ও গায়ক- নচিকেতা চক্রবর্তী (১৯৯৩)।

৭০. গায়ক–কিশোর কুমার (১৯৭৮), চলচ্চিত্র–ডন

৭১. গায়ক- বিনোদ রাঠোর ও সাধনা সরগম, ছবি—উড়ান (১৯৯৭)

৭২. গায়ক—কিশোর কুমার, চলচ্চিত্র —কালাকার (১৯৮৩)

৭৩. গায়ক—মান্না দে, চলচ্চিত্র—প্রথম কদম ফুল (১৯৭১)

৭৪. গায়ক-গায়িকা—উদিত নারায়ণ, অলকা ইয়াগনিক, চলচ্চিত্র—তেরে নাম (২০০৩)

৭৫. গায়ক—জিৎ গাঙ্গুলী, ছবি—পরান যায় জ্বলিয়া রে

৭৬. গীতিকার, সুরকার ও গায়ক—নচিকেতা

৭৭. গায়ক—কিশোর কুমার, চলচ্চিত্র—চলতে চলতে (১৯৭৬)

৭৮. গায়ক-গায়িকা—কুমার সানু, অলকা ইয়াগনিক, চলচ্চিত্র—সোলজার, ১৯৯৮

৭৯. গায়ক-গায়িকা—কুমার সানু, অনুরাধা পাড়োয়াল, চলচ্চিত্র—সড়ক (১৯৯১)

৮০. মূল গান- 'সাধের লাউ বানাইলি মোরে বৈরাগী'

৮১. গায়ক—মহম্মদ রফি, ছবি—গুননাম (১৯৬৫)

৮২. গীতিকার, সুরকার ও গায়ক- নচিকেতা চক্রবর্তী (১৯৯৩)

৮৩. গায়ক—মান্না দে (১৯৮২)

৮৪. গায়ক-গায়িকা—কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে, চলচ্চিত্র—সুরের আকাশে (১৯৮৮)

৮৫. মূল গান- 'শোন মন বলি তোমায়...', গীতিকার-স্বপন চক্রবর্তী, সুরকার ও গায়ক- রাহুল দেববর্মন।

৮৬. বিমেলেন্দু হালদার, *দক্ষিণ ২৪ পরগণা যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা (প্রথম খণ্ড)* (সোনারপুর: প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০১১), ২৪। পুরুষরা গান করতেন এবং স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করতেন।

৮৭. আব্দুল ওয়াহাব, *বাংলার লোকবাদ্য* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬), ৮০

৮৮. পল্লব সেনগুপ্ত, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি), ২৫১। এই তিনটি পরপর নিরপেক্ষ নয়।

৮৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *উত্তরবাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য* (কলকাতা: চতুষ্কোণ, বৈশাখ ১৩৮৩), ৩১

৯০. নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'জনজীবন সংহত গোষ্ঠী ও বাংলার লোকনাট্য', *লোকশ্রুতি*, সংকলন সংখ্যা, (ডিসেম্বর ১৯৮৬): ৫০

৯১. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালা গান ও লোক সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৯)

৯২. গিরীন্দ্রনাথ দাস, *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা* (কলকাতা: সুবর্ণরেখা, দ্বিতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ১৯৯৮), ২৩

৯৩. ঐ, পৃ. ২৪

৯৪. অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ* (কলকাতা: দেব উচ্চারণ, তৃতীয় মুদ্রণ: জুলাই ১৯৮১), ২৪-২৫

চতুর্থ অধ্যায়

গাজন লোকনাট্য: আঙ্গিক ও অভিনয় পাঠ্য হিসেবে বিশ্লেষণ

বর্ষশেষের চৈত্রসংক্রান্তিতে আগামী বছরের শুভকামনায় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে দরিদ্র কৃষি পরিবারের মানুষগুলি ভালো উৎপাদনের আশায় শিব-পার্বতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে গাজন নামক উৎসবে চারদিনব্যাপী নানান রীতি-নীতি পালন করে। এই উৎসবের একেবারে শেষ পর্বে থাকে বিনোদনের ব্যবস্থা। গ্রামের বৈচিত্রহীন জীবনে এই বিনোদন পর্বে আসর বসে গাজনপালার। নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে হাসি, মজা, সংলাপে সমৃদ্ধ গাজনপালা কাহিনি যা সারারাত মানুষকে আনন্দ প্রদান করে।

গ্রামজীবনে মনোরঞ্জনমূলক বিনোদনের অভাব। বিনোদনের জন্য ব্যয় করার মতো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবও মানুষের যথেষ্ট থাকায় গাজন উৎসবের গাজনপালায় অভিনয় করাও ছিল গ্রামের মানুষের কাছে অন্যতম বিনোদনের অঙ্গ। চৈত্র মাসের শুরুতে গ্রামের অধিবাসীগণ নিজেদের মধ্যে থেকে অভিনেতা, বাদ্যকার, নির্বাচন করে দল তৈরি করত। এরপর গ্রামেরই কারও বাড়িতে বা নাটমন্দিরে একমাস ধরে চলত মহড়া। উৎসবের শেষদিনে হত মঞ্চ বা আসরে অভিনয়। উৎসবের মধ্যেকার এই পর্বটি ছিল গ্রামের মানুষের শিল্পচর্চারও অন্যতম একটি মাধ্যম। গ্রামের অনেক প্রতিভাবান শিল্পী কেবলমাত্র জীবনের তাগিদে ও সুযোগের অভাবে শিল্পচর্চার সময় ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত সেক্ষেত্রে গাজন ছিল তাদের কাছে শিল্পচর্চার বিশেষ একটি মাধ্যম।

ক্রমে ক্রমে গাজন উৎসব থেকে আলাদা হয়ে গাজন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি লোকনাট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানে-স্থানে তৈরি হয় গাজনদল। পেশাদারি দল গঠিত হয়, ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। ক্রমে দলে যোগ হয় তত্ত্বাবধায়ক, রাঁধুনি, নির্দেশক, পরিচালক, গাজনমাস্টার ও আরও অনেকে। ক্রয় করা হয় পালা। মানুষের রুচির সাথে বজায় রেখে পালা নির্মাণ, গানের সুরারোপ, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করা হয়। পোস্টার, কার্ড, বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করা হয় এমনকি কোথাও কোথাও টিকিটের পরিবর্তে পালা পরিবেশনের ব্যবস্থাও করা হয়। নিজের গ্রাম, জেলা ছাড়িয়ে অন্যান্য জেলাতেও দলগুলি অভিনয়ের জন্য ডাক পায়। বর্তমানে এমন অনেক পরিবার রয়েছে যার মূল আয়ের উৎস এই পেশাদারি গাজনপালার দলগুলি। বর্তমানে গাজন উৎসব ছাড়াও কোনো পূজা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালী পূজা এবং মেলাকে (অনেক সময় ফড়ের মেলা) কেন্দ্র করে বা কেবলমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যেই গাজনের আসর বসে। এখন শুধুমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া প্রায় সারা বছরই গাজনের আসর অনুষ্ঠিত হয় তাই বলা যায় গাজন আজ কেবলমাত্র একটা উৎসব নয় সে নিজেকে মনোরঞ্জনমূলক একটি লোকনাট্য ও শিল্পচর্চার মাধ্যমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

৪.১ গাজনপালা অভিনয়ের আঙ্গিক

পেশাদারি গাজনদলগুলি যে পালা পরিবেশন করে তার আঙ্গিকগত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি পালা পরিবেশনে ৭ থেকে ৮টি করে ছক অর্থাৎ কাহিনি থাকে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছকগুলি ১৩ থেকে ২০ মিনিটের হয় আর বড় দৈর্ঘ্যের ছকগুলি ২২ থেকে ৩০ মিনিটের হয়। সব মিলিয়ে পরিবেশনটির সময় হয় মোট তিন ঘন্টা। পালাগুলি শুরুর আগে ফাঁকা মঞ্চে তিন বার ঘণ্টা বাজানো হয় সাজঘর থেকে। নানান বাদ্য যন্ত্রানুসংগীতের সাথে ফাঁকা মঞ্চে তখন আলোর নকশা হয়। মঞ্চে তখন কেবলমাত্র একটি তিন ধাপ সিঁড়ির পাটাতন রাখা থাকে যেটাতে দলের নাম, পরিচয় লেখা থাকে আর উপর থেকে নানা উচ্চতায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রগুলো ঝোলানো থাকে সাথে থাকে আলোর ব্যবস্থা। এই সময় কিছুক্ষণ অন্তর বাদ্যযন্ত্রানুসংগীতের ধরন বদলায়। তার সাথে ছন্দ মিলিয়ে ফাঁকা মঞ্চে হয় আলোর কারুকার্য। এরপর মঞ্চের পিছনে যেখানে অস্থায়ী সাজঘর তৈরি করা হয় সেখানে একটি বাক্সে ঐ দলের আরাধ্য দেবতাসহ অন্যান্য দেবতার, যেমন- মহাদেব, সরস্বতী, পঞ্চানন এদের ছবি থাকে। এরপর সেখানে তাদের সামনে ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে বন্দনা গান করা হয়। কখনো শিল্পী একা কখনো সমবেত ভাবে এই গান করেন। গানের এক একটি স্তবকের বিষয় এক এক রকম হয়। যেমন— প্রকৃতি বিষয়ক, দেশাত্ববোধ, মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা বিষয়ক প্রভৃতি। এরপর হয় শুরু হয় ঘোষণা। শুরুতেই নিষেধাজ্ঞামূলক ঘোষণা করা হয়। তারপর দলের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর আবার ফাঁকা মঞ্চে গান শুরু হয়। এবার গান চলাকালীন মঞ্চে অভিনেতারা প্রবেশ করেন এবং গানটি শেষ হওয়ার মুহূর্তে সংলাপ সহ পালা অভিনয় শুরু হয়। অভিনয় শুরু করার আগে অভিনেতারা মঞ্চ প্রণাম করেন। এরপর শুরু হয় প্রথম ছকের অভিনয়। কখনো প্রথম ছকের শেষে আবার কখনো প্রথম ছকের প্রথম পর্বের শেষে আবার ঘোষণা শুরু হয়। এবার কলাকুশলীর নাম ও পালার নাম ঘোষণা করা হয়।

এরপর শুরু হয় প্রথম ছকের শেষ পর্বের বা দ্বিতীয় ছকের অভিনয়। অভিনয় শুরুর আগে এই ছকটির নামও ঘোষণা করা হয়। সবকটি ছকের নাম থাকে না। সাধারণত প্রথম দুটি ছকের নাম থাকে। কোনো কোনো দলের পরিবেশনায় হয়তো অন্য কোন একটি ছকের নাম থাকে যে নাম অনুসারে পালাটির নামকরণ হয়।

প্রথম ছকের বিষয় পৌরাণিক কোন ঘটনার অনুকরণে হয়। দ্বিতীয় ছকটির বিষয় হয় রাধা-কৃষ্ণ প্রেম বা কৃষ্ণকেন্দ্রিক। তৃতীয় ছকটি থেকে শুরু হয় সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক নানান বিষয়ের ঘটনা পরিবেশন করা হয়। এর মধ্যে তৃতীয় ছকটির বিষয় হয় নায়ক নায়িকার প্রেম।

প্রথম ছকের শেষে এবং দ্বিতীয় ছকের শুরুর আগে নিবেদন করা হয় করাচ গান। এই গানের সাথে যে নৃত্য পরিবেশন হয় তাতে ধ্রুপদী নৃত্যের ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ছকের কাহিনিতে যেহেতু অশুভ শক্তির বিনাশ করা হয় তাই ‘করাচ গানে’র উদ্দেশ্য হল অসুর বধের পর

স্বর্গে যেমন আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেখানে দেবতাদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে ঊর্বশী কিন্নরীরা যেমন নৃত্য পরিবেশন করে তেমনি এখানেও অশুভ শক্তি, আত্মা, শয়তান বা খলনায়কের বিনাশের পর নর্তকীরা দর্শকদের কাছে আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে এই নৃত্য পরিবেশন করেন তাই তাদের পোশাকে, সাজ-প্রসাধনে অলংকারে ও নৃত্য কৌশলে ধ্রূপদী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম ছকটি পৌরাণিক ঘটনাকেন্দ্রিক হওয়ায় তার চরিত্ররাও পৌরাণিক চরিত্রের হন। দ্বিতীয় ছকটির চরিত্র রূপে থাকেন রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই প্রমুখ। তৃতীয় ছকটিতে চরিত্ররূপে থাকে আধুনিক নায়ক, নায়িকা এবং নায়কের বৌদি। এই তিনটি ছকের চরিত্ররা সমস্ত দলেই একই ধারা বজায় রাখে।

তারপর ক্রমশ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্রমানুসারে ছকগুলি পরিবেশন করা হয়। ছকগুলির শুরুতে 'মুখ গান', মাঝে সংলাপ মিশ্রিত 'মুখ্য গান' ও শেষে 'শেষের গান' থাকে। এছাড়া অভিনয়ের পরতে পরতে ছোট বড় নানান গান থাকে কখনো তা বিষয়ের সাথে যুক্ত হয় আবার কখনো একেবারেই বিষয় বহির্ভূত হয়। গানের সুরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করা হয় অনুকরণ। হিন্দি, বাংলা, ভোজপুরি প্রভৃতি নতুন বা পুরাতন গানের অনুকরণ করা হয়। আধুনিক, চলচ্চিত্রের বা জীবনমুখী গানের সুর অনুকরণ করে নিজস্ব ভাষায় গাওয়া হয়। কখনো আবার গানটির ভাষা ও সুর অপরিবর্তিত রেখেই গাওয়া হয়। আবার কখনো কখনো শিল্পী তার নিজস্ব ভাষা ও সুর নির্মিত গান করেন। তবে এই গানের সংখ্যা কম। পালাগুলিতে গানের সাথে নাচের প্রাধান্য থাকে। প্রথম ছকটিতে নাচ বিশেষ থাকে না বা খুবই কম থাকে। দ্বিতীয় ছকটি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক হওয়ায় তাতেও নাচ থাকে না বললেই চলে। তৃতীয় ছকে থাকে নাচ। নায়কের নাচে থাকে আধুনিকতার ধাঁচ আর নায়িকার নাচের মধ্যে থাকে শারীরিক আবেদনের প্রকাশ। চতুর্থ ছক থেকে বাকি ছকগুলিতে সবকটি ছকেই নাচ বাধ্যতামূলক নয়। তবে ছকের মধ্যে অনেক সময়েই অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সঙ্গতিবিহীন নাচের প্রয়োগ হয়। নাচের মধ্যে উদ্দামতা ও শারীরিক আবেদন খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় চরিত্রের বয়স অনুপাতে নাচের ধরনে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। যেহেতু গাজনপালার সব অভিনেতারাই পুরুষ হন তাই নারী চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করেন সেক্ষেত্রে নাচের ধাঁচ পুরুষ চরিত্রের নাচের ধাঁচের থেকে আলাদা রকম হয়।

সবকটি ছক পরিবেশনের শেষে একজন বা দুজন শিল্পী মঞ্চে উপস্থিত হয়ে 'বাউল গান' নামক একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। তার পূর্বে পরের দিন ঐ মঞ্চে যদি অন্য কোন দলের পালা পরিবেশনের নির্ধারণ করা থাকে তাহলে সেই দলের নাম, পালার নাম ও বিখ্যাত অভিনেতার নামটিও ঘোষণা করা হয়। 'বাউল গান' নামক সেই অনুষ্ঠানে বাউল গান বা কোন লোকগান অথবা সম্পূর্ণ আধুনিক গানও পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এইভাবে বর্তমানে পেশাদারি গাজনদলগুলির পালা পরিবেশন হয়।

গাজনপালা অভিনয় মঞ্চস্থ হওয়ার মাঝেই কখনো কখনো কোনো শিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অভিনয় চলাকালীন কোনো ছকের মাঝে অভিনেতাদের হঠাৎই থামিয়ে দিয়ে পুরস্কার দাতার নাম এবং কত টাকা দিয়েছেন তা ঘোষণা করে অভিনেতাকে মঞ্চে ডেকে এনে বা মঞ্চে থাকাকালীন তার গলায় বা পোশাকে সেই টাকাটি আটকে দেওয়া হয়। পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনেক সময় গানের মাধ্যমে করেন ঐ শিল্পী। সেই গানের সাথে চলতে থাকা ছকের কাহিনির কোনো সম্পর্ক থাকেনা। পুরস্কারস্বরূপ টাকার পরিমাণ অধিকাংশক্ষেত্রেই যৎসামান্য হয় কিন্তু এখানে টাকার পরিমাণ অপেক্ষা পুরস্কারস্বরূপ মূল্য শিল্পীর কাছে অনেক বেশী মূল্যবান ও সম্মানজনক। পুরস্কারপ্রদানের পরেই আবার অভিনয় শুরু হয়। ছকটি যে পর্যন্ত অভিনয় হয়েছিল ঠিক সেখান থেকেই আবার অভিনয় শুরু হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উপরিউক্ত বিষয়টি উদাহরণস্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখানো হল—১৪.১২.২০১৭ তারিখে মুকুন্দপুরের কাছে খুদিরাবাদের সূর্যশিখা ক্লাবের অনুষ্ঠিত নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তার গাজনপালা পরিবেশনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

প্রথমে ফাঁকা মঞ্চে "রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ..." গান সহ আলোর নকশা ও নানান লয়ে ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের পরিবেশন হয়। এই সময় সাজঘর থেকে তিনবার ঘণ্টা বাজানো হয়। তারপর পালা শুরুর আগে ঘোষণা শুরু হয়। পেশাদারি গাজন দলগুলির ঘোষণাতেও একটা নির্দিষ্ট ধাঁচ থাকে। দলের নাম ঘোষণা, পালার নাম ঘোষণা, শিল্পীদের নাম ঘোষণা, দর্শকবৃন্দের উদ্দেশ্যে কোনও সতর্ক বার্তা বা অনুরোধ—এসব ঘোষণার সময়, ভাষা ও ধরন সাধারণত সমস্ত দলের ক্ষেত্রে একই রকম হয়। এই দলটির ঘোষণা লক্ষ্য করলে বিষয়টি সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব- "সুধী, দর্শকবৃন্দ তথা অয়োজকমন্ডলী, সবাইকে জানাই নিউ দিগ্বিজয়ীর পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। কয়েকটি বিশেষ ঘোষণা-ঘোষণাগুলি মন দিয়ে অনুগ্রহ করে শুনবেন। আমাদের যেসমস্ত খুটিতে মাইকের এবং বক্সগুলি রয়েছে দয়া করে কেউ আপনারা এদিক ওদিক নাড়াবেন না তাতে গান শুনতে ও শোনাতে বিঘ্ন ঘটতে পারে। গান চলাকালীন মঞ্চের উপর কেউ টর্চ কিংবা লেজার লাইট ব্যবহার করবেন না। আমাদের সাজঘর থেকে মঞ্চে যাওয়ার রাস্তাটিতে অনুগ্রহ করে কেউ দাঁড়াবেন না। আমরা গান শেষ করার আগে দয়া করে কেউ আপনাদের মূল্যবান আসনটি পরিত্যাগ করবেন না তাহলে কিছুটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবেন। ঘোষণাটি শোনার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। শিল্পীদের কাছে দর্শক হল দেবতা। যতদিন এই দেবতাদের আশীর্বাদ মাথায় থাকবে ততদিন নিউ দিগ্বিজয়ী, দিগ্বিজয়ী থাকবে। ইতি—সন্তোষ হালদার ও সালাম পাইক। শুরু করছি পরম পুরুষ ঠাকুর যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নাট্যাচার্য কৃষ্ণের চরণে বন্দনা করে, মা বিশালক্ষীর চরণ পাথেয় করে মেলা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও বুকভরা ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করতে চলেছি ১৪২৫ ও ১৪২৬ বঙ্গাব্দের চ্যালেঞ্জ নয় চমক লাগাতে দর্শক দরবারে এসে গেছে সেই সর্বকালীন ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য একটি নাম নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয় বার্তা"।

তারপর আবার ফাঁকা মঞ্চে আলো ও বাদ্য হয় প্রায় ২০ সেকেন্ড। তারপর আবার ঘোষণা শুরু হয়—"বিশেষ আকর্ষণ থাকছে অশ্বিনী নাইয়ার রচিত, নির্দেশিত, অভিনীত-'মৃত্যুশয্যায় বিয়ের বাসর'। (সাধারণত প্রথম বা দ্বিতীয় ছকের নামই ঘোষণা করা হয়। এক্ষেত্রে অষ্টম বা শেষ ছকটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।) প্রোপাইটার সন্তোষ হালদার, ব্যবস্থাপনায় সালাম পাইক, ম্যানেজার শম্ভু হালদার। এই দলটার জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন—কাকদ্বীপ, কামারহাট, সন্তোষ হালদারের গদিঘর ও হোটর রাজুদার গদিঘর। আলো—ভাই ভাই ইলেকট্রনিক, নিয়ন্ত্রণে শম্ভু হালদার, ধ্বনি—ভাই ভাই ইলেকট্রনিক, নিয়ন্ত্রণে—রবিন হালদার, যন্ত্রসংগীতে—সর্বশ্রী গৌরপাত্র, ইলেকট্রনিক প্যাড—সুজিত কুমার নাইয়া, অভিনয় করছে—গোপীনাথ মালি ছন্দে তালি, তাল মেলাতে ছন্দের জাদুকর মাষ্টার কৌশিক শিকারী, আজকের মঞ্চে পুরুষ চরিত্রে—জয়ন্ত নাইয়া, লখিন্দর পন্ডিত, শঙ্কর মন্ডল, ছোট্টু নাইয়া, নারী চরিত্রে—সুপ্রভাত মন্ডল, কুমার রাজু, কুমার সুজিত ও মধু সর্দার। শ্রেষ্ঠাংশে সুপার ফাস্ট অ্যাক্টর, গায়ক ও বর্তমান শিল্পী সবার প্রিয় অশ্বিনী কুমার নাইয়া"।

এরপর ফাঁকা মঞ্চে গান শুরু হয়-"গুরুর আশীর্বাদে পেয়েছি যে সুর...গানই আমার পূজা পরিচয়"। এই গানের পর আবার ঘোষণা করা হয়—"এই কলাকুশলী শিল্পী সমন্বয়ে আমরা শুরু করতে চলেছি ডঃ জগন্নাথ গায়েন রচিত, অশ্বিনী নাইয়া নির্দেশিত—'ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত' "। ৩ বার নামটি ঘোষণা করা হয়।

প্রথম ছক দুষ্টের দমনকেন্দ্রিক কাহিনি 'ক্ষুধার্ত চায় লাল রক্ত' পরিবেশিত হয়। তারপর হয় 'করাচ গান'। তারপর রাধা-কৃষ্ণকেন্দ্রিক 'আয়ানের শয়নকক্ষ' নামক দ্বিতীয় ছক শুরু হয়। তার আগে ছকটির নাম ঘোষণা করা হয় এইভাবে—"নমস্কার, আমাদের দ্বিতীয় নিবেদন অশ্বিনী নাইয়া রচিত, নির্দেশিত, অভিনীত সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক গীতি আলেখ্য 'আয়ানের শয়নকক্ষ' "।

এরপর তৃতীয় ছক থেকে অষ্টম ছক পর্যন্ত পরিবেশন হয়। অষ্টম ছক 'মৃত্যুশয্যায় বিয়ের বাসর' এর নামেই নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তার ঐ দিনের পরিবেশিত গাজনপালাটির নামকরণ করা হয়েছিল। এরপর অন্য কোনো ছক শুরু হওয়ার আগে নাম ঘোষণা করা হয় না। সবকটি ছক শেষ হওয়ার পর বাউলগানের ঘোষণা করা হয় তার সাথে পরবর্তী দিনের অর্থাৎ ১৫.১২.২০১৭ তারিখের নির্ধারিত পালার নাম ঘোষণা করা হয় এইভাবে—"কেউ যাবেন না। অশ্বিনীবাবু গান করবে। আগামীকাল এই একই রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়ে যাবে নাট্যমঞ্জরী গাজন সংস্থা পরিবেশিত 'অন্ধগলির মাফিয়া ডন'। 'অন্ধ গলির মাফিয়া ডন' যার শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছে সত্যেন ঘোষ, অলোক মন্ডল, মিলন বিক্রম। এই প্রথমবার এই তিন স্টার আগামীকাল এখানে আসছে সত্যেন ঘোষ, অলোকমন্ডল, মিলন বিক্রম, অভিনীত গাজনগান 'অন্ধগলির মাফিয়া ডন'। আপনারা কেউ যাবেন না। কয়েকটি বাউলগান হবে"।

তবে ব্যতিক্রমও হয় যেমন ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ঐ একই জায়গায় ২৩.১২.২০১৭ তারিখে নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলটির বাউলগান ২০ সেকেন্ড পরিবেশন হওয়ার পর ঘোষণা শুরু হয়। ঘোষণার পর ঐ ছকের পরবর্তী অংশ পরিবেশিত হয়। পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি ক্ষেত্র সমীক্ষা দ্বারা বিশ্লেষণ করলে আদিশিবশক্তি গাজন তীর্থ ৮.১২.২০১৭ তারিখে মুকুন্দপুরের দাসপাড়ায় গাজনপালা পরিবেশনাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। সময় সপ্তম ছকের সমাপ্তির পর ওই ছকের শ্বশুর শাশুড়ি চরত্রাভিনেতাদের এবং ডাক্তার চরিত্রাভিনেতাকে নিয়ে এক ব্যক্তি মঞ্চে উপস্থিত হন তার পর তিনি ঘোষণা করেন—"দর্শকমন্ডলী, ছোট ছোট মা বোনেরা এবং বড় মায়েরা (শ্বাশুড়ি চরিত্রাভিনেতার কাছ থেকে নাম জেনে নিয়ে) পাঁচু গোপাল সর্দারের অভিনয় এবং গান শুনিয়া (শ্বশুর চরিত্রাভিনেতার কাছ থেকে নাম জেনে নিয়ে) জয়দেব সর্দারের অভিনয় এবং (ডাক্তার চরিত্রাভিনেতার কাছ থেকে নাম জেনে নিয়ে) নরেন সর্দারের গান এবং অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া আমি, তিনজনের আমি, তিন দশে তিরিশ টাকা আমি, ওদের আমি গান শুনিয়া আমার ভালো লেগেছে, আমি পুরস্কার দিলাম এবং বললাম যে দাদারা একটা ভালো ডুয়েট গান আমার শুনিয়ে আমায় দেবেন। ধন্যবাদ।"

এর পর ডাক্তার চরিত্রাভিনেতা গান করেন একা মঞ্চে যে গানের সাথে সেই মূহুর্তে অভিনীত হওয়া কাহিনির কোনো সামঞ্জস্য নেই। ওই পালা পরিবেশনেই অষ্টম বা শেষ ছকের একেবারে শেষ পর্বে অর্থাৎ ২৫ মিনিট অভিনয় হওয়ার পর যখন পণের দাবিতে বধূ হত্যার অপরাধে পুলিশ তিশার স্বামী ও শ্বাশুড়িকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ঠিক তার পরেই অভিনেতাকে পুরস্কার বা সম্মান প্রদানের জন্য দর্শকমন্ডলী বা আয়োজকমন্ডলীর কোনো এক প্রতিনিধি মঞ্চে উপস্থিত হন। যদিও সাধারণত পালা অভিনয়ের মাঝেই সম্মানপ্রদান করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে অভিনয়ের মাঝে বিরতি ঘটলে দর্শক মনে ঘটনার উত্তেজনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে সেই কারণে দলেরই এক কর্তা ব্যক্তি এসে পুরস্কারদাতাকে সরিয়ে নিয়ে যান। পালাভিনয় যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকে।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার ১৭.১২.২০১৭ তারিখে মুকুন্দপুরের খুদিরাবাদের সূর্যশিখা ক্লাবের আয়োজনের গাজনপালা পরিবেশনের একেবারে শেষে 'বাউল গান' পরিবেশনের চলাকালীন শিল্পীর সঙ্গীত পরিবেশনের মাঝেই দর্শক খুশি হয়ে তাকে সম্মানস্বরূপ টাকার একটি নোট গায়কের হাতে দেন এবং সঙ্গীত পরিবেশনার মাঝেই শিল্পী তা প্রণাম করে গ্রহণ করেন। ওই পুরস্কার বা সম্মানটুকুই শিল্পীকে তার কাজের প্রতি অনেকখানি আগ্রহী ও আবেগপ্রবন করে তুলতে সাহায্য করে।

৪.২ গাজনের সময় ও আসর

গাজনের সময়

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী গাজন উৎসবের একেবারে শেষ অংশের মনোরঞ্জনমূলক অংশটি হল গাজন লোকনাট্য পরিবেশনা। গ্রামের মানুষের বৈচিত্রহীন জীবনে নাচ, গান, বাদ্য সহযোগে, হাসি, মজা সমৃদ্ধ সংলাপধর্মী এই কাহিনি অনুষ্ঠান এক আনন্দ বিনোদনের উপাদান যা সারারাত ধরে পরিবেশিত হত। পূর্বের মতো গাজনপালা এখন সারারাত ধরে অনুষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলে। শহরতলি বা মফঃস্বল এলাকায় শব্দনিয়ন্ত্রণ আইনের কারণে গাজনপালা অনুষ্ঠান সন্ধ্যের কিছু পরে শুরু করে শেষ করতে হয় রাত দশটার মধ্যে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে রাত ৮টা-১০টার পর শুরু করে শেষ হয় ১২টা- ১টা এমনকি মধ্য রাত্রিবেলাতেও।

গাজনের আসর

অনেক বছর আগে যখন পেশাদারি গাজনদল তৈরি হয়নি, যখন গাজনপালা অভিনয় কেবলমাত্র গাজন ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ ছিল তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী গাজন উৎসবের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হত মনোরঞ্জনমূলক এক ধরনের পালা অভিনয়। তখন ছিল না মঞ্চ, ছিল জমিদার বাড়ি বা ব্যক্তিগত কারোর নাটমন্দির অথবা কোনো মন্দির প্রাঙ্গণ কিংবা গ্রামেরই কোনো খোলা জায়গা। সেখানেই বসতো গাজনপালার আসর। ক্রমে সব কিছুর সাথে সাথে গাজনপালা পরিবেশনের আসরেও এসেছে বিবর্তন। বর্তমানে গাজনপালা পরিবেশনের সাথে পূজা, উৎসব, মেলার সংযোগ রয়েছে। এটি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বিনোদনে পরিণত হয়েছে। এখন গ্রামের নাটমন্দিরে দর্শকদের সামনে পালা পরিবেশন করা হলেও প্রায় সারা বছর পেশাদারি দলগুলো গ্রামাঞ্চলসহ শহর ও মফঃস্বলের মাঝে কোনো খোলা জায়গায় মঞ্চ তৈরি করে গাজনপালা পরিবেশন করেন। আবার ১৯-০২-২০১৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে কলকাতা শহরের মুকুন্দপুর অঞ্চলের লালনমঞ্চে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চে গাজনপালা পরিবেশিত হয়েছিল।

তবে গ্রাম, শহর বা মফঃস্বলে বর্তমানে পেশাদারি গাজনপালাগুলির যে আসর হয় সেখানে এখন মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চের উপরে কাঠের তিন ধাপ সিঁড়ির একটি পাটাতন রাখা থাকে। তাতে দলের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর লেখা থাকে। মঞ্চের উপরে প্রায় ৬টা থেকে ১১টার কম-বেশী শব্দগ্রাহক যন্ত্র বিভিন্ন উচ্চতায় ঝোলানো হয়। মঞ্চের এক দিক খোলা ও দুদিক দিয়ে প্রবেশ করার ব্যবস্থা থাকে। পিছনে থাকে অস্থায়ী সাজঘর। টিন দিয়ে ঘেরা, সেখানে চেয়ারে, মাটিতে সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা থাকে। দড়িতে জামা কাপড় ঝোলানো থাকে আর আলো হিসাবে বাল্ব এর ব্যবহার হয়। সেখানে রাখা থাকে একটি বাক্স। যে বাক্সে ঐ দলের আরাধ্য দেবতাসহ অন্যান্য দেব-দেবীর ছবি রাখা থাকে। পালা শুরু হওয়ার আগে সেখানে ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্র ও গানের মাধ্যমে আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করেন তারপর পালা অভিনয় শুরু করেন। বর্তমান পেশাদারি গাজনদলের মঞ্চের সামনের অংশে রাখা থাকে রঙীন আলোর নকশা যন্ত্র। মঞ্চের দুপাশে বাদ্যকারগণ

বসেন এবং কখনো মঞ্চের উপরে নিয়ন্ত্রক থাকেন। একটু দূরে অন্ধকারেও কোনো কোনো বাদ্যকার থাকেন। খোলা মাঠে দর্শকরা মাটিতেই বসেন।

কখনো পেশাদারি দলগুলিকে নিয়ে টিকিটের বিনিময়ে পালা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়। যেমন—২০১৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে হোটরের মৌখালি ফুটবল খেলার মাঠে আয়োজিত নিউ দিগ্বিজয়ী দলের অভিনীত টিকিটের বিনিময়ে গাজনপালা ‘বিধবার গায়েহলুদ’। সেক্ষেত্রে মাঠের-চারপাশ ঘিরে মঞ্চ ও দর্শকাসন তৈরি করা হয়। পাশের কোনো ক্লাব ঘরে করা হয় টিকিট কাউন্টার। টিকিট মূল্য ১০ টাকা বা ২০ টাকা। দর্শকাসনে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হয় বাঁশ ও দড়ি দিয়ে। প্রবেশদ্বারে টিকিট পরীক্ষা করে তবেই দর্শকগণকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। অসংখ্য মানুষ সপরিবারে টিকিটের বিনিময়ে আসেন গাজনপালার রসাস্বাদন করতে। আসেন বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা সকলেই। মঞ্চ এবং তার তিনপাশে দর্শকাসনের ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্চের দুপাশে ও সামনে আলো, শব্দানুযন্ত্র ও আধুনিক বাদ্যযন্ত্রাদির ব্যবস্থা করা থাকে। সব মিলিয়ে বিশাল একটি খোলা জায়গায় এটির আয়োজন করা হয় এবং মঞ্চসহ দর্শকাসন সমস্তটাই কাপড়ের তাঁবু করে ঘেরা থাকে। অভিনয় শুরুর পরও বহু মানুষ জায়গার অভাবে দাঁড়িয়েই অভিনয় দেখেন। যদিও ব্যবসা ভালো হলে একটা সময় পর ব্যারিকেড খুলে দেওয়া হয়। তাড়াতাড়ি পালা শুরু করা হয়। ওই দিন শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে ৬ টা ৩০ মিনিটে শেষ হয়েছিল ১০টা ৩০ মিনিটে। শেষ হওয়ার পর দর্শকদের ফেরার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। সপরিবারে দর্শকগণ আসেন। সেইদিন ঐ স্থানে প্রায় মেলা বসে যায়।

৪.৩ বাদ্যযন্ত্র, যন্ত্রানুষঙ্গ ও আলো

বাদ্যযন্ত্র

সঙ্গীতের তৃতীয় অঙ্গ হল বাদ্যযন্ত্র। মানুষের ‘সংস্কৃতি’ বিকাশের আদিস্তরের সূচনালগ্নে নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রেরই আবির্ভাব হয়েছে বলে কল্পনা করা যায়।

বাদ্যযন্ত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের সর্বপ্রথম আবেগ হল ছন্দ বা তাল বোধ। যা সে প্রকৃতি থেকেই অনুভব করেছে। এই অনুভব ও তার বহুমুখী প্রকাশ থেকেই ক্রমশ ধীরে ধীরে বিবর্তনের মাধ্যমে একে একে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেছে। অনুমান করা হয় যে আদিম মানুষ যখন নাচ আরম্ভ করেছিল তখন সে তার হাত বা বুক বা পেট বা উরুতে (কুস্তিগীর বা মল্লযুদ্ধের মতো) আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা করত যার দ্বারা সে তার আনন্দ-ভয়-বিস্ময় প্রকাশ করত। অনুমান করা হয় যে এ থেকেই ক্রমশ ঠুকে বা পিটিয়ে যে সব বাদ্যন্ত্রগুলি রয়েছে যেমন—ঢাক, ঢোল প্রভৃতির আবিষ্কার হয়েছে।

তাদের পশু শিকার এর হৃদয়, চর্ম, অন্ত্র প্রভৃতি দ্বারাই নির্মিত হত এগুলি। একই রকমভাবে দুটি কাঠের বা পাথরের বা ঐ ধরনের কোন বস্তুর টুকরো ঠুকে আওয়াজ সৃষ্টি করেছিল তারা। মাটিতে গর্ত করে চামড়া বা গাছের পাতলা ছাল দিয়ে ঢেকে লম্বা শক্ত লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শব্দ উৎপন্ন করত। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, উক্ত আদিম প্রক্রিয়ায় এভাবেই জন্ম হয়েছে ঝাঁঝর-ঢোল-করতাল-দুন্দুভি জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের। এভাবেই ক্রমশ বায়ুর দ্বারা বাজানো যন্ত্র বাঁশি এবং তারের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে তাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে বাঁশি, বীণা চামড়ায় মোড়া বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এই আদিম বা লোকবাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র রয়েছে যেগুলি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ভাবে আজ অপরিহার্য থেকে বর্তমানেও অপরিহার্য রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে আবার বেশ কিছু লোকবাদ্য যন্ত্র তার আদিম রূপ থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।[১] লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার আদৌ না করা বা যতদূর সম্ভব পরিহার করাই উচিত কারণ এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকসঙ্গীতের চারিত্রিক গুণমান নষ্ট হয়ে যায়। অতি সম্প্রতি লোকসঙ্গীতের সঙ্গে নানা ধরনের উচ্চাঙ্গ এবং বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে লোকসঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্য স্থানে 'আধুনিক সঙ্গীত' নামে যে তরল গীতের প্রচলন আধুনিককালে দেখা যায় তাতে যেকোন প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হতে পারে।[২]

বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণি বিভাগ

অভিনব গুপ্তের মতানুযায়ী, ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের সংস্করণ। তার অধিকাংশ অধ্যায়ে তিনি বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন বাদ্যযন্ত্র হল 'আতোদ্য' অর্থাৎ যা আহত হয়। এই আতোদ্য জাতিগত ভাবে দুই প্রকার। যথা—

১. উচ্চাঙ্গ বাদ্যযন্ত্র। যথা—তবলা, সেতার, বীণা প্রভৃতি।

এবং ২. লোক বাদ্যযন্ত্র। যথা—করতাল, বাঁশি, একতারা প্রভৃতি।

এছাড়া রয়েছে বিদেশী বাদ্যযন্ত্র। যথা—হারমোনিয়াম, গিটার প্রভৃতি।

আবার আকৃতি ও ব্যবহার অনুযায়ী ভরতমুনি তাদের চার ভাগে ভাগ করেছেন। এই শ্লোকে তার পরিচয় রয়েছে—

ততোমচৈবানদ্ধম চ ঘনম শুষিরমেবচ ।
চতুর্বিধমতু বিজ্ঞেয়- মতোদ্যম তু লক্ষনাভিতম ।।
ততমতন্ত্রীগতম জ্ঞেয়মবনদ্ধম তু পশুকরম ।
ঘনমতলস্তু রিজ্ঞেয়ম শুষির বংশ উচ্চতে ।।[৩]

অর্থাৎ চারটি ভাগ হল—

১। তত বা তারের যন্ত্র। যথা—একতারা, দোতারা।

২। আনদ্ধ বা আচ্ছাদন যুক্ত যন্ত্র। যথা—ঢাক, ঢোল।

৩। ঘন বা ধাতু নির্মিত নিরেট যন্ত্র। যথা—ঝাঁঝ, করতাল, কাঁসর।

এবং ৪। শুষির বা ছিদ্রযুক্ত বায়ু পূরণে বেজে ওঠে এমন যন্ত্র। যথা—বাঁশি, শঙ্খ, সানাই।[৪]

যন্ত্রগুলির কাল এবং ঐতিহাসিক পটভূমি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ— ১। দেশী ও ২। আগন্তুক

১। দেশী- দু ধরনের। যথা- ক) আদি বঙ্গীয় সংস্কৃতি সজ্জাত।

খ) উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি বাহিত।

২। আগন্তুক দু ধরনের। যথা- ক) মুসলিম সংস্কৃতি বাহিত । যেমন-তবলা, সানাই প্রভৃতি

খ) ইউরোপীয় সংস্কৃতি বাহিত। যেমন- গিটার , ড্রাম প্রভৃতি।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলায় কোন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল তা অনুমান করতে গেলে প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প থেকে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিছু অনুমান করা যায় বিভিন্ন সময়ের বাংলা ও বাঙালির রচিত কাব্য–সাহিত্য গ্রন্থাদি থেকে। যেমন—দ্বাদশ শতাব্দীতে সর্বানন্দ রচিত *'অমরকোষ'* টীকা গ্রন্থে (১১৫৯ খ্রী.) লোকবাদ্যরূপে বাঁশি, শাঁখ, একতারা, ডমরু, মাদল, ঢোল, করতাল, ঘণ্টা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে।[৫]

গীতগোবিন্দে বাঁশি, করতাল এগুলির উল্লেখ রয়েছে। *চর্যাপদে*র ১১ সংখ্যক পদে ডমরু, ঘণ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। বড়ু চন্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে* বাঁশির উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণের সাথে সর্বত্র রয়েছে। কৃত্তিবাসের *রামায়ণে* শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ অংশে ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশি, শঙ্খ, তবলা (তবোল) এগুলির উল্লেখ রয়েছে। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যজীবনী*তে শঙ্খ, ঢাক, করতাল, ঘণ্টা, ডমরুর উল্লেখ রয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃতে* বাঁশির উল্লেখ পাওয়া যায়। *মনসামঙ্গল কাব্যে* ঢাক, বাঁশি, করতাল, সানাই, ঢোল, কাঁসির কথা রয়েছে। মুকুন্দরামের *চন্ডীমঙ্গলে* শঙ্খ, ডমরু, ঘণ্টা, কাঁসর এগুলির উল্লেখ রয়েছে। রূপরামের *ধর্মমঙ্গলে* শঙ্খ, কাঁসি, বাঁশি, কাঁসর প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লোকবাদ্যও বিবর্তনবাদী।

স্থান ও কাল রুচির সাথে সাথে একই ধরনের লোকবাদ্যের আকার এবং নামেরও পরিবর্তন হয়। বর্তমান পেশাদারি গাজনপালাগুলিতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের দিকে দিক্‌পাত করলে লক্ষ্য করা যায় যে সেখানে যেমন ঐতিহ্য বজায় আছে তেমনি যোগ হয়েছে আধুনিকতা আবার ব্যবহার হয় লোকবাদ্যও সেই সাথে দেশি ও বিদেশি বাদ্যযন্ত্রও। দর্শকদের কাছে পালাগুলিকে মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য এগুলির অবদান যথেষ্ট। বিষয়, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এগুলির যথাযথ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যথা—বাদ্যকারগণ মঞ্চেই অবস্থান করেন।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় মঞ্চের বামদিকে বাদ্যকার সানাই বাজাচ্ছেন।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকের শেষ দৃশ্যে যখন পাত্র প্রিয়াকে বিয়ে করতে সম্মতি জানায় সেই দৃশ্যে। তখন 'সানাই' এর আবহ তৈরি করা হয়েছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পালা শুরুর পূর্বে প্রথম ঘণ্টা পড়ার পর বিদ্যুৎ চমকের শব্দ, ঝড়ের শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে অক্টোপ্যাড এর সাহায্যে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকে ঘুমন্ত আয়ানকে লুকিয়ে রাধারাণীর কৃষ্ণ অভিসারে যাওয়া ও আয়ানের কাছে ধরা পড়ার দৃশ্যের আড়ালে বাঁশির ধ্বনি হয়েছে।

ঐ দলের ষষ্ঠ ছকে যখন ভজহরি জানায় যে পাপিয়ার প্রেমিক ছয় মাস আগে গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা গেছে তখন আবহে সানাই এর ধ্বনি শোনা যায়।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার প্রথম ছকের প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়ার আগে ফাঁকা মঞ্চে বাঁশি ও মাদল এর ব্যবহার হয়েছে।

আবার ঐ ছকেই যখন ঋষিবর শিবের আরাধনা করে গান করে—

"ওঁ মহেশ্বরং চারুচন্দ্র গিরি
ওঁ ভৃগুবর পরশুরাম"

তখন গানের সাথে ঢাকের বাদ্য ব্যবহার হয়েছে।

এরপর শিবের আবির্ভাব ঘটলে আবহে—"ওঁ শিবায় শিবায় নমঃ নমঃ..." ধ্বনিত হওয়ার সাথে শঙ্খধ্বনির ব্যবহার হয়েছে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে পাল অভিনয় সূচনার পূর্বে ঘণ্টা বাজানোর মাঝে যে কনসার্ট বাজানো হয় তাতে অক্টোপ্যাড ও তবলার ব্যবহার হয়েছে বোঝা যায়।

ঐ দলের দ্বিতীয় ছকে কৃষ্ণের সংলাপের সময় বাঁশি বাজানো হয়েছে। এরপর যখন কৃষ্ণ গান গায় তার গানের সাথে ঢোলক এর আওয়াজ পাওয়া যায়।

আবার শ্রীকৃষ্ণ তার মাথার সাদা ধুতি সরিয়ে জৈমুনি ও রাধিকাকে নিজরূপ দর্শন করায়। সেই দৃশ্যের আড়াল থেকে শঙ্খধ্বনি হয় এবং এই ছকের একেবারে শেষ দৃশ্যে রাধা, কৃষ্ণ ও জৈমুনির ফিনিশিং গানের সাথে তবলার বাদ্য শোনা যায়।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের দ্বিতীয় ছকে 'করাচ গানে'র বিভিন্ন স্তবকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—প্রথমাংশে তবলার ব্যবহার। তার পরের অংশে—ঢোলক ও ঝুনঝুনির ব্যবহার। শেষ অংশে অক্টোপ্যাড ও অর্গানের ব্যবহার হয়েছে।

দ্বিতীয় ছকে রাধা মঞ্চে প্রবেশ করে সিঁড়ি থেকে নেমে এসে মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গায়। পুরো সময়টাতেই আড়ালে বাদ্য যন্ত্ররূপে ঝুনঝুনি, তবলা, অর্গ্যান ও তারের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে বোঝা যায়।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকতে প্রথমে গিটারের ধ্বনি শোনা যায়। তারপর মৌখিক গান হয়—"নীল নীল অম্বর পর..."।

চতুর্থ ছক এ একেবারে পালার শুরুর দৃশ্যে গানের সাথে ঝুনঝুনি, ঢোল ও সানাই এর সমবেত বাদ্য শোনা যায়।

পঞ্চম ছকে খনা ও তার স্বামী যখন নাচতে নাচতে গান গায়—

"তোমার হৃদ মাঝারে রাখব
ছেড়ে দোব না......"

তখন গানের সাথে খোল, করতাল সমবেত ভাবে ধ্বনিত হয়।

ষষ্ঠ ছকে ছোট ভাই যখন গান গায়—

"আমি তিন দিনেতে করব ছ্যাদ্দ
মালসার ভাত খাব না..."

গানের সুরে কীর্ত্তনের অনুকরণ এবং তার সাথে খোল, করতাল কীর্ত্তনের অনুকরণে ধ্বনিত হয়।

যন্ত্রানুষঙ্গ

গাজনপালা অভিনয়ের মধ্যে নানান ভাবে নানা রকম যন্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহার হয়। সেগুলি হল—মাইক্রোফোন, আবহ তৈরি করার জন্য শব্দ নিয়ন্ত্রক নানান যন্ত্র, এছাড়া নানান যন্ত্রানুষঙ্গ মূলক দ্রব্যকে অভিনয়ের সময় অভিনেতারা ব্যবহার করেন। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত উক্ত গাজনদলগুলির পরিবেশনাকালীন ব্যবহৃত যন্ত্রানুষঙ্গগুলির উল্লেখ করে উদাহরণস্বরূপ তথ্য দেওয়া হল।

শব্দগ্রাহকযন্ত্রের ব্যবহার

গ্রামের নাটমন্দির, মন্দির প্রাঙ্গণ বা খোলা জায়গায় এখনও যখন গাজনপালা অনুষ্ঠান হয় শব্দগ্রাহকযন্ত্রের কোনও রকম ব্যবস্থা থাকে না কিন্তু পেশাদারি দলগুলি পরিবেশনের সময় হাজার

হাজার দর্শকের কাছে তাদের কণ্ঠস্বর পৌছনো অসম্ভব তাই প্রয়োজন হয় শব্দগ্রাহকযন্ত্রের। দূরের মানুষের কাছে গাজন অনুষ্ঠানের বার্তা যাতে পৌঁছে যায় সেজন্য মাইকের ব্যবস্থা থাকে আর সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কর্মী থাকে দলে। মঞ্চের উপরে বিভিন্ন উচ্চতায় নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে শব্দগ্রাহকযন্ত্রগুলো ঝোলানো থাকে আর মঞ্চের পাশ থেকে কর্মী সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে দড়ির মাধ্যমে। মঞ্চে যদি কোনো জায়গায় শব্দগ্রাহক যন্ত্র না থাকে অভিনয় চলাকালীন অভিনেতাদের সংলাপ দর্শকদের শ্রুতিগোচর হতে সমস্যা হয়। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর পঞ্চম ছকতে ছোট ভাই বৌদি আসার খবর দাদাকে দিয়ে পালিয়ে যায় আবার ফিরে এসে দাদাকে কিছু বলে কিন্তু মঞ্চে ঐ স্থানে শব্দগ্রাহকযন্ত্রের অভাবে সংলাপ দর্শকদের শ্রুতিগোচরে বাধা পায়।

শব্দগ্রাহকযন্ত্র বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে অভিনয় চলাকালীন অভিনেতাদের সদা এ বিষয়ে সচেতন থাকতে দেখা যায়। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর প্রথম ছকে হত্যার দৃশ্যে যখন দীপকে হত্যা করা হয় সে চিৎকার করে ওঠে চিৎকার করার সময় শব্দগ্রাহকযন্ত্রের কাছে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে। পরবর্তী দৃশ্যে নায়িকা রাজকন্যা আশার কান্না এবং গানের সময় সে একবার সিঁড়িতে মৃতের কাছে বসে পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে ওঠে এবং শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সামনে অবস্থান করে কান্নার অভিনয় করে, গান গায়। ঐ ছকেই নায়িকার নৃত্য পরিবেশনের দৃশ্যে নায়ক গান করে তাই নায়ক শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সামনেই অবস্থান করে। এরপর ভয় পেয়ে নায়ক নায়িকা মিলন দৃশ্য থেকে পরস্পর দূরে সরে যায় কিন্তু দুজনেই শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সামনে অবস্থান নেয়। আবার রাধারাণী গান গাওয়ার সময় মঞ্চের মাঝে সিঁড়িতে শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সামনে সচেতন ভাবে অবস্থান করে। চতুর্থ ছকে ছেলে বাবার কোলে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে সংলাপ বলার সময়েও শব্দগ্রাহকযন্ত্রের দিকেই বেশি মনোযোগ রাখার চেষ্টা করে বোঝা যায়। এই ছকেই বৃদ্ধ বাবা চরিত্রের অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করার সময় হাতে শব্দগ্রাহক যন্ত্র নিয়ে প্রবেশ করেন। তারপর রেখে দেওয়ার পর সহকর্মী এসে সেটি সরিয়ে নিয়ে যান। পঞ্চম ছকে গুয়ারকেল ঘুমিয়ে পড়লে বড় ভাই তাকে ডেকে তোলে। ডাকার সময় তাকে নীচু হয়ে ডাকতে হয়। সেখানে তার মুখের কাছে কোনো শব্দগ্রাহকযন্ত্র না থাকায় শিল্পী এতই উচ্চে কণ্ঠস্বর তোলেন এবং অভিনয়ের সাথে সাথে শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি ব্যবহারের প্রবল চেষ্টা করেন যে, তার সংলাপ বলার সাথে সাথে শব্দগ্রাহকযন্ত্রের প্রতি সচেতনতা প্রকাশ পায়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর দ্বিতীয় ছকে রাধারাণী মঞ্চে প্রবেশ করে সিঁড়ির যেখানে শব্দগ্রাহকযন্ত্রের অবস্থান সেখানে দাঁড়িয়ে গান করেন।

প্রয়োজনে কখনো শব্দগ্রাহক যন্ত্র নীচে নামাতে হয়। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকে বাবা চরিত্রাভিনেতা মঞ্চের মাঝে সিঁড়িতে বসে থাকেন, শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি অনেকটা উঁচুতে থাকায় সংলাপ দর্শকদের শ্রুতিগোচর হয় না তখন উপর থেকে ঝোলানো শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি তার মুখের সামনে নামিয়ে আনা হয় এবং তারপর অভিনেতা সংলাপ শুরু করেন। ঐ ছকেই বাবা চরিত্রাভিনেতা মঞ্চের মাঝের উঁচু সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে অনেক উচ্চতায় থাকা শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি তার

মুখের কাছে নেমে আসে। পঞ্চম ছকে দেখা যায় অভিনেতা শুয়ে থাকার কারণে একটি মাইক্রোফোনকে অনেক নীচে নামিয়ে আনা হয়। সপ্তম ছকে জামাই ও শ্বশুর চরিত্রাভিনেতা দুজনেই মঞ্চের মাঝের সিঁড়ির উপর গিয়ে বসেন। উপরে থাকা শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি তখন নীচে নামিয়ে আনা হয়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে রাজা খেতে বসেছে, রাণী পাশে বসে আছে, এই দৃশ্যে শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি নীচে তাদের কাছে নামিয়ে আনা হয়। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার প্রথম ছকে রাজকুমার পিছিয়ে গিয়ে রানীর কাছে দাঁড়ায় এবং উপর থেকে শব্দগ্রাহক যন্ত্র নীচে নামিয়ে আনা হয় আবার যখন রাজকুমার ও রানীমা পরস্পরকে ধরে সিঁড়িতে বসে, তখনও শব্দগ্রাহকযন্ত্র নীচে নামিয়ে আনা হয়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থের দ্বিতীয় ছকে শব্দগ্রাহকযন্ত্র নীচে নামিয়ে আনা হয়।

প্রয়োজনে কখনো শব্দগ্রাহকযন্ত্র উপরে ওঠাতে হয়। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকে ছেলে মঞ্চ থেকে চলে যাওয়ার পর বাবা চরিত্রাভিনেতা বসেছিলেন উঠে তিনি দাঁড়ান তখন নীচের ঝুলন্ত শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি ও উপরে উঠিয়ে আনা হয়। ঐ দলের সপ্তম ছকে দুজনে বসে থাকার সময় শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি নীচে ছিল, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে আসে তখন শব্দগ্রাহকযন্ত্রটিও ওপরে উঠিয়ে নেওয়া হয়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে রানী কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ায়, তার সাথে সাথে শব্দগ্রাহকযন্ত্রটিকেও ওপরে ওঠানো হয়। ঐ দলের ষষ্ঠ ছকে একা মঞ্চে পাপিয়া সংলাপ বলার মাঝে মঞ্চের উপরে সিঁড়ির নীচের ধাপে গিয়ে বসে। শব্দগ্রাহকযন্ত্র সামান্য উঠিয়ে তার মুখের কাছে স্থির করা হয়।

পালা চলাকালীন শব্দগ্রাহকযন্ত্র উপরে ও নীচে ওঠা-নামা করানোর সময় সমস্যাও হতে পারে। যেমন— শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে লিচু ও বাখারি বসার সময় শব্দগ্রাহকযন্ত্র ওপর থেকে নামিয়ে আনা হয় এবং বাখারির মাথায় ধাক্কা লেগে মাথায় লাগিয়ে রাখা সানগ্লাসটি পড়ে যায়। এরপর শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি আবার উপরে ওঠানো হয়। একটু পরে আবার নামিয়ে আনা হয় এবার বাখারির মাথা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে স্থির করা হয়।

অভিনেতা অভিনয় চলাকালীন নিজেই অনেক সময় শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি ঠিক করে নেন। যেমন— নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকে আয়ান চরিত্রাভিনেতা দুলতে থাকা শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি অভিনয় চলাকালীন অত্যন্ত সাবলীল ভাবে ঠিক করে নেন। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকে বাবা চরিত্রটির স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি সুবিধা যোগ্য না হওয়ায় শিল্পী অভিনয় করতে করতে নিজেই হাত দিয়ে নামিয়ে ঠিক করে নেন। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে রাজা সংলাপ বলার সময় শব্দগ্রাহকযন্ত্রটি বেশ উঁচুতে থাকায় নিজেই হাত দিয়ে টেনে নামিয়ে নেন।

অনেক সময় অভিনেতা একই শব্দগ্রাহকযন্ত্রের ব্যবহার দীর্ঘ সময় ধরে করেন। যেমন— শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে রাজকুমার মোগলিকে ধর্ষণ করার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ মঞ্চটিকে ব্যবহার করেছেন এবং সেই সাথে একটি শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে যে অভিনয় করেছেন তা

অনবদ্য। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর দ্বিতীয় ছকে শব্দগ্রাহকযন্ত্রের পরিবর্তন না করে একই জায়গায় একই মাইক্রোফোনে গান গায়। প্রথমে রাধা মঞ্চে প্রবেশ করে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গান করে তারপর আবহের সময় নীচে নেমে আসে এরপর নীচে দাঁড়িয়ে সেখানকার শব্দগ্রাহকযন্ত্রে গান গায়।

পাশাপাশি আগুপিছু অনেক শব্দগ্রাহকযন্ত্র থাকলে শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে শব্দগ্রাহকযন্ত্র বদল করে করে গান করেন বা সংলাপ বলেন। এতে দৃশ্যটিও সুন্দর হয়ে ওঠে। যেমন— নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর তৃতীয় ছকে এই অংশে নায়ক ফোকে একা বিভিন্ন শব্দগ্রাহক যন্ত্র বদলে বদলে সংলাপ বলে।

দুজন পরস্পর সংলাপ বলার সময় দুটি মাইক্রোফোনে অবস্থান করেন। যেমন— নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে নায়ক নায়িকা পরস্পর কথোপকথনের সময় শব্দগ্রাহকযন্ত্রের অবস্থানের কারণে মঞ্চের দুপাশে দুজন দাঁড়িয়ে সংলাপ বলে। ঐ দলের চতুর্থ ছকে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে ছেলে ও বউ টানতে টানতে মঞ্চে প্রবেশ করে তাকে ফেলে দিয়ে দুজনে সংলাপ বলার আগে দুটি শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময় অনুষ্ঠান চলাকালীন মাইক্রোফোনে যান্ত্রিক ক্রটি ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। অভিনেতারা নিজেরাই কখনো তার সমাধান করেন আবার কখনো অভিনয় থামিয়ে রেখে কর্মী দ্বারা তার সমাধান করা হয়। যেমন— শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে রাজপুত্র সংলাপ বলার সময় শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সমস্যা বুঝতে পেরে নিজেই অন্য শব্দগ্রাহকযন্ত্রের কাছে সরে যান। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর তৃতীয় ছকে শব্দগ্রাহকযন্ত্র অকার্যকর থাকায় নায়ক ফোকে মঞ্চে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যায় আবার চড়া আবহ শুরু হয়, মঞ্চ অন্ধকারই থাকে এবার আর ফোকে মঞ্চে প্রবেশ করে না। মঞ্চে উপস্থিত থাকা অবস্থাতেই কেন্দ্রীভূত আলো পড়ার পর গান ও নাচ শুরু করে সে। তখন উপস্থিত কর্মী সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন এরপর সহকর্মী এসে শব্দগ্রাহক যন্ত্র বদলে দিয়ে যায়। ঐ দলের চতুর্থ ছকে পালা চলাকালীন শব্দগ্রাহকযন্ত্রের সমস্যা হওয়ায় অভিনয় থামিয়ে রেখে অন্ধকার মঞ্চে কর্মী চেয়ার নিয়ে শব্দগ্রাহক যন্ত্র ঠিক করে।

শব্দগ্রাহকযন্ত্রের কারনে সমস্যাও হয় কখনো কখনো। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকে শব্দগ্রাহক যন্ত্র পিছনেও রয়েছে কিন্তু সঞ্জয় মঞ্চের পিছন দিকে তাকিয়ে হরিকাকার সাথে সংলাপ বলে ফলে তার মুখের অভিব্যক্তি দর্শকদের চোখে আড়াল হয়ে যায়।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে মাইক্রোফোনগুলি কর্মী আগে খুলে নেন। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর অষ্টম ছকে পালা শেষ হওয়ার পর ঘোষণা চলতে থাকে। ততক্ষণে শব্দগ্রাহকযন্ত্র খোলা শুরু হয়ে যায়।

শব্দগ্রাহকযন্ত্র উপরে ও নীচে ওঠা-নামা করানোর সময় সমস্যা হতে পারে। অনেক সময় অনুষ্ঠান চলাকালীন শব্দগ্রাহকযন্ত্রে ক্রটি হতেও পারে তখন উপস্থিত কর্মী সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান

করার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি আগুপিছু অনেক শব্দগ্রাহক যন্ত্র থাকলে শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে শব্দগ্রাহকযন্ত্র বদল করে করে গান করেন বা সংলাপ বলেন। এতে দৃশ্যটিও সুন্দর হয়ে ওঠে।

আবহ

নাটমন্দিরে বা খোলা প্রাঙ্গণে গাজনপালা অভিনয়ের সময় পূর্বে হোক বা বর্তমানে আবহ বিষয়টি সেখানে বিশেষভাবে প্রয়োগ ও প্রকট না হলেও বর্তমান পেশাদারি দলগুলি ব্যবসায়িক মানসিকতা ও আধুনিকতার কারণে প্রযুক্তিকে অবলম্বন করে পরিবেশনাকে যতটা সম্ভব মনোগ্রাহী করে তুলতে সচেষ্ট। তাই মঞ্চে দৃশ্যের সাথে বা বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নানা যন্ত্রানুষঙ্গের মাধ্যমে আবহের প্রয়োগ ঘটায় যার ফলস্বরূপ দৃশ্যটি দর্শক মনে অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে ওঠে। উল্লিখিত দলগুলির পরিবেশনকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হল।

অভিনয় চলাকালীন কোনো অভিনেতা মঞ্চে অনুপস্থিত থাকলেও আবহের মাধ্যমে তার উপস্থিতিকে প্রকাশ করা হয়। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর প্রথম ছকে নায়কের মা মঞ্চে অনুপস্থিত থাকলেও মঞ্চে কেবলমাত্র তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ঐ দলের ষষ্ঠ ছকে মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রটি মোবাইলে কথা বলে। ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তি মঞ্চে অনুপস্থিত। আবহে কেবলমাত্র তার কণ্ঠস্বর দর্শকরা শুনতে পায়। অষ্টম ছকে মঞ্চে তিশা অনুপস্থিত অথচ আড়াল থেকে “ভাই-ই-ই” বলে সে ডাকে। ফাঁকা মঞ্চে কেবলমাত্র আবহে তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে ভিখারি—“বাবু...” বলে চিৎকার করে। মঞ্চে সে অনুপস্থিত থাকলেও আবহে কেবলমাত্র তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। ঐ দলের পঞ্চম ছকে দরজার ওপারে অর্থাৎ ঘরের বাইরে কেউ এসেছে বোঝাতে মঞ্চের পিছন থেকে আবহে ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের ব্যবহার হয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকের দৃশ্যে জনগণের কণ্ঠস্বর ব্যবহার হয়েছে মঞ্চের পিছন থেকে। ঐ দলের ঐ ছকেই মঞ্চে সামু অনুপস্থিত। মঞ্চের পিছন থেকে তার কণ্ঠস্বর মাইকে শোনা গেছে। তৃতীয় ছকে মঞ্চে অভিনেতা অনুপস্থিত। এই দৃশ্যে মঞ্চের পিছন থেকে শিল্পী গান গেয়েছে এবং ফাঁকা মঞ্চে কেবলমাত্র আবহে তার গান শোনা গেছে। এরপর মঞ্চের পিছন থেকে নায়িকা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা কেবলমাত্র আবহে শোনা গেছে। পঞ্চম ছকে মঞ্চের পিছন থেকে একের পর এক আবহে শোনা যায় (ব্যঙ্গ করে)—“ছাগল বেপারী!” ,“লজেন বেপারী!”, “কে?”- এই সমস্ত বাক্যগুলি। এরপর ফোনের ওপারের ব্যক্তি মঞ্চের পিছন থেকে কথা বলে। মঞ্চে আবহের মাধ্যমে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় কিন্তু তাকে দেখা যায় না। আবার ঐ ছকেই লিচুদির সাথে ফোনের ওপারের ব্যক্তি মঞ্চের পিছন থেকে কথা বলে। এই দৃশ্যে প্রথমে আবহে তার কণ্ঠস্বর ব্যবহার হয়েছে তার কিছু পরে সে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে। ষষ্ঠ ছকে ফোন বাজার দৃশ্যে ফোনের শব্দ মঞ্চে আবহে শোনা গেছে। নিউ দিগ্বিজয়ী

বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে ভজহরির মোবাইলে ফোন এসেছে এবং তার মোবাইল আসার শব্দ ব্যবহার হয়েছে আবহে।

কোনো বিষয়ের উল্লেখ করার সময় সেই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আবহ তৈরি করা হয়। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে রাণী শঙ্খমালা ও পুত্র প্রত্যূষের যুদ্ধের সময় আবহে রণবাদ্যের ব্যবহার হয়েছে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর ষষ্ঠ ছকে নায়ক যখন পিয়াকে বিয়ে করতে রাজি হওয়ার দৃশ্যে আবহে সানাই এর ব্যবহার হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে বোঝানোর দৃশ্যে আবহে বাজ পড়ার মতো শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

আবহ সবসময় পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সাঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকে ধনা শাবল দিয়ে তার বাবার মাথায় আঘাত করার দৃশ্যে আবহের সহযোগিতায় পরিস্থিতির চাঞ্চল্যকরতা তৈরি হয়েছে। ঐ দলের ষষ্ঠ ছকে ভোর হওয়া ও ঘুম ভাঙার দৃশ্যে আবহে পাখির কিচিমিচি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। সপ্তম ছকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার দৃশ্যের উত্তেজনা বোঝাতে আবহে দ্রুত বাদ্যের ব্যবহার হয়েছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে ক্ষুধার্ত ভিখারি রাজার খাবার কেড়ে খেতে যায়। সেই দৃশ্যের উত্তেজনা বোঝাতে আবহে চড়া সুরে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। ঐ দলের পঞ্চম ছকে পাপিয়ার বাবা যখন তাকে বকাবকি করেছে তখন ক্রমশ তার কণ্ঠস্বরের উত্তেজিত ভাব এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবহেও উত্তেজিত ভাব আনা হয়েছে। প্রথম ছকে রাজকুমারী প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করে। সেই দৃশ্যে আবহে বাদ্যযন্ত্রে পাখির কিচিমিচি শব্দ ব্যবহার হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে ঠিক একই রকমভাবে তাদের মধ্যেকার ঝগড়ার সময়েও আবহে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার পরিস্থিতির উত্তেজনা প্রকাশে সাহায্য করেছে। ঐ দলের ঐ ছকে ছোট ভাই বাবার সোনার কলম চুরি করতে এসে বড় বৌদির কাছে ধরা পড়ে যায়। বৌদি 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করার সাথে সাথে আবহে যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে পরিস্থিতির উত্তেজক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে।

কখনো পরিস্থিতিকে ব্যক্ত করার জন্য আবহে কোনো শব্দেরই প্রয়োগ না ঘটিয়ে কেবলামাত্র নিস্তব্ধ রাখা হয়। তখন সেই নীরবতাই যেন অনেক কিছু বলে দেয়। আবার কখনো স্বাভাবিকের থেকে বেশী চড়া সুরে আবহের প্রয়োগ ঘটানো হয়। যা স্বাভাবিকের থেকে পরিস্থিতির অন্য মাত্রাকে ব্যক্ত করে। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে শুভঙ্করের মৃত্যুর সাথে সাথে আবহে বাদ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। নিস্তব্ধ মঞ্চে শুভঙ্করের মাথা কোলে নিয়ে সরমা একা বসে থাকে। শোকস্তব্ধ সরমার এই দৃশ্যটির সাথে নিস্তব্ধতা এখানে পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হয়েছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে বৃদ্ধ চলে যেতে চায়। তার সব সম্পত্তি ছেলে মেয়েকেই দিয়ে গেছে জানায়। এই সময় তার দীর্ঘ সংলাপের সাথে আবহে কোনো যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার হয়নি। দৃশ্যটির বেদনাবহতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিস্তব্ধতাই এখানে ব্যবহার হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে হরিকাকা সুবলের বোনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর "মারা গেছে" বলে চিৎকার

করে ওঠে। সাথে সাথে আবহে যন্ত্রসঙ্গীত থেমে যায়। মঞ্চে এই নিস্তব্ধতা বিরহকে দর্শক মনে বেদনার অনুভূতি প্রবলভাবে ফুটিয়ে তুলতে সহযোগিতা করে। ঐ দলের নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে খলনায়ক সংলাপের মাধ্যমে পালার নাম উচ্চারণ করে ঠিক সেই সময় অত্যন্ত চড়া শব্দে চিৎকারের মতন আবহের ব্যবহার হয়েছে। ঐ দলের ঐ ছকে চন্দ্রশেখরকে খলনায়করূপে দর্শকমনে স্থাপন করার এবং ভয় ভাব সৃষ্টি করার জন্য তার সংলাপ বলার ধরন, কণ্ঠস্বর ও আলোর সাথে সাথে আবহেও যন্ত্রসঙ্গীতের যে চড়া সুর ব্যবহার হয়েছে তা বিশেষ লক্ষণীয়। পঞ্চম ছকের শুরুতেই 'মুখ গান' এবং তার সাথে চড়া সুরে বাদ্যের আবহ ব্যবহার হয়েছে। ঐ ছকেই ভজহরির সংলাপে ক্রমশ উত্তেজিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ক্রমশ চড়া হয়ে উঠেছে আবহ। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে শুভঙ্করের মৃত্যুর পর সরমার চিৎকার ও কান্না শোনা যায়। তার সাথে আবার আবহে বাদ্য শুরু হয় এবং ক্রমশ সেটা চড়া হতে থাকে। এই পুরো দৃশ্যটিতে আবহ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অভিনয়ের মধ্যে চরিত্রের কোনো কাজ করার সময় সেই কাজ করার ছন্দের সাথে ছন্দ মিলিয়ে যন্ত্রানুসঙ্গীতে আবহ প্রয়োগ করে দৃশ্যটিকে আরও মনোগ্রাহী করে তোলা হয় দর্শকদের কাছে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর পঞ্চম ছকে ছোট দেওর প্রস্থানের পূর্বে বৌদিকে কিছু বলতে গেলে বৌদি তাকে চপেটাঘাত করে। সেই আঘাতের সাথে সাথে চড়ের শব্দ প্রয়োগ করা হয় আবহে। ঐ দলের সপ্তম ছকে রোগী ডাক্তারকে আঘাত করে ধাক্কা দেওয়া এবং আলোর তালে তালে আবহে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার হয়েছে। অষ্টম ছকে স্বামী তিশাকে মারতে থাকে চাবুক দিয়ে। মারার সাথে সাথে এই দৃশ্যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করে দৃশ্যটিকে আরও আকর্ষক করে তোলা হয়েছে। প্রথম ছকে মঞ্চে একতারা হাতে বাউল প্রবেশ করে কিন্তু বাদ্যযন্ত্রে কোথাও একতারার বাদ্য শুনতে পাওয়া যায় না। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে রাজা চন্দ্রশেখরকে চিনতে পেরে আলিঙ্গন করে। আলিঙ্গন করার ছন্দে ছন্দে আবহের ব্যবহার হয়েছে। ঐ দলের চতুর্থ ছকে মেজো ছেলে কামড়াবে বলায় বড় বউ লাফাতে থাকে তার লাফানোর সাথে ছন্দ মিলিয়ে আবহে যন্ত্রসঙ্গীত ব্যবহার হয়েছে আবার ভয়ে বড়দাদার পালানোর সাথে সাথেও ছন্দ মিলিয়ে আবহের ব্যবহার হয়েছে। পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ মঞ্চ থেকে প্রস্থান করার সময় বার বার পিছনে তাকিয়ে লিচুকে দেখে। তার তাকানোর তালে তালে আবহে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার হয়েছে। ঐ ছকেই লিচুর স্বামী যখন দরজা ধাক্কা দেয় এবং লিচু যখন দরজা খোলে তখন আবহে দরজা ধাক্কা দেওয়া ও খোলার শব্দ ব্যবহার হয়েছে। সপ্তম ছকে লিলির স্বামী তাকে চড় মারে। চড় মারার সাথে যন্ত্রে চড়ের শব্দ ব্যবহার হয়েছে। দৃশ্যে দুটির সময় মিল খুবই সুন্দর ভাবে ঘটেছে। তৃতীয় ছকে নায়ক সংলাপ বলে টেনে টেনে দীর্ঘ ভাবে এবং তার তালে তালে আবহে বাদ্যেরও টেনে টেনেই দীর্ঘভাবে ব্যবহার হয়েছে। চতুর্থ ছকে বাবা মেজো ছেলের গালে সজোরে চড় মারে। শব্দগ্রাহকযন্ত্রে সেই চড়ের শব্দ শোনা যায়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে লোনের অফিসার খনার কোল থেকে তার বাচ্চাকে কেড়ে নেওয়ার সময় কাজটির তালে

তালে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার হয়েছে। ঐ দলের সপ্তম ছকে গান চলাকালীন যে জায়গা দুবার থেমে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে আলো স্থির হয় ও যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ হয়ে যায় এবং পরে আবার শুরু হয়। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে প্রায় শেষ অংশে নায়ক ডেঙ্গু হাতে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্চ নিয়ে গিটারের মতো বাজায়। তখন আবহেও গিটার বেজেছে।

কেবলমাত্র কাজের সাথে নয়। মঞ্চে কোনো চরিত্রের হাঁটা চলা করার সময় তার পদক্ষেপের সাথে ছন্দ মিলিয়ে আবহে যন্ত্রানুসঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটিয়ে দর্শকমনে সেটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে চন্দ্রশেখরের অতৃপ্ত আত্মারূপী খলনায়ক সিঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসে। তার নামার পদক্ষেপের সাথে সাথে ছন্দ মিলিয়ে আবহের ব্যবহার হয়েছে। ঐ দলের পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ সিঁড়ির উপর থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে। তার পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আবহে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে দৃশ্যটিতে সুবল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে তার নেমে আসার সাথে ছন্দ মিলিয়ে আবহে যন্ত্রানুসঙ্গীতের ও কণ্ঠস্বরের ধ্বনি ব্যবহার হয়েছে।

কখনো কোনো পরিস্থিতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে দর্শকমনে উপস্থাপন করার জন্য সংলাপের প্রতিধ্বনি ঘটানো হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর প্রথম ছকটির প্রায় শেষ অংশে সংলাপের মাধ্যমে পালার নাম সজোরে বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি হতে থাকে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে ফোনে কথা বলার সময় শব্দের গমগমে ভাব এবং আবহে প্রতিধ্বনি হয়েছে। ঐ দলের চতুর্থ ছকে মঞ্চে ঘোষণা করা হয় প্রথম পুরস্কার প্রাপকের নাম। এই দৃশ্যে মঞ্চে কোনো অভিনেতা নেই কেবলমাত্র মাইকে ঘোষণা দ্বারা বিষয়টি মঞ্চস্থ করা হয়েছে। ষষ্ঠ ছকে ভজহরি চাকরের মঞ্চে প্রবেশ করার সময় আবহে 'ভজগৌরাঙ্গ লহগৌরাঙ্গ' গানের সুর বেজেছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে নিস্তব্ধ মঞ্চে সরমা মৃত শুভঙ্করকে নাম ধরে ডাকে। তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়।

ঘোষণার সময় আবহের প্রয়োগ। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ঘোষণার সময় বাদ্য একেবারেই নেই। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে পালার নাম ঘোষণার সময় অত্যন্ত চড়া সুরে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। এছাড়াও আবহকে আরও নানা ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ দলের ঐ ছকেই সরমা আর্তনাদ করার সময় পিছন দিক থেকে ঘুরে এসে পাশের মাইক্রোফোনে গিয়ে দাঁড়ায় এমন ভাবে যে তার কণ্ঠস্বরের আওয়াজ যেন দূর থেকে ভেসে এলো বলে মনে হয়। এরপর কালো ছায়া ও বয়স্ক সরমা পরস্পরের কাছাকাছি আসা ও দূরে যাওয়া বোঝাতে মৌখিক অভিব্যক্তির সাথে সাথে আলো ও আবহে যন্ত্রানুসঙ্গীতের ব্যবহারও অপরিহার্যরূপে কার্যকরী হয়েছে দৃশ্যটিতে। আবার সরমার চিৎকারের আবহের মাধ্যমে দৃশ্যটি যেন অতীত স্মৃতি থেকে বর্তমানের বাস্তবে ফিরে আসে।

ভিন্ন দলের পরিবেশনের সময় একই পরিস্থিতিতে একই ধরনের আবহের ব্যবহারে সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে বৃদ্ধ তার স্ত্রীর কানে কানে কথা বলে। সেই সময় আবহে যে ধরনের যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার হয়েছে তৃতীয় ছকে দেওর বৌদির কানে কানে কথা বলার সময় একই বাদ্যের আবহের ব্যবহার হয়েছে। ঐ দলের তৃতীয় ছকে বৌদি দেওরের কানে কানে জানায় ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করবে। সেই সময় আবহে নানারকম মৌখিক শব্দ করা হয়েছে। অন্য দলে এরকম দৃশ্যেও এই শব্দেরই ব্যবহার হতে দেখা যায়। পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ ও লিচুর স্বামী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। সেই সাথে আবহে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার হয়েছে। অন্য দলে এরকম দৃশ্যেও এই শব্দেরই ব্যবহার হতে দেখা যায়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে কালো ছায়ার সংলাপের মাঝে মাঝে তাকে ভয়ঙ্কর চরিত্ররূপে দর্শক মনে উপস্থাপন করার জন্য অত্যন্ত চড়া ও কর্কশ যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার হয়েছে। অন্যান্য দলের প্রথম ছকের শয়তান ও খলনায়ক চরিত্রের পশ্চাতে একই আবহের প্রয়োগ হতে দেখা যায়।

দ্রব্য

পেশাদারি গাজনপালাগুলির পালা অভিনয়ের সময় কখনো কখনো বিশেষ কোন যন্ত্রানুষঙ্গকে তারা অবলম্বন করেন। সেই সব যন্ত্রানুষঙ্গ সেই মুহূর্তে তাদের অভিনয়ের বিশেষ অঙ্গ হয়ে ওঠে।

প্রথম ছকে রাজা, রাণী, দেবতা থাকে তাই ত্রিশূল, তরবারি, প্রভৃতির ব্যবহার হয়। যেমন— শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে রাজকুমার মঞ্চে প্রবেশ করে কোমরে তলোয়ার নিয়ে। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে পুত্র নিবিড়কে হত্যা করার পর তার হত্যাকারী চন্দ্রশেখরের অতৃপ্ত আত্মাকে বধ করার জন্যে রাজা তরবারি ও চাবুক নিয়ে আক্রমণ করে। ঐ দলের ঐ ছকেই মহাদেব আবির্ভূত হয়ে রাণীকে ত্রিশূল প্রদান করে এবং সেই ত্রিশূল দ্বারাই চন্দ্রশেখরের প্রেতাত্মাকে রাণী বধ করে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের দ্বিতীয় ছকে ঘুমন্ত শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কাকাসুর তরবারি নিয়ে আঘাত করতে যায়। ঐ ছকেই রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক তাই বাঁশি, রেকাব, ধূপ, প্রদীপ প্রভৃতি থাকে। আদিশিবশক্তি গাজনতীর্থ দ্বিতীয় ছকে কৃষ্ণের হাতে বাঁশি ধরা থাকলেও সেটি বাজানো হয় না। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকে কৃষ্ণ হাতে বাঁশি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের দ্বিতীয় ছকে কৃষ্ণ মঞ্চে প্রবেশ করে হাতে বাঁশি নিয়ে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর দ্বিতীয় ছকের প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণের হাতে বাঁশি রয়েছে।

বাকিছকগুলি যেহেতু সমকালীন বিষয়ক তাই ঘটনা ও বিষয় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবহার হয়। ছোট শিশুকে বোঝাতে পুতুলের, রক্তের প্যাকেট বোঝাতে লাল প্যাকেট, ক্রিম বোঝাতে শিশি প্রভৃতি নানান দ্রব্যের ব্যবহার হয়। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের দ্বিতীয় ছকে পালার শুরুতে যশোদা কোলে শিশুপুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে প্রবেশ করে। এখানে শিশুর বদলে তোয়ালে জড়ানো

পুতুল ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর পঞ্চম ছকে পুরো পালাটিতেই খনা ও তার স্বামীর কোলে, কোমরে ও কাঁধে পুতুল বাঁধা থাকে তাদের সন্তানস্বরূপ এই পুতুলের ব্যবহার হয়েছে। আদিশিবশক্তি গাজনতীর্থ এর ষষ্ঠ ছকের প্রায় শেষ দৃশ্যে প্রিয়া নিজেকে 'গোবরে পদ্মফুল' বোঝানোর জন্যে সংকেতরূপে একটি ঘটে গোবরসহ পদ্মফুল এনে তার প্রেমিকের হাতে দেয়। আদিশিবশক্তি গাজনতীর্থ এর সপ্তম ছকে ডাক্তার গলায় স্টেথো নিয়ে ইঞ্জেকশান দেওয়ার জন্য একটি এত বিশাল মাপের ইঞ্জেকশান বার করে যা দেখে শাশুড়ি চরিত্রটি পালিয়ে যায়। ঐ ছকেই স্বামী চরিত্রটি বিষ খাওয়ার পর ডাক্তার রোগীর গালে জল দেওয়ার জন্য একটি বড় পাইপ নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে বড় ছেলে স্ত্রীর কাছে আদেশ পালনের জন্যে উপস্থিত হয় হাতে খেলনা তলোয়ার নিয়ে। ব্যঙ্গাত্মক সংকেত এটি। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ রাতের অন্ধকারে লিচুর ঘরে আসে তাকে খুশি করার জন্যে সঙ্গে 'ফেয়ার লাবলী' আনে। সেটি বোঝাতে মঞ্চে একটি বোতলের ব্যবহার হয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে চেটো ফ্যান্সি রক্তের থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করেছে বোঝাতে পকেট থেকে রক্তের শিশি বের করে। লাল রঙের দ্রব্যযুক্ত একটি শিশি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকে থলির ভেতর থেকে মালা বার করার সময় রক্তের প্যাকেট বের হয় মালার বদলে। লাল রঙের দ্রব্যের একটি প্যাকেট ব্যবহার করা হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর ষষ্ঠ ছকে শব ছাই বোঝাতে সাদা পুঁটলির ব্যবহার হয়েছে। ঐ ছকেই বাবা মারা গেছে তাই গুরুদশা বোঝাতে বড় ভাইয়ের হাতে কঞ্চি। প্রতিবন্ধী বোঝাতে স্ক্রাচ এর ব্যবহার হয়েছে। আবার পরবর্তী অংশে বাবার পাঁচভরি ওজনের সোনার কলম বোঝাতে একটি বড় কলম ব্যবহার হয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকের দ্বিতীয় পর্বে মোগলি ও সানুর প্রেমপর্বে সানু ওড়না দিয়ে মোগলির চোখ বেঁধে দেয়। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে ওয়াংচুকে গ্রেপ্তার করার জন্যে তার হোটেলের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত কর্মী ঝিলিক আদতে সি.আই.ডি অফিসার হাতে পিস্তল নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হয়। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে স্বামী চরিত্রটিকে মৃতদেহ বোঝানোর জন্য সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে রাখা থাকে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে পালার শুরুতে রাজকুমার দ্বারা ধর্ষিতা ও মৃতা শিউলির দেহ ওড়না দিয়ে ঢাকা থাকে। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে দেওর চরিত্রটির ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করতে যাওয়ার সময় হাতে বোতল থাকে যাতে করে সে ইউরিন নিয়ে যাচ্ছিল। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকতে মাতাল অবস্থায় ছোট ছেলে মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতে মদের বোতল বোঝাতে একটি বোতলের ব্যবহার হয়েছে।

কখনো কেবলমাত্র সঙ্গেই রাখা থাকে থলি, গামছা, চশমা, ব্যাগ প্রভৃতি দ্রব্য। তখন তা হয়ে ওঠে কেবলমাত্র সাজের অঙ্গ। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে ঘটক বাখারি মঞ্চে প্রবেশ করে কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে। ঐ দলের ঐ ছকেই পালার শুরুতেই নায়ক আকাশ ভিখারির

ছদ্মবেশে মঞ্চে প্রবেশ করে। হাতে থলি এবং কাচের বয়েম ও ঢাকনা দড়ি দিয়ে গলায় ঝোলানো থাকে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকে চাকর হরিকাকা যখন মালা নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে তার হাতে থলি ও কাঁধে গামছা থাকে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর পঞ্চম ছকে খনার স্বামীর কোমরে গামছা বাঁধা থাকে। ঐ ছকেই লোনের অফিসারের হাতে ব্যাগ থাকে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে শাঁখা ব্যাপারির কাঁধে কালো ব্যাগ থাকে। ঐ ছকেই হ্যান্ডেল চরিত্রটি হাতে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে।

কোনো কোনো দ্রব্য, শিল্পী সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে এবং মঞ্চে অভিনয়ের সময় সেটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন- নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচুর প্রবেশ করার আগের মুহূর্তে গুয়ে পুলিশ পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে ধূমপান করে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে রাণী শঙ্খমালার হাতে ত্রিশূল এবং রাজপুত্র প্রত্যুষের হাতে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ হয়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর সপ্তম ছকে নাতজামাই-এর মঞ্চে প্রবেশ ঘটে গলায় গামছা ও বগলে বালিশ নিয়ে। ঐ দলের ঐ ছকেই নাতজামাই মঞ্চে সত্যিই ধূমপান করে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর দ্বিতীয় ছকে দ্বিতীয় বার কৃষ্ণ যখন প্রবেশ করে সাদা ধুতি দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকের শেষ অংশে সঞ্জয়ের বোন মারা যাবার সংবাদ ডাক্তার জানায় হরির মোবাইলে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার হয়েছে এখানে। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচু লুকিয়ে শৌচকর্ম করতে বসলে গুয়ে পুলিশ তাকে দেখতে পেয়ে বাঁশি বাজায়। অভিনেতা সত্যিই বাঁশি বাজায় মঞ্চে। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে পাপিয়ার বাবা কফি খাওয়ার উদ্দেশে মঞ্চে প্রবেশ করে ধূমপান করতে করতে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে শাঁখা ব্যাপারি পরানোর জন্য ব্যাগ থেকে শাঁখা বের করে।

কোনো কোনো দ্রব্য অভিনেতা সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করেন তবে সেটিকে ব্যবহার করা হয় না। যেমন- আদিশিবশক্তি গাজনতীর্থ এর প্রথম ছকে পালার শেষ দৃশ্যে একতারা হাতে নিয়ে বাউল প্রবেশ করে। কিন্তু বাজায় না। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ মঞ্চে প্রবেশ করার সময় তার বাম কাঁধে দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকে বড় টর্চ কিন্তু মঞ্চে তা জ্বালানো হয় না। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের অষ্টম ছকে তাসা পার্টি প্রবেশ করে হাতে তাসা ও কাঁসি নিয়ে। কিন্তু বাজায় না। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে পালার শুরুতে ভক্ত গোবিন্দ চরিত্রটি মঞ্চে প্রবেশ করে হাতে শাড়ি নিয়ে। ঐ দলের ঐ ছকেই মৌপিয়া চরিত্রটি মঞ্চে প্রবেশ করে একটি পুতুল নিয়ে। শিশুকে বোঝাতে ব্যবহার হয়েছে। হাতে ব্যাগ রয়েছে। নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে ভজহরি পাপিয়া ও তার বাবার জন্যে হাতে পাত্র এবং তাতে দুটো কাপ হাতে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে।

কোনো কোনো দ্রব্য দৃশ্যের পূর্বে মঞ্চেই অভিনেতার কাছাকাছি রাখা থাকে। যেমন- নিউ দিগবজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচুর স্বামী ফিরে আসার পর গুয়ে পুলিশ তার খাটের নিচে ধরা পড়ার পর তাকে মারার জন্যে লিচুর স্বামী হাতে লাঠি নিয়ে উপস্থিত হয়। পূর্বেই লাঠিটি মঞ্চে রাখা ছিল । ঐ দলের ঐ ছকে লিচুর স্বামী গুয়ে পুলিশকে তাড়িয়ে দেওয়ায় তার দিলে চলে যাওয়ার সময় সে লিচুর কাছে যে 'ফেরার লাবলী' দিয়েছিল সেটা ফেরত চায়। লিচু তার দিকে একটা বোতল ছুঁড়ে দেয়। বোতলটিও আগেই মঞ্চে রাখা ছিল।

কোনো কোনো দ্রব্য অভিনয় চলাকালীন অন্য অভিনেতা বা কোনো কর্মকর্তা পাশ থেকে বা মঞ্চের পিছন থেকে মঞ্চের কাপড় সরিয়ে অভিনেতার কাছে পৌঁছে দেন। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে মঞ্চের বাইরে থেকে সহকর্মী এসে রাজকুমার প্রত্যুষের ফেলে যাওয়া তরবারি কুড়িয়ে নিয়ে যায়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর ষষ্ঠ ছকের শেষ দৃশ্যে বাবার সমাধিতে দেওয়ার জন্য বড় বউ ফুলের মালা হাতে নিয়ে দাঁড়ায়। মালাটি এই দৃশ্যের কিছুক্ষণ আগে পিছনের পর্দা সরিয়ে মঞ্চে রাখা হয়।

আলো

গাজন উৎসবে গ্রামের অপেশাদারি গাজনপালা পরিবেশনা অধিকাংশ সময় দিনের বেলাতে অনুষ্ঠিত হত তাই আলোর ব্যবস্থাপনার কোনো প্রয়োজন হত না তবে সন্ধ্যের পরে যে অনুষ্ঠান হত সেখানে প্রয়োজনে আলোর ব্যবস্থা করা হত। সেক্ষেত্রে হ্যাজাক বা ঐ জাতীয় আলোর ব্যবহার হত। বর্তমানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই থাকায় এখন গাজনপালার পেশাদারি দলগুলিতে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা থাকে এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রক কর্মীও থাকে। পালার বিষয় ও ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মঞ্চে আলোকপাত ঘটানো হয়। এতে দৃশ্যটি আরও সজীব ও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে দর্শকদের কাছে সুতরাং বর্তমানে গাজনপালা পরিবেশনের দৃশ্য তৈরীতে আলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই রাতের বেলায় পেশাদারিদলগুলির পরিবেশনায় আলোর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে নানান রঙীন আলোর সাথে সাথে কারুকার্যময় আলোর নকশা, কেন্দ্রীভূত আলোরও ব্যবহার করা হয়। পালা শুরু হওয়ার পূর্বে কনসার্ট বাজানোর সময় ফাঁকা মঞ্চেও আলোর কারুকার্য করা হয়। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে স্থির আলোকচিত্র করলে মঞ্চের উপরের আলোর ব্যবস্থা স্পষ্ট বোঝা যাবে। পালা পরিবেশন শুরু হওয়ার আগে কেবলমাত্র ঘোষণার সময়েই নানা রকম আলোর ব্যবহার ও কারুকার্য করা হয়। দিগ্বিজয়ী গাজন সংস্থার ১৪.১২.২০১৭ তারিখে খুদিরাবাদের সূর্যশিখা ক্লাবের আয়োজনে পরিবেশিত পালা অভিনয়ের শুরুতে ঘোষণার সময় যে আলোর কারুকার্য হয়েছিল তার বিশ্লেষণ করা হল।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির ঘোষণার সময় ঘণ্টা বাজানোর আগে থেকে ঘোষণা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রতি পাঁচ সেকেন্ড অন্তর আলোর ধরন বদলায়। কখনো বিদ্যুতের মতো ঝলক, কখনো ঝলকবিহীন আলো জ্বলে এবং নেভে, কখনো দু-তিন রকম আলো জ্বলে এবং নেভে, কখনো নানান রঙিন আলোর নকশা হয় মঞ্চজুড়ে এবং ঘোষণা শুরু হওয়ার আগে ক্রমশ আলোর জৌলুস কমতে কমতে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। এতক্ষণ যে আলোর কারুকার্য হয় তা সম্পূর্ণটাই বাজনার সাথে ছন্দ বজায় রেখে ঘটে। ঘোষণা শুরু হয় মঞ্চ একেবারেই অন্ধকার অবস্থায়। দলের নাম ঘোষণার সময় রঙীন আলোর নকশা শুরু হয় মঞ্চে। প্রায় কুড়ি সেকেন্ড হওয়ার পর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। আবছা সাদা আলোয় মঞ্চ আলোকিত হয়। এরপর আবার ঘোষণা শুরু হয়। নাম ঘোষণা চলাকালীন মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। এরপর সবুজ স্থির আলোয় মঞ্চ আলোকিত হয়। তখন ‘বন্দনা গান’ শুরু হয়। তারপর ক্রমশ রঙীন আলোর বদল ঘটে গান চলাকালীন। এরপর গান শেষে মঞ্চ আবার অন্ধকার হয়ে যায় তখন পালার নাম ঘোষণা করা হয়। তিন বার নাম ঘোষণার করার পর মুহূর্তেই মঞ্চে স্থির আলো পড়ে এবং অভিনয় শুরু হয়।

ছকের অভিনয় শুরু ও শেষে এবং অভিনয় চলাকালীন অভিনেতাদের মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান করার সময় আলোর ব্যবহার বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যথা- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের দ্বিতীয় ছকে কৃষ্ণের কাছে পৃথিবী বর লাভ করে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করার সময় ক্ষণিকের জন্য মঞ্চটি অন্ধকার করা হয়। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকতে দৃশ্য চলাকালীন শ্বশুর চরিত্রটি প্রবেশ করে। ক্ষণিকের জন্য মঞ্চ অন্ধকার হয়েই আবার সাদা আলোয় মঞ্চ আলোকিত হয়ে ওঠে। ঐ দলের ঐ ছকে দৃশ্য চলাকালীন তিশা কাঁদতে কাঁদতে মঞ্চ ত্যাগ করার সময় মঞ্চ অর্ধেক অন্ধকার থাকে অন্যদিকে অল্প সাদা আলোয় আলোকিত থাকে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির চতুর্থ ছকে দাদার পালানো অর্থাৎ মঞ্চ প্রস্থান এবং আবার মঞ্চে প্রবেশ এরপর মেজো ভাই তাড়া করায় আবার মঞ্চ থেকে প্রস্থান- এই পুরো দৃশ্যটিতে মঞ্চে আগমন ও প্রস্থানের সাথে সাথে আলোর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে মঞ্চের পিছন দিক ও সিঁড়ির অংশ অন্ধকার থাকায় এবং সামনের অংশ আলোকিত থাকায় সুবলের মঞ্চে প্রবেশ করার দৃশ্যটি বিশেষভাবে দর্শকদের নজরে ধরা পড়ে না। এরপর পিছনের অংশ আলোকিত হয়ে উঠলে সুবলকে দেখা যায়। তারপর তার সংলাপ শুরু হয়। ঐ দলের ঐ ছকেই যখন সরমাকে বিদায় জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় শুভঙ্কর সেই দৃশ্য তৈরীর জন্য মঞ্চে আলো আঁধারি হতে হতে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকের দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয় ২ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে মঞ্চে অনেক সময় একদিক দিয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকায় অন্ধকারে শিল্পী মঞ্চে প্রবেশ করার পর মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠলে তবেই অভিনেতা দর্শকদের দিকে এগিয়ে আসেন।

বর্তমানে পেশাদারি গাজনপালা দলগুলি তাদের পরিবেশনকে আরও মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য আধুনিক কারুকার্যময় আলোর ব্যবহার করেন। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের দ্বিতীয়

ছকে রাধার গান শেষ হওয়ার সাথে সাথে রঙিন আলোর নকশাও বন্ধ হয়ে যায় এবং পৃথিবী ও রাধার কথোপকথনের সময় তাদের উপর রঙিন কেন্দ্রীভূত আলোর ব্যবহার হয়।

আলোর নকশা গানের ছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে দৃশ্যটিতে রঙিন কেন্দ্রীভূত আলোর ব্যবহার করা হয়েছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির ষষ্ঠ ছকের শুরুতেই 'মুখ গানে'র চড়া সুর ব্যবহার হয়েছে, নাচেও তার প্রভাব রয়েছে এবং আলোতেও সেই চড়া প্রভাব রয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে শুরুর দৃশ্যে নায়ক মঞ্চের পিছন থেকে গান গায় "নীল... নীল... অম্বর পর..." ফাঁকা মঞ্চে কেবলমাত্র নায়ক অবস্থান করে এবং তার উপর কেন্দ্রীভূত আলো থাকে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে বাখারি ও লিচু মঞ্চের মাঝের সিঁড়িতে বসে তাদের পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করার দৃশ্যে মঞ্চ অন্ধকার এবং কেবলমাত্র তাদের উপর কেন্দ্রীভূত আলোর ব্যবহারে দৃশ্যটির গুরুত্ব ও সৌন্দর্য অনেক বর্ধিত হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের শুরুতে অভিনেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকেন। তার উপর কেন্দ্রীভূত আলো পড়ে এবং তিনি গান শুরু করেন।

আনন্দ, দুঃখ, ভয়, উত্তেজনা প্রভৃতি নানান পরিস্থিতি ব্যক্ত করতে আলোর সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে শেষ হওয়ার আগে দুঃখের দৃশ্যে আলোর জৌলুস কমে আসে। মঞ্চে অল্প সাদা আলো এবং অধিকাংশটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় দৃশ্যটির দুঃখানুভূতি দর্শক মনে সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে যে দৃশ্যে ধনা শাবল দিয়ে বাবার মাথায় আঘাত করে সেই দৃশ্যের চাঞ্চল্যকরতা বা উত্তেজিত পরিস্থিতি বোঝাতে মঞ্চে ঘন ঘন আলোর বদল হয়েছে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে বগলে শাবল নিয়ে যখন জগন্নাথ মঞ্চে প্রবেশ করে তখন রাত বোঝাতে মঞ্চে মৃদু আলোর ব্যবহার হয়েছে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ঐ ছকেই ভোর বা সকাল হয়ে গেছে বোঝাতে মঞ্চে অল্প লাল আলো আঁধারির ব্যবহার হয়েছে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে স্বামী যখন স্ত্রীকে চড় মারে সেই দৃশ্যের উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে মঞ্চে অভিনেতাদের পিছনে চড়া আলোর ব্যবহারে। ঐ দলের ঐ ছকেই শ্বশুর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার দৃশ্যে উত্তেজক পরিস্থিতি বোঝাতে মঞ্চে ঘন ঘন লাল, সাদা, হলুদ আলোর বদল ঘটেছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির প্রথম ছকে ক্ষুধার্ত ভিখারি যখন আহাররত রাজা ও রাণীর খাবার কেড়ে নিতে যায় তখন সেই দৃশ্যের উত্তেজনা বোঝাতে মঞ্চে আলোর ঝলক ব্যবহার হয়েছে। এরপর যখন খলনায়কের কণ্ঠস্বরের ও সংলাপের মাধ্যমে দর্শক মনে ভয়ের অনুভূতি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাল আবছা আলোর ব্যবহার দৃশ্যটিকে ভয়ানুভূতির করে তুলতে সাহায্য করে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির চতুর্থ ছকে এই দৃশ্যে মেজো ছেলে যখন মায়ের গলা চেপে ধরে এবং অপর ব্যক্তি তার বাবাকে চেপে ধরে তখন হঠাৎ মেজো ছেলে মাকে ছেড়ে দিয়ে বলে—"বাবা, বাবা দেখো না মা কেমন করছে। ওমা, আমার ক্রুটি হয়েছে মা, আমার ক্রুটি হয়েছে।" এরপরেই সে মায়ের গলা চেপে ধরতে উদ্যত হয়

এবং মাকে হত্যা করে। এই পুরো দৃশ্যটিতে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরীর জন্য অভিনয়ের সাথে মঞ্চে দৃশ্যটিকে দর্শক মনোগ্রাহী করে তুলতে আলোর ব্যবহার অনেকাংশেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ষষ্ঠ ছকে ভজহরির সংলাপে উত্তেজিত ভাব প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠস্বর ক্রমশ চড়া হয়, মঞ্চেও লাল আলোর ব্যবহার তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঐ ছকেই যখন পাপিয়াকে তার বাবা ভর্ৎসনা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলার দৃশ্যের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে আলোর ব্যবহারেও প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে সুবল তার পুরনো দিনের কথা উদ্দেশ্য করে 'পুরানো সেই দিনের কথা...' গানটি গাওয়ার সাথে সাথে অতীত দিনের স্মৃতি বোঝাতে মঞ্চটি প্রায় অন্ধকার করা হয়। এরপর গান শেষ হয়। তারা বাস্তবে ফিরে আসে এবং মঞ্চ আবার আলোকিত হয়ে ওঠে। ঐ ছকেই শুভঙ্করের মৃত্যুর সাথে সাথে সরমা স্থির হয়ে যায় আলোও স্থির হয়ে যায়। নিস্তব্ধ মঞ্চে আবছা নীল রঙের স্থির আলো থাকে এবং বাকি মঞ্চ অন্ধকার থাকে। এরপর সরমার কান্না ও চিৎকার ক্রমশ বাড়তে থাকে সেই সাথে আলোতে চড়া ভাবও বাড়তে থাকে। এরপর দৃশ্য শেষ হয়। মঞ্চের মাঝে মৃত শুভঙ্করের মাথা কোলে নিয়ে সরমা বসে থাকে। প্রায় অন্ধকার মঞ্চ। পিছনে হাল্কা লাল আলো। দৃশ্য শেষ হয়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় এবং ঘোষণা শুরু হয়। আবার মঞ্চ আলোকিত হয়। পুরো দৃশ্যটিতে মৃত্যুর শোকস্তব্ধ পরিস্থিতি এবং তারপর বাস্তবে ফিরে আসা বোঝাতে আলো ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে সঞ্জয়ের বোন মারা গেছে জানার পর দর্শকদের জানানোর উদ্দেশ্যে হরি জোরে চিৎকার করে "মারা গেছে" বলে। সাথে সাথে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। তার পর আবার ধীরে ধীরে আলোকিত হয়। নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার এখানে শোক বিষয়টিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। ষষ্ঠ ছকে চোর পালানোর দৃশ্যের উত্তেজিত অবস্থা আলোর মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ঐ ছকেই দুই ভাই এর ঝগড়ার দৃশ্যের উত্তেজিত পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য আলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

কোনো বিষয়, বস্তু প্রভৃতির উল্লেখ করার সময় তার সাথে আলোর প্রয়োগেও সামঞ্জস্য বজায় থাকে। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির প্রথম ছকে বকুলডাঙ্গা গ্রামের উল্লেখ করার সময় মঞ্চে সবুজ স্থির আলো ব্যবহার হয়েছে। এরপর শয়তান বা খলনায়ক যখন বলে—"রক্ত... তাজা রক্ত..." তখন মঞ্চে লাল রঙের আলোর ব্যবহার হয়েছে আবার যখন রাজকন্যাকে খলনায়ক হত্যা করে তার রক্ত পান করার দৃশ্যেও মঞ্চে লাল আলোর ব্যবহার হয়েছে। তারপর অন্ধকার হয়ে গেছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির পঞ্চম ছকে রাত্রিবেলা বোঝাতে হাল্কা নীল আলো ব্যবহার হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে বোঝাতে বাজ পড়ার শব্দের সাথে বজ্রপাতের মতোই শব্দ ও সেই সাথে বজ্রপাতের মতোই আলোর ঝলক ব্যবহার হয়েছে মঞ্চে।

কোনো কাজ, সংলাপ বা চলাফেরা করার সাথে সাথে ছন্দ মিলিয়ে আলোর প্রয়োগ করা হয় এতে দৃশ্যটি দর্শকদের কাছে আরও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে গান চলাকালীন আলোর নকশা ছিল মঞ্চে। গান শেষ হওয়ার সাথে সাথে আলোর নকশাও

বন্ধ হয়ে যায়। তখন সাদা কেন্দ্রীভূত আলোর ব্যবহার হয়। অভিনেতা সিঁড়ির উপর থেকে নীচে নেমে আসার দৃশ্যে স্পট লাইটও তার সাথে সাথে নেমে আসতে থাকে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে রোগী ডাক্তারকে প্রহার করার দৃশ্যে আঘাতের সাথে আলোর ছন্দ এক সাথে ঘটে। এরপর তিশার স্বামী তিশাকে চাবুক দিয়ে মারে। এই দৃশ্যে চাবুক মারার সাথে সাথে আলোর ছন্দেও সামঞ্জস্য ব্যবহার হয়েছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির তৃতীয় ছকে নায়ক যখন কুকুরদের উল্লেখ করে বলে—"ঐ তুলসীগাচ যেকানে দেখা পাবে ঐ তুলসী গাচের মাতার উপর দাঁড়িয়ে ইস্ স্ স্..." বলার সময় মুখে শব্দ করে, সেই শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলো জ্বলা ও নেভা ব্যবহার হয়েছে এতে দর্শকমনে হাস্যরসের সঞ্চার করেছে। ঐ দলের ঐ ছকেই যখন নায়ক সংলাপ বলে সুর করে টেনে টেনে দীর্ঘ ভাবে তার সাথে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে সামঞ্জস্য রেখে, সেই বাদ্যের ছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলোর ব্যবহার হয়েছে। ঐ দলের চতুর্থ ছকে মেজো ভাই বৌদিকে কামড়াতে যায়। বৌদি লাফিয়ে ওঠে, সেই লাফানোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলোকিত হয় মঞ্চ। পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ চলে যাবার সময় বার বার পিছনে তাকিয়ে লিচুকে দেখে সেই তাকানোর সাথে সাথে সমঞ্জস্য রেখে আলোর ব্যবহার হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে বাচ্চার কান্নার সাথে ছন্দ মিলিয়ে রঙিন আলোর ব্যবহার হয়েছে। ঐ ছকে লোনের অফিসার খনার কোল থেকে বাচ্চা কেড়ে নিতে যাওয়ার সাথে ছন্দ মিলিয়ে আলোর ব্যবহার হয়েছে।

মঞ্চে নাচ ও গান চলাকালীন নাচ ও গানের লয়, অর্থ, উদ্দেশ্য এবং চরিত্রদের বয়স অনুযায়ী আলোর ধরন, আলোতে চড়া বা মৃদুভাব এবং তার গতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে নায়ক নায়িকার নাচের দৃশ্যে রঙিন আলোর নকশা দেখা যায় এবং এরপরেই মঞ্চে কাগজ কুচি ছড়িয়ে দৃশ্যটিকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এরপর গান ও নাচ শেষ হলে মঞ্চে আলোর নকশাও বন্ধ হয়ে যায়। তখন কেবলমাত্র রঙিন আলো মঞ্চকে আলোকিত করে রাখে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির তৃতীয় ছকে একেবারে শেষে 'শেষের গানে' নায়ক ও নায়িকার উদ্দাম নৃত্যের সাথে চড়া বাদ্য এবং সেই সাথে চড়া আলোর দ্রুত ঝলকানি এবং রঙিন নকশার ব্যবহার হয়েছে। পঞ্চম ছকে এই দুই সময়ে 'মুখ্য গানে'র একই লাইন দুরকম ভাবে গাওয়া হয়েছে। প্রথম অংশে সুরের মধ্যে চড়া ভাব কম সেই সময় মঞ্চে স্থির আলো ব্যবহার হয়েছে। পরের অংশে চড়া ভাবে গাওয়া হয়েছে তখন মঞ্চের আলোতে চড়া ভাব ব্যবহার হয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে বাখারি ও লিচু দুজনেই বয়স্ক। তাদের নাচের মধ্যে দ্রুততা কম থাকায় সামঞ্জস্য রেখে আলোতেও চড়া ভাব কম ব্যবহার হয়েছে। তেমনি এই সময় বাখারি লিচুকে উদ্দেশ্য করে রোমান্টিক গান গায় সেই সময় আলোর কারুকার্যহীন এবং আলোতে মৃদু ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ দলের সপ্তম ছকে শিল্পী মঞ্চের এক জায়গায় অবস্থান করে গান গায়। নাচ বিহীন, কেবলমাত্র হাত সঞ্চালনের মাধ্যমে। আলোর ব্যবহারেও মৃদু মৃদু প্রভাব রয়েছে সেই সময়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছক শুরু হয় এইভাবে শিল্পী মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকে। তার উপর কেন্দ্রীভূত আলো

পড়ে। এরপর শিল্পী গান শুরু করে। তৃতীয় ছকে নায়িকা মঞ্চে প্রবেশ করে। তবে পোশাক ও নাচ শারিরীক আবেদনমূলক। মঞ্চের আলোতেও চড়া ভাব ও দ্রুত আলোর ঝলক ব্যবহার হয়েছে। সপ্তম ছকে গান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আলোও বন্ধ হয়ে যায়।

মঞ্চে কোনো দৃশ্য তৈরি করতে এবং এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যের বদল ঘটাতে আলো গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির অষ্টম ছকে তাসাপার্টির উপস্থিতিতে গানচলাকালীন হঠাৎ গুলির শব্দে আহত হয় সন্ন্যাসী। এই সময় মঞ্চে আলোর ঝলক ব্যবহার হয়েছে। তার মধ্যে তাসাপাটি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর মঞ্চে আলোর ঝলকানি থেমে যায় এবং মুহূর্তেই দৃশ্য বদল ঘটে। পরের দৃশ্যে গুলিবিদ্ধ সন্ন্যাসীর মৃত্যু বেদনার দৃশ্য তৈরি করতে মাঝের ঐ আলোর ঝলকানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকের শেষ দৃশ্যে সুবল ও সরমা মুখোমুখি দাঁড়ায় স্থির ভাবে। সেই সময় মঞ্চ প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। দৃশ্যটি শেষ হয় তখন মঞ্চ একেবারেই অন্ধকার হয়ে যায়। এরপর সরমার উপর আলো পড়ে। পরের দৃশ্য শুরু হয়। পিছনে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সুবল মঞ্চ প্রস্থান করে যা দর্শক চোখে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে না। সপ্তম ছকে হাবলদার নাতজামাইকে খোঁজার দৃশ্যে আলো আঁধারির মাধ্যমে দৃশ্যটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ ছকে মঞ্চে সকলেই উপস্থিত কেবলমাত্র আলোর ব্যবহারের মাধ্যমে দৃশ্য বদলায়। পিছনের সিঁড়িতে হরি দাঁড়িয়ে ছিল আর মঞ্চের সামনে ছিল অজয়, মনি ও মনির মা। হরিকাকা নীচে নেমে মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং পাশের অন্ধকার অংশের মধ্যে দিয়ে মনির মা সিঁড়িতে হরিকাকার আগের জায়গায় চলে যায়। এই স্থান বদলের দৃশ্যটি তৈরি করতে আলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ঐ ছকেই বাবুর আড়ালে চাকর তার প্রসঙ্গে মন্তব্য করে। এখানে আড়াল বোঝাতে আলোর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই দৃশ্যে মঞ্চ অন্ধকার এবং ব্যক্তিগুলি সামান্য আলোকিত হয়েছে। ষষ্ঠ ছকে মঞ্চের পিছনের পর্দা সরিয়ে সহকর্মী পরবর্তী দৃশ্যের জন্য ফুলের মালা মঞ্চে রেখে দেয়। ঠিক সেই সময় মঞ্চের নীচের অংশ অন্ধকার করা হয়।

মঞ্চে একসাথে একাধিক আলো প্রয়োগ করে দৃশ্য তৈরী, দৃশ্য বদল, বা দৃশ্যটিকে আরও সুন্দর করা হয়। যথা- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে হত্যার দৃশ্যে আলোর কাজ লক্ষণীয়। দুপাশে দুই নারীর উপর সাদা কেন্দ্রীভূত আলো বুক পর্যন্ত করা হয়েছে এবং পিছনে হত্যার দৃশ্যে লাল আলোর ব্যবহার করে বাকিমঞ্চ অন্ধকার করার এবং সেই সাথে আলোর ঝলকানি একসাথে দৃশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলটির তৃতীয় ছকে নায়কের গায়ের উপর বসে নায়িকা তাকে গালাগালি দেয়—“you ruscle, stupid, nonsense...” এবং তাকে আঘাত করতে থাকে। আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যটিকে বোঝাতে মঞ্চে সামনের যে অংশে তারা রয়েছে সেই অংশে আবছা অন্ধকার, এবং তাদের পিছনের অংশে সাদা স্থির আলোর ব্যবহার হয়েছে। প্রথম ছকে মঞ্চের পিছনদিক থেকে সুবল প্রবেশ করে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। মঞ্চের পিছনদিক ও সিঁড়ির অংশ অন্ধকার থাকায় এবং সামনের অংশে আলো থাকায় বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে আসে না। এরপর পিছনের

অংশে আলো পড়ে। সুবলকে দেখা যায়। তার সংলাপ শুরু হয়। ঐ ছকেই হত্যার দৃশ্যে আলোর কাজ লক্ষ্যণীয়। দুপাশে দুই নারীর উপর সাদা কেন্দ্রীভূত আলো বুক অবধি, পিছনে হত্যার দৃশ্যে লাল আলো। বাকিমঞ্চ অন্ধকার। সেই সাথে আলোর ঝলকানি ব্যবহার হয়েছে। আবার ওই ছকেরই শেষ দৃশ্যে মৃত শুভঙ্করের সাথে মুখোমুখি হয় সরমা ও তার মেয়ে। পর্দায় আলোর মাধ্যমে কঙ্কাল তৈরি করে শুভঙ্করকে বোঝানো হয়েছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন দলের একই ধরনের ছকে একই ধরনের দৃশ্যের মধ্যে আলোর প্রয়োগে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন- নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে কালো ছায়ার সংলাপে ভয়ঙ্কর ভাব আনতে তার সংলাপের মাঝে মাঝে রঙিন আলোর ঝলকানি ব্যবহার হয়েছে। এই ধরনের দৃশ্যে সব দলেই প্রায় একই রকম দেখা যায়।

৪.৪ অভিনেতা ও দর্শক

গাজনপালার পরিবেশনের মধ্যে মঞ্চে অভিনয়ের সময় শিল্পীরা উপস্থিত দর্শকদের সাথে নানা ভাবে সংযোগস্থাপন করেন যার ফলে দর্শক অনেক বেশি বিষয়টির সাথে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন। ফলস্বরূপ বিষয়টির প্রতি বেশি মনোযোগী হন, বিষয়টি তাদের কাছে বেশি মনোগ্রাহী হয় এবং সচেতনতামূলক বিষয়টি প্রভাবিত করতে সাহায্য করে। এই জনসংযোগ ঘটানোর কাজটি শিল্পীরা পরিবেশনের মাধ্যমে নানারকম ভাবে করে থাকেন। অভিনেতা তার অভিনয় শুরু করেন সরাসরি দর্শকদের উদ্দেশ্যে সংলাপ বলতে বলতে বা অভিনয় চলাকালীন দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোন সংলাপ বলেন। এতে দর্শকরাও ঐ অভিনেতার সাথে সংযুক্ত হয়ে যান। যেমন-শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে চাকর ভজগোবিন্দ তার দিদিমণিকে পার্কে পরপুরুষের সাথে প্রেম করতে দেখে এই ধরনে মেয়েদের সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছে প্রায় দেড় মিনিটের সংলাপ। সম্পূর্ণটাই দর্শকদের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে যেন ব্যক্ত করেছে। ঐ দলের ঐ ছকেই বাকারি তার নাতির বিয়ে না হওয়ার কথা দর্শকদের কাছে ব্যক্ত করে। মঞ্চে একা দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে সে বলে—"এটটা শর্ত ধরে রেকেচে। সেই শর্তর জন্যে বে' হচ্ছে না। উপরন্তু আমার ঢেমন খেতে হচ্চে।" নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে দিদিমা মন্দিরা তার সংলাপের শুরুতে দুঃখের কথা দর্শকদের কাছে ব্যক্ত করে। ঐ ছকেই বড়, মেজ, সেজ কোনো বাবুই থানায় না থাকার দুঃখ হাবলদার সংলাপের শুরুতেই দর্শকদের জানিয়েছে।

অভিনেতারা অনেক সময়েই দর্শকদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে সংলাপ বলেন। মহিলাদের 'দিদি' ও পুরুষদের 'দাদা' সম্বোধন করেন। এছাড়া 'দাদাভাই', 'দিদিভাই', 'বাবু', 'সুধীজন', 'প্রিয়জন', 'গুরুজন' নানা সম্বোধনের ফলে গ্রামের সাধাসিধে এই দর্শকবৃন্দরা খুব সহজেই প্রভাবিত হন। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়িকা নায়ককে উদ্দেশ্য করে বলে —

"তোমাদের মতো কত ছেলেদের এই গাঁটেতে গোঁজা আচে। তুমিও 'দাদাদের' ডাকচ আমিও 'দিদিদের' ডাকব। ওগো 'দিদি' (দর্শকদের উদ্দেশ্যে) তোমরাও ঘুরে আসো... তোমার (নায়ককে) ব্যবস্থা কোরে দোবো।" ঐ দলের পঞ্চম ছকে বিয়ের পাত্রকে দেখে তার টাক মাথা নিয়ে পাত্রী কিঞ্চিত ইতস্তত করে তখন পাত্র বলে তার চুলে কোনোদিন কিছু আটকায়নি। এরপর দর্শকদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করে—"কি রা'দাদা' চুলে কোনোদিন কিছু আটকেচে?"। ঐ ছকে স্বামী তার স্ত্রীকে অনুরোধ করে একবার 'বাবা' বলে ডাকতে। তখন স্ত্রী দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে—"কী সর্বোনাশ! চিন্তা করতে পারো। ও দিদিরা, তোমরা কেউ কোনোদিন স্বামীর 'বাবা' বলে ডেকেচ বলো?" এরপর দুদিন স্বামীকে দেখতে না পেয়ে স্ত্রী দর্শকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে—"ও দিদি আমার স্বামীকে দেকেচো?" নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে আবার ভজহরি দর্শকদের 'বাবারা' সম্বোধন করে বলে—"আমি না হয় মূর্খ মানুষ বাবারা বুঝতে পারিনি। ফাঁকে না ফেলে কাপে ঝেড়ে দিয়েছি।" শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকের 'মুখ গানে'র পরই ভিখারি দর্শকদের কাছে ভিক্ষা চায় এইভাবে—"সুধীজন, গুরুজন, প্রিয়জন সবাইকে জানাই..."। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে শ্বশুর শাশুড়ি মেজো ছেলের বাড়ি থেকে দুই মিনিট আগে চলে আসার কারণে এবং শাশুড়ি পায়খানা করে বারান্দা নোংরা করে ফেলায় বড় ছেলের বউ দর্শকদের উদ্দেশ্যে 'দাদা' ও 'দিদিগো' সম্বোধন করে পালার শুরুতে তাদের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ জানিয়েছে দর্শকদের কাছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে দুব্বুলি বৌদি মাটি ফেরে যাওয়ার গল্প করার সময় এবং বর্ষাকালে গ্রামের দুরাবস্থা বর্ণনা দেওয়ার সময় দর্শকদের 'দিদিগো' সম্বোধন করে মনের দুঃখের কথা ব্যক্ত করেছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে সঞ্জয় বৌকে ভয় পাওয়ার দুঃখের কথা সংলাপের শুরুতেই দর্শকদের কাছে ব্যক্ত করেছে এবং তাদের 'দাদা' সম্বোধন করেছে। পঞ্চম ছকে খনার স্বামী সংলাপ শুরু করেছে দর্শকদের উদ্দেশ্যে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে যুবক নায়িকার কাছে মধু চেয়ে না পাওয়ায় নায়ক দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছে—"ও দাদা, তোমরা চার-পাঁচ জন আমার সোঙ্গে এসো তো দাদা।" নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে ভৃত্য ভজহরি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে—"না বাবারা এত বড় ভুল আমি করব না। দিদিমনিকে ক্ষতি কিন্তু বাবারা আমি করিনি।" আবার বলে—"আমার এই দিদিমনিকে আমি পোচন্ড ভালোবাসতাম দাদাভাইরা।"

কখনো কখনো পালার মধ্যে সংলাপের মাঝে দর্শকদের উল্লেখ করে যুক্ত করা হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে মৃত বাবার শব দেহ ভেবে সাদা কাপড় ঢাকা দিয়ে থাকা স্বামীকেই স্ত্রী 'বাবা' বলে ডাকলে চাদর সরিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে স্বামী জানায়—ঘরের মধ্যে সে একবার স্ত্রীকে 'বাবা' বলে ডাকতে বলেছিল স্ত্রী ডাকেনি কিন্তু (দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে) এত লোকের সামনে বললো—এবার কী হবে?। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে গোবিন্দ দিদিমণির সন্তানের প্রতি অবহেলাকে তুলনা করে দর্শকদের দেখিয়ে বলে—"...আমার এখানে অনেক মায়েরা এসেছে যে

মায়ের সন্তান হয়নি...”। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে বাবু তার চাকর ভজহরিকে নাক ঝেড়ে কফি করে আনতে বললে সে কফির মধ্যেই নাক ঝেড়ে আনে। বাবু রেগে গেলে ভজহরি দর্শকদের দেখিয়ে বলে—“বাবু তুমি সত্যি কথা বলো তো, এতগুলো মানুষের সামনে তুমি কি বলোনি? যে ভালো করে নাক্-টাক্ ঝেড়ে কপি- টপি তৈরি করে নিয়ায়।” নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে দাদা দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ভাইয়ের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলে—“আমি নাকি কে হই। ছুঁচোর অবস্থা দেখ।”

কখনো কখনো যে জায়গায় গাজনপালাটি পরিবেশন হয় সেখানকার বা তার পার্শ্ববর্তী কোন জায়গার উল্লেখ সংলাপের মধ্যে করে সেখানকার দর্শকগণকে প্রভাবিত করেন অভিনেতারা। যথা—আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে গানের মধ্যে নায়ক বলে—“দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় যাব এক্ষুনি...” (মধু আনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে)। এ থেকে বোঝা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত জায়গাতেই অনুষ্ঠান হচ্ছে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে ছোট ভাই গুয়ারকেলের ঠান্ডা লাগার কারন জানতে চাইলে সে বলে, ঐ গাজন অনুষ্ঠিত মাসে একমাসব্যপী মাঘ মেলা হওয়ার কারনে ঠান্ডা লেগে গেছে। ঐ ছকে দেওর বৌদিকে জানায় তার বাবা মারা গেছে। দেহ শ্মশানে আছে। কোন্ শ্মশানে জানতে চাইলে সে বলে ‘ড্যায়মন্ড হারবার’ এ। এরপর পাত্র-পাত্রীর মাকে জানায় এর আগে সে যেসব জায়গায় বিয়ে করতে গেছিল সেগুলো হল—ক্যানিং, রায়দিঘী। এই জায়গাগুলিও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অধ্যুষিত অতিপরিচিত অঞ্চল এবং গাজনের গদিঘরের কাছাকাছি। অষ্টম ছকে বধূ হত্যার পর পুলিশ এসে জানায় সে সোনারপুর থানার ওসি। সোনারপুর থানা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিরাট অঞ্চলব্যাপী একটি থানা। আবার ওসি জানায় সে খবর পেয়েছে মুকুন্দপুর গ্রাম থেকে খুন করা হয়েছে। গাজনপালাটির অনুষ্ঠিত জায়গাটি মুকুন্দপুর গ্রামে অবস্থিত। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে নায়িকা পাপিয়া তাদের বাড়িতে তার প্রেমিককে আসার জন্য ফোনে জানতে চায় সে কোথায় আছে? তার প্রেমিক জানায় গড়িয়া স্টেশনে নেমে গেছে। তারপর পাপিয়া তাকে বলে—“তুমি ওখান থেকে অটো ধরে বলবে সূর্যশিখা কেলাব যাব।” গাজনপালাটি মুকুন্দপুরের কাছে খুদিরাবাদ অঞ্চলের সূর্যশিখা ক্লাবের মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সন্নিকটস্থ জনবহুল স্টেশন গড়িয়া। সেখান থেকে অটোতে ঐ স্থানে পৌঁছতে সময় লাগে পনেরো মিনিট। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে নায়িকা তার প্রেমিকের সাথে দেখা করার জন্য স্থানের উল্লেখ করে ফোনে জানায়—“জামতলা বাস স্ট্যান্ডের মোড়ে অপেক্ষা করবে”। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে পালার মাঝে ঘটনাকেন্দ্রিক বিষয়ে ঘোষণা করা হয় গড়িয়ায় একটি নতুন শ্মশান হয়েছে তার উদ্বোধন হবে সেই উদ্বোধনকে কেন্দ্র করেই ছকের বাকিঘটনা ঘটে। যে অঞ্চলে পালাভিনয় হচ্ছিল সেই খুদিরাবাদ জায়গাটির কাছেই গড়িয়া একটি জনবহুল অতি পরিচিত জায়গা। সেখানে একটি শ্মশানও রয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকতে বৌদি দেওরকে জানায় সে গোটা গড়িয়ায় তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। পঞ্চম ছকে লিচুদি ঘটক বাখারির উপর

রেগে গিয়ে বলে—“এই বাখারি তোর আজকে গড়িয়ায় কাটব।” ষষ্ঠ ছকে সুন্দরী প্রেমিকা পাওয়ার জন্য দুই ব্যক্তি রেষারেষি করতে করতে ভিখারিকে সর্বস্ব দান করে দেয়। অবশেষে পরনের প্যান্টও যখন খুলে দেয় তখন ভিখারি নিজেই বলে—“সূর্যশিখায় যে এত বড় বড় মানুষ আছে আগে জানা ছিল না।” নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে দিদিমা জানায় তার নাতনি যাদবপুরের পচা খালের পাশে এক ঝুপড়িতে আছে। খুদিরাবাদ জায়গাটি যাদবপুরের অদূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। ঐ দলের চতুর্থ ছকের শুরুর দিকে সঞ্জয় একার সংলাপের সময় চাকররাও তাকে মানছে না বোঝানোর জন্য বলে—“যেন ডায়মন্ডহারবার নদী থেকে ছামলী ধরে এনেছি।”

অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর

প্রতিটি দলের পরিবেশনের মধ্যে কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রেও কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- খলনায়ক চরিত্রের কণ্ঠস্বর কর্কশ ও উচ্চারন টেনে টেনে দীর্ঘ ভাবে করা হয়। প্রতিটি পালা পরিবেশনের প্রথম ছকের ক্ষেত্রে এটি লক্ষণীয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থদলের প্রথম ছকে খলনায়ক চরিত্রে কর্কশ কণ্ঠস্বর ব্যবহার হয়। টেনে-টেনে, থেমে-থেমে সংলাপ এবং সংলাপের শুরুতেই হুঙ্কার করা হয় যা অন্যান্য দলের প্রথম ছকেরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ঐ দলের ঐ ছকেই খলনায়কের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে হিংসাত্মকভাব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এমনকি খলনায়কের ভালোবাসার বা দুঃখের কথা শোনানোর সময় কণ্ঠস্বরে আবার বদল ঘটেছে তাও লক্ষ্যণীয়। ঐ দলের তৃতীয় ছকে বৌদি দেওরকে তার ভাইপোর জন্য মধু আনার দায়িত্ব দেওয়ার সময় বলে--- “আমার বাচ্চার যদি কিছু হয়, পুরো দায়িত্ব কিন্তু তো---মার”। এখানে ‘তোমার’ শব্দটি উচ্চারণ করার সময় ‘তো’ টেনে দীর্ঘ ভাবে উচ্চারণ করে সংক্ষেপে ‘মার’ বলেই মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে। চতুর্থ ছকে বাবা চরিত্রটি যখন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে তখন সংলাপ এর শেষে কণ্ঠস্বর টেনে উচ্চারণ করে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা গাজন দলের প্রথম ছকে সংলাপের মধ্যে ছকের নাম,বা পালার নাম বলার সময় চিৎকার করে বলা হয়। ঐ দলের ঐ ছকেই খলনায়ক প্রস্থান করার আগে---‘‘আশীষ জানিলাম তোরে, চিরসুখী হইবি’ পর্যন্ত বিশেষ ভাবে টেনে টেনে উচ্চারণ করে বাক্যের বাকি অংশ ‘মায়াময় চরাচরে’ স্বাভাবিক উচ্চারনে বলে শিল্পী মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে। তৃতীয় ছকে দেওর ও বৌদির কথপোকথন হয় এরকম—

দেওর—“এ বৌদি, মেয়েটা ক্যানো মারতেচে শুনবি?”

বৌদি—“হ্যাঁ”

দেওর—“তুই আমারে বললি দুটো বোতল ভরেনে সোজা চলে যাবি”।

এই অংশে কণ্ঠস্বরের উচ্চতার তারতম্য লক্ষিত হয়। ঐ ছকেই এরপর দেওর বলে- “দুটো বোতল ভরেনে হন হন করে আসতিচি আর ম্যাডাম পথের মাঝখানে আটকে”- বাক্যের এই অংশ অত্যন্ত

দ্রুত ভাবে বলে। বাকিঅংশ---“ঐ দুটো বোতলের মাল সব ফেলে দিয়েছে”-এই অংশ কেঁদে কেঁদে টেনে টেনে উচ্চারণ করে আবার যখন বলে- “আর ওভার লোড দিলে গা.....ড়ী....ই....ই....”। গাড়ী বলার সময় কণ্ঠস্বর হঠাৎ ধীরে হয়ে যায়। সেরকমই যখন বলে- “কোতায় যোগা, কোতায় বোবা, কোতায় গোগা” – এই অংশে কণ্ঠস্বরে সুর করে টেনে দীর্ঘ ও থেমে থেমে উচ্চারন করে আবার কথোপকথনের এই অংশে- বৌদি---“তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ রয়েচে, আমাদের এই কোচেটার”-একই রকমভাবে বলে এবং বাকিঅংশটি -“একটু ভা-লো করে দিও অ্যাঁ”- স্বরের বদল করে বলে। ঐ দলের চতুর্থ ছকে মেজ ছেলে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে এবং বলে – “না, বাবা, না” তারপর চিৎকার করে বলে “ভুল যে আমি করে ফেলেছি বাবা, নেশার ঘোরে বুঝতে পারিনি, মাকে আমি মেরে ফেলে দিয়েছি, পরের যুক্তি শুনে আমার নিজের মাকে আমি ভুলে গিয়েছি বাবা। ভুল তো করেছি, তাই আমার শাস্তি আমাকে পেতে দাও বাবা, আমার শাস্তি তুমি আমাকে পেতে দাও বাবা”। এরপর আরও চিৎকার মিশ্রিত কান্না নিয়ে বলে “আমার শাস্তি তুমি আমাকে পেতে দাও”। ষষ্ঠ ছকে মাঝের অংশ থেকে পরিস্থিতিতে উত্তেজিত ভাব সৃষ্টি করতে ক্রমশ কণ্ঠস্বরে চড়া ভাব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম ছকে যখন সন্ন্যাসী মাতঙ্গিনীকে বলে “আমিও সুযোগ পেলে ঐ নাড়ার গাদায় ফেলে এমন ঘষা ঘষে দোব মাতার চুলকটা তুলে নিয়ে বেল বার করে ছেড়ে দোব” তার স্বরের মধ্যে রূঢ়তা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় ছকে যখন বৌদি বলে- “ও বাবা গো, ভালো মানুষের ঝির মতো আগে বোতলটা ভরে দাও”। কয়েকটি অংশে অনেক দীর্ঘভাবে উচ্চারণ করে বাকিঅংশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উচ্চারন করে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে সংলাপ বলতে বলতে কণ্ঠস্বরে ক্রমশ চড়া ভাব এবং উত্তেজিত ভাব প্রকাশ পায় আবার কণ্ঠস্বরে উত্তেজিত ভাব থেকে হঠাৎই ভাব নম্র ভাব যায়। এরপর আবার কণ্ঠস্বরে নম্র ভাব থেকে ক্রমশ উত্তেজিত ভাব হয়ে যায় । ঐ দলের চতুর্থ ছকে গোবিন্দর ম্যাডামের প্রতি উক্তিতে কণ্ঠস্বরে ক্রমশ উত্তেজিত ভাব প্রকাশ পায়।

আবার কখনো কণ্ঠস্বরে হঠাৎই কান্না মিশ্রিত আবার কখনো কণ্ঠস্বরে ক্রমশ উত্তেজিত ভাব প্রকাশ হয়। যেমন- নাট্যমন্দির গাজন তীর্থ দলের চতুর্থ ছকে হরি সঞ্জয়ের বোন মারা যাওয়ার খবর শোনার সময় কানে মোবাইল ধরেই ‘মারা গেছে’ বলে চিৎকার করে। ওই ছকেই আবার সঞ্জয় বউ এর সাথে শান্ত স্বরে কথা বলেছে আবার পরক্ষণেই সঞ্জয় চাকরের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলে। ষষ্ঠ ছকে বড় বউ চোর ধরার সময় চিৎকার করে আবার ভাই ও বড় বউ এর ঝগড়ার দৃশ্যে কণ্ঠস্বরেও উচ্চ চড় ভাব উত্তেজনার প্রকাশ ঘটায়। সেখানে কণ্ঠস্বরে ঝগড়ার প্রভাব রয়েছে।

৪.৫ আঙ্গিক ও আহার্য অভিনয়ের ধরন

স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুষগুলির কাছে গ্রামীণ লোকনাট্যরূপ গাজনপালা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার পিছনে তার আঙ্গিক ও আহার্য অভিনয়ের যে বিশেষ কারণগুলি রয়েছে সেগুলি হল—

গাজনপালাগুলির পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা হাস্যরস এবং অশালীনতার ঈঙ্গিত। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখ রেখে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

গাজনপালায় হাস্যরস

বিমলেন্দু হালদার তার গ্রন্থে কখনো বলেছেন—

> "যাত্রাগানের উদ্ভবের আগে কৃষ্ণযাত্রা বা কেষ্টযাত্রা এবং গাজন এখানকার জনসমাজকে উৎসবে আর আনন্দে ভরপুর করে রাখত"।

আবার কখনো বলেছেন

> "...আবার এদের মধ্যে রসাত্মক আবেদনের জন্য গাজনের আকর্ষণ ছিল বেশি।"[৬]

গাজনপালা নামক লোকনাট্যের বিষয় যাই হোক এর পরিবেশনের আঙ্গিকে স্থুল হাস্যরসের ধরন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই হাস্যরস কখনো কখনো একটু চটুলও হয়ে ওঠে। গ্রাম্য নিরক্ষর বা স্বল্পস্বাক্ষরিত মানুষগুলির কাছে এই কারণে হয়ত এই পালা নাটকগুলি আরও বেশি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। আসলে গানগুলির মধ্যে গ্রামের মানুষের মনোরঞ্জন বিষয়টি মুখ্য তাই গানের সুর-তাল-ছন্দের ত্রুটিবিহীনতা অপেক্ষা রসাস্বাদন বিষয়টি অনেক বেশি হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। যার অন্যতম বিষয় হাস্যরস। গাজনপালাগানেও হাস্যরস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র মৈত্রের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তার 'বাংলা নাটকের বিবর্তন' নামক গ্রন্থে বলেছেন-

> "লেবেডেফ কেন *'সঙবদল'* অনুবাদ করেছিলেন, তার হেতু হাস্যরস তাঁর হিন্দী ব্যাকরণের ভূমিকায় উল্লিখিত- 'আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম ভারতবর্ষয়েরা সোজাসুজি গম্ভীর বাস্তব বুদ্ধি ভাবনার তাহা যতই শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে বলা হউক না কেন---তাহার অপেক্ষা ভেঙচানি ও ভাঁড়ামি বেশি পছন্দ করে"।[৭]

গাজনপালাগানের পরিবেশনের মধ্যে সাধারণত প্রথম ছক ও দ্বিতীয় ছক দুটি পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক আঙ্গিকের ছক হয়। এই দুটি ছকে কমেডি থাকে না। তৃতীয় ছকটি থেকে সাধারণত হাস্যরসের প্রয়োগ করা হয়। কোনো কোনো ছকের বিষয় সম্পূর্ণ দুঃখের হলেও তার মাঝে মাঝেই হাস্যরসের প্রয়োগ হয় আবার কোনো কোনো ছকের বিষয়ই হয় হাস্যরসের। সেক্ষেত্রে আদ্যপান্ত পুরোটাই হাস্যরসে মোড়া থাকে। গাজনপালায় হাস্যরস সৃষ্টির অন্যতম উপাদান হল অঙ্গভঙ্গি। শিল্পীর মৌখিক ও শারীরিক অঙ্গ সঞ্চালন হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান কারণ। যেমন- শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে বাড়ি ফেরার পথে হ্যান্ডেলের সাথে রতনকাকার দেখা হলে তার কাছে হ্যান্ডেল নিজের বউ এর কথা জানতে চায়। সে জানায় তার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে শুনেছে ঘরের ভেতরে তার বউ "আ... আ..." করে উঠেছে। একথা বলার সময় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে হাস্যরস তৈরি করে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে ছোট ভাই গুয়ারকেল প্রবল কান্না শুরু করে। কান্নার ধরন দৃশ্যটিতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। ঐ দলের ঐ ছকেই যখন গুয়ারকেল এসে দাদাকে কিছু বলে তারপর

মঞ্চ প্রস্থান করে এবং বৌদিকে নিয়ে আবার মঞ্চে প্রবেশ করে। তাদের অভিনয়ের ধরনে সম্পূর্ণ এই দৃশ্যটি দর্শকমনে হাস্যরস সৃষ্টি করে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে হরিনাম বাসরে কীর্ত্তনীয়া যেভাবে কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন গাওয়ায় ভঙ্গিতে নায়কের গান গাওয়া এবং তার গান শুনে তার বৌদির নিজের কান চেপে ধরে 'বাবা গো' বলে চিৎকার করা, পুরো দৃশ্যটির মাধ্যমে তারা মঞ্চে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। ঐ ছকেই এরপর ডবল মাল চাপালে গাড়ী যেতে না পেরে উল্টে যাবে। সংলাপটির সাথে সাথে নায়কের বৌদি যে ভঙ্গিতে সেটি দেখায় তাতে দৃশ্যে হাস্যরস তৈরীর চেষ্টা করে আবার নায়ক, নায়িকার কাছে নিজের ভালোবাসার কথা বলার সময় লজ্জিত ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে দর্শকমনে হাসির উদ্রেক ঘটানোর উদ্দেশ্যে। পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ লিচুর বাড়ির খাটের নীচে প্রধান সাহেবকে দেখে বলে— "এ ছেলেরা পোদান কোতায় ঢুকেচে দ্যাক।" সংলাপ বলার দৃশ্যে প্রধান সাহেব গুয়েপুলিশের ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়। এই দৃশ্যটি হাস্যরস সৃষ্টি করে। এরপর যখন লিচুর স্বামীর কাছে প্রধান সাহেব ধরা পড়ে গিয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে হাসে। তার হাসির ভঙ্গি দর্শক মনে হাসির উদ্রেক করে। ষষ্ঠ ছকে ভজহরির নাকের সর্দি দেখে এবং পাপিয়া সেকথা বলায় ভজহরির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হাসিতে হাস্যরস সৃষ্টি হয়। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে বাখারি ও লিচু আনন্দিত হয়ে একসাথে লাফিয়ে পরস্পর হাতে তালি দেয়। এই দৃশ্যটির মাধ্যমে হাস্যরস তৈরীর চেষ্টা হয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে শাঁখা বেপারির কথা শুনে হ্যান্ডেল ভুল বোঝে এবং এতটাই মনে আঘাত পায় যে মাটিতে পড়ে যায়। তার পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটিতে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে সঞ্জয় জানায় সে বউকে ভয় পায়, বউ এর হাতে মার খায়। এই তার দুঃখের জীবন। তার এই দুঃখের কথা জানানোর ভঙ্গি দর্শক মনে হাসির উদ্রেক করে। ঐ ছকেই মণি রেগে গেলে তার স্বামী সঞ্জয়—"না—না—না মণি, তুমি রেগে যেও না, তুমি রেগে গেলে আমার ভয় লাগছে" সংলাপ বলে তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি হাস্যরস তৈরি করেছে। ঐ দলের ষষ্ঠ ছকে খনার স্বামী বাচ্চার হিসু খেয়ে বোঝে সে হিসু করেছে। দৃশ্যটি হাস্যকর। এরপর খনার কান্নার ধরন হাস্যরস তৈরি করে। আবার খনা —"আমার আতা গাছে তে তোতা পাখি বাসা করেছে"- গানটি গাওয়ার সময় যে অভিব্যক্তি করেছে তাতে হাস্যরস তৈরি হয়েছে। এরপর লোনের অফিসারের ধমক খেয়ে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ খনার চমকে ওঠার ভঙ্গিতে দর্শক মনে হাসির সঞ্চার করে। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই খনার "রি...রি...রি...রি..." করতে থাকার ভঙ্গিও হাস্যজনক।

গাজনপালায় সংলাপের মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি আরেকটি উপায় কোন বক্তব্য, পাশ থেকে মন্তব্য, দ্বৈত অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে হাস্যরস তৈরি করা হয়। যথা—

কথোপকথনে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে বৌদি দেওরকে বলে—"এই যে হেঁড়া গোগাটা আবার কি জিনিস?"

দেওর বলে—"যোগার মাসতুতো ভাই"।

ঐ দলের চতুর্থ ছকে বড় ভাই মেজ ভাইকে বলে—"আমি তোর অভিশাপ করব, আমি তোর অভিশাপ করচি, তোর সারা গায়ে দাদ, হাজা, চুলকানি একজিমা ভত্তি হয়ে যাবে। দশ বারোটা কুটুম্ব আসবে শুদ্ধ চুলকে দিতে।" এরপর মেজ ভাই উত্তরে বলে—"দ্যাক দাদা যে আসে আসুক, কিন্তু পতম চুলকোতে তোর শালিটার আগে পাঠাস।"

দ্বৈত অর্থেও হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে পাত্রীর বাবা ও হবু জামাই এর মধ্যে দ্বৈত অর্থে কথপোকথন হয় এরকম- বাবা—"তা চাষবাস কতদূর?"

ব্রাহ্মণ—"চাষবাস? ও পাট নাই।"

"বাবা— ও পাট নাই। সরু সরু চাল, আমার মেয়ে থাকবে ভালো, খাবে ভালো।"

সংলাপের মাধ্যমে হাস্যরস তৈরি করা হয়েছে। যেমন— নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে মা মারা যাওয়ার পর মেজো ছেলে মায়ের জন্য কাঁদতে থাকে। সেই দেখে তার সঙ্গীও কাঁদতে শুরু করে। তখন সঙ্গীকে সে বলে—"এই দুঃখের সময় তোর কান্নার কোন এস্কেল জ্ঞান আচে?" আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে পাত্র পাত্রীর মায়ের শিক্ষিতা হওয়ার কারণে তাকে প্রণাম করে 'লেগ ডাস্ট' নিতে যায়। সংলাপের মাধ্যমে এখানে হাস্যরস তৈরি করা হয়েছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে বৌদি তারপর তার দেওরকে বলে—"এ তো কুমার শানুর বাচ্চা নয় গো, এ তো ডিম।" আবার নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে হরি জানতে চায় মালা কি হবে

সঞ্জয় তাকে বলে—"তোমার বাপের বে' হবে।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে লোনের সভাপতি শুনে খনা জিজ্ঞাসা করে—"রাষ্ট্রপতির বউ সভাপতি?" একথা শুনে অফিসারের কাছে খনা জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে বলে—"এই তোমার অপিসে সার থাকে?" আবার খনার স্বামীকে কুঁড়ে বলায় সে বলে—"শালা সেই মেন জায়গায় ঘা দেচে, সেই গোড়ায়তে ঘা দেচে"। পরবর্তী অংশে খনার স্বামীর কাছে টাকা ফেরত চাওয়ায় সে লোনের অফিসারকে 'জ্যাঠাবাবু', 'পিসেমশাই', 'ভায়রাভাই' সম্বোধন করে খুশি করার চেষ্টা করে।

সংলাপ বা অঙ্গভঙ্গির সঞ্চালনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আবহের মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়। কখনো কোনো মন্তব্যের পর কেবলমাত্র আবহের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় বিষয়টি হাস্যকর।

সুতরাং গাজনপালায় হাস্যরস সৃষ্টিতে আবহের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে নায়ক গলায় বোতল নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে আবহে হাস্যরস তৈরি করেছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে ভজহরির নাকের সর্দির দেখতে পাওয়ায় এবং পাপিয়া ও তার বাবা ভজহরিকে সেকথা জানানোর সময় ভজহরির হাসির সাথে আবহতে হাস্যরস সৃষ্টি হয়।

লোকনাট্যের অভিনেতারা অত্যন্ত প্রতিভা সম্পন্ন। এরা একার সংলাপ বা অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমেই কেবলমাত্র হাস্যরস সৃষ্টি করেন না। পারস্পরিক অভিনয়ের মাধ্যমেও দৃশ্যে হাস্যরস তৈরি করেন যা বেশ কঠিন বিষয়। যেমন- নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে বড় ছেলে নিজের বউকে 'গুরুজন' সম্বোধন করে। তখন মেজ ছেলে পাশ থেকে মন্তব্য করে—"হ্যাঁ, গুরুজন বলতে গ্রাবিটি বেড়ে গেচে।" সেই সময় বড় বউ লাফিয়ে এগিয়ে এসে কোমর বেঁকিয়ে নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গি করতে থাকে। তিনজনের পারস্পরিক অভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যটিতে হাস্যরস তৈরি হয়েছে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে স্বামীর তাড়া করার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ খনার চমকে ওঠা-পারস্পরিক অভিনয় হাস্যরস তৈরি করেছে।

অনেক সময় ছকটির বিষয়ই হয় হাস্যরসাত্মক। সেখানে দুঃখের কোনো স্থানই নেই। আদ্যপ্যান্ত নিটোল হাস্যরসে মোড়া থাকে। সেরকমই কয়েকটি ছক হল- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ এর সপ্তম ছক, দিগ্বিজয়ী গাজন সংস্থার পঞ্চম ছক, শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম ছক এবং নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর পঞ্চম ও সপ্তম ছক।

কোন কোন ছক রয়েছে যার বিষয় দুঃখজনক অথচ কাহিনির মাঝে মধ্যেই হাস্যরস তৈরি করা হয়। এইসব ছকে দুঃখজনক পরিস্থিতিতেও হাল্কা হাস্যরস সৃষ্টি করে দর্শক মনোরঞ্জন ঘটানো হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে বাবা তার সম্পত্তি গালের মধ্যে রেখেছে তাই ভাই বোন দুজনে বাবার গালের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সম্পত্তি বার করার চেষ্টা করে। বাবা কামড়ে দেওয়ায় মেয়ে হাত বার করে ঝাড়তে থাকে এবং কাঁদতে থাকে। দৃশ্যটি বৃদ্ধের প্রতি অবহেলা দর্শকমনে দুঃখানুভূতি তৈরি করলেও সাময়িকভাবে তার মাঝে হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। ঐ ছকের বিষয়টি আপতিক ভাবে মজার মনে হয় কিন্তু তার আড়ালে বেদনা মেশানো থাকে। স্বামী তার স্ত্রীকে অনুরোধ জানায় 'বাবা' বলে ডাকার। এতে দৃশ্যে দর্শক মনে হাসির উদ্রেক করে। স্ত্রী অরাজি হলে স্বামী রাগ করে করে চলে যায়। এরপর সে মঞ্চ ত্যাগ করে আবার ফিরে আসে। এই পুরো দৃশ্যটিতে হাস্যরস সৃষ্টি করে। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে গুয়ারকেলের কাছে তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে সে জানায় বড় ভাই কাঁদছে তাই সেও কাঁদছে। সে জানায় যেহেতু তারা এক সহোদর তাই বড় ভাইয়ের কান্না দেখে সেও কাঁদছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে বউ শ্বাশুড়ীকে মারার সময় ছেলেও তার বউকে সুযোগ পেয়ে লাথির আঘাত করে নেয়। দৃশ্যটি দর্শক মনে দুঃখের মধ্যেও হাস্যরস তৈরি করে। পঞ্চম ছকে লিচু তার স্বামীর কাছে তার মনের

দুঃখের কথা ব্যক্ত করে এর মাঝেই গুয়েপুলিশ ও তার স্বামীর মধ্যে ঘুষি ও লাথি মারা এবং কথপোকথন দৃশ্যটি দুঃখের মধ্যে কমেডি তৈরি করে।

এছাড়াও অভিনেতারা হাস্যরস সৃষ্টির জন্য অভিনয়ের সময় কোন দ্রব্যকেও অবলম্বন করেন। এক্ষেত্রে দ্রব্যের আকার আকৃতি এমন করা হয় যে তা দর্শক মনে হাসির সঞ্চার করে। যেমন—

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে স্বামী মঞ্চে প্রবেশ করে নিমকাঠি দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে। হাস্যরস তৈরীর জন্য নিমকাঠিটি প্রায় এক হাত লম্বা ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ ছকেই এরপর ডাক্তার বিশালাকারের ইঞ্জেকশান বার করে। তাই দেখে শ্বাশুড়ি পালিয়ে যায়। দৃশ্যে ইঞ্জেকশানের আকার এবং শ্বাশুড়ির পালিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটিতে হাস্যরস তৈরি করে।

শিল্পীরা এই হাস্যরস বিষয়টিকে অবলম্বন করে লোকরঞ্জন ঘটানোর চেষ্টা করে। মানব জীবনের অসঙ্গতি, অহংকার সর্বস্বতা, বৈষম্য, আত্মস্বার্থপরতা ইত্যাদি যে ব্যজস্তুতিতে প্রকাশিত হয় তা নির্মল পরিহাসের মাধ্যমে পরিবেশিত হলেও বক্রহাস্যর মাধ্যমে সচকিত হয়ে ওঠেন দর্শকমণ্ডলী। সমাজ কল্যাণে নিরক্ষর লোকরচয়িতার এরকম হাস্যরসের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দান বিশ্বসাহিত্যে সুলভ নয়।

গাজনপালার আঙ্গিক অভিনয়, সংলাপ ও দৃশ্যে চটুলতা প্রয়োগ

গিরীন্দ্রনাথ দাস মন্তব্য করেছেন—

> "যে কোন সাহিত্য, তার সাহিত্য-গুণ যতই লঘু হোক, তবু তা সাহিত্য হিসাবে কিছু না কিছু মূল্যবান বটে। কোন রচনা, সাহিত্য হয়ে উঠেছে কিনা তার মানদণ্ড নির্ণয়ে নানা মনীষীর নানা মত। সাধারণভাবে অনেকে সাহিত্যের মূল্য তার রস বিচারের মাধ্যমে নির্ধারণ করেন। অবশ্য রসবিচার সহজসাধ্য নয়। একজনের কাছে যে রচনা সুন্দর বলে অনুভূত হবে, অন্যজনের কাছে তা ততখানি সুন্দর বা আদৌ সুন্দর নাও হতে পারে। একেবারে অজ পল্লীগ্রামের অতি অল্প শিক্ষিত এবং কোন প্রকারে বাংলা ভাষা পড়তে সক্ষম নগেন মাহাতো বড় জোর সুর করে পাঁচালী পড়তে পারে এবং পড়ে সে রসাস্বাদন করে আনন্দ অনুভব করে কিন্তু তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আবার কলকাতার অমুক সাহিত্য সংঘের অধ্যাপক শ্রী অমুক, 'উর্ব্বশী' কবিতার রসমাধুর্য অনুভব করে তার তারিফ করতে পারেন, কিন্তু তার পক্ষে 'পীরগোরাচাঁদ' পাঁচালীর রসাস্বাদনে কিছু মাত্র তৃপ্তি না পাওয়াই স্বাভাবিক।"[৮]

গাজনপালার পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে চটুলতা। গাজনপালার মধ্যে এই চটুলতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংলাপে বা অঙ্গভাষায় যার প্রকাশ ঘটানো হয়। সমাজের অনেক ব্রাত্য বিষয় অনেক সহজেই সাবলীল ভাবে এখানে ধরা দেয়। নিম্নবর্ণীয় শ্রমজীবী মানুষগুলি অবলীলায় এমন

অনেক বিষয়কে চটুল হাস্যরসের মোড়কে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করেন যা তথাকথিত সভ্য সমাজের চোখে শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করে, তবে গ্রাম্য পরিবেশে সংকীর্ণ মানসিকতায় ও পরিবেশে সেগুলি পরিবেশিত হলেও গাজনপালাকে দর্শকমনে জনপ্রিয় করে তোলার এটিও অন্যতম একটি কৌশল বলা যায়। আবার সমাজ-সংস্কারের কাজটিও পালাকার এই চটুলতার মাধ্যমে করে চলেছেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুগম্ভীর বিষয় যা সহজে এই নিরক্ষর বা স্বল্পস্বাক্ষরিত মানুষগুলোর কাছে তুলে ধরা কঠিন হত বা এদেরকে ওই বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা কষ্টসাধ্য হত সেই বিষয়গুলি খুব সহজেই পালাকারেরা হাস্যরস বা চটুলতার মোড়কে এই মানুষগুলির কাছে উপস্থাপন করে জনসচেতনতামূলক ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ করে চলেছেন। পালাকাহিনির মধ্যে কেমন ভাবে ধরা দেয় সেইসব চটুলতা নীচে তারই উল্লেখ করা হল।

অনেক সময় কোন অশালীন শব্দের প্রয়োগ না ঘটিয়েও অশালীন ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ প্রয়োগ করা হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে ডাক্তার রেগে গিয়ে রোগীকে বলে— "এমন জায়গায় টিপে ধরব না, জীবনে ব্যতা সারবে না।" নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে নায়ক বুঝতে পারে না কেন তাকে ঘন ঘন বাইরে যেতে হয়। এর কারণ সে তার বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলে বৌদি বলে—"কি হয়েচে মানে? তোর দেকতে ওপরে অত ফোলা থাকলে কি হবে? ভেতরে পুরো ভস্কা।" নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে মেজ ভাই যখন বড় বউদির উপর রাগ করে বলে—"দ্যাক দাদা, বৌদি যদি তোর বউ না হয়ে যদি আমার বউ হতো ন্যায়, ধরে টিপে মেরে দিতুম।" বড় বউদিও—"বাবা গো মরে যাব" বলে লাফিয়ে ওঠে। তখন বড় দাদা বলে—"না মহারাণী (বউকে সম্বোধন করে) উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই, ওর টেপা ওব্বেশ আচে।" নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচুর স্বামী গুয়ে পুলিশকে তাড়িয়ে দিলে সে চলে যাওয়ার সময় লিচুকে যে ফেয়ার লাভলীর বোতল দিয়েছিল সেটা ফেরত চায়। লিচু ফেরত দিলে সেটা দেখে লিচুকে বলে— "এই আই ফুলো বোতল দিচি এক রাতে বোতল চেপ্টে দেচে।" নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে দেওর—"এ জল সে জল নয় সোনা"। ঐ ছকেই দেওর—"তাই তো বলি, আমি খাচ্চি দাচ্চি ঠিক আচি কিন্তু পজিশান মতো গে জব্দ হয়ে যাচ্চি। না বাবা বেশি দেরি করব না..."

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে ব্যাপারি বলে- "তা তুমি একা মে ছেলে? তোমার আগে আরও চার পাঁচটা মে-ছেলেকে আমাকে করে আসতে হচ্ছে।" নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে প্রধান সাহেব—"এ নাতবউ, এক কাজ কর। আমার দুমরে নে ঐ গত্তে আবার ঢুইকে দে।" ঐ ছকেই গুয়ে পুলিশ—"ও তুমি খাটের নীচে ঢুকে ইঁট গাঁত তোচ?"

পারস্পরিক কথপোকথনেও থাকে অশালীনতার ইঙ্গিত। যেমন- নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে রাতের বেলায় লিচুর ঘরে গুয়েপুলিশ আর প্রধান সাহেবকে দেখে লিচুর স্বামী তাদের সেখানে থাকার কারণ জানতে চাইলে লিচুর স্বামীকে গুয়ে পুলিশ —"পোদান ঘরের ভেতর ইঁট গাঁতচেল...?"

লিচুর স্বামী –"এই পোধান নয় রাজমিস্তিরি, সে নয় ইঁট গাঁতচেল, তা তুই একানে কি কত্তে এইচিস?"

গুয়ে পুলিশ তখন –"আ'ই (আমি) তো পোদানের কাচে সিমেন্ট বালি মেকে দিচ্চিলুম।" আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে ফোনে কথোপকথনের সময় নায়িকা বলে–"হ্যালো, এটা কোথায় লাগল?" অপর প্রান্তে বলে–"কেন? ঠিক জায়গায় লেগেছে। আমার হৃদয়ের মাঝখানে।" শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে গানের মধ্যে নায়িকা গায় –"ওরে আমি শুধু মধুভরা মৌচাক।"

নায়ক গায়– "না দিলে করব আজ বাজিমাত।"

গানের ভাষাতেও থাকে অশালীনতার ইঙ্গিত। যেমন– আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়িকা বলে –"ওরে আমি শুধু মধুভরা মৌচাক।"

নায়ক গানের মাধ্যমে উত্তরে জানায়–"না দিলে করব আজ বাজিমাত।"

নায়িকা–"মে দেকলে কেন তোদের লালা ঝরে ইডিয়েট...ইডিয়েট......ইডিয়েট"

নায়ক উত্তরে বলে–"যৌবন ভরা জামরুল খেতে লাগে বেশ... লাগে বেশ... লাগে বেশ।"

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকের 'মুখ্য গানে'র মধ্যে পাত্রীর মা মঞ্চে প্রবেশ করে তার স্বামী জগন্নাথ মাখালের কাছে জানতে চায় সে ছুট পাড়াপাড়ি করছে কেন? জগন্নাথ জানায় একটু পরে তার 'গা'র' ওপর ছুট পাড়াপাড়ি করবে।

কখনো কখনো দ্ব্যর্থক শব্দের মাধ্যমে অশালীনতার প্রকাশ ঘটে। যেমন– আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়ক নায়িকা মধুকে বলে–"আমি মধু খুঁজে গেরামময় ঘুরে বেড়াচ্চি, বাজারে বেড়াচ্চি আর মধুর চাক নিয়ে আমার সামনে ঘুরতেছে।" নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে খনার স্বামী প্যান্টের মধ্যে গুঁজে রাখা বাচ্চার উদ্দেশ্যে বলে–"সেই উল্টো পাল্টা জায়গায় হাত দে করে দিচিস?"

কথোপকথনের মাধ্যমেও এরূপ ঘটে। যেমন– শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে ময়না ও ডেঙ্গুর কথপোকথন, নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে নায়ক ও নায়িকার কথপোকথন, নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ-এর তৃতীয় ছকে সুতি খাল মাপার দৃশ্যে মাটি কাটার সময় তার যে অবস্থা হয়েছিল সে অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার সময় নায়ক ও তার বউদির কথপোকথন, সুতি খালের মাপ নেওয়ার সময় নায়ক ফোকে ও নায়িকা চৈতালির কথপোকথন, শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে নায়ক ডেঙ্গু ও তার বউদির কথপোকথন, সপ্তম ছকে হ্যান্ডেল, হ্যান্ডেলের বউ ও ব্যাপারীর মধ্যে কথোপকথনে অশালীন ইঙ্গিত প্রকাশ পায়।

কখনো কখনো ভাষায় থাকে অশালীনতার ইঙ্গিত। সংলাপের মধ্যেও থাকে অশালীনতার ব্যবহার। যেমন- নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ লিচুর নাম শোনার পর বলে—"এবার আমি লিচু ছিঁড়িই খাবো।" এরপর গুয়ে পুলিশ এভাবে লিচুকে ডাকে—"লি—চুদি", "লি—চুদি"। সপ্তম ছকে ছেলে ও ছেলে বউ এর সাথে বৃদ্ধ বাবার ঝগড়ার সময় ছেলে বউকে সে বলে—"তুই উৎপাত করবিনি উৎপাত কললে চিৎপাত কোদ্দেবো"। ঐ ছকেই বৃদ্ধ এবং তার স্ত্রীর কথপোকথন—

বৃদ্ধ—"যা বলব তাই করবি? আউড়া ... আউড়া..."

বৃদ্ধা—"এ দ্যাখো এসব কি কথাবার্তা গো?"

বৃদ্ধ—"আউড়া মানে আমার কাচে এসো।"

বৃদ্ধা—"আউড়া মানে কাচে যেতে হবে?"

বৃদ্ধ—"হ ... এ হিন্দি বোজে না। আমি হিন্দীর গু মেড়িয়ে এইচি..."

নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে সন্ন্যাসী মাতঙ্গিনীকে বলে—"আমিও সুযোগ পেলে ঐ নাড়ার গাদায় ফেলে এমন ঘষা ঘষে দোব। মাতার চুলটা তুলে নিয়ে বেল বার করে ছেড়ে দোব।" শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে রাজকুমার—"নাম আমার প্রত্যুষ। বিশাল রাজ্যের রাজপুত্র আমি। আসিয়াছিলাম এখানে শিকার করিবার তরে। আর তোর মতোন পাহাড়ি ফুল দেখিয়া আমার দেহে উঠেছে জাগিয়া। আয়—আয় মোগলি আয় তোর ঐ সৌন্দর্যকে আমি, আমি না, চুষে চুষে ভোগ করব।"

সংলাপের মধ্যে প্রায়শই গালি ব্যবহার হয়। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে মাতাল বলে —"শালা আমি জগন্নাথ মাখাল।" সপ্তম ছকে ঝগড়ার সময় স্ত্রী নিজেই স্বামীকে সগর্বে বলে তাকে একডাকে সকলে চেনে কারণ সে 'ভাতার মারে'। ঐ ছকেই স্ত্রী তার স্বামীকে বলে—"তোমার মতো 'ভাতারের' সাথে সংসার করার চে গলায় দড়ি দিয়ে মরা আমার অনেক ভালো।" অষ্টম ছকে তিশার স্বামী তিশাকে সম্বোধন করে বলে—"আরে ঐ শালী যদি করবি চালাকি পরে বুঝবি জ্বালাটা কি।" আবার কখনো বলে—"তুই হলি একটা রাস্তার মে-বেজন্মা", কখনো বলে—"ওই শালী কথাটা কানে গিয়েছে?", কখনো বলে—"... শালী তোর বাপ সে তো অকালেই পটল তুলেছে আর তোর যে ছোট ভাই—শালা একজন তো চোখেই দেখতে পায় না আরেকজন কানা অন্ধ।" নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচু প্রধান সাহেবকে দেখার পরিবর্তে তিন লাখ টাকা চায়। প্রধান সাহেব বলে—"তিন লাক কি পয়োজন পললে চার লাক পোদে আমি ঢুকিয়ে দেব।" তৃতীয় ছকে দেওর—"মাল তোল পরীক্ষা করব।" শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে অনেক ছেলের সাথে প্রেমের অভিনয় করে তাদের সর্বস্বান্ত করেছে মৌপিয়া একথা জানার পর তার প্রেমিক

তাকে অশ্লীল ভাষায় বলে—“শালা রেন্ডি, শালা ছেলে খাকী, কত ছেলের মাথা খেইচি এরকম, শালা মানুষ খাকী ... থুঃ (থুথু ছুঁড়ে দেয়)।” ঐ দলের ঐ ছকে ২য় ব্যক্তি—“ওয়াং ...বোকাচোদা ... হ্যাং হাং হ ...” । নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে বোউদি তার দেওরকে যে সমস্ত উক্তি করে— “ও মুকপোড়া, আমার বাবা কি আর বেঁচে আচে যে তোমার কাজটা এসে করে দে যাবে?”, “আ-হা-হা-হা, হাঁড়া কোথাকার!”, “আই হ্যাড়া তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু।” চতুর্থ ছকে মেজ ছেলে মহিলা পুলিশেকে উদ্দেশ্য করে বলে—“আরে শালা! কি সুন্দর দেক দিনি।” পঞ্চম ছকে গুয়ে পুলিশ বলে— “তা আমার নয় কট বাননের মতো দেকতে তোর তো ভালো দেকতে, তোর বউ ঘরে লোক ঢোকাচ্চে? ম্‌ম্‌ম্‌ শালা নিজে হোঁদল কুতকুতের বাচ্চা।” ঐ ছকেই লিচুর স্বামী—“এ শালার চরিত্র খারাপ হলে কি হবে এর টনটনে জ্ঞান আচে এর খুব ভালো জ্ঞান আচে।” সপ্তম ছকে বাবা ছেলেকে বলে—“শালা দাঁতের ফাঁকে চুল বেঁধে গেচে। এই—এই তোর মাতা কেমড়ে খে নোব। তোর কালো পিতিবি সাদা করে দোব। ও শালা চুলে বেঁধে গেল গো।” এরপর বাবা চরিত্রটি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে—“শালা বুড়ির মাংস টকসি হয়ে গেচে।” এরপর বাবা চরিত্রটি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে—“ও—ই গোলা ধাক্কা দিয়ে তোদের করব রে ঘর ছাড়া আমি হলাম বিলেত ফেরত পাশ করা মাগের ভেড়া।” শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে তপন ঘটককে ফোনে বলে —“এই শুয়ারের বাচ্চা মারের ভয় থাকে, টাকা ফেরত দে।” ঐ ছকেই বাকারি চেটোকে বলে—“তবে গো শুয়ারের বাচ্চা আমাকে বিলিতি পেঁচা বলচ কেনো? অ্যা ... ই শুয়ারের বাচ্চা, শালা শুয়ারের নাতি!”। নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকে বৃদ্ধ এবং তার স্ত্রীর কথোপকথনে— বৃদ্ধ বলে —“হ ... এ হিন্দি বোজে না। আমি হিন্দীর গু মেড়িয়ে এইচি...”

সংলাপের মাঝে অশালীন শব্দেরও প্রয়োগ হয়। যেমন- নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে বৌদি—“ও বাবা কে আমার সঙ্গে চোপরা করে দ্যাক। এ তুই আমারে চিনিস? এই খাকী তোর মতো তিন চারটে মেয়েছেলে আমি গাঁটরি করে ...।”

বৌদি—“এই-এই বুক চাবড়া এ সব হরিনামের মাঝখানে ডিজে আওড়া এর মানেটা কি রে?”

নায়ক—“হরিনামে হার মানাচ্ছে আওড়া ডিজে।”

দেওরের হাবভাব দেখে বৌদি তাকে বলে—বৌদি—“এ দ্যাকনা তোর কি খ্যাঁচ এয়েচে?”

বৌদি—“আর সেই রোগটা হল ঘন ঘন পেচ্ছাপ করা আর সেই জন্যে। ঐ পেচ্ছাপ বোতলে ভর্তি করে সোজা চলে যাচ্ছিল ডাক্তার খানায় পরীক্ষা করবে বলে, তার মাঝখানে তুমি এমন কেলেঙ্কারি করে দিলে আমার কোচের (সম্বোধন) মালটা গেল পড়ে!” চতুর্থ ছকে বউ শাশুড়ি সম্পর্কে দর্শকদের কাছে বলে—“দিদিগো দু মিনিট সময় একনো বাকি আচে আর সেই দু মিনিটের ভেতরে বুড়ি আমার বাড়ি থালা থালা গিলেচে আর ঝোড়াখানেক বাস্তে (বাস্ততে) হেগেচে।” পঞ্চম ছকে প্রধান সাহেব— “তিন লাক কি, পয়োজন পললে চার লাক পোদে ঢুকিয়ে দেব।”

অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও ঘটে অশালীনতার প্রকাশ। যেমন- আদি শবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে স্বামী ও স্ত্রী ঝগড়ার সময় স্ত্রী বাম হাত দিয়ে শাড়ি হাঁটুর উপরে উঁচু করে তুলে ধরে।

নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে লিচুকে প্রধান সাহেব একটু 'দেখতে' বলে। লিচু জানতে চায় যে, প্রধান তো কদিন পরেই মরে যাবে তাহলে প্রধানকে কি দেখবে? প্রধান তখন বলে—"ওই তো, মরে যাবার আগে একটা খালি 'খেলে যাব'। শুদ্ধ একটু উলু উলু আর একটু খুলু খুলু।" এই সময় তার অঙ্গভাষায় অশালীনতা প্রকাশ পায়। তৃতীয় ছকে বৌদি—"ও বাবা কে আমার সঙ্গে চোপরা করে দ্যাক। ও তুই আমারে চিনিস? এই খাকী তোর মতো তিন চারটে মেয়ে ছেলে আমি গাঁটরি করে রাখি। কি ভেবেচিস তুই?"- বলার সময় অশালীন অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে। এরপর বলে-"অ্যাঁ ! ম্যা গো ম্যা কন্যাশীরী পকল্প! সেটা আবার কি জিনিস গো?"- এই সংলাপের সাথে তার বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে অশালীন ভাব প্রকাশ পায়। আবার পরবর্তী অংশে বলে—"আ-হা-হা-হা-হা কটকটি বুড়ি কট কট কট কট করে কতা বলে শুদু।" শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থাদলের ষষ্ঠ ছকে ভিখারি মৌপিয়ার দুই প্রেমিককে জানায় সে বাথরুমে যাবে হিসু করতে তাই ভিক্ষার কৌটোটা একজনের হাতে দিয়ে ধরতে বলে—"হিচু করেগা" বলার সাথে যে অঙ্গভঙ্গিতে অশালীন ভাবের প্রকাশ পায়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে ছোট ভাই ও বড় বউ এর ঝগড়ার দৃশ্যে ছোট ভাই বলে—"ফাঁকা জায়গায় ঝাড়ব আয়...।" সাথে অশালীন অঙ্গ-ভঙ্গি করে। ঐ দলের ঐ ছকেই ছোট ভাই এর বউ মন্দোদরী মঞ্চে প্রবেশ করেই—"কি হলটা কী?" বলে লাফাতে থাকে। বউদির দিকে ভেংচি কেটে দেওর ব্যঙ্গ করে। এরপর মারামারির দৃশ্যে বৌদির দিকে দেওরের অশালীন ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে। গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে বৌদি—"আমার দেওর কিচু না পারলেও—এইটা পারে এইটা" সংলাপের সাথে অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে। ঐ দলের সপ্তম ছকে বেপারি হ্যান্ডেলের বউকে—"জোরে করান একখান গুটখান দাও না" – বলার সময় তার অঙ্গভাষায় অশালীনতা প্রকাশ পায়। দৃশ্যের মধ্যেও কখনো কখনো অশালীনতা লক্ষিত হয়। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে নায়ক ফোকে ও নায়িকা চৈতালীর সুতি খালের মাপ নেওয়ার দৃশ্যের কথপোকথন ও আলো আঁধারিতে এই দৃশ্যটি দেখলে ও শুনলে অশালীন দৃশ্যের ইঙ্গিত দিলেও আসলে তারা সুতি খাল মাপছে। নিউদিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকের চুম্বন দৃশ্য অশালীনতার ইঙ্গিতবহ।

৪.৬ গাজন অভিনয়ের অঙ্গিকগত বিশেষত্ব

গাজন অভিনয়ের আঙ্গিকগত বিশেষত্ত্ব আলোচনার সূচনায় আঙ্গিকগত অভিনয় বিষয়টি আলোচনা প্রয়োজন তাই আঙ্গিকভাষা বা অঙ্গভাষা বিষয়ে প্রথমিক আলোচনা প্রয়োজন।

অঙ্গভাষা

ভাষার সাহায্যে বা ভাষা ব্যবহার না করে মানুষ যখন তার আবেগ, অনুভূতি, মনোভাব ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলিকে দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সচেতন বা অচেতন ভাবে যে সব ভঙ্গি ব্যবহারের দ্বারা এক বা একাধিক বক্তব্য প্রকাশ করে যা অন্যেও সহজেই বুঝতে পারে সেটিই সাধারণভাবে অঙ্গভাষা বা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলে পরিচিত।[৯] ড. সনৎ কুমার মিত্র (২০০৩) বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন অঙ্গভাষা। তিনি অঙ্গভাষার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন—

> "ভাষা সহযোগে অথবা ভাষা আদৌ ব্যবহার না করে দেহের, হাতের, মাথার, পায়ের, মুখের, হাটার, বসার, শোয়ার কায়দা অর্থাৎ সমস্ত শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সচেতন অথবা অচেতন ভাবে ভঙ্গি ব্যবহার করে একটি বক্তব্য প্রকাশ করে—যা অন্যেও সহজেই বুঝতে পারে তাকেই অঙ্গভাষা বলে।"[১০]

আঙ্গিকভাষার বৈশিষ্ট্য—

১) অঙ্গভাষা হল ভাববোধক ভঙ্গি

২) ভাবভঙ্গি-অভিব্যক্তি বিচলন অনৈচ্ছিক

৩) ভঙ্গিকে প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়

৪) অঙ্গ-ভঙ্গি সমূহ অর্থ বা বার্তার সংবাহক

৫) অঙ্গভাষার কোনো লিপি নেই

৬) অঙ্গভাষার ভাণ্ডার সীমিত, মুখভঙ্গি অঙ্গভঙ্গি এর সম্বল

৭) গূঢ়ার্থ, আবেগ এবং সংঘাতের সংবাহক

৮) অনুভববেদ্য

৯) অন্তর সত্যের প্রকাশক

১০) এটির বোধগম্যতা বিশ্বজনীন

আঙ্গিকভাষার বৈচিত্র্য

অঙ্গভাষা জন্মগত ও স্বভাবসিদ্ধ। এর বৈচিত্রও অসীম। বিশ্ববিখ্যাত অঙ্গভাষা বিশারদ এলান পীজ অঙ্গভাষাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে— অঙ্গভাষা বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর

পূর্ববর্তী সময়ের সর্বাধিক উল্লেখিত গবেষণাকর্মটি হল চার্লস ডারউইনের বইটি। সেখানে মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি ও অঙ্গভাষা বিষয়ে আধুনিক গবেষণা করা হয়েছে। তারা প্রায় দশ লক্ষ্য ভাষাহীন ইঙ্গিত ও সংকেত নথিভুক্ত করেছেন।

১। এলান পীজ মনে করেন, শাব্দিক মাধ্যম কেবলমাত্র সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।[১১]

২। ভাববিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত মৌলিক অভিব্যক্তিগুলি সারা পৃথিবীতে একই রকম। যথা—হাসি, কান্না, রাগ ইত্যাদির অভিব্যক্তি একই রকম।

৩। অঙ্গভাষাকে মানুষ জন্মগতভাবে আয়ত্ত করে। এটি সহজাত।

৪। কোনো কোনো অভিব্যক্তি সার্বজনীন। যথা—কাঁধ ঝাঁকানো, প্রণাম।

অভিনয়ে আঙ্গিকভাষার ব্যবহার

অঙ্গভাষা মুখের থেকেও শতগুণে বিজ্ঞানসম্মত ভাষা। এ ভাষা যেমন মনের ভাষা তেমন অঙ্গ-রঙ্গের ভাষা তাই নৃত্যে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে এ ভাষার গুরুত্ব অনেক। অঙ্গ বলতে যেহেতু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গ সমস্তটাকে একসাথে বোঝায় সেইভাবে আঙ্গিক অভিনয় বিষয়টিও ব্যবহার হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব প্রকাশের মাধ্যমে যে অভিনয় করা হয় সেটিকেই আঙ্গিক অভিনয় বলে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গের সমবেত বা সমন্বিত ভাব ভঙ্গি বা কৌশলের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা হয় যার মাধ্যমে আনন্দ, বেদনা, অভিমান, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক বিষয়গুলি বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কৃত্রিম ভাবে প্রকাশিত হয়ে দর্শকের মনকে প্রভাবিত করে।

গাজনপালা অভিনয়ের আঙ্গিকভাষায় অতিরঞ্জন

মুকাভিনয় রূপে অভিনয়ের উদ্ভবকাল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৩৬৪ অব্দে।[১২] গ্রীক শব্দ এর অর্থ হল 'অনুকৃতি' যার ভাব ক্রিয়ার উপস্থাপনা প্রকাশিত হয় দেহভঙ্গি ও পদক্ষেপের মাধ্যমে। এর একটি ধারা থেকে যুদ্ধ নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। সভ্যতার বিবর্তনের ধারা বেয়ে সেই প্রাচীন মুখাভিনয়ের জন্ম হয়েছে, তারপর ক্রমশ উদ্ভব হয়েছে আঙ্গিক অভিনয়ের। তাই আঙ্গিক অভিনয় নাটকের সাথে ভীষণ ভাবে জড়িয়ে থাকে। যার প্রকাশ লোকনাট্যেও দেখা যায় আর গাজনপালার পরতে পরতে আঙ্গিক অভিনয় থাকলেও কোনো কোনো ছকে অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জিত ভাবে অঙ্গভাষাকে উপস্থাপন করা হয়। গাজনপালাতে অভিনয়ের মাঝে অঙ্গভাষার ব্যবহার প্রায়শই হয়ে থাকে।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত উক্ত দলগুলির পাওয়া তথ্যের উল্লেখ করে নীচে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হল। যেমন— নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর চতুর্থ ছকে গানের শেষে সঞ্জয় হাতের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়

গান শেষ হয়ে গেছে। এরপর সঞ্জয় হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে সংলাপ বলা শুরু করে। সঞ্জয় মনে না থাকা বিষয়টি মাথা চুলকে প্রকাশ করে। সঞ্জয় মালার কথা ভুলে গেছে সংলাপটি বলার সময়ও মাথা চুলকিয়ে তা আঙ্গিক ভাষায় প্রকাশ করে। হরি যখন বলে বাড়ির কত্তা বউমণি। মণি খুশির ভাব বোঝাতে দুলতে থাকে। হরির গান শুনে মণির রাগ হয়েছে বোঝাতে মনি নিজেই নিজের হাতে ঘুষি মারে। মণির কথা শুনে হরি তার হাসিকে ব্যঙ্গাত্মক হাসি বোঝাতে গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে হাসে। সঞ্জয় স্বগোতোক্তি করছে বোঝাতে পিছনের শব্দগ্রাহকযন্ত্রে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ এর ষষ্ঠ ছকে ১৬ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড থেকে-১৬ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড পর্যন্ত মন্দোদরীর অঙ্গভাষায় অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ রয়েছে। মঞ্চে প্রবেশ করেই— "কী হলোটা কী!" বলার ধরনে প্রকাশ পেয়েছে। আবার ১৯ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড থেকে-২০ মিনিট ১৪ সেকেন্ড পর্যন্ত অঙ্গভাষায় গ্রামীণ ঝগড়া ও মারামারি ঘটেছে এখানে এবং ২৩ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে ছোটবউ মন্দোদরী —"আমি কি বংশের সে তুমি জানো?" সংলাপ বলার সময় অঙ্গভাষায় অহংকারের প্রকাশ ঘটায় মাথা উঁচু করে বুক চাপড়িয়ে।

তবে অঙ্গভাষায় অতিরঞ্জিত ভাবের প্রকাশ গাজনপালার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যায়। বিশেষত তৃতীয় ছকের চরিত্রগুলিতে এবং বিশেষ করে নায়কের বৌদি চরিত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অতিরঞ্জন। উক্ত চারটি দলের পরিবেশনায় অঙ্গভাষায় অতিরঞ্জন প্রকাশের কিছু উল্লেখ করা হল। যথা- আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে দেওরের কান্নার কারণ জানতে চেয়ে বৌদি তাকে মারে। তাকে মারার সময় দেওরের বৌদির চরিত্রের আঙ্গিক ভাষায় অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দলের সপ্তম ছকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মারামারি করার দৃশ্যে স্বামী মঞ্চের উপরের সিঁড়িতে শুয়ে পড়ে স্ত্রী হাঁটুর উপরে শাড়ি তুলে তাকে লাথি মারতে থাকে। এখানে স্ত্রী চরিত্রটি আঙ্গিক অভিনয়ে অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দলের অষ্টম ছকে তিশার উপরে নির্যাতন করার সময় তার স্বামী তাকে লাথি মারে এবং সাথে সাথেই সে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। এখানে তিশার প্রতিক্রিয়ায় অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ঐ দলের তৃতীয় ছকে নায়কের ও নায়িকার মারপিট হওয়ার দৃশ্যে নায়কের বৌদি চরিত্রটির অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করে নায়িকাকে সরিয়ে দিয়ে সজোরে লাথি মারে। এই সম্পূর্ণ অভিনয় অংশে অভিনেতার অঙ্গভঙ্গিতে অতিরঞ্জিত অভিনয় ধরা পড়ে। ঐ দলের সপ্তম ছকে স্বামী স্ত্রী ঝগড়ার সময় স্ত্রী বাম হাত দিয়ে শাড়ি হাঁটুর কাছে উঁচু করে তুলে ধরে। দৃশ্যটিতে স্ত্রীর আঙ্গিক অভিনয়ে অতিরঞ্জিত ভাবের প্রকাশ পেয়েছে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে ০৬ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডে বৌদির মঞ্চে প্রবেশ করে যখন বলে —"হায় ... ভেঙে দিয়েচে" তখন মৌখিক অঙ্গভঙ্গিতে অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। বুকে, মাথায় হাত দিয়ে ক্ষতি হয়ে গেছে বোঝানোর সময় মৌখিক অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ করে মঞ্চে প্রবেশ ঘটেছে আবার ০৭ মিনিট ২৮ সেকেন্ডে দেওর হাত পা ছোঁড়ার মাধ্যমে বোঝায় যে সে ক্যারাটে প্র্যাকটিস করছে। তার শূন্যে ঘুষি ছোঁড়া এবং তার বৌদির প্রতিক্রিয়ায় সর্বত্রই অভিনয়ের মধ্যে অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ০৭

মিনিট ৩৪ সেকেন্ড নাগাদ দেওরকে ব্যঙ্গ করে তার বৌদি। কারণ জমিতে পালা বেড়ে জল থৈ থৈ করছে। এখানে ব্যঙ্গাত্মক সংলাপের পাশাপাশি বউদি চরিত্রের আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমেও ব্যঙ্গাত্মক ভাব প্রকাশ পেয়েছে অতিরঞ্জিত ভাবে এবং ০৭ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে- বৌদি নায়ককে বলে —"ও মুকপোড়া, আমার বাবা কি আর বেঁচে আচে যে তোমার কাজটা এসে করে দে যাবে?"—এই সংলাপ বলার সময় তার অভিনয়ের মধ্যে অতিরঞ্জিত অঙ্গভঙ্গি ও মৌখিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। সেই সাথে দেওরকে জল ছেঁচতে বলায় সে বৌদিকে বলে, তার বাবা যেন এসে কাজটা করে দেয়। একথা শোনার পর বৌদির যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তাতে অতিরঞ্জিত ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। ১৫ মিনিট ২৮ সেকেন্ডে- নায়কের গায়ের ওপর বসে নায়িকা তাকে আঘাত করায় নায়কের বৌদি সেখানে উপস্থিত হয় এবং নায়িকাকে পদাঘাত করে। প্রতিটি পদাঘাতের সাথে সাথে নায়িকা প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লাফিয়ে পিছিয়ে যায় আর নায়ক অর্থাৎ তার দেওরকে একটা পদাঘাত করার সাথে সাথে তিনবার প্রতিক্রিয়া করে। সামগ্রিকভাবে দৃশ্যটিতে তিনজনের অভিনয়ই অতিরঞ্জিত মনে হয়। ১৬ মিনিট ১৮ সেকেন্ডে যুবতীর সাথে ঝগড়ার সময় বৌদি চরিত্রটি লাফাতে লাফাতে বলে—"ও বাবা কে আমার সঙ্গে চোপরা করে দ্যাক। এ তুই আমারে চিনিস?" এরপরের সংলাপ—"এই মরা খাকী তোর মতো তিন চারটে মে ছেলে আমি গাঁটরি করে ... কি ভেবেচিস তুই?" বলার সময় শাড়ি হাঁটুর কাছে টেনে তুলে ঔদ্ধত্য ও অশালীন ভাব বোঝাতে চায় অতিরঞ্জিত ভাবে। ১৭ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে দেওর কীর্তনের সুর করলে বৌদি কান চেপে ধরে "ও বাবা গো..." বলে চিৎকার করে। ২০ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডে নায়ক নায়িকার কাছে ক্ষমা চাওয়ার আগে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করে অতিরঞ্জিত অভিনয়ের মাধ্যমে হাস্যরস তৈরি করতে চায়। ২১ মিনিট ০৮ সেকেন্ডে নায়ক গান গায়—"শোল মাছে মদ্দে ডিম বর্ষাকালে থাকবে কি" তখন বৌদির সংলাপ—"একসঙ্গে খালি ডিম ছাড়তেচে আর ডিম ছেড়তেচে এদের বাচ্চা আর হচ্চে না।" এই সংলাপের সাথে তার অভিনয়ের সময় অতিরিক্ত গা দোলানো এবং মৌখিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে যা অতিরঞ্জিত মনে হয়। ২১ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে নায়িকার কাছে নায়ক যখন জানিয়েছে সে আসলে কোথায় যাচ্ছিল, কেন যাচ্ছিল, কি ভাবে পড়ে গেল। তখন তার অঙ্গভঙ্গিতে অতিরিক্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ঐ ছকেই দেওরের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করার সংলাপের সাথে অভিব্যক্তিতে অতিরঞ্জিত ভাব লক্ষিত হয়। যখন সে বলে—"আ-হা-হা-হা ... ওসুদ টসুদ খেচিলিস?" পরবর্তী অংশে নায়িকা যখন বুঝতে পারে বোতলে ইউরিয়া নয় ইউরিন ছিল তখন নায়ক লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় এবং তাকে বোতল ভরে দিতে বলে। নায়কের প্রতিক্রিয়াটি অপ্রাসঙ্গিক ও অতিরঞ্জিত মনে হয়। এরপর নায়ক নায়িকাকে বলে বকনে বাছুররা ছোট আস্তে আস্তে যখন বড় হয় তখন তাদের 'যৌবন চাকার দেয়' এই সংলাপ বলার সময় তার অঙ্গভঙ্গিতে ও মৌখিক অভিব্যক্তিতে অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পায়। সেই সাথে নায়ক নায়িকাকে এও বলে যে বকনে বাছুরেরা শিং দিয়ে বাঁধ ভাঙে। সে কথা জানানোর ধরন, অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তিতেও অতিরঞ্জিত ভাব লক্ষিত হয়। আবার নায়কের গায়ের উপর বসে নায়িকার আঘাত করার এই দৃশ্য দেখে নায়কের বৌদি বলে— "হায়রে ভগবান! এ কি—উৎপাত, মদ্দের উপরে মেয়ে চিৎপাত" সংলাপ বলার সাথে সাথে

তার অঙ্গভাষা ও অভিব্যক্তিতে অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এরপর বৌদি লাফাতে লাফাতে নায়িকাকে বলে—"ও বাবা এ আমার সঙ্গে চোপরা করে দ্যাক। এ তুই আমারে চিনিস?" ঘাড় দুলিয়ে বলে। এরপর শাড়ি হাঁটুর কাছে তুলে গা দুলিয়ে বলে—"এই খাকী তোর মতো তিন চারটে মেয়ে ছেলে আমি গাঁটিরি করি। কি ভেবেচিস তুই? মারব লাথি"। সম্পূর্ণ দৃশ্যে অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এরপর নায়িকার কাছে তার ভালোবাসার কথার প্রকাশ করার সময় নায়ক অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ করে। এই দৃশ্য দেখে বলে—"অ্যাই দ্যাখো তোমার কি বিকার টিকার এয়েচে নাকি?" ঐ দলের চতুর্থ ছকে ০১মিনিট ২০ সেকেন্ডে বড়বউ বুক চাপড়িয়ে সংলাপ শুরু করে তার শ্বশুর ও শাশুড়ির সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করার মাঝে যখন বলে—"তায়লে এই সব বুড়ির কি করতে হবে?" এই সংলাপের সময় লাফিয়ে ওঠা দেখে দর্শকের কাছে অতিরঞ্জিত মনে হওয়া স্বাভাবিক। ০৪ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে বড় ছেলে স্ত্রীকে গুরুজন বলায় সে কোমরে হাত দিয়ে অতিরঞ্জিত ভাবে গর্বের প্রকাশ দেখায়। ০৬ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে বড় বৌদি মেজ ভাইকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলার দৃশ্যে তার অঙ্গভাষা ও মৌখিক অভিব্যক্তিতে অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে বৌদি চরিত্রটির মঞ্চে প্রবেশ করা ও সংলাপ বলার সময় তার অঙ্গভাষায় ও অভিব্যক্তিতে অতিরঞ্জিত ভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

বর্তমানে গড়ে ওঠা পেশাদারি গাজনপালা দলগুলির নিজস্ব একটি আঙ্গিকে পালাগুলি পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেই নির্দিষ্ট আঙ্গিকেই সমস্ত দলের পালা পরিবেশিত হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত প্রায় সারাবছরই পরিবেশিত এই পালাগুলির জন্য এখন মঞ্চ নির্মাণ করা হয় তাই পূর্বের গাজনপালার আসর আর বর্তমানে গাজনপালার আসরে দেখা দিয়েছে বিস্তর ফারাক। দর্শক রুচির কথা ভেবে প্রযুক্তিওবিদ্যার প্রয়োগে তাকে করে তোলা হয়েছে অনেক বেশি আকর্ষনীয়। যন্ত্রানুষঙ্গ থেকে আলো সর্বত্রই তার প্রভাব স্পষ্ট। কেবলমাত্র পুরাতনী দেশি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সে আর সীমাবদ্ধ নেই সেখানেও রয়েছে পাশ্চাত্য প্রভাব। পালা রচনাতেও দর্শক রুচি ও তাদের জীবনযাত্রার চিত্র বজায় রাখা হয়। এছাড়া অভিনেতাদের অভিনয় প্রতিভার গুণে দর্শকগণ পালাদর্শনের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির সাথে নিজেদের একাত্ম করে ফেলা, তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করার মধ্য দিয়ে যেন গাজনপালার কাহিনিগুলি তাদের জীবনেরই কথা বলে। পাশাপাশি হাস্যরস, চটুলতা গাজনপালার দর্শকের কাছে এটির প্রতি আকর্ষনের অন্যতম কারন। যদিও গাজনপালাগুলি নানা দিক দিয়ে অতিরঞ্জিত বলা যায় তবুও এই পালাগুলি যেন তাদের নিত্য জীবনেরই গল্পগাঁথা।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সনৎ কুমার মিত্র, *পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ: ২৩শে মার্চ ১৯৮৫), ৮-৯

২. S.Krishnaswami. *Some Indian folk instrument like the dholok, the naal, the anand lahari, the morchank, the ektara and varieties of drums are being lifted out the narrow confines of conventional playing and increasingly harnessed for the purposes of modern Indian music: Musical Instrumentb of Indiai*. (Delhi:1971), 21

৩. সনৎ কুমার মিত্র, *পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ: ২৩শে মার্চ ১৯৮৫), ১৩

৪. রাজ্যেশ্বর মিত্র, প্রাচীন বাঙলার সঙ্গীত (কলকাতা: ১৩৭১), ৮১-৯৩

৫. ডঃ সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা* (কলকাতা: ১৯৭৪), ৩০৪

৬. বিমেলেন্দু হালদার, *দক্ষিণ ২৪ পরগণা যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা (প্রথম খণ্ড)* (সোনারপুর: প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০১১), ৩০-৩১। রসাত্মক আবেদনের মধ্যে হাস্যরস ও আদিরসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

৭. সুরেশ চন্দ্র মিত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন* (কলকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১০), ১০৩

৮. গিরীন্দ্রনাথ দাস, *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা* (কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯৮), ২২

৯. "অঙ্গভাষা সংজ্ঞা ও বিষয় বৈচিত্র্য", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* অঙ্গভাষা বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-১ (বর্ষ ১৭, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, বৈশাখ- আষাঢ়, ১৪১১): ১৬২। অঙ্গভাষা অর্থাৎ আঙ্গিক অভিনয়।

১০. সনৎকুমার মিত্র, "সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে লোকভাষা", *অঙ্গভাষা* (কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), ১২

১১. "অঙ্গভাষা সংজ্ঞা ও বিষয় বৈচিত্র্য", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* অঙ্গভাষা বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-১ (বর্ষ ১৭, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, বৈশাখ- আষাঢ়, ১৪১১): ১৬৪

১২. "অঙ্গভাষা বিশ্বজনীন সংযোগ মাধ্যম", *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* অঙ্গভাষা বিশেষ সংখ্যা, সংখ্যা-১ (বর্ষ ১৭, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, বৈশাখ- আষাঢ়, ১৪১১): ১৭২

পঞ্চম অধ্যায়

গাজন উৎসব ও পালাভিনয়: সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সাম্প্রতিক অবস্থা

৫.১ নিম্নবর্ণ ও বর্গের সংস্কৃতি ও গাজন

পশ্চিমবাংলার সর্বত্রই মানব জীবনে রয়েছে নানান লৌকিক দেব-দেবীর প্রভাব। যাদের জীবনে এদের প্রচলন তারা মূলত নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষ। এই দেব-দেবীকে ঘিরে নিম্নবর্গীয় সমাজে ক্রমে গড়ে উঠেছে অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় আচার, উৎসব অনুষ্ঠান। পশ্চিমবাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার নিম্নবর্গীয় কৃষি সমাজে শিব ধরা দিয়েছেন হলধর রূপে। দক্ষিণে সুন্দরবনাঞ্চলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য শিবের থান ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে বহু দিন ধরেই এখানে পালিত হয়ে আসছে ধর্মীয় গাজন উৎসব। চৈত্র মাসের শেষে পুরাতন বছরের সমাপ্তি ও নতুন বছরের সূচনার প্রাক্কালে, শিব-পার্বতীর বিবাহ-মিলন কল্পনায় আগত বছরে যথেষ্ট শস্য উৎপাদন ও স্বাচ্ছন্দ্যের কামনা এই উৎসবের উদ্দেশ্য। তবে গাজন কেবলমাত্র উৎসবই নয় এটি এই অঞ্চলের মানুষের একটি শিল্পচর্চাও। যে শিল্পের মধ্যে ধরা দেয় এখানকার লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি লোকঐতিহ্য, লোকসাহিত্য ও লোকজীবনের নানান চিত্র।

বাংলায় প্রচলিত লৌকিক দেব- দেবীর মধ্যে প্রাচীন কৃষিসংস্কৃতি বিষয়টি বেশ মিশে রয়েছে। কৃষি সভ্যতাটিই যে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা তা লৌকিক দেব-দেবীর রূপকল্পনা ও পূজা-পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় আর যেহেতু শিব কৃষিদেবতা, তাই অনুমান করা যায় যে, মানুষের ভূমিকর্ষণের প্রাক্পর্যায়েই বাংলায় শিবের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই অঞ্চলের সমাজের নিম্নস্তরের মানুষেরা নিজেদের মতো করে শিবকে আপন করে নেওয়ায় তাদের কাছে শিব হয়ে ওঠে ছিল ঘরের মানুষ। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—

> "তিনি (শিব) চাষাদের হাতে পড়িয়া চাষা হইলেন।"[১]

শিবের এই রূপটি সারা বাংলার মতো দুই চব্বিশ পরগনা জেলাতেও দেখা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, জেলে কৈবর্ত থেকে শুরু করে নমঃশূদ্র, গোয়ালা, চিত্রকার, তিলি, মালাকার, যুগী, সূত্রধর, অধিকারী, পরই, কাপালী, তন্তুবায়, নাপিত, সদগোপ, কুম্ভকার, চর্মকার, কর্মকার, শুড়ি, মাহিষ্য, তিয়র, হাড়ি, দুলুই, বাগদি, ডোম, কাওরা-নানা বর্ণের মানুষ নানান পেশায় যুক্ত হলেও কৃষিই এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা আর এই কৃষির দেবতা হলেন শিব। তাই প্রতি বছর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি ও বর্ষার পূর্বে চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাংলায় কৃষিদেবতা শিবকে কেন্দ্র করে নানান আচার সমন্বিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়, যা কৃষি প্রজনন বিষয়ক। আসলে শিব কৃষিদেবতা, প্রজননেরও দেবতা। তাই কৃষি প্রজননের উদ্দেশ্যেই এই আচার অনুষ্ঠান। যেহেতু বাংলার কৃষিপ্রধান

পরিবারগুলোর সারা বছরের সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে ফসল উৎপাদনের উপর তাই সারা বছরের সুখ সমৃদ্ধির কামনাতেই এই আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন। শিব একাধারে সৃষ্টি ও সংহারের দেবতা। কৃষি উৎপাদনের সহায়তার পাশাপাশি কৃষি নির্ভরশীল মানুষগুলির জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দূর করেন। সুন্দরবন উপকূলবর্তী কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, ক্যানিং, নামখানা, কচুখালি, সন্দেশখালি কিংবা বারাসাত লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলের প্রত্যন্তরের অধিকাংশ নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির জীবনে একদিকে ছিল নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় অন্যদিকে ছিল সমাজের উপর তলার মানুষের শোষণ, পীড়ন, জমিদার, বর্গাদারদের অত্যাচার, নিপীড়ন। সেইজন্যই একদিকে কৃষিজমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি অন্যদিকে সামাজিক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দেবধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ শিবকেই দেবতা রূপে অবলম্বন করেছিলেন যা আজও জনপ্রিয়। প্রজননের অন্যতম প্রতীক হলেন শিব। শিবলিঙ্গের সাথে যুক্ত থাকেন পার্বতী। তিনি ধরিত্রী, বসুমাতা। লৌকিক ধারণা অনুযায়ী শিব ও শিবানীর অভিন্নতারূপে যে রূপ অর্ধ নারীশ্বর তারই প্রকাশ গৌরীপট্ট যুক্ত শিবলিঙ্গে। পুরুষ প্রকৃতির প্রকাশরূপে প্রজননের তত্ত্বটি এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। শিব সৃষ্টির দেবতা সুতরাং তিনি উৎপাদন ও প্রজননের প্রতীক আবার গৌরী হলেন বসুমাতা ধরিত্রী, যেখানে উৎপাদন হয়ে থাকে তাই সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও প্রজননের প্রতীক শিব ও পার্বতীর বিবাহ মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে চৈত্র মাসিক গাজন উৎসব হল আসলে শস্যোৎসব। পুরাতন কৃষিবর্ষের সমাপ্তি ও নতুন কৃষিবর্ষের সূচনালগ্নে অনুষ্ঠিত হয় এই গাজন উৎসব ও গাজনপালাগান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ, কুলপি, মন্দিরবাজার, উস্তি, ডায়মণ্ডহারবার, বিষ্ণুপুর অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামে থেকে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী বিশেষত কৃষিনির্ভর নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনে বিশেষ উচ্চমানের বিনোদন ব্যবস্থা অসম্ভব হলেও মনের গভীরে সংস্কৃতিচর্চার ইচ্ছা থাকে প্রবল তাই একদিকে বিনোদন অন্যদিকে ধর্মীয় বিশ্বাস এর সাথে সংস্কৃতিচর্চাও মিশে রয়েছে এই গাজন উৎসবের মধ্যে। 'গাজন' শব্দটির আগমন সম্পর্কে গবেষকদের মত, 'গর্জন' শব্দ থেকেই 'গাজনে'র উৎপত্তি। শিবের বিবাহ যাত্রায় তার অনুগামী সহচরগণ ''হর হর বম্ বম্'' যে উল্লাস সূচক হুঙ্কার দিয়ে থাকেন বা গর্জন করেন তা থেকেই এর নামকরণ 'গাজন' হয়েছে বলে অনুমান করা যায়।[২]

গাজন উৎসবের মধ্যে আদিমসংস্কৃতির ধারা বেশ প্রবলভাবে বিদ্যমান। গাজন উৎসব যেহেতু গ্রামীণ কৃষিনির্ভর নিম্নসম্প্রদায়ের উৎসব তাই এই উৎসবের ভক্ত সন্ন্যাসীরাও মূলত অনুচ্চবর্ণের মানুষজন। গাজনের সাথে প্রেত পূজা ও নদী পূজা মিশে রয়েছে। যেমন- 'কাকবলি'। এই ধরণের আচরণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হতেও দেখা যায়। এছাড়া 'আগরা পূজা', 'চিতা জাগানো' নামক আদিম সংস্কারগুলো প্রেত-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর মধ্যেও রয়েছে এক অন্ধ যাদু বিশ্বাস। এই প্রথাগুলি যদিও এখন অনেক জায়গাতেই বন্ধ হয়ে গেছে। গাজনের 'চড়ক' উৎসবকে বলা হয় 'গাছ জাগানো'। এর পশ্চাতেও রয়েছে এক আদিম যাদুসংস্কার। এছাড়া গাজন উৎসবে এমন কিছু আচরণ করা হয় যার সাথে ব্যাধি মুক্তির প্রতি বিশ্বাসের বিষয়টি যুক্ত বলে মনে করেছেন অনেক গবেষক।

যেমন- গবেষক দুলালকান্তি চৌধুরী মনে করেছেন গাজন উৎসবে পালিত 'কাঁটারিঝাপ', 'কাঁটাঝাঁপ', 'বাণফোঁড়া' বিষয়গুলির সাথে আদিম শল্য চিকিৎসার সাযুজ্য রয়েছে। তাঁর মতে বছরের পর বছর এগুলি পালন করার ফলে হাঁপানি, যক্ষ্মা এ জাতীয় রোগ মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।[৩] তবে নিম্নবর্গীয় মানুষগুলি একে শিবের আশীর্বাদ বলেই বিশ্বাস করেন। তাদের কাছে যুক্তি-তক্কো বিজ্ঞান অপেক্ষা অন্ধ বিশ্বাস বেশি প্রাধান্য পায়। যুগ যুগ ধরে ধারণায় মিশে থাকা বিশ্বাস এদের মনের গভীরে গেঁথে রয়েছে। তবুও একথাই বলা যায় যে এই আদিম বিশ্বাসে ভর করে যুগ যুগ ধরে এগুলো তারা পালন করে আসছে। এরকম আরেকটি বিশ্বাস দেখা যায় পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো জায়গায়। সেখানে নারদ, শিব ও দুর্গার সং সেজে প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ির সামনে থেকে সামান্য মাটি তুলে নেয়। তারা বিশ্বাস করে এতে তাদের গৃহের মাটির অংশ হর-পার্বতীর অধীনে রইল। নতুন বছরের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-প্রতিবন্ধকতা থেকে হর-পার্বতীই গৃহ বা গৃহস্থদেরকে রক্ষা করবেন। এছাড়া সন্ন্যাসীদের শরীরে বান বা বর্শা গেঁথে চড়ক গাছের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে মানত চোকানোও এক অন্ধবিশ্বাস। এর পশ্চাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে আরাধ্য দেব-দেবীর কাছে। আদিম সংস্কৃতির ধারার পরিবর্তিত রূপটির ধারক ও বাহক হিসেবে বর্তমান হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে গাজন উৎসবের রীতিগুলি যেমন- মড়াখেলা, মুখোশখেলা প্রভৃতি এই আচার অনুষ্ঠানগুলির প্রাচীনতা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তা আদিমযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। 'নীলপূজা'র দিন শোলমাছ পুড়িয়ে ভাত রান্না প্রথাটিও আদিম একটি সংস্কার। আদিম সংস্কার ও বিশ্বাসের সাথে যেমন যাদুবিশ্বাস, মন্ত্র-তন্ত্র জড়িয়ে রয়েছে তেমন গাজনের সাথেও মন্ত্র-তন্ত্র যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। যেমন- মনে করা হয় শিবের অনুচরদের মধ্যে রয়েছে ভুত-প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী ও সমস্ত শ্মশানবাসী। তাই নীলপূজার আগেরদিন পান সুপারি দিয়ে সমস্ত শ্মশানবাসীকে নিমন্ত্রণ করেন সন্ন্যাসীরা এবং 'নীল' পূজারদিন শোলমাছ পোড়ানো ভাত শ্মশানে তাদের উদ্দেশ্যে দিয়ে আসেন। তবে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল, গাজন উৎসবের উদ্দেশ্যই এক অন্ধবিশ্বাস। কেউ এটি পালন করেন রোগমুক্তির আশায় আবার কেউ ভালো ফসল পাবার বা সারাবছর স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার উদ্দেশ্যে। ভক্তিই এখানে তাদের বিশ্বাসের মূল স্তম্ভ।

লোকবিশ্বাস যে, দ্বাদশরাশিতে চক্রাকারে আবর্তনের শেষ পর্বে সূর্যের প্রবেশ ঘটে মীনরাশিতে। সূর্যের প্রতীক পৃথিবীর বুকে শস্যদেবতারূপী শিবের বার্ষিক বন্দনাই গাজনের অন্তর্বর্তী চড়ক উৎসবের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। শিবের ব্রত গ্রহণ করে ভক্তরা গাজন উৎসবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নানারকম শারিরীক কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে ত্রিশূল হাতে নিয়ে শিবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে একমাস ধরে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে প্রদক্ষিণ করে ভিক্ষা করে বেড়ান। এই সময় এরা হবিষান্ন খান। ২৬শে চৈত্র বিকেলে স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে উত্তরীয় ধারণ করে কৌলিক গোত্র ত্যাগ করে শিবগোত্র গ্রহণ করেন। এরপর মূল সন্ন্যাসীর নির্দেশ মতো অন্যান্য সকল সন্ন্যাসীগণ পূজা অর্চনায় আনুষঙ্গিক কাজ নিষ্ঠাসহকারে পালন করেন। সন্ন্যাসীদের একে একে বাণ, ত্রিশূল, বেতাসন

ইত্যাদি ধারণের জন্য লোহা, বেতাসন ইত্যাদি শুদ্ধি ও ঢাক, ঢোল, কাঁসি শুদ্ধি করা হয়। চারদিনব্যপী নানান আচরণ পালন করা হয়। সংক্রান্তির শেষ দিন হয় 'চড়ক' উৎসব। একে বলে 'গাছ জাগানো'। আসলে এটি উর্বরতা কামনার ব্যঞ্জনস্বরূপ। চড়ক গাছের উপরে ভর করে চড়কের সন্ন্যাসীরা বৃত্তাকারে শূন্যে পাক খান। আগে সন্ন্যাসীরা পিঠে মোটা লোহার বড়শি গেঁথে চড়ক গাছের চারদিকে ঘুরত। গাজনের অন্যতম একটি বিষয় হল 'সঙ'। সন্ন্যাসীরা গায়ে রঙ মেখে শিব পার্বতী ও অন্যান্য দেব-দেবী সেজে সঙ যাত্রায় বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করেন। ২৭শে চৈত্র ভোরবেলা থেকে গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে নির্বিশেষে এই সঙযাত্রায় যোগ দেন। ঢাক-ঢোল-বাঁশির সমবেত ধ্বনির সাথে শিবের ধ্বনি করা হয় গ্রামের গাজনতলায়। সঙের একটা বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক জীবনের নানারকম অন্যায়, অবিচার ইত্যাদি নির্ভয়ে প্রকাশ করা এবং নির্মমভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। এর মধ্যে সমসাময়িক পরিস্থিতিও প্রকাশ পায়। বছরের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা ও ঘটনার বিষয়ে গ্রামবাসীর অভিমত প্রকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম হিসেবেও সঙের ছড়া বা গান উল্লেখযোগ্য। এরপর ২৮শে চৈত্র হয় 'ঝাঁপান' উৎসব। একে বলা হয় 'হাটসন্ন্যাস'। এই দিন হয় 'বানফোঁড়' উৎসব, 'বঁটিঝাঁপ'। এরপর ২৯শে চৈত্র হল 'নীলপূজা'। সারাদিন নির্জলা উপবাস করে দুপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শিবমন্দির বা শিবের থানে সন্তানের মঙ্গলকামনায় ও সংসারের শুভ কামনায় হয় বাতিদান পর্ব। একে 'ধুল সন্ন্যাস'ও বলা হয়। এদিন সকালের দিকে সন্ন্যাসীদের গ্রাম প্রদক্ষিণ এবং বিকেলে 'খেজুর ভাঙা' আচার পালন করা হয়। খেজুরগাছকে এখানে মাতৃরূপে পূজা করা হয়। তারপর সারারাত ধরে চলে শিবমাহাত্ম্যমূলক নানা কল্পকাহিনি । ৩০শে চৈত্র হল গাজন উৎসবের শেষ দিন। এই দিন পালিত হয় 'আগুনসন্ন্যাস' ব্রত। 'আগুনঝাঁপ', 'তাড়াঝাঁপ', 'কাঁটাঝাঁপ', 'বানফোঁড়া', আগুনের উপর দিয়ে হাঁটা-প্রভৃতি নানা শারিরীক ও মানসিক ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রসাধন করা হয় যার উদ্দেশ্য হল দেবতাকে সন্তুষ্ট করা। এরপর উৎসবের শেষ পর্বে ভক্তরা নিজ নিজ 'মানত চোকায়'। 'ওজোন ভোগ', 'দন্ডীকাটা', 'বাতাসার লুট', 'বুকচিরে রক্ত দান' প্রভৃতি নানা আচরণের মাধ্যমে। এরপর প্রসাদ বিতরণ। তারপর সারারাত ধরে চলে গাজনপালাগান। গ্রামের মানুষের বৈচিত্রহীন জীবনে নাচ, গান, বাজনা, হাসি, ঠাট্টা সমৃদ্ধ সংলাপধর্মী এই কাহিনি অনুষ্ঠান হল এক আনন্দ বিনোদনের উপাদান। অবশেষে স্নান সেরে নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন বস্ত্র পরে আবার নিজেদের কৌলিক গোত্রে ফিরে আসা। এরপর আমিষ ভোজনের পালা দিয়ে সম্পূর্ণ হয় ধর্মীয় গাজন উৎসব আর সূচনা হয় নতুন বছরের।

গ্রাম জীবনে বিনোদনের অভাব। বিনোদনের জন্য ব্যয় করার মতো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেরও অভাব যথেষ্ট। গাজন উৎসবে গাজনপালা অভিনয় ছিল গ্রামের মানুষের কাছে অন্যতম বিনোদনের অঙ্গ। চৈত্র মাসের শুরুতে গ্রামের অধিবাসীগণ নিজেদের মধ্যে থেকে অভিনেতা, বাদ্যকার, নির্বাচন করে দল তৈরি করত। সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী বহির্ভূত মানুষ সকলেই এতে অংশগ্রহণ করত। এরপর গ্রামেরই কারও বাড়িতে বা নাটমন্দিরে একমাস ধরে চলত গাজনের মহড়া। গাজন উৎসবের শেষ

দিনে হত অভিনয়। গাজন উৎসবের এই গাজনপালা নামক লোকনাট্যটি ছিল গ্রামের মানুষের শিল্পচর্চার অন্যতম একটি মাধ্যম। গ্রামের অনেক প্রতিভাবান শিল্পী কেবলমাত্র জীবনের তাগিদে ও সুযোগের অভাবে শিল্পচর্চার সময় ও সুযোগ পেত না। গাজন ছিল সেই মানুষগুলির শিল্পচর্চার এক বিশেষ মাধ্যম।

ক্রমে ক্রমে গাজন উৎসব থেকে আলাদা হয়ে গাজন লোকনাট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানে স্থানে তৈরি হয় গাজন দল। পেশাদারি ভাবে তারা দল গঠন করে। ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। দলে যোগ হয় তত্ত্বাবধায়ক, রাঁধুনী, নির্দেশক, পরিচালক, বাদ্যকার, পালাকার, আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রক এবং আরও নানান সদস্য। ক্রয় করা হয় পালা। মানুষের রুচি ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পালানির্মাণ, গানের সুরারোপ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আরও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, টিকিটের ব্যবস্থাও হয়। নিজের গ্রাম, জেলা ছাড়িয়ে অন্যান্য জেলাতেও তারা অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ পায়। এখন এমন অনেক মানুষ আছেন যাদের পরিবারের আয়ের মূল উৎস লোকনাট্য গাজন। উৎসব ছাড়াও কোনও মেলাকে কেন্দ্র করে বা কেবলমাত্র বিনোদনের জন্যও গাজনের আসর বসে। আজ শুধুমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই অনুষ্ঠিত হয় গাজনের আসর। তাই বলা যায় গাজন কেবলমাত্র উৎসব নয় ক্রমে সে নিজেকে লোকনাট্য ও শিল্পচর্চার মাধ্যমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

একদিকে পুরাতন বছরের শেষ ও নতুন বছরের সূচনার সন্ধিক্ষণে আগামী দিনগুলোর স্বাচ্ছন্দ্য, প্রচুর শস্যোৎপাদন ও সুস্থতা কামনার মধ্য দিয়ে আদিম ভারতবর্ষের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কারের ধারা বজায় রয়েছে গাজন উৎসবে। আবার অপরদিকে 'গাজন' একটি লোকায়ত সঙ্গীত। উৎসবকে কেন্দ্র করে এর সূচনা হলেও বর্তমানে এটি গ্রামীণ লোকনাটকে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কেবলমাত্র ধর্মীয় গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে গাজন বর্তমানে লোকগান ও লোকনাট্যে পরিণত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।"[৪]

আবার নির্মলেন্দু ভৌমিক মন্তব্য করেছেন—

> "কোনো লোকগোষ্ঠীর সংহতি জ্ঞাপক, Myth, Ritual, জীবনচর্চার সকলদিক যখন তাদের অভিনয় ও সংলাপে প্রতিফলিত হয়, তখন তা লোকনাট্য হয়।"[৫]

উক্ত সকল বৈশিষ্ট্যই গাজনপালার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিশেষত সুন্দরবনাঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির জীবনযাপন অত্যন্ত আড়ম্বরহীন তাই মনোরঞ্জনের জন্য অর্থব্যয় এই মানুষগুলির কাছে বিলাসিতার সমতুল্য। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যতা এই মানুষগুলির

সারাজীবনের সঙ্গী। তবুও কখনো কখনো গতানুগতিক জীবনের মধ্যেও প্রয়োজন হয় মনোরঞ্জনের। তবে সাধ্যও খুবই কম। তাই নিজেদের কাজের অবসরে নিত্য দিনের গতানুগতিকতা দূর করতে চলত গ্রামীণ সংস্কৃতিচর্চা, যার কেন্দ্রে ছিল ঠাকুর-দেবতা-ধর্মগুরু-স্বর্গ-নরক—এ জাতীয় ভাবনা চিন্তা সংস্কার। লোকনাট্য গাজন তাদের সেই সাধপূরণ করে। কলাকুশলী থেকে দর্শক সকল গ্রামবাসীর কাছেই সারাবছর পরিশ্রমের অবসরে মনোরঞ্জনের একটি অন্যতম উপায় হল গাজনপালা লোকনাট্য বিষয়টি। দেবব্রত নস্কর তার '*চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি*' গ্রন্থে বলেন—

> "চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত পালাগানগুলি এ অঞ্চলের মানুষের আদিম ঐতিহ্য সঞ্জাত জাদুবিশ্বাস, প্রসূত ইহা লৌকিক সুখ সমৃদ্ধি কামনাময়, রোগশোক হতে পরিত্রানময় দৈববিশ্বাস কেন্দ্রিক, লৌকিক আচার আচরণ সর্বস্ব এক বিশিষ্টরূপ যা এই অঞ্চলের লোক সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভাষা সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।"[৬]

নাচ-গান-কথোপকথনের মাধ্যমে এর একদিকে রয়েছে উৎসব অন্যদিকে কাহিনির রসাস্বাদন। পাশাপাশি রয়েছে আকর্ষণীয় রসাত্মক আবেদনও। তাই গাজন কেবল পূজোৎসবের অনুষ্ঠান নয় অভিনয় জগতেরও এক ধারা--এক বিশেষ লোকনাট্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে গাজনপালা শিল্পের পীঠস্থান বলা যায়। এই লোকনাট্যটির সদস্যগণ সাধারণত হন গ্রামের প্রতিনিধি। দর্শকগনও সাধারণত হন গ্রামীণ মানুষ। কারণ গ্রামাঞ্চলেই এটি বেশি জনপ্রিয়। তাই গাজনপালা কাহিনির বিষয়বস্তুও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই মানুষগুলোর জীবনের কথা বলে। অনেক সময় গ্রামেরই কোন ঘটনাকে অবলম্বন করে এটি নির্মিত হয়ে ওঠে। উপস্থাপনায় আতিশয্যহীনতা, সহজ সরল গ্রাম্য মানুষেরই ভাষায় পরিবেশিত পালাগুলির অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় এর হাস্যরস। শব্দের প্রয়োগ ও অঙ্গভঙ্গিতে গ্রাম্য শালীনতাহীনতার প্রশ্রয় থাকে। সেই কারণেই হোক বা সহজ সাবলীলতা বজায় রাখার জন্যই হোক কিংবা সুরক্ষার কারণেই হোক গাজনপালার কাহিনির নারী চরিত্রগুলির অভিনেতাগণ আজও পুরুষেরাই। নারীর মতো পোশাক পরিচ্ছদ, প্রসাধন, কেশবিন্যাস করে নারীকণ্ঠ অনুকরণ এবং নারীসুলভ অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে পুরুষেরাই এই চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন। গানগুলো মুখে মুখেই রচিত হত এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে যে কাহিনির বিস্তার তাঁর সংলাপও রচিত হত আসরেই। গাজনপালা পরিবেশনের স্থান সাধারণত গ্রামের মন্দির প্রাঙ্গণ বা মন্দির সংলগ্ন কোন স্থান অর্থাৎ গাজনতলা। চার দিক খোলা জায়গায় যেমন আর সব লোকনাট্যের আসর বসে তেমনি গাজনেরও আসর বসে। লোকনাট্যের এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি গাজনপালাগুলি বহন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। আধুনিকতার সাথে সাথে সমস্ত বিষয়ের সাথে গাজনপালাগুলিরও কিছু পরিবর্তন এসেছে। তবুও আজও এটি গ্রাম বাংলার জনপ্রিয় লোকনাট্যগুলির একটি। পূর্বে গ্রামেরই মানুষজনকে নিয়ে তৈরি হত গাজনদল। গ্রামেরই কেউ হতেন বাদ্যকার, পালাকার, কেউ অভিনেতা, নির্দেশক। সারাদিন কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলাতেই কোনো জায়গায় হত মহড়া। চৈত্রমাসব্যাপী মহড়ার পর গাজন উৎসবের

শেষ দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হত গজনপালা কাহিনিটি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষেরা তাদের কষ্টকর জীবনযাত্রার অবসরে বংশ পরম্পরায় কিংবা নিজে থেকে আগ্রহী হয়েই লোকায়ত এই সংস্কৃতিটির চর্চা করে আসছে বহুকাল ধরে। এই সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে জনমানস গঠনের পাশাপাশি হত গ্রামোন্নয়নের কাজও। গ্রামের মানুষগুলি গাজনপালা অনুষ্ঠিত করে সেই অর্থ দিয়ে গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও নানান উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। এছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা গঠন ও নীতিমূলক শিক্ষাদান করা হয় এই পালার মাধ্যমে। অনেক সময়েই দলাদলি-ঝগড়া-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-মারামারি-হিংসা-ঈর্ষা প্রভৃতি গ্রাম সমাজকে জীর্ণ করে তোলে। তার সাথে যোগ হয় রাজনৈতিক দলাদলি। ফলে গ্রামজীবনের শান্ত নিরুদ্বেগ পরিবেশের সুস্থিতি বিনষ্ট হয়। গ্রামের মানুষদের মধ্যে সেই বিবাদ-বিসংবাদ-দলাদলি-হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে আবার এক সাথে মিলিত উৎসব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরিতেও যেমন গাজনপালার অবদান রয়েছে তেমনি গ্রাম সমাজ গঠন ও উন্নয়নেও তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবোদ্ভূত সংস্কৃতি চেতনায় পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতার নাগরিক সমাজে ও জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও সুন্দরবনাঞ্চলের গাঙ্গেয় উপকূলে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। তাই এই অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতিগুলি তাদের প্রাচীন ধারাকে বহুদিন ধরে অব্যাহত রাখতে পেরেছে। তবুও দিনবদল আর পরিবর্তনের সাথে সাথে খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে সেখানেও। এই অঞ্চলের বহুকালের চর্চিত লোকসংস্কৃতিগুলির মধ্যে এখানকার মানুষ তাদের একাধারে বিনোদন, মনোরঞ্জন, ও শিল্পচর্চার আকাঙ্ক্ষাগুলির অনুসন্ধান করেছিল। 'সঙ' ও 'গাজনে'ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রথমে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় তৈরি হয় লোক সংস্কৃতিগুলির চর্চাকেন্দ্র, আখড়া, টেক, সমিতি প্রভৃতি। পরবর্তীকালে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় তৈরি হয় ছোট ছোট গাজন সংস্থা। ক্রমে ক্রমে তৈরি হয় পেশাদারি গাজনদল ও গদিঘর (কার্যালয়)। সমগ্র দক্ষিন চব্বিশ পরগনায় বহু গদিঘর রয়েছে এখন। এছাড়া কাকদ্বীপ, কামারহাট, কুলতলি, রামগঙ্গা, ঘটুগঞ্জ, জয়নগর, ঘটিহারানিয়া প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর গাজনদল রয়েছে অসংখ্য। যেমন— 'জয় বাবা আদিপঞ্চানন', 'জয় মা সরস্বতী', 'জয় মা রাজলক্ষী', 'জয় মা আদিকালী', 'জয় মা মনসা', 'নাট্যমঞ্জরী গাজন সংস্থা', 'শিল্পমঞ্জরী গাজন সংস্থা' প্রভৃতি। এরা নিজেদের গ্রামে তো বটেই আশেপাশের গ্রামেও এমনকি নিজের জেলা অতিক্রম করে অন্য জেলাতেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অভিনয় করে। যেমন, মেদিনীপুর জেলায় গাজনের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশি। বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। এই সমস্ত জায়গায় পর পর হয়ত একশোটি রাতের অভিনয়ের আগাম বায়না নিয়ে এরা এক-দেড় মাসের জন্য দল নিয়ে বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন, ত্যাগ করে কেবলমাত্র পালা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়েন।[৭] যে দিন যে স্থানে অনুষ্ঠান হয় দলটি সেইদিন সেইস্থানেই অবস্থান করে। পরদিন অন্যত্র যাত্রা করে। যাতায়াত, সদস্য ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বহন করার জন্য দলে গাড়ির ব্যবস্থা থাকে। একটি গাজনদলে কলাকুশলী থাকেন প্রায় ৭-৮ জন, বাদ্যকার ৪-৫ জন,

আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রক ৩-৪ জন, তাছাড়া মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, রাঁধুনি সহ মোট ১৮-২০ জন সদস্য থাকেন।[৮] এই সব সদস্যদের সাথে দলের মালিকের বাৎসরিক চুক্তি থাকে। আর্থিক চুক্তির পাশাপাশি তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিরও ব্যবস্থা করতে হয় মালিককে। সমস্ত খরচই বহন করেন গাজন মালিক।

আদিতে আঞ্চলিক গায়েনরা শিব-দুর্গার সঙ সেজে গাজনগান পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দান করতেন। বিনিময়ে প্রাপ্তি হত চাল, ডাল, সব্জি, সামান্য অর্থ প্রভৃতি দ্রব্যাদি। ক্রমে ব্যবসায়িক পদ্ধতি শুরু হওয়ায় তা রূপান্তরিত হয় অর্থ উপার্জনে। বর্তমানে পূজা বা মেলা উপলক্ষ্যে গাজনপালার আয়োজনের পাশাপাশি কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের কারনে টিকিটের বিনিময়েও গাজনপালার আয়োজন হয়।[৯] রথের দিন উদ্বোধনের পর থেকেই শুরু হয় বায়না নেওয়া। কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে বায়না করা হয়। শহরতলিতে একটি দিন পিছু গাজনদলের আয় প্রায় ২০-২৫ হাজার টাকা। তবে গ্রামাঞ্চলে এর জনপ্রিয়তা অনেক, সেখানকার দর্শক সংখ্যাও ব্যাপক। গ্রামাঞ্চলে এক রাতের অনুষ্ঠান পিছু একটি গাজন দলের আয় প্রায় ৩০-৩৫ হাজার টাকা।[১০]

এখন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ও প্রতিযোগিতার কারণে দলগুলি পেশাদার পালাকারদের কাছ থেকে পালা ক্রয় করেন। একটি পালা একটি দলই ক্রয় করতে পারে। দলগুলি প্রতি বছর নতুন পালা ক্রয় ও অভিনয় করেন। পালার দামও তার আকার অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। যেমন—একটি মূল গল্পের (পৌরাণিক ছোঁয়ায় আলেখ্য) দাম হয় ১০,০০০ টাকা-২৫,০০০ টাকা। আবার ছোট ছোট কাহিনি যেমন—পারিবারিক ঘটনা, সামাজিক সমস্যা, জনসচেতনতামূলক প্রভৃতি বিষয়ক পালাগুলির দাম ৪,০০০ টাকা থেকে ৭,০০০ টাকা পর্যন্ত। দলের মালিক তার পছন্দ মতো পালা ক্রয় করেন।[১১] এখন পেশাদারি গাজনদলগুলি পেশাদারি শিক্ষক বা নির্দেশকের দ্বারা নির্দেশনার ব্যবস্থা করেন। এরা হলেন 'গাজনমাস্টার'। এরা এক একটি ছোট ছোট পালার জন্য যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া বাবদ প্রায় ৫,০০০ টাকা নিয়ে থাকেন। এছাড়াও থাকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। কেবলমাত্র অভিনয়ই নয় বিশেষ করে নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয়, নাচের ভঙ্গিমা, দাঁড়ানো, কথা বলার ধরণ সবই এরা শিখিয়ে থাকেন।[১২]

দেশ-কাল-সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জন মনরঞ্জনের উপায় বা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গাজন এখনও কোথাও কোথাও তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চললেও ব্যবসায়িক কারনে তার নিজের বদল ঘটাতে হয়েছে অনেক। বদল অনেক ঘটেছে তবুও পরম ভালোবাসায় তারা কাজ করে চলেছেন। একজন গাজন মালিকের বর্তমান বাৎসরিক ব্যয় প্রায় বরো-তেরো লাখ টাকা।[১৩] কেবলমাত্র উল্টো রথের দিনেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য গাজন মালিকের খরচ হয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা।[১৪] এছাড়া বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবস্থাও গাজন মালিক করেন। পোস্টার পিছু খরচ হয় প্রায় ষাট হাজার

টাকা, ব্যানার বানাতে খরচ হয় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। এছাড়া লিফলেট, কার্ড তো আছেই। সেগুলোর জন্য বিশেষ ভাবে সাজসজ্জা, ছবিতোলা এ সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচও রয়েছে।[১৫]

নাগরিক জীবনে মনোরঞ্জনের উপকরনের অভাব নেই। ভিন্ন ভাবে অর্থ উপার্জনকারী মানুষের সংখ্যা ও মাসিক বা বাৎসরিক আয়ের পরিমানও যথেষ্ট। তুলনায় এই গ্রাম্য দরিদ্র নিম্নবর্ণীয় মানুষগুলির আয় খুবই স্বল্প। তারই প্রভাব দেখা যায় বিনোদন জগতেও। শহর কিংবা শহরতলির অতিসাধারণ কোনো প্রেক্ষাগৃহের একটি টিকিটের মূল্য যেখানে ৬০ টাকা থেকে শুরু করে ৯০ টাকা বা ১০০ টাকা। মাল্টিপ্লেক্সগুলির যেকোন চলচ্চিত্রের একটি টিকিটের মূল্য যেখানে ২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা সেখানে গাজনপালার টিকিটের মূল্য মাত্র ১০ টাকা। আসলে এর থেকে বেশি খরচ করার মতো সামর্থ্য গ্রামের অধিকাংশ দর্শকদের নেই। শিল্পী ও কলাকুশলীদের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য বিস্তর। গাজন শিল্পীদের ও কলাকুশলীদের তাই আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ও নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই জনমনোরঞ্জনের উপায় প্রস্তুত করতে হয়। এখানকার দর্শকেরা প্রায় সকলেই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার ও সাংসারিক প্রতিবন্ধকতার জালে আবদ্ধ হওয়ায় সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝে চৈত্র থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত সময়ে গাজনগানের মধ্যেই তারা খুঁজে পায় জীবনের রসদ। স্বল্প অর্থ ব্যয়ে প্রাণের আনন্দ এতে অনেকখানি। তাই গাজন মালিককেও সতর্ক থাকতে হয় ব্যয়ভারের দিকে। শহরাঞ্চলে একজন একক গায়ক বা শিল্পী একটি অনুষ্ঠান পিছু আয় করেন অন্ততঃপক্ষে যেখানে ৫০-৬০ হাজার টাকা সেখানে ১৫-২০ জন সদস্য নিয়ে একটি গাজন দলের এই একই জায়গায় অনুষ্ঠানে আয় হয় অনুষ্ঠান পিছু মাত্র ১৫-১৬ হাজার টাকা।[১৬] বাৎসরিক চুক্তিতে কলাকুশলীদের আর্থিক আয়ও বিশেষ কিছু নয়। অভিনেতাদের মধ্যে যিনি বেশি দক্ষ বা প্রাজ্ঞ তার আর্থিক চুক্তির পরিমান সবচেয়ে বেশি। নিউ দিগ্বিবিজয়ী বিজয়বার্তা দলের অভিনেতা লখিন্দর পণ্ডিত উনিশ বছর এই পেশায় রয়েছেন। দলের ৮ জন অভিনেতার মধ্যে তিনিই দক্ষ ও প্রবীণ। তার বাৎসরিক আর্থিক চুক্তি হয় এক লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা। অন্যান্য শিল্পীরা কেউ ৪০ হাজার, কেউ ৫০ হাজার কারও বা ৬০ হাজার টাকার আর্থিক চুক্তি হয়। দলের বাদ্যকারগণদের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম বিষয় দেখা যায়। এই দলে ৪ জন বাদক এর মধ্যে যিনি অক্টোপ্যাড বাজান তার অর্থিক চুক্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ৭০ হাজার টাকা। অর্গানম্যান এর ৬৫ হাজার, তবলাবাদক ৫০ হাজার এবং বাঁশিবাদকের ৪৫ হাজার টাকার আর্থিক চুক্তি রয়েছে।[১৭] রথের দিন উদ্বোধন হওয়ার পর দুই-তিন মাস মহড়া হয় এবং বিশ্বকর্মা পূজার দিন থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। চুক্তি থাকে ৭ই আষাঢ় পর্যন্ত।[১৮]

সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনশিল্পী, কলাকুশলী, পালাকার, মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, সর্বজনই এই অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। শিল্পীরা অত্যন্ত প্রতিভাবান হওয়ার কারণে এই প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন। যেহেতু বর্ষাকালে যাতায়াত ও অনুষ্ঠান করার অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে তাই দলগুলি ঐ সময় অনুষ্ঠান বন্ধ রাখেন। সেই সময় কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ অন্য উপায় অবলম্বন করেন। সুতরাং এটাই এদের সারা বছরের মূল

আয় এবং তার পরিমাণও বিশেষ নয়। তবুও এরা এই পেশায় যুক্ত রয়েছেন আসলে এর সাথে মিশে আছে আবেগ। গাজনের প্রতি ভালোবাসা। সেজন্যই কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় এই পেশায় এলেও কেউ কেউ আবার বংশগত পেশা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্ব-উদ্যোগে এই পেশায় আসেন। তাই নিতাই সরদারের মতন গাজনশিল্পী বাবার মৃতদেহ দাহ করার সময়ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে।[১৯] আবেগ এখানে বাস্তবতার যন্ত্রণাকেও ছাপিয়ে যায়।

এই দরিদ্র গ্রামীণ মানুষগুলির মধ্যেই রয়েছে শিল্পীসত্ত্বা। অভিনেতা, গায়ক, পালাকার, সুরকার, যন্ত্রশিল্পী, প্রায় সকলেই নিম্নবর্গের হিন্দু সমাজের মানুষ। এনারা সাংসারিক ও পেশার প্রয়োজনে দৈনন্দিন কাজকর্মের সাথে সাথে পালা রচনা, গান রচনা, সুর দেওয়ার কাজ করেছেন। জগন্নাথ গায়েন পেশায় চিকিৎসক। পালা, গান, রচনা ও সুর দেওয়ার পাশাপাশি নিজ পোশাকে অব্যাহত রেখেছেন। আসলে তিনি সঙ্গীতপ্রেমী, শিল্পী এছাড়া এই মানুষগুলির মধ্যে রয়েছে গাজনের প্রতি আবেগ ও ভালোবাসা।

গ্রামেই গাজনের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। যদিও জনপ্রিয়তার নিরিখে গ্রামে ও নগরে সার্বিকভাবে অন্যান্য বিষয়ের কাছে এই অনুষ্ঠানটির বিস্তর তারতম্য তবুও শিকড়ের টানে, প্রাণের আবেগে, অন্তরের আন্তরিকতায় এই মানুষগুলি আজও গাজন করে চলেন। যদিও তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই দুর্বল, সামাজিক গুরুত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ তবুও তারা গতিশীল। কেবলমাত্র জীবন ধারনের প্রয়োজনে নয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে এই পথে এগিয়ে চলেছেন। সমাজ এদের কাছে কৃতার্থ। প্রাণের আবেগের কারণেই এই গ্রামীণ বিনোদন নামক শিল্পসংস্কৃতির চর্চা করতে পারেন আর এই কারণেই এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অভিনেতা ও শিল্পীরা যে সসম্মানে অভিনয় করে চলেছেন আসলে শহরতলি থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে তারা যে সম্মান, যশ, ভালোবাসা, অর্জন করেন সেটাই তাদের সাফল্য। তাতেই তাদের আনন্দ, সার্থকতা। তাদের প্রতিভার জন্য সম্মান, যশ, ভালোবাসা, অর্জন করেন তবে এই অর্জন তাদের আনন্দিত করলেও অহমিকা দান করে না। তাই সম্মান, ভালোবাসা অর্জন করার পরও তারা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। এটাই তাদের বিশেষত্ব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় দরিদ্র এই মানুষগুলিই এদেশের গাজন উৎসব ও শিল্পকে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই ভাবেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকনাট্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন এই নিম্নবর্গীয় মানুষগুলি।

গ্রামের দর্শকদের মতো গাজন শিল্পীদেরও জীবন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। যেহেতু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের জীবনেও প্রভাব ফেলে তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ ভালো নয়। খেটে খাওয়া এই মানুষগুলো জীবনে অভাব অনটনের মাঝেই যেটুকু শিল্প চর্চা করেন তা কেবলমাত্র প্রাণের আবেগের কারণেই সম্ভব।

৫.২ গাজন কৃত্যানুষ্ঠান থেকে মনোরঞ্জক পালাভিনয়

ইতিহাসের সীমানা অতিক্রম করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের জীবনযাত্রার যে চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তা হল শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের কঠোর সংগ্রামের চিত্র। বিরুদ্ধ পরিবেশ, ব্যবহারিক দ্রব্য সম্ভারের স্বল্পতা, এই মানুষগুলির অর্থনৈতিক পরিবেশকে এক অনিশ্চয়তায় ঘিরে রেখেছিল। তার সাথে ছিল রোগ, ব্যাধি, অকালমৃত্যু নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সৃষ্টি করেছিল উদ্বেগ, সংশয়, ও শঙ্কা। এছাড়া দিন-রাত্রি, ঋতুভেদ, জন্ম-মৃত্যু, নিদ্রা ও স্বপ্নের বিকাশ ও অন্যান্য ঘটনাবলির বৈচিত্র্য সমাবেশ এ সকল নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষগুলির মনের মণিকোঠায় বহু অযৌক্তিক বিশ্বাসের অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শক্তি কল্পনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। গ্রাম্য, নিরক্ষর, অজ্ঞ এই মানুষগুলি যুক্তির যথার্থ কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে এই সকল শক্তি নিচয়ের ধ্যান-ধারনায় বা তুষ্টি সাধনায় সমবেত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল নিরুদ্বেগ, নিশ্চয়তা। উৎসব হল এ সবের প্রতিধ্বনি। এই মানুষগুলির জীবন সংগ্রামের কালজয়ী ঘটনার বাঙ্ময় মূর্ছনা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় কৃষিসমাজে গাজন হল সেই রকমই একটি ধর্মীয় উৎসব। যেখানে কঠোর বাস্তব ঘেরা পরিবেশের বাইরে মানুষের বুদ্ধির অনতিগম্য, অতিপ্রাকৃত জগতের বিভিন্ন শক্তি নিচয়ের তুষ্টি সাধনের মাধ্যমে পার্থিব সম্পদের অধিকারী হওয়ার এক সুকৌশল প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি ঘটত। যুগ যুগ ধরে এই প্রচেষ্টায় মানুষের মন নানা ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রতি বছর সমবেত ভাবে কয়েকদিনব্যপী আচরণ পালনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠী চেতনার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তারা আত্মার নিবিড়তায় পরস্পরকে আবদ্ধ করে তুলতো।

সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বিশেষত সুন্দরবনাঞ্চলের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির নিম্নবর্গীয় দরিদ্র কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষগুলির জীবনকে লৌকিক দেব-দেবী প্রভাবিত করেছিলেন। শিব হয়ে উঠেছিলেন তাদের ঘরের দেবতা। তাই সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব্যাপী অগণিত শিবমন্দির আর শিবের থান দেখতে পাওয়া যায়। শিব এই মানুষগুলির জীবনে হলধররূপে অবির্ভূত হয়েছেন। এখানকার অধিকাংশ জায়গায় লিঙ্গরূপী শিব পূজিত হন। শিব ও শিবানীর অভিন্নতারূপের প্রকাশ এটি। শিব সৃষ্টির দেবতা, সংহারের দেবতা, উৎপাদন ও প্রজননের প্রতীক এবং শিবানী বসুমাতা ধরিত্রী, যেখানে উৎপাদন হয়। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সুন্দরবনাঞ্চল অধ্যুষিত বিশেষত কৃষিনির্ভর দরিদ্র মানুষগুলির জীবনে গাজন নামক শস্য উৎসবটি ছিল চৈত্র মাসে পুরাতন বছরের শেষ ও নতুন বছরের প্রারম্ভের সন্ধিক্ষণে আগত বছরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কামনার উৎসব। এই উৎসবটিকে মনে করা হত শিব-পাবর্তীর বিবাহ উৎসব। সেখানে শিবভক্ত সন্ন্যাসীর দল অনুগামী বরযাত্রী। চারদিনব্যাপী নানান আচরণ পালনের সাথে সাথে শিবমাহাত্ম্যসূচক ধ্বনি ও গান করা হয় এই উৎসবে। গাজন আদিম উৎসব। অন্ধবিশ্বাস, সংশয়, উদ্বেগ থেকে এখানকার আদিম অধিবাসীগণ আস্থা রেখেছিলেন লৌকিক দেব-দেবীর উপর। তাই লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক উৎসবের মধ্যে নিহিত থাকে আদিম সংস্কার। গাজন উৎসবটি সেরকমই একটি উৎসব। যার মধ্যে সন্ধান পাওয়া যায় আদিম সংস্কৃতির

ধারার। 'কাকবলি', 'আগরা পূজা' 'চিতা জাগানো', 'ভর হওয়া' 'গাছ জাগানো', 'কাঁটাঝাঁপ', 'বানফোঁড়া', 'কাটারিঝাঁপ', 'শোল মাছ পোড়ানো' প্রভৃতি রীতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় আদিম সংস্কার, প্রেত বিশ্বাস, বা অন্ধ যাদুবিশ্বাস। চৈত্রমাসের শেষে চারদিনব্যাপী গাজন উৎসবের উন্মাদনায় একসময় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ হিন্দু এলাকাগুলি উদ্বেলিত হয়ে উঠত। সন্ন্যাসগ্রহণ অর্থাৎ উত্তরীয় ধারনের মাধ্যমে শিবের গোত্র শিরোধার্য ও আত্মগোত্র পরিত্যাগ করে চারদিনব্যাপী নানা ক্রিয়াপালন করে পয়লা বৈশাখের দিনে আবার নিজ গোত্রে ফিরে আসতেন। সন্ন্যাসীর বস্ত্র পরিধান, হবিষান্ন আহার, ত্রিশূল বেতাসন ধারন এর সাথে পালিত হত রীতি-নীতি। ২৬শে চৈত্র স্নানের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। বান, ত্রিশূল, বেতাসন, ঢাক, ঢোল, কাঁসি শুদ্ধি পর্বের সাথে শিব পূজা করা হত। ২৭শে চৈত্র শিবের আরাধনার সাথে সাথে সঙ সেজে গ্রাম পরিক্রমা এবং নাচ, গান, বাদ্য সহযোগে শিব-পার্বতীর গান ও মাঙ্গন গ্রহণ করা হত। ২৮শে চৈত্র হত চড়ক পূজা ও ঝাঁপান উৎসব। ২৯শে চৈত্র সন্ন্যাসীসহ গ্রামে আবাল, বৃদ্ধ বনিতা সকলে সন্তান ও পরিবারের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পালন করতেন নীলপূজা। ৩০শে চৈত্র 'আগুনঝাঁপ', 'কাঁটাঝাঁপ', 'বানফোঁড়া', প্রভৃতি ক্লেশ ও কৃচ্ছসাধনের মধ্যে দিয়ে উদ্দীষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করা হত। সেই সাথে 'দন্ডীকাটা', 'ওজনভোগ', 'বাতাসার লুট', 'বুকচিরে রক্ত দান'—এ সবের মধ্যে দিয়ে মনের বাসনা পূর্ণ করার ফলস্বরূপ আরাধ্য দেবতাকে তুষ্ট করেন 'মানত চোকানো'র মাধ্যমে। ঐ দিন রাত্রে সারারাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠিত হত মনোরঞ্জনমূলক পালা অভিনয়। পরদিন অর্থাৎ নতুন বছরের শুভারম্ভে সন্ন্যাসী উত্তরীয় কেটে পুকুরের মাটিতে স্থাপিত করে, স্নান সেরে নতুন পরিধান করে আমিষ আহারের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসেন নিজ গোত্রে। সম্পন্ন হয় গাজন উৎসবের। কৃষি নির্ভরশীল মানুষগুলির সারা বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করত শস্য উৎপাদনের উপর। তাই নতুন বছরের সূচনায় পালিত হওয়া শস্য উৎসবের সাথে মিশে থাকতো এই মানুষগুলির ভক্তি ও নিষ্ঠা।

গাজন উৎসবের একটি অঙ্গ হল 'সঙ'। সঙের সাথে গাজনের সম্পর্ক নিবিড়। চৈত্র গাজনে গঙ্গা স্নানের সময় শিব-পাবর্তীর বিবাহের বরযাত্রী, নন্দী-ভৃঙ্গী, ভুত-প্রেত, পশু-পাখি প্রভৃতির সাজ নিয়ে ঢাক-কাঁসি বাদ্য সহযোগে নৃত্য করতে করতে সঙযাত্রা বা শোভাযাত্রা বের করত। যা ছিল বীরত্বব্যঞ্জক উন্মাদনার অভিব্যক্তি। এই রূপটি পাওয়া যায় বীরেশ্বরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণনায় 'বাংলা দেশের সঙ প্রসঙ্গ' তে—

> "সেকালের প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গান হত। চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের দল বিভিন্ন পথে ডাক ও কাঁসি বাজিয়ে পুরুত এবং সেই সঙ্গে 'সঙ' বের হত।"[২০]

সঙ দুই প্রকার—নির্বাক সঙ ও নৃত্য গীত মুখর সঙ।[২১] প্রথমদিকে কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি সহ শোভাযাত্রা করা হত এটি ছিল নির্বাক সঙ পরে পালা নাটকের আঙ্গিকে সঙের প্রচলন হয়। ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ধর্মমূলকহীন গান বা অনুষ্ঠান। যা ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের এক শক্তিশালী মাধ্যম। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

"উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে আমাদের চড়ক গাজন প্রভৃতিতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রকাশক নানা প্রকারের 'সঙ' এই সকল জনপ্রিয় পূজা অনুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।"[২২]

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আবার বলেছেন—

"গৌড়বঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব বিকাশ হইতছে। গত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত বিনোদনের ধারা—'সঙ' (সঙ)। প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পোশাক পরিয়া অঙ্গভঙ্গি সহযোগে গান, ছড়া-কাটা প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একটি পরিহাসোজ্জ্বল অনুকৃতিকে 'সমাঙ্গ' অর্থাৎ অনুরূপ অঙ্গ বলা হইত। এই সংস্কৃত শব্দ হইতে উত্তর ভারতের হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় 'সবাগ' (সও আঙ্গ) এবং বাংলার 'সবঙ্গ' 'লঙ' বা 'সঙ'। ছদ্মবেশ অর্থে 'সঙ' শব্দ বাংলাদেশে খৃষ্টীয় আঠারো শতকের শেষে দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে 'জাত' বা 'যাত্রা' অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় এইভাবে পালিত চড়ক, গাজন প্রভৃতিতে জনসাধারণের জীবনযাত্রায় প্রকাশক নানা প্রকারের 'সঙ' এই সকল পূজানুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।"[২৩]

যুগ বদলের সাথে সাথে গাজনে সঙের বৈশিষ্ট্য ও ভাবনায় পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে গাজনের সঙ বলতে শিব-পার্বতী সহ নানা দেব-দেবী, নন্দী-ভৃঙ্গী সহ ভূত-প্রেত সাজার প্রবণতা ছিল। সময়ের বদলে গাজনের সঙের বিষয়বস্তুতেও দেখা দিয়েছে আধুনিকতা। দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়েছে সামাজিক প্রভাব। চিন্তা ভাবনায় এসেছে বিজ্ঞানসম্মত ধারা। কলকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতির বিষয় হয়ে উঠেছে জেলে পাড়ার সঙের বিষয়। খিদিরপুরের সঙেও সমাজবিরোধী, দুর্নীতিসহ নানান সামাজিক ও সমসাময়িক বিষয়কে অবলম্বন করা হয়। তমলুক শহরে গাজনের সঙে এরকম নতুন প্রবর্তন দেখা গেছে। কলকাতার চিৎপুর, খিদিরপুর, জেলেপাড়া, কাঁসারী পাড়া, বাগবাজার, আহিরীটোলা, তালতলা, বেলেপুকুর থেকে যে সকল সঙ বের হতো তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বাবু কালচারের সময়ে এই সমস্ত সঙে নতুন মাত্রা যোগ হয়। শিব-পার্বতীর জায়গায় শোভাযাত্রায় ঘোড়ার গাড়ির উপরে কৃত্রিম পাহাড়, ময়ুরপঙ্খী নৌকা প্রভৃতির সংযোগ হয়েছিল। পালকিতে লম্পট মোহান্ত, গোদাপালক প্রভৃতি সজ্জিত হয়ে সঙ যাত্রায় বের করা হত।[২৪] এর পরবর্তীকালে সঙে তামাশার দিকটি বেশি গুরুত্ব পায়। কলকাতার জেলেপাড়ার সঙে নানান-কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, সামাজিক অন্যায়-অনাচার প্রভৃতি বিষয়গুলো ছড়া, গান সহ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পরিবেশিত হতো। কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর ১৩৯১ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে আবার মধ্য কলকাতার রাস্তায় বের করা হয়। কিন্তু ১৯২৯ সালে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। 'কলিকাতা কৈবর্ত সমিতি' দ্বারা আয়োজিত জেলেপাড়ার সঙের শোভাযাত্রা ১৩৯১ বঙ্গাব্দের ৩০শে চৈত্র শনিবার বাঁকা রায় স্ট্রীটের দুপুর দুইটার সময় আয়োজিত হয়। সেখানে বক্তা ছিলেন তৎকালীন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, তদকালীন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ।[২৫]

১৯২০ সালে মীরবাজার পল্লী থেকে খুব বড় একটা সঙের শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। দুপুর থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত শোভা যাত্রা বের হতে থাকে। ১৯৫২ সালে সঙের শেষ ওরকম শোভা যাত্রাটি বের হয়েছিল।[২৬] উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত কলকাতা শহরের বিভিন্ন পল্লীতে চৈত্র সংক্রান্তির আগে থেকে রাস্তায় রাস্তায় সঙ বের করা হতো। সংলাপ, গান ও ছড়ার মাধমে দেব-দেবীর বন্দনা, কলকাতা কর্পোরেশনের কাজের নানান অসঙ্গতি, দুর্নীতি, স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি, ছোট রায়বাহাদুরের প্রতি কটাক্ষপাত, দেশের মনীষীদের মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিয়োগ ব্যথা প্রভৃতি ছাড়াও নানান সামাজিক চিন্তাভাবনা এর গানগুলিতে প্রকাশ পেত এবং মানুষকে প্রভাবিত করত। শক্তিশালী মাধ্যম হওয়ায় প্রায় একশ বছর পূর্বে কাঁসারী পাড়ার সঙের মিছিলে রঙ্গ, ব্যঙ্গমূলক ছোট ছোট নাটিকা অভিনয় করা হত। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতার জেলেপাড়ার সঙের মিছিলে মোহন গোস্বামী রচিত হোমরুল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'হোমরুল' নামক একটি পথনাটক কলকাতার রাজপথে পরিবেশন করা হয়। ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র চুরির বিষয়কে কেন্দ্র করে জেলেপাড়ার সঙ 'বিদ্যার মন্দিরে সিঁদ' নামে একটি গান করেছিল। ১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথম মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হন। সেই ঘটনা অবলম্বনে জেলে পাড়ায় সঙ বেরোয়। সেখানে বলা হয়—

'নাশ কর্তে ফি আর দাস
এঁদের দাঁড় করালেন সি.আর.দাশ।"[২৭]

শহর কলকাতার এই সঙের প্রভাব মফঃস্বলের সঙকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে জেলে পাড়ার সঙে মফঃস্বল এলাকাগুলি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ সেখানকার সঙেও পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে। ক্রমশ গ্রামের সঙেও এই পরিবর্তন সূচিত হয়। দেব-দেবী চরিত্রের মাধ্যমে সামাজিক নানান সমস্যা, অবক্ষয় মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ক্রমশ দেব-দেবীর পাশাপাশি মানব চরিত্রও স্থান পায়। তাদের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কিত কাহিনি ও সমস্যাগুলি সংলাপ, গান, নাচের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দরিদ্র মানুষগুলির জীবনে সাধ থাকলেও বিনোদনের জন্য ছিল সাধ্যের অভাব। কেবলমাত্র বিনোদনের কারণে অর্থব্যয় তাদের কাছে ছিল বিলাসিতার নামান্তর। তবুও কর্মমুখর জীবনে অবসর সময়ে নিত্য দিনের গতানুগতিকতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে করত গ্রামীণ সংস্কৃতিচর্চা। যার কেন্দ্রে ছিল দেব-দেবী, ধর্মগুরু, স্বর্গ-নরক-এ সমস্ত ভাবনা চিন্তার সংস্কার। চৈত্রমাসব্যাপী প্রতিদিন কাজের শেষে তারা সমবেত হতো কোন ফাঁকা স্থানে। নিজেদের রচনা করা পালা, সুর করা গান, সংবদ্ধ করা সংলাপ, সৃষ্টি করা চরিত্রের ডালি নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুত করে তুলত। প্রায় মাসব্যাপী মহড়ার শেষে গাজন উৎসবের শেষ দিন রাত্রে সকলের সামনে উপস্থাপিত হতো সেই গাজনপালা। প্রায় সারা রাত্রিব্যাপী এই আনন্দ অনুষ্ঠানটি ছিল আসলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। পাশাপাশি ধর্মীয় আঙ্গিকে আনন্দ বিনোদনের উপাদানস্বরূপ। ক্রমশ এই

গাজনপালা নামক মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানটিতেও বিষয় নির্বাচনে, ভাবনা চিন্তায়, চরিত্র চিত্রনে বদল দেখা দেয়। সম্পূর্ণ দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের অনেকাংশেই স্থান করে নেয় বাস্তব জীবনের ঘটনা। দেব-দেবী চরিত্রের বদলে রূপায়ন হয় মানব চরিত্রের। আশেপাশে ঘটমান কোন বিষয় বা ঐ গ্রামেই ঘটে যাওয়া কোন বিষয়কে অবলম্বন করে নির্মিত হয় কাহিনি। চারপাশের চরিত্রগুলি থেকেই নির্বাচন করে নেওয়া হয় কাহিনির চরিত্রদের। এতে গাজনপালাগুলি মানুষের কাছে আরও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। ক্রমশ দিনবদলের সাথে জনপ্রিয়তা বর্ধিত হওয়ায় গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে গাজনদল। তারপর এক সময় তাতে যুক্ত হয় ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। গড়ে ওঠে পেশাদারি গাজনদল, বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অসংখ্য, পেশাদারি গাজনদল গড়ে উঠেছে ও গদিঘর (কার্যালয়) নির্মিত হয়েছে। অর্থ যশ, জনপ্রিয়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিয়োগ হয়েছে দলের তত্ত্বাবধায়ক, আলো, শব্দ, নিয়ন্ত্রক কর্মী, নির্মিত হয়েছে মঞ্চ। দেশীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের সাথে যুক্ত করা হয়েছে আধুনিক, পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র। সাজসজ্জা থেকে প্রসাধন সমস্ত কিছুতেই এই বদল ঘটেছে। বদল ঘটেছে পালার গানের ভাষায়, সুরে, সংলাপে। তেমনি বদল ঘটেছে চরিত্র নির্মাণে, বিষয় বৈচিত্র্যেও।

সময়ের সাথে সাথে গাজনপালাগুলির বিষয় ও চরিত্রে বদল এলেও তার মধ্যে প্রকাশ পায় সমকালীন সমাজের চিত্র। চতুর্পাশ্বে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলি অবলম্বন করে পালা কাহিনিগুলি নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিখাদ হাস্যরস ও রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের সমস্যা, অবক্ষয়িতরূপ, জটিল বিষয়, অন্ধকার দিকগুলিকে গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষগুলির সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে ঐ বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবিত করা, সমস্যাগুলির প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। গাজনপালাগুলির পরতে পরতে তা স্পষ্ট।

গাজনপালা কাহিনিগুলিতে ধরা পড়ে সমকালীন সমাজের পারিবারিক চিত্র। বাবা মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য হীনতা, অবহেলা এমনকি অত্যাচারের বিষয়কে কেন্দ্রীভূত করে পালানির্মাণ বেশ প্রচলিত একটি বিষয়। যেমন- আদি শিবশক্তি দলের চতুর্থ ছকের বিষয় ছিল পিতা-মাতার প্রতি পুত্রের অবহেলা, অসম্মান। যা শেষ পর্যন্ত পুত্রকে নিজের কর্ম সম্পর্কে অনুশোচনা জাগায়। পুত্রের কাছে নানান রকম ভাবে অপমানিত হয়ে অবহেলিত হয়ে পিতা গেয়েছেন—

“ভাই বলো পুত্র বলো
কেউ নয় আমার আপন হইল গো
যারে আমি আপন ভাবি
যারে আমি আপন গো
আপন কোন জন চিনলাম না।”

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে সন্তানের কাছে অবহেলিতা মায়ের প্রতি বলা হয়েছে—

"ভাগের মা নাকি গঙ্গা পায় না
আমরা যে বিভক্ত, আজ বহু ভাগে
ধর্ম পথ আর নীতি অনুরাগে
এই যে ঘটনা ঘটায় আমাদের মা
একদিন সে আর গঙ্গা পাবে না।"

বাবা মায়ের প্রতি সন্তানের উদাসীনতা অবহেলার পাশাপাশি পালাকারেরা বাংলার চিরপরিচিত সন্তান বাৎসল্য রূপটিকেও তুলে ধরেন কাহিনির মধ্যে। যেমন— নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে রানী তার পুত্রের উদ্দেশ্যে গেয়েছেন—

"ওরে আমার আঁচলের ধন
সকল দুঃখ ভুলিয়ে দেয় হেরিলে বদন।"

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার দ্বিতীয় ছকে মাতা যশোদার কৃষ্ণের প্রতি সন্তান বাৎসল্যতার মধ্য দিয়ে মানব সন্তানে প্রতি বাংলার মায়ের চিরপরিচিত স্নেহ, মমতার পরম রূপটি প্রকাশ করেছেন। পালাকার এই ভাবে—

"এক ফালি চাঁদ
আকাশ হয়ে নেমে এলি তুই কোলে
হাজার তারা হার মেনেছে
মা এর আঁচল তলে
শিখা হয়ে জ্বলবি রে তুই
আমার প্রাণের দীপে
যতই দুঃখ আসে আসুক
রাখব বুকে তোকে
ছায়ার মতো বাঁধব তোকে
চোখের পলে পলে।"

গাজনপালার কাহিনির মধ্যে প্রকাশ পায় দাম্পত্য, প্রেম, নির্ভরতা, কলহও। পারিবারিক, সামাজিক ছকগুলির ঘটনা প্রেক্ষিতে সেই চিত্র ধরা দেয় দর্শকচক্ষে। যেমন— আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে দাম্পত্য অশান্তির পর স্ত্রীর কণ্ঠে স্বামীর প্রতি নির্ভরশীলতা সহ প্রেমের চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে—

"আরে শোনো বলি ওগো স্বামী
আরে কেনো করো রাগারাগি
আরে তুমি মরে চলে গেলে
কার কাছে থাকব আমি?"

স্বামীও তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে—

"যদি ভুল করে থাকি
ক্ষমা করো গো...লায়লা মজনু গো।"

ষষ্ঠ ছকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। বৃদ্ধ স্বামী তার বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি বলেন—

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন বউয়ের কথায় চলি
আদেশ করেন বউ বউ গুরুজন
বউয়ের আদেশে আমি দেখব বৃন্দাবন।"

গাজনপালাগুলির মাধ্যমে পালাকারেরা সমাজ সংস্কারক রূপে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সামাজিক নানান মন্দ বিষয়গুলিকে রঙ্গ, ব্যঙ্গ, তামাশা, পরিহাসের মাধ্যমে মনোরঞ্জক উপাদান রূপে গ্রাম্য মানুষগুলির সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে আসলে সমাজের অগ্রসরতার প্রতিবন্ধক দিকগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিরক্ষর মানুষগুলিকে সচেতন করে তোলেন। ঈশ্বর উপাসনার মধ্যস্থ ভন্ডামি প্রকাশ পেয়েছে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ির চরিত্রে। একদিকে তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম জপ করে চলেছেন আরেক দিকে পুত্রবধূর উপর নির্মম অত্যাচার করে চলেছেন। আর সেই রূপটিই প্রকাশ পায় বারে বারে। পুত্রবধূ তার কাছে জীবন ভিক্ষা চাইলে তিনি উদ্দেশ্য করে বলেন—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
কার কাছে চাইলি জীবন ভিক্ষারে।"

আবার পুত্রের কথা পুত্র বধূর কাছে জানতে চেয়ে বলে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
খোকা কি এখনও ঘরে?"

আবার নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকের অঞ্চল প্রধানের চরিত্রে কৃষ্ণনাম জপ করার পাশাপাশি তার দুষ্ট চারিত্রিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে সে জানায়—

"আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মন
আর হরে কিষ্ট হরি বলে যাব বৃন্দাবন।"

আবার কখনো বলে—

"হরে কিষ্ট হরে হরে
উপর থেকে যা কিছু আসবে
দেব লাল টুকটুকে নাত বউয়ের ঘরে।"

নাতবউ-এর প্রতি উদ্দেশ্যে করে গায়—

"এত রাতে মনটাকে পুষে রেখো না
এসো না...এসো না।"

নাতবউয়ের স্বামীর হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে সে গায়—

"কিষ্ট কিষ্ট হরে হরে
এবার গুরু যাব প্রানে মরে
জয় নিতাই—জয় নিতাই"

অবশেষে প্রাণ বাঁচানোর উপায় খুঁজে পেয়ে গানের মাধ্যমে প্রকাশ পায়—

"কিষ্ট কিষ্ট হরে হরে
প্রাণ বাঁচাবার তরে
পোদান ঢুকছে আজ ঐ
খাটের নীচের ঘরে।"

সেখানে ধরা পড়ে গিয়ে নাতির উদ্দেশ্যে গায়—

"যা হয়েচে দেনা বাবা চেপে
লোকে জানলে দেবে মেরে
তুই যা চাইবি সব দেব ছেড়ে।"

কর্মসুত্রে প্রবাসে থাকা স্বামীর কাছে স্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে ধরা পড়েছে পুলিশের চারিত্রিক দুষ্টতা—

স্ত্রী— "তুমি নাইকো ঘরে, আমি মে'ছেলে
একা যেতে হয় রাত্রে ফাঁকে
তাই পুলিশ বলে এসো কাছে
তোমার সাথে কিছু কতা আছে।"

স্বামী (পুলিশকে উদ্দেশ্য করে)—

"সব থাকতে তোর একি স্বভাব
পরের বউ এর কাছে কেন আসিস?"

নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে খনার স্বামী মদের নেশায় আসক্ত। স্থানীয় সভাপতি মদ, জুয়া বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে চাইলে সে বলে—

"মদ, গাঁজা, সাট্টা বন্ধ করবে? যা এখন জগত চলছে জীবনে পারবে না।"

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে হবু জামাইকে আশীর্বাদ করে শ্বশুর মশাই বলেন—

"মদ্য পানে মতি হোক, লিভার স্ট্রোকে মৃত্যু হোক।"

নাট্য মন্দির গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে অকর্মণ্য অলস, মাদকাসক্ত, স্ত্রীর উপর অত্যাচারী স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, দায়িত্ব জ্ঞানহীন স্বামী গানের সুরে বলে—

"বউ আমার ঘরের লক্ষ্মী
নো ঝুঁকি নো টেনশন"

তখন তার প্রসঙ্গে সভাপতি উক্তি করে—

'গাঁটে নেই পয়সা কড়ি
চড়ে গাড়ি করে প্রোডাকশান।"

সামাজিক বৈষম্যতা শহরের মতো গ্রামেও বিদ্যমান। শ্রেণিবৈষম্য যেমন রয়েছে তেমন রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্যতাও। উচ্চবিত্তের প্রতি কটাক্ষ, কখনো পরিহাসের মধ্যে দিয়ে পালাকারদের লেখনীতে সেই চিত্র ধরা পড়ে। কখনো চিত্রিত হয় অর্থবানের আমোদ-প্রমোদ বিলাসিতার চিত্র আবার কখনো বা অর্থহীনদের দারিদ্রতা ফুটে ওঠে। আদি শিবভক্তি গাজনতীর্থ দলের ছকে পণের দাবিতে অত্যাচারী গৃহবধূর দরিদ্র ভ্রাতারা ভিক্ষা করে পণের টাকা সংগ্রহ করা সময় গেয়েছে—

"ও বাবুরা
দু চার পয়সা দাও গো হাতে হাতে
পথে নেমে হাত পেতেছি
ভিক্ষার কারণে
তোমাদের ওই কানাগলি
নামিয়ে দেবে মোদের গলায় দড়ি
তোমরা আমার মাতা পিতা
দিও না ফিরিয়ে।"

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে ভিখারি রাজদ্বারে উপস্থিত হয়ে অন্ন চায়—

"বলি ও গো বাবু, ধরি দুটি পা
তোমরা আমায় কিছু দাও না খেতে, আমায় মেরো না
সন্তান থাকে যা মায়ের কোলে
খোদার খাবার চাইলে খেতে, মা কি দেবে ফেলে?"

উচ্চবিত্তের আমোদ প্রমোদ-এর চিত্র মেলে নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে। বিত্তবান পিতা কন্যাকে উদ্দেশ্য করে গেয়েছ—

"খাও দাও নাচো
বাঁচো শুধু বাঁচো
সুযোগটা হাতে পেলে
এক ক্ষুধা সুখ
নিয়ে ভরো বুক
দিনটা কাটাও হেসে খেলে।"

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার ষষ্ঠ ছকে ভিখারীর পরিহাসমূলক গানে ধরা পড়েছে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যতা—

"একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ
ওরে টাকার দিকে সবার লক্ষ্য
তিনে নিত্য চারে বেদ
টাকাই যে মানুষকে বাড়ায় ভেদাভেদ
পাঁচে পঞ্চবান ছয়ে ঋতু
টাকার কাছে যে সবাই ভীতু
সাতে সমুদ্র আটে অষ্টবসু
টাকা যে মানুষকে বানায় পশু
আর নয়ে নবগ্রহ দশে দিক
টাকা থাকলে এই দুনিয়ায় সব ঠিক।"

সামাজিক নানান অন্ধাকারময় দিক, সমাজ অগ্রসরের প্রতিবন্ধকতা, প্রকাশিত হয় পালাকারের রচনায়। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্টম ছকে পণপ্রথার ভয়ঙ্করতাকে কেন্দ্র করে কাহিনি নির্মিত হয়েছে। দরিদ্র কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়েছিল উচ্চ বিত্তের পরিবারে অথচ পণের টাকা দিতে না পারার অপরাধে স্বামী ও শ্বাশুড়ির হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। মৃত দিদির কাছে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করা পণের টাকা এনে ভাইরা কাঁদতে থাকে—

"দিদি কথা বল, ডাকে সাড়া দে
ভাই বলে বুকে টেনে নে
আমরা ভিক্ষা করে মেগে এলাম
পণের টাকা দিতে
সুখে শান্তিতে থাকবি বলে
বিয়ে দিল বাবা বড়ো ঘরে
এই কি ছিল কপালে?"

নিউ দিগ্বিজয় বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে বাবা মায়ের উপর অত্যাচার করায় জেষ্ঠ ভ্রাতা নিষেধ করলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাকে তাচ্ছিল্য করে বলে—

"নদীতে যেমন ভাটা পড়ে, ভাটার পরে জুয়ার
আমায় জ্ঞান দিচ্ছে শিক্ষিত শুয়ার।"

সমাজের পরকীয়া রূপটি পালাকারের কাহিনির মধ্যে বারে বারে দেখা দেয়। শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকটি সম্পূর্ণ নির্মিত হয়েছে পরকীয়া সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। কর্ম ব্যস্ত স্বামীর গৃহবধূর একাধিক পরকীয়ার প্রতি গানে বলা হয়েছে—

"চুমেদারী, চুমেদারী বৌদি আমার

বার বার দিচ্ছে চুম
বোঝে না হাইভোল্টেজে
কেটে যাবে ডুম।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের শুরুতে দেখা দেয় সঞ্জয় তার মৃত শ্বশুরের মৃত্যুদিনে মাল্যদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সেখানে মৃত শ্বশুরের ছবিতে মাল্যদানের জন্য আড়াই হাজার টাকা কেবলমাত্র ফুলের জন্য ব্যয় করা হয়। অথচ তার শ্বশুর ছিল একজন সমাজ বিরোধী। চুরি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, সবই করেছিল। তার মাল্যদান অনুষ্ঠানে বিশেষ নিমন্ত্রিতরা হল চুল্লু ব্যাপারী তপন, হাতকাটা মদন, পকেটমার লালু।

ভৃত্যের প্রতি স্বার্থপর মনিবের অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে এই ছকেই। ভৃত্য হরি আক্ষেপ করে মনিবের প্রতি উক্তি জানিয়েছেন– "এই হল ভদ্দর লোকেদের আচার ব্যবহার। এদের কাজের সময়ে হরি, বিপদের সময় হরি, আর খাবার সময়ে খেতে দেবে শুকনো মুড়ি।"

এক সময় ক্রুদ্ধ ভৃত্য মনিবের প্রতি মনের বিরুদ্ধতা ব্যক্ত করে গানে–

"মানুষ যদি হয়ে থাকি, দেব এদের বুকে মাটি
পরবে কথা হলে বাসি, পরে কিন্তু লাভের মিষ্টি
বেকার কাজে সময় ব্যয়, অসম্মানে অর্থ ব্যয়
বউয়ের কথায় ওঠে বসে, এদেরই কি আসে যায়?"

ঐ দলের ষষ্ঠ ছকে সমাজে প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও অবমাননার নজির মেলে। মৃত বাবা মায়ের কৃত্যানুষ্ঠানের প্রতি পালাকারের উক্তি---

"বাবা মা মরলে পরে
কর্ম করো ভালো করে
পাবে যে সুফল
যেমন কর্ম করবে দাদা
তেমন পাবে ফল।"

এরপর মৃত বাবার কৃত্যানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন সন্তান বলে---

'আমি তিন দিনেতে করব ছ্যাদ্দ
মালসার ভাত খাব না
আমি মাছ মাংস ভালোবাসি
বউ ছাড়া চলি না।"

আবার সম্পত্তি পিপাসু সন্তান অর্থের লোভে মাকে হত্যা করতে চায়। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে সেই চিত্র এঁকেছেন পালাকার। অর্থ পিপাসু সন্তান গানের মাধ্যমে বলে–

"কেন দেরি করছিস তুই

ধর বাবা চেপে

এই ফাঁকে মাটারে'

দি টিপে মেরে

মা গো মা মধু নাম

নেব কাঁধে করে

নিয়ে যাব তোমায়

আসল মাটির ঘরে।

এই হরি নাম যাবে মায়ের সাথে গো

মা আমার হেলে দুলে যাবে শশ্মান ঘাটে গো।"

মৃত মায়ের সৎকার্য করার সময় মেজ ছেলে মদ্যপ অবস্থায় উপস্থিত হয়। তখন মঞ্চে আবহ সঙ্গীত হয়—

"কেন ভুল করিস তালে

মুখে হরি হরি বলে

মদ খেয়ে থাক না সবাই মেতে।"

সেই মদ্যপ পুত্র গানের মাধ্যমে জানায়—

"যদি মাল খেয়ে না হয় বেসামাল

তবে কিসের মাতাল?

ঢাল রে গলায় ঢাল

দেখবি কত রংমশাল

পাল্টে দেব হালচাল

জানিস না মদেতে কত যে যাদু

কিছু বুঝলে ছোট বাবু?"

সামাজিক দুরবস্থা প্রকাশ পেয়েছে শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থার সপ্তম ছকের নায়কের গানে—

"বাবারে ও বাবারে

চারিদিকে মেয়ের হাহাকার

রেপ কেসেতে হচ্ছে মার্ডার

আমি কি একা খেয়ে যাব ঝাড়।"

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে সুন্দরবন উপকূলবর্তী মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র সামান্য অনুমান করা যায় যখন বাল্য বিধবাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার স্বামীর মারা যাওয়ার কারণ। বৃদ্ধা জানান তার স্বামী কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। কাঁকড়ার গর্তে হাত না দিয়ে সাপের গর্তে হাত দিয়ে দেওয়ায় সাপের কামড়ে তার প্রাণ যায়। তাই সে বাল্য বিধবা। এই চিত্রের মধ্য দিয়ে

সুন্দরবনাঞ্চলের উপকূলবর্তী মানুষের বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম প্রতি নিয়ত করতে হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে এবং নারীও যে প্রকৃতির শিকার হন সেই নির্মম চিত্র তুলে ধরেছেন পালাকার।

পালাগুলি লোকসাংবাদিকতার কাজও করে। দেশের খবর জানা যায় অনেক সময় কাহিনির মধ্যে দিয়ে। নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয় বার্তা দলের সপ্তম ছকের শুরুতে বৃদ্ধ সাংসারিক অশান্তির সাথে পাহাড়ের আন্দোলন অশান্তিকে তুলনা করে সংলাপ শুরু করেছেন এই ভাবে—"আগুন জ্বলছে, দার্জিলিং পাহাড় জ্বলতেছে, এবার আমার সোংসারে আগুন জ্বলবে।"

প্রশাসনিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের বিষয় প্রকাশ পায় পালাগুলির মধ্যে। যেমন—নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে কন্যাশ্রী প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়। বাবা মায়ের যা কিছু বিষয় তার অবর্তমানে পুত্র ও কন্যা সমান অধিকারী সেই সংবাদ দেওয়া হয় আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের মধ্যে।

সরকারি জনসচেতনতামূলক প্রচারের জন্যও পালাগুলিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকে গ্রামবাসীদের জন্য সরকার যা যা ব্যবস্থা করেছে তার উল্লেখ করে সরকারের প্রশংসা করা হয়েছে। সেরকমই এক জায়গায় পুলিশ জানায়—

"ডিউটি করে দাদা শরীর আমার যাচ্ছে চলে
রাত্তিরে ঘুম আসে না এবার বুঝি যাব মরে
যেকানে সেকানে পাইখানা করবে নাতো আবর্জনা
সরকার করল আইন স্বচ্ছ ভারত অভিযানে।"

আবার কখনো বলা হয়েছে এভাবে—

"একটি গাছ একটি প্রাণ এই মন্ত্রে শিখে নিন
গাছ লাগিয়ে শোধ করে দাও গাছের প্রতি জীবন ঋন
যাও যাও বিদ্রোহীরা যুদ্ধ শুরু করো
দেশ বাঁচানোর গাছ সেজে মারো কিংবা মরো
হাত জোড় করে বলছি সবাই স্বচ্ছ ভারত গড়ো
নির্মল বাংলা গড়ো স্বচ্ছ ভারত গড়ো নির্মল বাংলা গড়ো"

কেবলমাত্র সমাজের দুরাবস্থা বা অন্ধকারময় দিকটিই নয় ভালো সুন্দর বিষয়, পারিপার্শ্বিক বসবাসকারী মানুষগুলির ব্যবহার, তাদের মনের উদারতা, আন্তরিকতা, আতিথেয়তা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব, প্রকৃতির নির্মল রূপটিও প্রকাশ পায় পালাগুলির মধ্যে। যেমন- আদি শিবশক্তি গাজনপালার তৃতীয় ছকে নিরক্ষর গ্রাম্য যুবক শহুরে যুবতীকে ভুল বোঝার উপলব্ধির পর তেলো কাঁকড়ার টক দিয়ে আতিথেয়তার মাধ্যমে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নবর্গীয় দরিদ্র গ্রাম্য মানুষগুলির সরল আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটেছে। তেমনি ষষ্ঠ ছকের শেষে বিয়েতে পাত্র অসম্মত

জানার পরও প্রিয়া তাকে জলখাবার খেয়ে যেতে বলার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের আতিথেয়তা রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে রাজকুমারীর কণ্ঠে—

"কুলু কুলু ঢেউ লাগি মনে আজ
ঝিরি ঝিরি বয়ে চলে মলয় বাতাস
দোলে দোদুল দোলে দোদুল মন আমার
প্রজাপতি, প্রজাপতির ঐ পাখায় মনের আবেশে লুকায়
ছলাক ছলাক কলস বারি উথলিয়া যায়রে যায়
রাখালিয়া বাঁশি বাজে নীল দিগন্ত নীলিমায়।"

নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা দলের 'করাচ গানে'ও প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন পালাকার।

"রুনু ঝুনু নুপুর বাজে পায়ের তালে
ভোরের ও কোকিল ডেকে যায় বলে
মনের ময়ূর নাচে পেখম তুলে
বসুন্ধরা আলো করেছে
ঝিকি মিকি জোছনা ভরা নীল আকাশে
দখিনা পবন বয়ে যায় মনের খুশিতে।"

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণীও শুনিয়েছেন পালাকারেরা। তাই নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পরিবেশেনের শুরুতে 'বন্দনা গানে'র মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমনন্বয়ের কথা বলা হয়েছে।

"রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
আশমানে সব বেড়িয়েছে যে আশমানী তারা।
আজ পড়বি ঈদের নমাজ রে মন শেষের ঈদটাতে
ঐ ময়দানের সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।
কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন তিনি মহান
দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন নেতাজী ক্ষুদিরাম
তোমার মূর্তি নিয়ে ফুল দিয়ে করছে সবাই পুজো
যদি বেঁচে থাকো সুভাষ একবার ফিরে এসো
সরস্বতীর গান আজ গাইব আমি গান হিন্দু মুসলমান সে নামে করি প্রণাম।"

নাট্যমন্দির গাজন সংস্থার 'বন্দনা গানে'ও রয়েছে হিন্দু মুসলীম ধর্ম সমন্বয়ের আহ্বান—

"এই মাটিতেই জন্ম মোদের
এ যে ভারত মহান

যে আল্লায় সেই ভগবান

জানাই প্রণাম আর সালাম।”

চিন বিপ্লবে লোকপুরাণ, গান, গাঁথা, গল্পাদিকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করেছিলেন বিপ্লবীরা। সোভিয়েত, গোর্কির নেতৃত্বে লোকসংস্কৃতিকে প্রগতির স্বার্থে ব্যবহারের পন্থা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছিল।[২৮]

Victor Turner ও বলেছেন–

> “In large-scale modern societies, social dramas may escalate from the local level to national revolutions, or from the very beginning may take the form of war between nations”[২৯]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় সমাজেও শাসক শোষকেরা অথবা প্রগতিশীল পরিবর্তন কর্মীরা সংস্কৃতিকে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করে চলেছেন। এই বহমান ইতিহাস মানুষের ইচ্ছার এক নিরপেক্ষ প্রবাহ। গাজনপালাগুলির মধ্যে রঙ্গ, তামাশার মাধ্যমে প্রতিবাদ প্রতিরোধের রূপটি প্রকাশ পায়। গাজনপালাগুলিতে লোকসমাজের নান্দনিকতা আমাদের চমৎকৃত করে। সামগ্রিক ভাবে--- পালাকারেরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে শিল্পসম্মতরূপ প্রদান করেন যা প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে নান্দনিকতার জগতে আমাদের উত্তীর্ণ করে। মনোরঞ্জনমূলক পালাকারদের এই সৃজনশীলতা এবং নান্দনিক দৃষ্টি-ভঙ্গি সম্পূর্ণ ভাবে তাদের নিজস্ব প্রতিভার ফলস্বরূপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামুক্ত। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসমাজ এর চর্চা ও দৃষ্টিনন্দনরূপ প্রদান করে দর্শককে মুগ্ধ করে চলেছে তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় লোকসমাজের সমাজ মনস্কতা, সমসাময়িক কাল চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় এই গাজনপালা কাহিনিগুলিতে।

৫.৩ গাজনপালাভিনয় ও লোকশিক্ষা

জীবের জীবন ধারনের জন্য অন্নসংস্থান এক বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। আহারের প্রয়োজনেই তার শস্য উৎপাদন। যে উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল তার জীবনের মনোরঞ্জনমূলক দিকটিও। ফলত শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন অবস্থায় ভবিষ্যতের অন্নসংস্থানের ভরসায় নানা রকম উৎসব পালনের প্রচলন ছিল বাঙলার সমাজে। আসলে বাঙলার অধিকাংশ মানুষ ছিলেন কৃষিজীবী। কৃষি উৎপাদনই ছিল পরিবারগুলির সারা বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নির্ধারক। এরকম কিছু উৎসবের প্রচলন আজও সমাজে অব্যাহত রয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় কৃষিজীবী মানুষগুলির জীবনে এরকমই একটি শস্য উৎপাদনকেন্দ্রিক ধর্মীয় উৎসব হল গাজন উৎসব। কৃষি উৎপাদনশীল ব্যক্তির ব্যাপকতা হ্রাসের

সাথে সাথে এই উৎসবের উন্মাদনা বর্তমানে বিস্তর হ্রাস পেলেও কিছু স্থানে তা এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

চারদিনব্যাপী নানান রীতি-নীতি সমন্বিত এই ধর্মীয় গাজন উৎসব পালিত হয় যার শেষদিন রাত্রে আয়োজন করা হয় একটি মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠানের। এটি হল গাজনপালাগান সমৃদ্ধ লোকনাট্যানুষ্ঠান। লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক নৃত্য-সংগীতে-সংলাপ মিশ্রিত কাহিনি বিশেষ এই গাজনপালাগানগুলি লোকনাট্যের ঐতিহ্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের লোকসমাজের নিকট অতিশয় আদরনীয় ও বিনোদনের এ এক বিশেষ উপকরণ। এখানকার মানুষের দৈব বিশ্বাস, ভক্তি, সামাজিক সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি এই গাজনপালাগানের মধ্যে নিহিত থাকায় পালাগানগুলি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় দরিদ্র লোকসমাজের আর্থ-সমাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় বহন করে। প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পালাকারেরা লোকনাট্যের আকারে ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সমাজ সমস্যামূলক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে হাসি-কান্নার আঙ্গিকে নৃত্য-সংগীত-সংলাপ সমৃদ্ধ গাজনপালা ও গানগুলি রচনা ও পরিবেশন করে এই অঞ্চলের গ্রাম্য জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতেন। পালাগানগুলির অধিকাংশ জুড়ে থাকত দেব-দেবীকেন্দ্রিক বিষয়। ক্রমে মানব জীবনের কাহিনি তার বিষয়রূপে আশ্রয় পায়। বিভিন্ন ধর্মান্তর্গত দেব-দেবী অথবা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব নিয়ে এই সমস্ত কাহিনি নিম্নবর্গীয় নিরক্ষর জন-সাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হত। বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—

> "গ্রাম্য কবিগণের গৃহস্থালী বর্ণনায় শিবদুর্গা লৌকিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মানুষ গ্রাম্য সমাজের গৃহ দম্পতী।"[৩০]

কাহিনি দেব-দেবীকেন্দ্রিক হওয়ায় তার মূল বক্তব্য জন-সাধারণের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করত। গানের কাব্যগুন অপেক্ষা কাহিনি মুখ্য বিষয় হয়ে উঠত। সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল তাই এ ক্ষেত্রেও ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে পরিবর্তন। দিন বদলের সাথে সাথে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গড়ে উঠছে অসংখ্য পেশাদারি গাজনদল ও তাদের গদিঘর। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে প্রায় সারাবছর অর্থের বিনিময়ে মানুষের বিনোদন প্রদান করে চলেছেন এরা। এদের পরিবেশিত পালাগানগুলো যেন সমাজের দ্যোত্বক। দেবব্রত নস্কর এ সম্পর্কে বলেছেন—

> "আখ্যান বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টি, গীতি মাধুর্য ও কাব্যগুনে এইসব লৌকিক পালাগুলির সাহিত্যমূল্য অপরিসীম। সামাজিক বিচারে বলা যায় চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেব-দেবী নির্ভর লোকায়ত পালাগান সমূহ চব্বিশ পরগনা তথা সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের লোকসমাজের পরিচয় জ্ঞাপক ও সাহিত্য সংস্কৃতির মূখ্য পরিচায়ক।"[৩১]

গাজনপালাগুলি বাস্তবধর্মী। এর আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ। তাই সহজেই দর্শককে তা আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে এবং বিষয়বস্তু মানুষের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। বহু বছর ধরে

অগণিত মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত গাজনপালাগুলি এবং তার অভিনেতাদের সহজ, সরল, প্রানের আবেদনময় পরিবেশনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম্য নিরক্ষর বা স্বল্প স্বাক্ষরিত মানুষগুলির মনে ও জীবনে এক বিশাল ব্যপকতায় পক্ষবিস্তার করে। নৃত্য-গীত মূর্ছনা ও সংলাপে গাঁথা ওই লোককাহিনিগুলির পরতে পরতে রয়েছে এই সমাজের মানুষের জানা, অজানা, বাস্তব নানান বিষয়। তাই এই চলমান প্রবহমান, সংস্কৃতিটি জীবন্ত মনুষ্য সমাজকে উদ্দীপিত করে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির শিক্ষা ও চেতনার জন্য লোকনাট্য গাজন অপরিহার্য। যুগ যুগ ধরে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের সাথে সে নিজেকে ছন্দ মিলিয়ে চলেছে। আজও চলছে। তাই তার বিষয়েও সে প্রভাব প্রতীয়মান। মূলত দেব-দেবীমূলক কাহিনিগুলি তাই আজ অনেক বেশি জীবনকেন্দ্রিক। ধর্মচেতনার পাশাপাশি গোষ্ঠীচেতনা, সংস্কৃতি চেতনা এবং গ্রামজীবনের বাস্তব জীবন চেতনা সেখানে স্থান পেয়েছে। গ্রামীণ সমাজ আজ এমন এক মাধ্যমের পুনরাবিষ্কার করেছে যা তার একান্ত নিজস্ব এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। লোকসংস্কৃতি আমাদের গ্রামীণ সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করে। গাজনপালাগুলিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পালাকারেরা সৌন্দর্য উৎঘাটিত করেন তা মাতৃভূমির প্রতি তাদের ভালোবাসার উৎসস্বরূপ। এর অভিনয়ের ভাষা এখানকার মানুষেরই প্রচলিত মৌখিক ভাষা ফলে দর্শক মনে তা সহজেই গ্রহণযোগ্য এবং স্থায়ী হয়। তাই ঐ অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির জীবনে এটি সহজেই শিক্ষার একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছে। মনোরঞ্জনের পাশাপাশি এটি গণশিক্ষার একটি বাহন। এছাড়া সঙ্গীত ও নৃত্য সহজেই যেহেতু মানুষের কাছে মনোগ্রাহী হয় তাই আনন্দের পাশাপাশি এগুলিও শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠতে সহায়ক হয়। শিক্ষা মানুষের চেতনা জাগায় শিবপদ ভৌমিক এ বিষয়ে বলেন—

> "শতকরা আশি ভাগ অশিক্ষিত গ্রামীণ অভুক্ত মানুষের শিক্ষা ও চেতনার জন্য লোকসংস্কৃতি আজও অপরিহার্য হয়ে আছে।"[৩২]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চল জুড়ে যুগ যুগ ধরে সমাজ পরিবর্তনের সাথে ছন্দ বজায় রেখে এই কর্মটিই সাধন করেন গাজনপালাকার ও অভিনেতাগণ।

চৈত্র সংক্রান্তিতে ধর্মীয় উৎসব গাজনের শোভাযাত্রায় সঙ্গীত, ছড়া সংযোগে পরিহাসাত্মক ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয়ের প্রচলন ছিল। সমকালীন সমস্যা, অনাচার, দুর্নীতি ব্যঙ্গের আকারে প্রকাশ করা হত সঙের সাজে কথ্য ভাষায়। ক্রমশ সঙ এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হত এই সঙ এর গানে। ক্রমে বিখ্যাত রচনাকারেরাও সঙের গান রচনায় লেখনী ধরেন। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

> "সঙ এর গান ও পালা রচনা করতেন অমৃতলাল বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রমুখ বিদগ্ধ মানুষ।"[৩৩]

সঙের মধ্য দিয়ে সামাজিক নানান অন্যায়, অবিচারের প্রতি সাধারন মানুষের সচেতন দিকপাত ঘটানো হত রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন—

> "সঙ/নকশা সমাজের অন্যায় দিকে ব্যঙ্গ করে সমাজ সংস্কারের স্রোতকে অব্যাহত রেখেছিল।"[৩৪]

সঙ যে সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার একটি নিদর্শন পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে—

> "সমাজের মান্য ব্যক্তিদের এবং ইংরেজ শাসকদের বিপর্যস্ত করে তুলত সং। কলকাতার মিশনারি, জমিদার এবং মান্য ব্যক্তিদের অনুরোধে ১৮৬৫ তে সিসিল বিডন গাজনে অশ্লীল নৃত্যগীতাদি এবং নিষ্ঠুর বানফোঁড়াদি নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতা দেন।"[৩৫]

বাংলার গাজনপালা নামক লোকনাট্যে নিম্নবর্ণের হিন্দু জনজাতির একচ্ছত্র প্রাধান্য। সঙ সেজে, তামাশা, গান, ও ছড়ার মাধ্যমে উচ্চবর্ণসহ সমাজের নানান দিক ও সমাজ কর্তৃত্বের প্রতি সমালোচনার রীতি পদ্ধতিতে তাদের জনসচেতনমূলক দৃষ্টি-ভঙ্গি নির্মাণ এক ঐতিহ্য।

শ্রেণি সচেতনতা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাইরে থেকে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী নিম্নবর্গীয়, শ্রেণির মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থেকে দূরে সমাজের প্রান্তবাসী এই জনগণের কাছে সমাজ সম্পর্কিত সকল ধারনা স্পষ্ট থাকেনা। তাই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা সামাজিক বিষয় কর্তৃত্বাধীন মোড়ল, মহাজন, ধনী, নারীলোলুপ, জোতদার অনায়াসে এই লোকনাট্যগুলিতে আক্রান্ত হয় আর আধা সামন্ত সমাজের মূল্যেবোধে জড়িত থাকেন গাজনের রচনাকার, অভিনেতারা। তাই গণ-ঐতিহ্যে প্রতিবাদী প্রগতিশীলতার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় পশ্চাদপদ চেতনার দীর্ঘছায়া। গাজনপালাগুলিতে সমাজচেতনায়, আক্রমণের বর্শামুখ রাজনৈতিক শাসক, উচ্চবর্ণ, অর্থনৈতিক, শোষক, নাগরিক উন্নাসিকদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। হাস্যরস মিশ্রিত বিনোদনমূলক উপাদানের মধ্য দিয়ে সমালোচনা পরিহাস, সচেতনতাবোধ জাগরণ এর প্রাধান্য বিস্তার করে। ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক চরিত্র, মোড়ল, আধুনিক নাগরিক যুবতী, কলহপ্রিয়া মুখরা গৃহবধূ, দরিদ্র অসহায় গৃহবধুর দর্জাল শ্বশ্রুমাতা, সকলেই স্থান পান এই তীর্যক মনোভাবপন্ন চরিত্রগুলিতে। পালাকারের রচনায় মন্দ মানুষগুলি আত্মরক্ষা করতে অপারক। স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য প্রচারেও গাজনপালাকে অংশত ব্যবহার করেন পালাকারেরা। পরিবার থেকে সমাজ অতিক্রম করে রাষ্ট্র সমস্ত বিষয়ের জনসচেতনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিক্ষেপ করা হয় গাজনের পালাকাহিনিতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অগণিত শিল্পী রয়েছেন যারা আপন প্রতিভাবলে ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে পালাগানগুলি রচনা ও পরিবেশন করেন। তাদের কল্পনা, আদর্শ, জীবনবোধ, ভবিষ্যতের বিকাশপন্থা, তীব্র আশা-আকাঙ্খা, প্রভৃতি তাদের সৃষ্ট পালাগানসমুহে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

শুভবোধ, বুদ্ধি ও চেতনার জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষার প্রসার। লোকনাট্যগুলির মধ্য দিয়ে সেই সামাজিক কাজটি করা হয়। বর্তমানে পোশাদার পালা প্রচলনেও পালাকারেরা তাদের রচনার মধ্যে দিয়ে এই সমাজসংস্কারমূলক উদ্দেশ্যটিকে বজায় রাখার চেষ্টা করেন। গ্রাম্য প্রতিভাবান শিল্পীদের অভিনয় প্রতিভার গুনে সহজেই মানুষের মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে গাজনপালার বিষয়গুলি। সংগীত ও নৃত্য সহযোগে তার মধ্যেকার বার্তা খুব সহজেই এই নিরক্ষর মানুষগুলিকে স্পর্শ করে। হাস্য বা করুণ রসের মাধ্যমে তা সহজেই তাদের হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। তাই অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষগুলির কাছে কোন শিক্ষামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম এই গাজনপালা গানগুলি। পালাকারেরা এর মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে সমাজ সচেতনতা বোধ জাগ্রত করা, সমাজ সংস্কার করার কাজটি করে চলেছেন। প্রতিটি দলের প্রথম ছকে অশুভ শক্তির বিনাশ প্রদর্শন করেন পালাকারগন। সাধারনত দুর্গার অসুর বধের আঙ্গিকে এটি অভিনয় করা হয়। নারী সম্মান, নারী শক্তির জয়, নারীকে অগ্রসর হওয়ার বার্তা এবং অশুভ, অকল্যান, অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় জনগনকে উদ্বুদ্ধ করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে গ্রামে সার্ভে করতে আসা শিক্ষিতা শহুরে যুবতীর কাছে গ্রাম্য অশিক্ষিত যুবক জানতে পারে যেকোন স্থানের জল খাওয়া অনুচিত। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পালাকার দর্শকদের উদ্দেশ্যে পানীয় জল বিষয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিয়েছেন।

গ্রাম্য যুবকের নিরক্ষরতার কারণে বোধগম্যতার অভাব বিষয়টি পালাকার বুঝিয়েছেন 'মধু' শব্দটির মধ্য দিয়ে। যুবক দ্রব্য মধু ও নাম মধুর মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে তা বোধগম্যতায় অপারক। প্রসঙ্গত বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন ছকের শেষে যুবককে শিক্ষার কারণে শহরমুখী করা ও শেষে আবার গ্রামে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি শিক্ষিতা নারীর প্রতি বিশেষ সম্ভ্রমও প্রকাশ করেছেন।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকের ঘটনার মধ্যদিয়ে পালাকার অশ্বিনী নাইয়া বাবা মায়ের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন নতুন প্রজন্মকে। কাহিনিতে বৃদ্ধ পিতা সন্তানের অবহেলার কারণে আক্ষেপ করেছেন কান্নামিশ্রিত গানে—

"ভাই বলো পুত্র বলো'
কেউ নয় আমার আপন হইল গো
যারে আমি আপন ভাবি
যারে আমি আপন গো
আপন কোন জন চিনলাম না
ভোলামনের দুনিয়াটা চিনতে পারলাম না।"

কাহিনি র মধ্যে পুত্র পিতাকে 'তুই' সম্বোধন, পিতার সামনেই ধূমপান করা, তার কোলে পা রেখে দাঁড়ানো। নানান ঘটনা ও দৃশ্যের মাধ্যমে পিতার প্রতি তার অশ্রদ্ধা, তাচ্ছিল্য, অবহেলা মিশ্রিত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। বাবার কণ্ঠে গানের মাধ্যমে তাই পালাকার, নবীন প্রজন্মকে সচেতন করেছেন তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে—

"পিতা মাতার কষ্ট দিয়ে
সাজাও নিজের ঘর
তুমিও একদিন পিতা হবে
আর কিছুদিন পর।"

পরবর্তী ঘটনায় মাত্র ১০ টাকা চাওয়ার কারণে পুত্র পিতাকে পদাঘাত করে। বাবার সম্পত্তিস্বরূপ ৫০ বিঘা জমি, দুটো বাস, দুটা ভেসেল বিক্রয়ের খবর পাওয়ার পর পুত্র পিতার মৃত্যু কামনা করে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে দিয়ে আগাম প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সম্পন্ন করেছে। তাই পিতা পুত্রের উদ্দেশ্যে গানে বলেন—

"বামন ডেকে দিলি তোরা পায়শ্চিত্ত করে
মরিনি ঘুরছি আমি, চৈতন্য কাজ করে।
ভগবান ছাড়া কে মারিতে পারে?"

এরপর পিতার সম্পত্তি যে সন্তানেরই প্রাপ্য এ কথা জানিয়ে বলেন—

"বাবার কিছু থাকলে পরে পাবে ছেলে মেয়ে
এ কথা বারে বারে সরখাতায় বলে।
ছেলের মতো ছেলে হলে
বাবা কি তার না বলে?"

অবশেষে পুত্র তার পিতার প্রতি নিজের অন্যায় উপলব্ধি করে। তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে—

"বাবা ভুল করেছি ক্ষমা করো
আমি তোমারি ছেলে,
সব ভুলে নাও না টেনে অশ্বিনী বলে।"

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে এক দম্পতির পুরুষ চরিত্রটির 'বাবা' ডাক শোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সন্তান না হওয়ার জন্য স্ত্রীকে দোষ দেওয়া, সমাজের চোখে নারী কলঙ্কিত রূপে প্রতিপন্ন হাওয়া এবং অবশেষে ঐ পুরুষ চরিত্রটি নিজের ভুল উপলব্ধি ও স্বীকারের মধ্য দিয়ে পালাকার বন্ধ্যাত্ব যে নারীর অপরাধ নয়, বন্ধ্যা নারীরও সমাজে সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে সে কলঙ্কিত নয়—এই বার্তা সমাজকে দিয়েছেন।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে পালাকার মদ্যপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক সেই বার্তাটি পরিহাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। হবু শ্বশ্রুপিতাকে প্রণাম জানালে তিনি আশীর্বাদ স্বরূপ হবু জামাতাকে বলেন—"মদ্যপানে মোতি হোক আর লিভার স্ট্রোকে মৃত্যু হোক।"

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে বিবাহযোগ্যা পুত্র বা কন্যার পিতা মাতাকে সচেতন করেছেন পালাকার। বিবাহের পূর্বে যেন পাত্র বা পাত্রীর চরিত্র বিষয়ে সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করা হয়। পাত্র এক্ষেত্রে বলেন—

"ওরে ডালিম গাচে লাগলে পোকা ডালিম হয় দরকচা।
আর চেটে যায়, বাদুর পেঁচা, ভালো তোরা
খেয়ে না, কাকের বাসায় কোকিলের ছানা
...
আরে ননির ডেলা না গলালে
হয় না গাওয়া ঘি।"

ঘটনাক্রমে, এখানে পাত্র পাত্রীর মায়ের চরিত্র যাচাই করেন এবং তার চরিত্রে ত্রুটি পান। তবে অবশেষে পাত্রীর যে কোনো চারিত্রিক ত্রুটি নেই সেটিও উপলব্ধি করেন। তখন ঐ পাত্রই বলেন—"গোবর গাদায়ও পদ্মফুল ফোটে।" অর্থাৎ বাবা মায়ের চারিত্রিক ত্রুটি থাকলেই তার সন্তানের সেই ত্রুটি নাও থাকতে পারে এ বিষয়টি দর্শকদের বুঝিয়েছেন পালাকার।

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে নারী সম্মান, নারীর অগ্রসরতার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়গুলি পালাকার অশ্বিনী নাইয়া কাহিনির মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। স্বামীর অত্যাচারে অত্যাচারিতা স্ত্রী দর্শকদের উদ্দেশ্যে নিজের কষ্টের কথা ব্যক্ত করেছেন ছকের শুরুতেই এইভাবে—"তোমরা বলো? কত মার সহ্য করব? ঠিক আছে দেখি এই বয়সে আর কত মার সহ্য করতে হয়?"

কাহিনির মধ্যে দেখা যায় অলস, মদ্যপ স্বামী তার স্ত্রীর সম্মানের বিষয়টি না ভেবে জোর করে ভাটায় কাজ করতে পাঠাতে চায়। এই অত্যাচারে অত্যাচারিতা স্ত্রী স্বামীর প্রতি অভিযোগ, অভিমান গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করে—

"থাকব না চলে যাব, করব না তোর সংসার
দুবেলা মারিস ধরে, খেতে দিসনা খিদের ভাত।
ব্যবস্থা তোর করে দেবো, আনতে গেলে।"

স্বামী গানের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর করে—

"বললে কথা, ধরব টিপে
দেখি তোরে আজ কে বাঁচাবে।"

পরবর্তী অংশে স্ত্রী চরিত্রটি নারীর অনগ্রসরতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে দর্শকদের কাছে—“ও দিদি কিগো, আমরা কি কলিযুগে পুরুষদের কাছে পিছিয়ে থাকব নাকি, অ্যাঁ?” এবং কাহিনির সমাপ্তি অংশে স্বামী তার ভুল বুঝতে পারে। স্ত্রীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে গানের মাধ্যমে—

“আশ্বিনে বলে এই গানের ছলে
কোনোদিন তোকে আমি মারব না রে
ভুল হয়েছে...দে ক্ষমা ক’রে।”

আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের অষ্টম ছকের মূল বিষয় হল পণপ্রথাটির ভয়ঙ্কর রূপ, তার সামাজিক প্রভাব, কতখানি এটি অন্যায়, এবং কেন এই অন্যায় করা অনুচিত—এই সমস্ত বিষয়ে জনসচেতনতা রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন পালাকার। কাহিনিতে তিশা একজন গৃহবধূ। বাবা মা শ্বশুর বাড়ির পণের দাবি পূরণ করতে অপারক হওয়ায় বিবাহিত জীবনে সুখ শান্তি তার অজানা। যন্ত্রনাময় জীবন সে রাখতে চায় না। সে নিজেই চায় আত্মহননের পথ নির্বাচন করতে। তার শাশুড়ি মাতার সাথে তার স্বামীও অত্যাচারের দোষে দুষ্ট। স্বামী তার মাকে দায়িত্ব দেয় তিশাকে বুঝিয়ে দিতে যে দুদিনের মধ্যে পণের টাকা আনতে না পারলে প্রহার ও মৃত্যু নিশ্চিত। তিশা বাবা মায়ের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তার শাশুড়িমা শর্ত দেয় পণের টাকা আনলে তবেই সে যাওয়ার অনুমতি পাবে। তিশা যেন সেখানে গিয়ে ভাইদের জানায় দিদির শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে পনের টাকা না দিলে তারা দিদির ‘মরামুখ’ দেখবে। এরপর তিশা খালি হাতে ফিরে এসে জানায় ভাইরা পরে পণের টাকা দিয়ে যাবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে না দেওয়ায় তিশার স্বামী তাকে চাবুক দ্বারা প্রহারে উদ্যত হয় এবং তিশার মৃত্যু ঘটে। এরপর তিশার দুই প্রতিবন্ধী ভাই ভিক্ষালব্ধ পণের টাকা তিশার শ্বশুর বাড়িতে দিতে এসে তার মৃতদেহ দেখতে পায়। এরপর কান্নামিশ্রিত গানে তাদের কষ্ট প্রকাশ পায় এভাবে—

“সুখে শান্তিতে থাকবি বলে
বিয়ে দিল বাবা বড় ঘরে।
এই কি ছিল কপালে?”

এরপর পালাকার নরেশ অধিকারী দর্শকদের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক বার্তা দিয়েছেন ভাইদের কণ্ঠে---

“কেউ কোরো না এ ভুল মেয়ের ঘরে
এমনি যাবে অকালে।”

পাশাপাশি তিশার স্বামীও অন্যদেরকে বধূহত্যা, বধূ নির্যাতন না করার বার্তা দিয়ে বলেন—

> “ওগো সভ্য সমাজের মানুষ চেয়ে দেখো আজ অসহায়ের চিতা জ্বলে, বধূ হত্যার দায়ে স্বামী যাচ্ছে জেলে, না না আমি যা ভুল করেছি আমার মায়ের কথা শুনে, এ ভুল আর তোমরা কোরো না। এ ভুল তোমরা কেউ কোরো না এই ধরিত্রীর মাঝে।”

এরপর পুলিশের আগমন ঘটে। তিশার শাশুড়ি অপরাধীরূপে ধরা পড়ে ঘুষ দিতে চাইলে পুলিশ জানায় সে ঘুষ নেয় না। সে চায় অপরাধীর সাজা হোক। এই বিষয়টির মধ্য দিয়ে পালাকার ঘুষ নেওয়া অন্যায় এবং অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত—এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন দর্শকদের কাছে।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের প্রথম ছকে ভিখারি ক্ষুধার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে ভিক্ষা করে এই ভাবে—"বাবু, তোমরা আমায় দুটো খেতে দাওনা বাবু, আমি যে ক্ষুধার জ্বালা আর সইতে পারছি না বাবু।" এরপর সে রাজার মুখের অন্ন কেড়ে খেতে গেলে রাজা তাকে হত্যা করে। এই নিষ্ঠুর দৃশ্যের মাধ্যমে পালাকার ক্ষুধার্তকে অন্নদানের শিক্ষা জনগণকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের দ্বিতীয় ছকে পালাকার স্বপন গায়েন পরকীয়ার বিরুদ্ধে বার্তা দিতে চেয়েছেন রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের আঙ্গিকে। ঘুমন্ত আয়ানকে রেখে রাধারানী কৃষ্ণ অভিসার যাত্রায় উদ্যত হলে আয়ান তা জানতে পারেন। স্ত্রীকে চাবুকের আঘাত করতে উদ্যত হলে রাধারানী জানায় প্রেমের দেবতা কৃষ্ণকে ভুলতে সে অক্ষম। এ কথা শোনার পর আয়ান নিজেই কৃষ্ণের কাছে রাধারানীকে পৌঁছে দিয়ে রাধারানীকে গ্রহণ করতে বলে। কিন্তু কৃষ্ণ তা গ্রহণ করেন না। কারণ স্বরূপ জানান রাধারানী পরপত্নী। গানে তার প্রকাশ ঘটে—

"নানা চাইনা চাইনা তোমার প্রেমের পত্নী
ফিরায়ে নাও কেঁদোনা, তুমি
পিয়া অভিমানী, ভুল করেছো তুমি
প'রে আশা কেন মনে থাকতে স্বামী?"

স্বামী থাকা সত্ত্বেও পরকীয়া অন্যায় ও ভুল কাজ পালাকার স্বপন গায়েন এখানে সেই বার্তা দিয়েছেন।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের তৃতীয় ছকে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিয়েছেন পালাকার। দেওরকে বার বার বাইরে যেতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় বৌদি তাকে জোর করে 'ইউরিন' পরীক্ষা করতে পাঠায় ডাক্তারের কাছে এবং জানায় ডাক্তার যেমন যেমন বলবে সে যেন তেমন তেমন ভাবেই চলে। মধুমেহ রোগের প্রাথমিক লক্ষন যে ঘন ঘন শৌচালয়ে যাওয়া, এর জন্য প্রয়োজন 'ইউরিন টেস্ট' করা এবং রোগ ধরা পড়লে, ডাক্তারের কথা মতো চলাই যে উচিত কাজ, সে সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন পালাকার। এই ছকেও শহুরে শিক্ষিতা যুবতী গ্রাম্য অশিক্ষিত যুবককে শহরে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চান। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করেছেন পালাকার।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের চতুর্থ ছকে পালাকার দর্শকবৃন্দকে জানিয়েছেন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর ডাক্তারের কাছ থেকে 'ডেথ সার্টিফিকেট' নেওয়া কতটা প্রয়োজন। কাহিনিতে অর্থলোভী পুত্র মাকে হত্যা করে শশ্মানে নিয়ে গেলে শশ্মানকর্মী 'ডেথ সার্টিফিকেট' দেখাতে বলেন। অপারক

হওয়ায় পুলিশ এসে পুত্রকে গ্রেপ্তার করে। এর ফল শাস্তি, তা পালাকার বোঝান চেতনা প্রাপ্তপুত্রের গানের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে। সে গায়—

"তোমরা সবাই আমায় নিয়ে
দাওনা ধরে শাস্তি
হাসতে হাসতে মায়ের জন্য
নেব গলায় ফাঁসি।"

পাশাপাশি এই ছকে পিতামাতার প্রতি অবহেলা করা অনুচিত। তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদান করা সন্তানের দায়িত্ব, কর্তব্য সে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত ঘটিয়েছেন পালাকার। ছকের প্রথমাংশে মা-বাবার প্রতি অন্যায় অত্যাচারের প্রকাশ ঘটেছে কাহিনির পরতে পরতে। সন্তান নিজেই মায়ের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছেন গানের মাধ্যমে—

"ভাগের মা নাকি গঙ্গা পায় না
আমরা যে বিভক্ত, আজ বহু ভাগে
ধর্ম, পথ আর নীতি অনুরাগে
এই যে ঘনঘটায় আমাদের মা
একদিন সে আর গঙ্গা পাবে না।"

অবশেষে মায়ের মৃত্যুর পর পুত্র তার অন্যায় বুঝতে পারে। তখন অনুতপ্ত পুত্রের কণ্ঠে তীব্র অনুশোচনা প্রকাশ পায়—

"যতবার দেখি মাগো তোমায় আমি
সাধ মেটে না, তবু তোমার দেখে
সবাই বলে ভগবান সুন্দর
হবে নাকো সুন্দর তোমার চেয়ে।"

আবার মৃত মাকে দেখে কখনো বলে—

"কেন ঘুমাস বল্
একবার চেয়ে দেখ না তুই
ছেলের চোখে ঝরে জল।
মাগো কোন অভিমানে রে তুই
কেন ঘুমাস বল।"

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের পঞ্চম ছকের নিবেদন হাস্যরসের মাধ্যমে পালাকার একটি স্বাস্থ্য সচেতন এবং পরিবেশ দুষণরোধ করার বার্তা দিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে যত্রতত্র শৌচকর্ম করা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দুইয়ের পক্ষেই যে ক্ষতিকারক সেই সচেতনতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এই ছকে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত ঘটিয়েছেন পালাকার তা হল পরকীয়া অন্যায় কাজ। লিচু স্বামীর অনুপস্থিতিতে গুয়ে পুলিশ ও অঞ্চল প্রধানের সঙ্গে পরকীয়া করে। কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকা স্বামী হঠাৎ ফিরে আসায় লিচুর পরকীয়া কর্ম ধরা পড়ে যায় স্বামীর কাছে। স্বামী জানায় সেও কর্মসূত্রে বাইরে থাকে, অনেক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে। স্ত্রীকে ভালো রাখার জন্যই তার এই কষ্ট স্বীকার করা। অবশেষে লিচু নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বামীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের ষষ্ঠ ছকে সমস্ত শ্রেণির মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত এই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন পালাকার। ছকটিতে পাপিয়া তাদের ভৃত্য ভজহরিকে নানা ভাবে অসম্মান করে। অথচ পাপিয়ার প্রেমিকের দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে পাপিয়ার সকল দায়িত্ব নিয়ে তার সামাজিক সম্মান রক্ষা করার চেষ্টা করে ভজহরি। এরপর পাপিয়া নিজের ভুল উপলব্ধি করে ভজহরির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে—

"তুমি থাকবে যে ঘরে ভালোবাসব তোমাকে
ভুল হয়েছে আমায় তুমি দাও ক্ষমা করে
তুমি দাও ক্ষমা করে।"

নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের সপ্তম ছকের পালা কাহিনিকার এই ছকের কাহিনির মধ্যে পিতা মাতার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত-বিষয়টির প্রতি আলোকপাত ঘটিয়েছেন। স্ত্রীর কথায় চালিত হওয়া পুত্রকে দেখে বৃদ্ধ পিতা পরিহাস করে গায়—

"স্ত্রীর পায়ে করলে প্রনাম
বুঝেছি কত মূল্যবান।"

পুত্রের কাছে অযত্ন, অবহেলিত, পিতা আক্ষেপ করে বলে—

"পিতামাতাকে কষ্ট দিয়ে করিস নারে ভুল
দুঃখের সীমা থাকবে নাতো হারাবি সব কুল,
যতই পারিস পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা কর
এই পিতা মাতা হবে আপন যখন, সবাই হবে পর।"

আবার পরবর্তী অংশে গানের মাধ্যমে বলে—

"যতই যাও না মন্দির মসজিদ
যতই ঘোরো তীর্থস্থান
বাবা মাকে না বাসলে ভালো
হয় না খুশি ভগবান।"

আসলে বাবা চরিত্রটিকে এখানে উপলক্ষ্য করে তার মাধ্যমে নবীন প্রজন্মকে এই শিক্ষার বাণী শুনিয়েছেন পালাকার।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের প্রথম ছকে পালাকার নারী ধর্ষণ যে চূড়ান্ত অপরাধ এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত সে বিষেয়ে আলোকপাত ঘটিয়েছেন। কাহিনিতে রাজকুমার প্রত্যুষ দ্বারা শিউলির কন্যা ধর্ষিতা হন। শিউলি কন্যার প্রতি অন্যায়ের জন্য রানী শঙ্খমালার কাছে বিচার প্রার্থনা করেন। রানী শিউলির কথা অবিশ্বাস করেন। এর পরবর্তী পর্বে রাজকুমার মোগলির সম্মানহানির চেষ্টা করলে রানী শঙ্খমালা তা চাক্ষুষ করেন এবং নারীর প্রতি এই অন্যায়ের কারণে পুত্রকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। অবশেষে ত্রিশূল দিয়ে তাকে হত্যা করেন এবং কাহিনির শেষে বলেন—

"পুত্রকে জন্ম দিয়ে কি চেয়েছি কি যে পেলাম
দুষ্ট দমন রাজ্য শাসনে মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম।"

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের দ্বিতীয় ছকে শিশু হত্যা বা শিশুনির্যাতন যে মহাপাপ পালাকার তা শ্রীকৃষ্ণ ও কাকাসুরের চরিত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছেন। কাহিনিতে কংসের প্রান রক্ষার্থে কাকাসুর দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কৃষ্ণকে বধ করার জন্য উপস্থিত হয়। কাকাসুর শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ নিজরূপ দর্শন দিয়ে বলেন—

"শিশু হত্যা শিশু পাচার মহাপাপ। এ শিশু হত্যার অপরাধ হইলে দানিব তোমার মৃত্যু।"

সেই সাথে কর্মফলের শিক্ষা দেন। শ্রীকৃষ্ণের সংলাপের মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণ কাকাসুরকে বলেন—

"সাবধান। সাবধান কাকাসুর। ভুলিও না কর্মগুনে ফল হয় বিধির বিচারে।"

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের তৃতীয় ছকে পালাকার রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্লাড ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত ঘটিয়েছেন। বৌদির অনুরোধে দুর্ঘটনাগ্রস্থ অসুস্থ দাদার জন্য রক্তের প্রয়োজনে যুবক যায় রক্ত সংগ্রহ করতে। পথে নায়িকা ময়নাকে পেয়ে সে তারই রক্ত নিতে চায়। তখন শহুরে শিক্ষিতা ময়না জানায় রক্তের প্রয়োজন হলে ব্লাড ব্যাঙ্কে যেতে হয়, রক্তদান শিবিরে যেতে হয়। আসলে ময়নার সংলাপের মাধ্যমে এই বার্তাটি কেবলমাত্র গ্রাম্য যুবককে দেওয়া পালাকারের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষজনের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের চতুর্থ ছকে পরকীয়া বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। মৌপিয়ার ভৃত্য গোবিন্দের সংলাপে রয়েছে-"সতীর পুন্যে পতির জয়।" স্বামীর অনুপস্থিতিতে একাধিক পরকীয়া করে মৌপিয়া। অবশেষে এক অসৎ, দুশ্চরিত্র, ঠগ, প্রতারকের সাথে পরকীয়া করে। পুলিশের জালে ধরা পড়ার পর মৌপিয়া নিজের ভুল বুঝতে পারে। অবশেষে নিজের কাজের প্রতি অনুতপ্ত হয়। গানের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়-

"ধরনীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাব
এই কামনা-
আর কিছু না-

আগামীর পায়ে পায়ে আমি ওগো মুছে যাব সেই ঠিকানা

আর কিছু না—”

এই কাহিনির মধ্যেই মৌপিয়ার সন্তানের প্রতি অবহেলার পরিপ্রেক্ষিতে ভৃত্য গোবিন্দের সংলাপে সন্তানের জন্য মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং তা বিকল্পহীন এই বার্তা দিয়েছেন কাহিনিকার।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের পঞ্চম ছকে কাহিনির বিষয় সম্পূর্ণভাবে লোকশিক্ষামূলক। বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি জানানোই এই কাহিনির মূল উদ্দেশ্য। কাহিনিতে যুবক যুবতীর বিবাহের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর যুবক রক্ত পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেয়। তাদের পরিবারের মানুষেরাই এ বিষয়ে অজ্ঞাত। তখন যুবক গানের মাধ্যমে জানায়—

“সব টেস্ট করেই এখন করছে দেখো চাষ।

...

আরে বিয়ের আগে বেলাড টেস্ট হয় কত জনায়।”

এর পর সংলাপের মাধ্যমে সে সকলকে বুঝিয়ে বলে—“কারণ, তোর যে সন্তান হবে তার বাঁকা চেকা পোলিও রোগ হতে পারে।” এর পর বিষয়টি সকলের বোধগম্য হয়। সকলে ঐ সিদ্ধান্তে সম্মতি জানায়। আসলে গ্রামের অজ্ঞ মানুষের প্রতিই সচেতন বার্তা দিয়েছেন কাহিনিকার।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের ষষ্ঠ ছকে পালাকার সাবধানবানী দিয়েছেন জনগনের উদ্দেশ্যে। তিনি সাবধান করেছেন প্রেমে অন্ধ হয়ে সর্বশান্ত হওয়া সম্পর্কে। আসলে কাহিনিতে ঝিলিকের প্রেমিকরা প্রেমে অন্ধ হয়ে সর্বশান্ত হয়। একাধিক প্রেমিকের মধ্যে জয়ী হওয়ার প্রতিযোগিতাই এই সর্বশান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। তাই তাদের দেখে ভিখারির কণ্ঠে পালাকার জানিয়েছেন—

“এই পোকামাকড় ছুটে আসে

আগুন দেখা পায়—

আর রেসের মাঠে দুটো ঘোড়া

ছুটে জব্দমারা হয়।”

পরে আবার গায়—

“আরে ভো কাট্টা প্রেমের ফাঁদে

সব-ই চলে যায়।

আর ভিক্ষা তোদের করতে হবে

ঐ রাস্তায়-রাস্তায়।”

এই কাহিনিতে পালাকার আরেকটি বিষয়ও তুলে ধরেছেন তা হল অনেক সময় স্বেচ্ছায় নয়, প্রয়োজনে মানুষ খারাপ কাজ করতে বাধ্য হয়। ঝিলিকের মা ক্যান্সার রোগী। তাকে বাঁচানোর জন্য পাঁচলাখ টাকার প্রয়োজন। মোড়ল মশায়ের কাছে সে কথা জানালে ঝিলিকের ‘ইজ্জতের’ বিনিময়ে সে তার মাকে বাঁচাতে সম্মতি জানায়। কিন্তু ঝিলিক এই কুপ্রস্তাবে অসম্মতি দেয়। অবশেষে সে

পরকীয়ার পথ বেছে নেয়। আকাশের সংলাপে পালাকার বলেছেন—“গঙ্গা দিয়ে তো অনেক ময়লা বয়ে যায় তাই বলে কি গঙ্গা অপবিত্র হয়?”

আরেকটি বিষয়ে পালাকার কাহিনির শেষে দর্শকগনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তা হল অন্যায়ের প্রতিবাদ করার বিষয়। আকাশ ঝিলিককে মোড়লের অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় উদ্বুদ্ধ করে আসলে পালাকার দর্শকদের সচেতন করেছেন।

শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা দলের সপ্তম ছকে পালাকার নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। শাঁখা ব্যাপারির সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি জনগনকে জানানোর চেষ্টা করেছেন যে সংসার সুখের হয় রমনীর গুনে। তাই স্ত্রীকে সন্দেহ করা উচিত নয়। তাকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসতে বলেছেন। “এতে সংসারটা সুন্দর হবে নইলে রসাতলে যাবে।” পাশাপাশি মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখার কথা বলেছেন পালাকার।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের প্রথম ছকে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পালাকার সুবলের সংলাপে বলেন—“ধর্ম ছিল বলীয়ান। নারী শক্তিতে দানবকুল হয়েছিল ধ্বংস। তাই নারীসমাজ আজ জাগ্রত।”

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের দ্বিতীয় ছকে রচনাকার কর্মফল সম্পর্কে সচেতন করেছেন শ্রীকৃষ্ণের সংলাপের মধ্যে দিয়ে। অহংকারী রাধাকে শ্রীকৃষ্ণ জানান, সে যেন তার অহংকার মুছে ফেলে কারণ যুগে যুগে কৃষ্ণ তারই। সেই প্রসঙ্গেই বলেন কর্মগুনে ফল লাভ হয়।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের তৃতীয় ছকে রচনাকার মন্দ কথা ও কাজ বলতে ও করতে নিষেধ করেছেন নায়িকা চৈতালীর কণ্ঠের মাধ্যমে। ছকটির একেবারে সমাপ্তিতে চৈতালি গেয়ে ওঠে—

“মন্দ কিছু বোলো না
মন্দ কিছু কোরো না কখনও
এই হল জীবনের গান
মনে রেখ চিরদিন, চিরকাল।”

এ বার্তা আসলে সকল মানুষের প্রতি তাদের বার্তা।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের চতুর্থ ছকে দেখা যায় সঞ্জয় তার মৃত শ্বশুর এর মৃত্যুদিনে মাল্যদানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। অথচ তার শ্বশুর ছিল চোর, ছিনতাইবাজ, খুনী, ধর্ষক। সেই স্তরের মানুষই ঐ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রিত জন। এই বিষয়টিকে বিদ্রূপ করে ভৃত্য হরি বলে—“মালা দেয় শহীদ কবিদের গলায়।” সে বিনয়, বাদল, দীনেশ, নেতাজী সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এদের উল্লেখ করে। সম্মানীয় মানুষের গলায় মালা দিতে বলে। আসলে রচনাকার প্রকৃত সম্মানীয় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার কথা বলতে চেয়েছেন এখানে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের পঞ্চম ছকে অকর্মন্য, মদ্যপ স্বামী ও একাধিক সন্তান নিয়ে খনার জীবনের অসহায় পরিস্থিতি দর্শক সমক্ষে উপস্থাপনের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রন ও ছোট পরিবার গড়ার বার্তা দিয়েছেন পালাকার।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের ষষ্ঠ ছকে মৃত অধ্যাপক পিতার প্রতি দুই পুত্রের দুই রকম আচরণ প্রদর্শন করেছেন। জেষ্ঠ্য ভ্রাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ততটাই অসম্মান করে। দুই রকম চরিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পালাকার পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বার্তা স্পষ্ঠ ভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং যদিও অন্তিমে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজের ভুল স্বীকার করে মৃত বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে বৃদ্ধার চরিত্রের মধ্য দিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন—অল্প বয়সে বিবাহ অনুচিত, সন্তান ধারন অল্প বয়সে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং আইন বিরুদ্ধ। বৃদ্ধা বাল্য বিধবা। অল্প বয়সে বিবাহ ও স্বামীর মৃত্যুর কারণে সারাজীবন তাকে কষ্ট করে যেতে হয়েছে। সে নাতনির বিয়ে দিতে চায়নি অল্প বয়সে। কিন্তু নাতনি পালিয়ে বিয়ে করে এবং সন্তান ধারন করে। এ প্রসঙ্গে হাবিলদার বৃদ্ধাকে জানায় এই অন্যায়ের জন্য সে তাদেরকে জেলে পাঠিয়ে দেবে। হাবিলদারই অল্প বয়সে সন্তান ধারন ক্ষতিকারক সেকথা জানায়। আসলে বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তান ধারন অনুচিত এই সচেতন বার্তাটি অজ্ঞাত গ্রামবাসীকে জানিয়েছেন পালাকার।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গরিব মানুষের দেশ, শ্রমজীবী মানুষের দেশ। তাই সাধ থাকলেও এদের উচ্চমানের বিনোদনমূলক সাধ্যের অভাব। শতাধিক বছর পূর্বে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রায় বেঁচে থাকার আপ্রান প্রচেষ্টাই ছিল বিষয়। বিনোদন সেখানে বিলাসিতাতুল্য। তবুও শ্রমজীবী প্রধান মানুষেরা সারাদিনের কর্মাবসরটিকে ভরিয়ে রাখতেন গ্রামীণ সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে। যার অনেকখানি অধিকার করেছিল দেব-দেবী, ধর্ম, বিশ্বাস, স্বর্গ-নরক, ভাবনা, চিন্তা, সংস্কার। সহজ, সরল ধর্মানুরাগী, দরিদ্র, নিম্নবর্গীয় মানুষগুলি প্রানভরে তা উপভোগ করতেন। আজও করেন। লোকভাষা, ব্রত, পার্বন, লোকশিক্ষা, ইত্যাদি সব কিছু জড়িয়ে আছে এখানকার গাজনপালাগুলির পরতে পরতে। ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও নিবদ্ধ থাকে সেখানে। সারাদিন পরিশ্রমের অবশেষে সারারাত্রি জেগে সেই অনুষ্ঠানের আনন্দ তাদের আগামী পথ চলা ও বেঁচে থাকার রসদ জোগায়।

৫.৪ গাজনের বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তন: সময়ের দলিল

প্রাণধারনের জন্য অন্নসংস্থান সকল জীবের মুখ্য অভিপ্রায়। কৃষি নির্ভরশীল মানুষের জীবনে শস্য-উৎপাদনের উপরেই নির্ভর করত আগামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। শস্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে অন্ধবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তাদের জীবনে আসে ধর্মীয় পূজা উৎসব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় দরিদ্র

মানুষগুলির জীবনে এই ভাবেই শস্যকেন্দ্রিক যে উৎসবটির আগমন ঘটেছিল তা হল চৈত্রমাসের শিবকেন্দ্রিক গাজন উৎসব।

গাজন উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হল গাজনপালাগান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ বিনোদনরূপে গাজনগানের প্রচলন সর্বব্যপী। যাত্রাগানের উদ্ভবের পূর্বে এখানকার জনসমাজকে উৎসবে আনন্দে ভরিয়ে রাখত এই গাজনগান। রসাত্মক আবেদনের কারণে এর আকর্ষণ ছিল বেশি। গবেষক ধূর্জটি নস্কর *'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন ও গাজনমেলা'* গ্রন্থে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাধে বানচাবড়ার কেশবেশ্বর শিবমন্দিরে ২৬শে চৈত্র থেকে পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত গাজন উৎসবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[৩৬] সুতরাং আড়াইশো বছর পূর্বেও এখানে গাজন উৎসব হত এ কথা জানা যাচ্ছে। অতএব প্রায় দুশো বছর ধরে এই গাজনগান এখানকার জনজীবনের বিনোদনের অন্যতম উপকরণ হিসাবে জনগণের মন ভরিয়ে রেখেছে। বহুকাল ধরে এই সমাজে সর্বত্র শিবের গাজন ও ধর্মের গাজনের প্রচলন রয়েছে। তবে ধর্মের গাজন অপেক্ষা শিবের গাজনের আধিক্য বেশি। শিবের গাজন এই অঞ্চলের বহু প্রাচীন লোক উৎসব। বাংলার জনপ্রিয় দেবতা শিবকে কেন্দ্র করে এই গাজন গানের আসর আয়োজিত হত। কৃষি প্রধান বাংলার বর্ষ চক্রে পুরাতন কৃষিবর্ষের বিদায় এবং নতুন কৃষিবর্ষের সূচনার সন্ধিক্ষণে এই উৎসবের আয়োজন করা হতো। শিব আসলে প্রজননের দেবতা। পুরাতন বছরের শেষে ও নতুন বছরের সূচনার সন্ধিক্ষণে চারদিনব্যাপী এই উৎসবে আয়োজন হত নানান কিছু, পালন হত রীতি-নীতি। ধর্মীয় বিষয় ছিল তার সাথে ধর্ম সম্বন্ধীয় মনোরঞ্জনমূলক বিষয়ও ছিল এই উৎসবের অঙ্গ। গাজনপালা অনুষ্ঠান সেই অঙ্গেরই অংশ। সারারাত্রিব্যাপী এই মনোরঞ্জনের জন্য কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষগুলি এক মাস ধরে দিনের শেষে অবসরে নিজেদের প্রস্তুত করত মহড়ার মাধ্যমে। গ্রাম্য, দরিদ্র, কর্মমুখর জীবনে এটি মনোরঞ্জনের বিষয়ের পাশাপাশি ছিল সুপ্ত প্রতিভাবান শিল্পী সুলভ মানুষগুলির প্রতিভার প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।

আরেকটি মনোরঞ্জনমূলক বিষয় ছিল গাজন উৎসবের অঙ্গ। তা হল 'সঙ'। শিব-দুর্গা সেজে নাচগানের মাধ্যমে মনোরঞ্জন করা হত এখানে। ক্রমে ক্রমে সঙের গানে সামাজিক প্রভাব প্রতিফলিত হয়। নানান সামাজিক ঘটনাকে তীর্যক ভঙ্গীতে হাস্য ও কৌতুকের মাধ্যমে বিদ্ধ করা হত সঙের যাত্রায়। আবার গাজনপালাগুলিতেও দিন বদলের সাথে সাথে দেবতার মাহাত্ম্যমূলক কাহিনির জায়গায় স্থান পায় সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানান ধরনের কাহিনি। ক্রমে গ্রামে গ্রামে দল গঠিত হয়। তারপর এক সময় ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি যোগ হওয়ায় পেশাদারিরূপ গ্রহণ করে দলগুলি। সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অনেকাংশ জুড়েই বর্তমানে অসংখ্য পেশাদারি গাজনদল ও তার গদিঘর নির্মিত হয়েছে।

'ঐতিহ্য' শব্দটি বহমানতার দ্যোতক। শতাব্দী ক্রমে পুরুষ পরম্পরায় জীবনচর্যার যে ধারাটি প্রবাহিত হয় তাই হল ঐতিহ্য। কিন্তু কালের সাথে তালের সামঞ্জস্য রেখে এই ধারায় আসে

পরিবর্তন। লোকসমাজের দীর্ঘকালের অনুশীলন লব্ধ জীবনচর্যার ঐতিহ্যও প্রভাবিত হয়। সভ্যতার অগ্রগতির প্রকাশ পায় সেখানে। লোকনাট্য লোকঐতিহ্যের একটি দিক। বিশেষত বাক্‌কেন্দ্রিক ও অঙ্গ-ভঙ্গিকেন্দ্রিক অনুকৃতিমূলক শিল্পের মূল উদ্দেশ্য নাট্যরস পরিবেশন। একাধিক চরিত্র সহায়তায় ও ঘটনা বিশেষের দ্বন্দ্ব ময়তায় তার উপস্থাপনা। লোকসমাজই এর স্রস্ঠা। নাচ, গান, সংলাপ সমৃদ্ধ এক স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থাপনা। যার ভাষা ঐ সমাজেরই মৌখিক ভাষা। অভিনেতা ও দর্শকগণ ওই একই সমাজের সদস্য। গাজনপালা নামক লোকনাট্যটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম্য দরিদ্র নিম্নবর্গীয় মানুষের সমাজে সমাদৃত এমনই একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য।

ব্যক্তির সৃষ্টিকে পছন্দ মতো বদলে নিতে লোকসমাজ কুণ্ঠাবোধ করে না। লোকসমাজের রুচি, ধ্যান-ধারনা, বিশ্বাস, সংস্কার নীতিবোধের অনুকুল হওয়া পর্যন্ত এই ভাঙা-গড়ার কাজ চলতে থাকে। মানস মজুমদার তার *‘লোক ঐতিহ্যের দর্পণে’* নামক গ্রন্থে বলেছেন—

> “বিশ্বজগৎ গতিশীল। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যও স্থিতিশীল নয়। কালে কালে বহু রূপান্তরের সাক্ষী। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে লোক ঐতিহ্যের ধারাটি বহমান।”[৩৭]

এ বিষয়ে গাজনপালা লোকনাট্যটিও তার ব্যতিক্রম নয়। লোকনাট্যের রচনাপ্রকৃতির বিশেষত্ব হল তার বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়। যথা---পুরান নির্ভর, লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক, মহাপুরুষের চরিত্রকেন্দ্রিক, স্থানীয় ইতিহাসাশ্রয়ী, সামাজিক কাহিনি ও হাস্যকৌতুকমূলক। গাজনপালা নামক লোকনাট্যে তার সবকটি বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যুগে যুগে সমাজের রূপান্তর ও তার আর্থ-সামাজিক পরিবেশের প্রভাব পড়েছে গাজনপালা কাহিনির বিষয়বস্তুতে। পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে, ভৌগলিক পরিবেশের পরিবর্তনে ও কালের প্রভাবে এই পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। গাজনপালাগুলি লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য কিন্তু সে যতই আধুনিক হচ্ছে, ততই সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে তার দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। দেব-দেবী, পুরান, ইতিহাসের চরিত্র কাহিনিসমৃদ্ধ, তার যে শোভা তার রূপবদল ঘটেছে। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, মনোরঞ্জক ও বিনোদনমূলক উপাদানের কারণে আদর্শকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। আবেগ আন্তরিকতার তুলনায় যান্ত্রিকতাই স্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছে। সমাজ জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়ায় দেখা দিয়েছে নতুন সামাজিক, পারিবারিক মূল্যবোধ। সেগুলি প্রকাশিত হচ্ছে গাজনপালাগুলির কাহিনিতে। দিন বদলের সাথে সাথে আরও যে সকল রূপান্তরিত দিকগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে এই গাজনপালা নামক বিষয়টিতে সেগুলি হল---এখন কেবলমাত্র সাহিত্য নির্ভর বিষয়কে ভিত্তি করে সংস্কৃতিকে বজায় রেখে আনন্দ বিতরন এর পরিবেশনায় লক্ষিত হয় না। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি যোগ হওয়ায় এর সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থ, জনপ্রিয়তা ও যশলাভের উদ্দেশ্য। ফলত স্পর্শ করেছে এর ঐতিহ্যবাহী সরলতা, আন্তরিকতা ও হৃদয়ের স্বতঃস্ফুর্ততাকে। প্রভাবিত হয়েছে গাজনপালা কাহিনির সাহিত্যগত দিকটি। শিষ্ট বা লিখিত উচ্চ ধারার সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে মৌখিক ধারার লৌকিক সাহিত্যগুলিও চির প্রবহমান থেকেছে। দেবব্রত নস্কর তার ‘চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থে বলেছেন—

"লোকসাহিত্যের এক বিশিষ্টরূপ পালাগান।"[৩৮]

কিন্তু দিনবদলের সাথে সাথে গাজনপালাগানের সেই সাহিত্যগত দিকটিও আজ পরিবর্তিত। তার লিখিতরূপও এখন প্রত্যক্ষ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির উল্লেখ করার সময় উচ্চ পরিশীলিত সাহিত্যের সাথে সমমর্যাদায় স্থান পায় লোকসাহিত্য সংস্কৃতি।

"বাংলার লৌকিক ঐতিহ্য সঞ্জাত সাহিত্যের মধ্যে পালাগান অন্যতম নিদর্শন---যার ধারক প্রধানত শ্রুতি বা স্মৃতি বা প্রচলিত প্রথা এবং আস্বাদক সহৃদয় সমাজ বা সমষ্টি গত মানুষ"[৩৯]

সুতরাং বলা যায় বাংলার লৌকিক পালাগানগুলিকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য অপূর্ণ রয়ে যায়।

বাংলা লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক পালাগানগুলির যুগভেদে তিনটি ধারা। যথা—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। বিশেষজ্ঞগনের মতে এর প্রাচীন বা আদিরূপ পাওয়া যায় '*গীতগোবিন্দ*', '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*' কাব্যে। মধ্যযুগীয় বিশিষ্টরূপের সন্ধান মেলে মঙ্গলকাব্যসমুহে। আর আধুনিক যুগের পালাগান অর্থাৎ প্রচলিত লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগান। তবে লোকায়ত পালাসমুহের মধ্যে লোকনাট্যগত যে সকল বৈশিষ্ট্য তা যে আধুনিক এ কথা বলা যায় না। কারণ সম্পর্কে অজিত ঘোষের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন—

"জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন-এ কৃষ্ণালীলার আদি নাট্যরুপের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলির গান ও সংলাপ হইতে পরবর্তীকালে যাত্রাগানের যে প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"[৪০]

লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক গাজপালাগানগুলির লোকনাট্যের ঐতিহ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় লোকসমাজে অতিশয় আদরণীয় ও বিনোদনের মাধ্যম। এখানকার মানুষের দৈববিশ্বাস, ভক্তি, সামাজিক-সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয় লোকায়ত পালাগানের মধ্যে নিহিত থাকায় পালাগানগুলি এই অঞ্চলের লোকসমাজের আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় পরিচয় বহন করে। তবে লোকসংস্কৃতি বা লৌকিক ধারা সুনির্দিষ্ট সময় সীমায় বন্দী থাকে না। এগুলি পরিবর্তনশীল।

ধর্মান্তর্গত বিভিন্ন দেব-দেবী বিশেষত শিব-পার্বতীকে নিয়ে বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে নিয়ে গাজনপালাগুলির কাহিনি যখন নিরক্ষর জনসাধারনের মধ্যে পরিবেশিত হত তখন কাহিনির মূল বক্তব্য ঐ নিরক্ষর মানুষগুলিকে প্রভাবিত করত। গানের কাব্যগুণ অপেক্ষা কাহিনি মুখ্য বিষয় হয়ে উঠত। পরবর্তীকালে দেবতাকেন্দ্রিক ধর্মমূলক কাহিনির নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য বিবর্তিত হয়ে যায় লৌকিক কাহিনির নীতিপ্রচারের মাধ্যমে। যেখানে দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের পাশাপাশি স্থান পায় প্রনয় কাহিনি, ইতিহাসমিশ্রিত কাহিনি, নীতিশিক্ষামূলক কাহিনি, পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি প্রচারমূলক কাহিনিও। দেব-দেবীর জায়গায় চরিত্ররূপে স্থান করে নেয় সাধারণ মানুষ। দেব-দেবীও সেখানে মানব-মানবীরূপে ধরা দেয়। বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য বলেন---

"গ্রাম্য কবিগণের গৃহস্থালী বর্ণনায় শিবদুর্গা লৌকিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মানুষ গ্রাম্য সমাজের গৃহ দম্পতী।"[৪১]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রতিভাবান পালাকার ও শিল্পীদের কল্পনায়, রচনায়, অভিনয়ে আদর্শ জীবনবোধ, ভবিষ্যতের বিকাশ পন্থা, তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এই সকল চরিত্রের মাধ্যমে গাজনপালাগুলিতে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আসলে ক্রমবর্ধমান অভিবাসন, কৃষির সাথে শিল্পের সংযোগস্থাপন, আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ, জাতীয় রাজনীতির প্রভাব, কৃষিজমিতে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রাম্য চরিত্রগুলিকেই বহুলাংশে পরিবর্তিত করেছে। সেই প্রভাবও স্পষ্ট গাজনপালা কাহিনির বিষয় ও চরিত্র সৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তার সাথে সমাজে বর্ধিত হয়েছে নারী নির্যাতন, ধর্ষন, পরকীয়া সম্পর্ক, দাম্পত্য অশান্তি, বৈষয়িক দ্বন্দ্ব। সেই দিকগুলিও ধরা দিয়েছে পালাকারের লেখনীতে।

বর্তমান পেশাদারি গাজনদলগুলির পালা পরিবেশনের প্রথম ছকটি পৌরানিক আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়। পৌরানিক চরিত্রকে অবলম্বন করে সমাজের কোন অন্ধকারময় দিক এবং শত্রু নাশের মাধ্যমে সেই অন্ধকারের বিনাশকে দর্শক সমক্ষে তুলে ধরা হয় অভিনয়ের মাধ্যমে। এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্গার অসুরবধের অনুকরণে উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় ছকটি 'রাধা-কৃষ্ণ' ছক। রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই, কাকাসুর, যশোদা এই সকল চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে পরিবেশিত কাহিনির মাধ্যমে ধর্মীয় নীতি, আধ্যাত্মিকবাদকে উপস্থাপন করা হয়। তৃতীয় ছক থেকে শেষ অবধি সমস্ত ছকের বিষয় হয় সমকালীন সমাজের নানান বিষয়। চরিত্রগুলিও বিষয় অনুযায়ী নির্ধারন করা হয়। 'লোক সংস্কৃতি চর্চা' গ্রন্থে শিবপদ ভৌমিক, সুস্মিতা ভৌমিক বলেন—

"শিল্প, বিশেষ করে লোকশিল্প জীবনের সঙ্গে শুধু অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্তই নয় জীবনের বিচিত্র সমস্যা ও কান্নাহাসি থেকেই তার উদ্ভব। তাই তার বিষয় ও আঙ্গিক বিচারে সামাজিক প্রেক্ষাপটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।"[৪২]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক লোকায়ত গাজনপালাগান ও গাজন উৎসব সংক্রান্ত নানান সংস্কারাদি যুগের দাবীর সাথে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিশেষত ধর্মীয় উৎসব গাজনের রীতি-নীতি সংক্রান্ত আদিম যে সমস্ত সংস্কারাদি বর্তমানে পালিত হয় তার অস্তিত্ব রক্ষায় অনেক শিথিলতা দর্শিত হয়। গাজনপালা শিল্পীদের মধ্যেও এই বিবর্তন লক্ষিত হয়। পালা গানের আসরে পূজাচার, বন্দনা গানের ধারা বজায় থাকলেও সংস্কার পালনে শিথিলতা ধরা পড়ে।

ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে গাজনপালার বিষয়াঙ্গিকের ধারার যে সমস্ত পরিবর্তিতরূপ ধরা দিয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল---এর আসর নির্মাণ। পূর্বে গাজনপালা অনুষ্ঠিত হতো জমিদার বাড়ি বা ব্যক্তিগত কারোর নাটমন্দিরে, গ্রামের মন্দিরপ্রাঙ্গনে বা কোনো উন্মুক্ত জায়গায়। বর্তমানে গাজন পূজা, উৎসব, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অনেকাংশেই থাকে বিনোদনের অভিপ্রায়। ভক্তি বা নিষ্ঠার স্থান সেখানে স্বল্প। পূর্বে চারিদিক খোলা জায়গায় বসত গাজনের আসর। বর্তমানে মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। দুপাশ

দিয়ে প্রবেশ পথের ব্যবস্থা করা হয় এই মঞ্চে। অতি স্বাচ্ছন্দ্যে তিন-চার জন ব্যক্তি অভিনয় করতে পারেন। মঞ্চের মাঝে দলের নাম ঠিকানা লেখা যুক্ত তিন ধাপ পাটাতনের একটি সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকে। মঞ্চের উপরে ও নীচে দুইপাশে বাদ্যকারগন বসেন। এছাড়া থাকেন আলো ও শব্দ নিয়ন্ত্রকগণ।

বর্তমানে মঞ্চের পিছনে নির্মাণ করা হয় অস্থায়ী সাজঘর। ত্রিপল ও বাঁশ দিয়ে নির্মিত এই সাজঘরে টাঙানো দড়ি ও বাঁশের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয় সাজসজ্জার সমস্ত উপকরণ। সাজসজ্জাতেও এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। প্রাকৃতিক রঙ বা আলতা, সিঁদুর, ভুষোকালির জায়গায় স্থান করে নিয়েছে আধুনিক প্রসাধন দ্রব্যসামগ্রী, প্রয়োজনে টাক, গোঁফ, দাড়ি বোঝাতে উপযুক্ত উপকরনের ব্যবহার হয়। আবার নারী চরিত্রানুযায়ী মানানসই কেশ বিন্যাসেরও ব্যবস্থা করা হয়। পোশাককে যুগপোযোগী ও চরিত্রানুযায়ী মানানসই করে তোলার প্রচেষ্টায় দলমালিক বিভিন্ন স্থান ও বাজার থেকে দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহে সচেষ্ট হন।

একেবারে পূর্বে গাজনপালাগানগুলির আয়োজন হত দিনের আলোয়। ক্রমে রাতের অন্ধকার দূর করতে গ্যাসলাইট, হ্যাজাক এর ব্যবহার হত। বর্তমানে মঞ্চে নানান রকম ভাবে আলোর ব্যবহার হয়। রঙীন আলোর সাথে, আলোর নকশা, স্থির কেন্দ্রীভূত আলোর ব্যবহার হয়, ঘটনার পরিস্থিতি ও চরিত্র অনুযায়ী বিষয়টি প্রকাশ করায় আলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আলোগুলি নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্যক্তি নির্ধারন করা থাকে।

গাজনপালাগুলির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তাকে আরও শ্রুতি সুখকর করার অভিপ্রায়ে পূর্বে ব্যবহৃত হারমোনিয়াম, তবলা, বাঁশি, করতাল, ঢোল, খোল, ঘুঙুর, বাঁশির প্রভৃতি দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে পাশ্চাত্য ও আধুনিক নানান বাদ্যযন্ত্র যথা---অক্টোপ্যাড, কীবোর্ড, সিন্থেসাইজার, ড্রাম, অর্গান, প্রভৃতির ব্যবহার হয় এখন পেশাদারি গাজনপালাগুলিতে।

চরিত্রকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য নানান উপকরণের সাহায্য নেওয়া হয়। যথা -- সন্ন্যাসীর জপমালা, পুলিশের বন্দুক, প্রহরীর টর্চ, বৃদ্ধের হুঁকো, ভৃত্যের গামছা, রক্ত বোঝাতে লাল তরলযুক্ত প্যাকেট, ক্রিম বোঝাতে ছোট কৌট, এছাড়া, চশমা, ফুলের মালা, সিগারেট, টোপর, বিড়ি, ঘট, পদ্মফুল প্রভৃতি। বিষয়টিকে দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এই সমস্ত উপকরণকে ব্যবহার করা হয়।

পূর্বে খোলা জায়গায় অভিনেতারা উচ্চ কণ্ঠে গাজনপালা পরিবেশন করতেন কিন্তু পোশাদারি পরিবেশনায়, মঞ্চ নির্মাণ ও দর্শকবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শব্দনিয়ন্ত্রক যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। মঞ্চের উপরে নানান উচ্চতায় শব্দগ্রাহক যন্ত্রগুলি ঝোলানো থাকে। মঞ্চের বাইরে দুইপাশে মাইক ও স্পীকারের ব্যবস্থা থাকে। এগুলি নিয়ন্ত্রনের জন্য শব্দনিয়ন্ত্রণ কর্মী থাকেন।

গাজনপালাগুলির চরিত্রগুলি দেশের মাটি জল থেকে উদ্ভুত। চরিত্রগুলি স্বভাবে সম্পূর্ণ গ্রাম্য, বাঙালী, অধিকাংশই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দরিদ্র নিম্নবর্গীয় মানুষ। আচার-আচরণ, কথাবার্তায় চরিত্রগুলি এই লোকসমাজেরই প্রতিভু। পাশাপাশি পুরাণ বা দেব-দেবী আশ্রয়ী এই লোকনাট্যের চরিত্রের আরেক ধরন। সমস্ত চরিত্রই হতো দর্শকদের যেন কাছের মানুষ। যেন অতি পরিচিত। তাই তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাহস-ভীরুতা, লজ্জা-লজ্জাহীনতা সমস্ত কিছুর সাথে দর্শকবৃন্দের পরিচয় যেন অত্যন্ত নিবিড়। সময়ের সাথে সাথে বিষয়ের বদল ঘটেছে। প্রয়োজনে অনুরূপ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চরিত্রেও বদল ঘটে কিন্তু সমাজেরও রূপান্তর ঘটেছে ফলে বিষয় ও চরিত্রগুলি এখনো যেন তাদের জীবনের কথাই বলে।

লোকনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার। তবে বর্তমানে গাজনপালাগুলিতে সর্বজনবোধ শিষ্ট কথ্য গদ্য সংলাপ এবং হিন্দি ও ইংরাজী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

প্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমানে পেশাদারি পালাগুলির পরিবেশনার আরেক উপকরণ। আবহের ব্যবহার তার মধ্যে একটি। ঘটনা অনুযায়ী আড়াল থেকে শিল্পী মৌখিক ভাবে বা কোন দ্রব্য বা যন্ত্রের সাহায্যে উপযুক্ত আবহ নির্মাণ করে পরিবেশিত দৃশ্যটিকে অনেক বেশি বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য করে তোলেন দর্শক মনে। এছাড়া মঞ্চে পর্দার (স্ক্রিনের) ব্যবহার হয়। সেখানে নানান দ্রব্য ও দৃশ্য প্রস্ফুটিত করার মাধ্যমে মঞ্চের অভিনীত দৃশ্যটিকে দর্শক মনে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে সাহায্য করে।

পূর্বের ন্যায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে বর্তমানে গাজনপালার অনুষ্ঠান হয় না বলা যায়। কোন সংঘ, বা সমিতির উদ্যোগে পূজা বা মেলার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এখন কেবলমাত্র চৈত্রমাস নয়, বিশ্বকর্মা পূজার পর থেকে বর্ষা আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সারাবছর পেশাদারি গাজনদলগুলি গাজনপালা পরিবেশন করেন।

দর্শক রুচির উপযোগী কাহিনি নির্মাণের কারণে পালাকারদের কাছ থেকে পালা ক্রয় করা হয়। নির্দেশক নিয়োগ করা হয়। তিনি অর্থের বিনিময়ে নির্দশনার কাজ করেন। নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় ও নৃত্যের দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করে গড়ে তোলার কাজটিতেও সাহায্য করেন।

অভিনয়েও এসেছে পরিবির্তন। দর্শক ও শ্রোতাদেরকে পালা অভিনয়ের সাথে একাত্ম করে তোলার জন্য অভিনয়ের মাঝে তাদের ‘দাদা’, ‘দিদি’ বলে সম্বোধন করে সংযোগ স্থাপন করা হয়। অনেক সময় একা অভিনেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের কাছে মনের আনন্দ, বেদনা বা কোন বক্তব্য ব্যক্ত করেন। এমনকি মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণও জানান। কখনো অনুষ্ঠিত অঞ্চলটির নাম, সেই

স্থানের অধ্যুষিত অঞ্চলের থানা, দোকান, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ডের নাম উল্লেখ করে বা প্রশংসা করে দর্শকদের সাথে সংযোগস্থাপন ও তাদেরকে প্রভাবিত করা হয়।

গাজনপালার গানগুলি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বরুণ কুমার চক্রবর্তীর *'লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে'* নামক গ্রন্থের মন্তব্যটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন—

> "লোক সঙ্গীত ঐতিহ্যানুসারী ট্র্যাডিশনাল গান, এর টেস্ট এবং সুর দুই-ই আমরা পরম্পরা সুত্রে প্রাপ্ত। অধিকাংশ লোকসঙ্গীতই মৌখিক রচনা, মুখে মুখে সৃষ্ট এবং সেগুলিতে পদাবলী সাহিত্যের পদকর্তার মতো ভনিতা নেই ফলতঃ রচয়িতার নাম অনুলেখিত। তাই বলে লোকসঙ্গীতে কখনই ভনিতা যুক্ত হবে না, হলে তার জাত যাবে এমন নয়।"[৪৩]

প্রয়াত অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তা ভনিতা মুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে বর্তমান পেশাদার গাজনপালাকারগণ ভনিতার মাধ্যমে গানে নিজের নাম প্রকাশ করেন। পালাকার জগন্নাথ গায়েন, অশ্বিনী নাইয়া, নরেশ অধিকারী, প্রফুল্ল সরদার প্রমুখদের পালাগানে তার নিদর্শন রয়েছে। যেমন—

"কৃষ্ণ অংশে জন্ম তোমার, তুমি মহালক্ষী
স্বপন গায়েনের বানী, অশ্বিনীর কাহিনি
তুমি স্বপ্নে গড়া মোর প্রতিমা।"

তবে গাজনপালার মধ্যস্থ সঙ্গীতগুলিকে পোশাদার রচয়িতার বদান্যতায় লোকসঙ্গীতের স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। এগুলি আসলে লোকসঙ্গীতের আদলে রচিত পরিশীলিত সঙ্গীত। যা ব্যবসায়িক স্বার্থে রচিত। সেখানে গাজনপালাগানের ঐতিহ্যবাহী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুপস্থিত। যুগের দাবি মানতে গিয়ে, ব্যবসায়িক স্বার্থচরিতার্থ করতে গিয়ে পরম্পরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, বিকৃত হচ্ছে।

সঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দীন বলেছিলেন—

> "দু হাজার বছর পরেও যেন আগামী দিনের মানুষ আমাদের অতীত ও বর্তমানের পল্লিসুর ও তাদের আদিম পুরুষের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে।"[৪৪]

কিন্তু গাজনের সুরে পড়েছে তথাকথিত যুগের প্রভাব। আধুনিক কথা ও সুর, আধুনিক পশ্চিমী বাদ্যযন্ত্র দ্বারা যে পরিবেশনা বর্তমানে হচ্ছে তা ঐতিহ্যানুযায়ী পরিবেশনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তথাকথিত নতুনত্বের মোহে, যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে ধ্বংস হচ্ছে পরম্পরা, বিসর্জন হচ্ছে লোক ঐতিহ্যের। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির অজ্ঞতার কারণে, বা তাৎক্ষণিকভাবে লাভের বাসনায় গানের অনুকরণ ও প্রয়োগের ত্রুটি হয়। পূজার গান হয়ে যায় প্রেমের গান, ত্যাগের গান হয়ে ওঠে ভোগের গান, এই ধুলি মলিন পৃথিবীর অনন্যতায় মোহমুক্ত হয়ে নিত্য সান্নিধ্য লাভের 'আকাঙ্খাজনিত গানকে মিলনের গান, প্রেমের গান, সঙ্গীনীর সান্নিধ্য লাভের গানে রূপান্তরিত করে প্রয়োগ করা হয়। যেমন-

ত্যাগের পথ অবলম্বনের গান 'সাধের লাউ বানাইলি মোরে বৈরাগী'। এটিকে নাট্যমন্দির গাজনতীর্থ দলের সপ্তম ছকে ভোগের গান অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে 'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না' গানটিকে ঐ দলের পঞ্চম ছকে প্রেমেরগান রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। গানের অর্থ কেবল নয় তার সুরের ও লয়েরও পরিবর্তন ঘটানো হয়। যে গানের লয় ধীর মন্থর তাকেই দেখা যায় প্রেমের গানে রূপান্তরিত করে সুরকে দ্রুত লয়ে উন্নীত করে প্রয়োগ করা হয়।

আসলে লোকনাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলি লোকসমাজ চালিত, আস্বাদিত এবং তাদের দ্বারাই সৃষ্ট ও গীত হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে দলমালিকের পছন্দ অনুযায়ী গীতিকার এগুলি রচনা ও সুর করেন। সম্পূর্ণটাই পরিচালিত হয় ব্যবসায়িক স্বার্থে। শিল্পীর স্বাধীনতা সেখানে তুচ্ছ। যশ, অর্থ লাভ সেখানে মুখ্য। লোকঐতিহ্য বজায় রাখা তাদের কাছে অর্থহীন বিষয়। লোকসংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে গ্রামের সমাজের, মানুষের রুচির পরিবর্তনের সাথে ছন্দ মিলিয়ে চলে। গাজনেও সেই বদল ঘটেছে। যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়েই তার এই পরিবর্তন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকে কলকাতা ও শহরগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক ধরনের নতুন রসসমৃদ্ধ যাত্রার উদ্ভব হয়। সেখানে ভক্তিরসের সাথে হাস্যরস, করুন, বীর, বীভৎস প্রভৃতি বিভিন্ন রসের সমাবেশ দেখা দেয়। এতে মধ্যযুগীয় নাট্যগীতির ভক্তিসুর ক্রমশ ক্ষীন হয়ে আসে। এই সব স্থুলহাস্যরস সমৃদ্ধ যাত্রাপালার নামকরণ হয় যাত্রা, তৎকালীন ধনী ও জমিদার শ্রেনীর অলস বিলাসীরা এই সখের যাত্রার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চটুল, ভাঁড়ামি, ইতরজনোচিত সংলাপ, ও আদিরসের আধিক্যের ফলে এক অন্য ধারার জীবনকাহিনি এর মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হত। পৌরানিক কাহিনির মধ্যে নানা ঘটনার উত্তেজিত সমাবেশ ঘটাতেন পালাকারেরা। তার একদিকে পৌরাণিক কাহিনির প্রতি বিশ্বস্ততার প্রকাশ ঘটত অন্যদিকে বাস্তব জীবনবোধের মধ্যে আমোদ প্রমোদের উপকরণ সংগ্রহ করতেন। অমিত কুমার ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন---"কলকাতার এই সখের যাত্রাভিনয় ক্রমে ক্রমে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল।"[৪৫]

প্রাচীন যাত্রারীতির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে পালাকীর্তনের আলোচনাও আসে। অমিত কুমার ঘোষ বলেন—

"সপ্তদশ শতক থেকে যে পালাকীর্তনের প্রচলন হয় সেই কীর্তনের মধ্যে যাত্রাশৈলীর কিছু কিছু নিদর্শন চোখে পড়ে।"[৪৬]

এরপর সংলাপের প্রাধান্যের ফলে পালাকীর্তনে নাট্যরূপ ধরা দেয়। যাত্রার মতো গাজনপালাগুলি যতদিন কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলেই অভিনীত হয়েছে ততদিন তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। কিন্তু যখনই সে গ্রামের গন্ডী অতিক্রম করে শহরমুখী হয়েছে, শহরতলিতে ছড়িয়ে পড়েছে তখনই সে অনুকরনে পরিণত হয়েছে। একথা ঠিক যে যুগ পরিবর্তনের সাথে গাজনপালার বিষয়, আঙ্গিক ও অভিনয় রীতিতে পরিবর্তন স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাচীন গাজনপালার আঙ্গিক, রুপরীতি বৈশিষ্ট্যকে সরিয়ে নতুন যাত্রার আঙ্গিক ও অভিনয় রীতিকে অনুকরণ করে তবে সেই গাজনপালার বেঁচে থাকার

সার্থকতা বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। বিশ শতকের শেষে বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম, দুরদর্শন, বেতার, টেপরেকর্ডার, ক্যাসেট প্রভৃতি গ্রামজীবনে পৌঁছায়। গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠে ভিডিও হল। প্রভাবিত হয় গ্রামের গাজনপালাগুলি। বর্তমানে শহুরে যাত্রা ও চলচ্চিত্রের গ্রামীণ সংস্করণ গাজনপালায় পরিলক্ষিত হয়। যাত্রা ও চলচ্চিত্রের প্লট ও গানের ব্যাপক অনুসৃতরূপ দেখা যায় গাজনপালাগুলির মধ্যে। আসলে এ কেবলমাত্র অবসর বিনোদন নয়। অধিকতর উপার্জন বা মুনাফার উদ্দেশ্যেই এই রূপ-রীতি বদল।

একশ বছরের বেশ কিছু আগেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে যাত্রাগানের প্রচলন ছিল। আরও পূর্ব থেকে দেশে কৃষ্ণযাত্রার কথা জানা যায়। আবার পালা-পাঁচালি, সঙ-গাজন প্রভৃতিরও বেশ প্রচলন ছিল। যাত্রা গানের উদ্ভবের পূর্বে এখানে যাত্রাগানের প্রেক্ষাপটটি সাজিয়ে দিয়েছিল এই সব লোকসংস্কৃতিগত অনুষ্ঠানগুলি।[৪৭]

গাজন উৎসবের আঙ্গিকের মধ্যে যাত্রা গানের পূর্বাভাষ নিহিত রয়েছে। নৃত্য-সংগীত-সংলাপ মিশ্রিত কাহিনির বিস্তার—সমস্ত নিয়েই গাজনপালা লোকনাট্য। কেবলমাত্র গাজনপালাগুলিই নয় সমগ্র গাজন উৎসবের মধ্যেই রয়েছে যেন অভিনয় জগতের চলমান প্রদর্শনী। তার বর্ণনা পাওয়া যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রবন্ধের 'কলিকাতার চড়ক পার্বন' ও গাজন প্রসঙ্গে। যেখানে গাজনের বর্ণনায় পাওয়া যায় নাচ-গান-সঙের সাজ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক চলমান অভিনয় রূপে। পরবর্তীকালে এই গাজনপালার রূপ ও রীতির পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবেশনার সাথে যাত্রার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পালা অভিনয়ের শুরুর পূর্বে বাদ্যের কনসার্ট, পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনির অগ্রসরতা, কাহিনিতে আদি-মধ্য-অন্ত্য বিভাজন, নৃত্য প্রভৃতি। যাত্রার অনুসরণে ছোট ছোট কাহিনি পরিবেশনের মাধ্যমে তা রূপ নিয়েছে আধা যাত্রা আধা গাজনের।।

গাজন গানও পরবর্তীকালে গাজনপালা নামক লোকনাট্যে রূপান্তরিত ঘটেছে। চলচ্চিত্র ও চিৎপুরী যাত্রার নাচ, গানের প্রভাবে যে স্বল্প রূপান্তর ঘটিয়ে বর্তমানে আধা যাত্রা আধা গাজনের রূপ ধারন করেছে তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা— অন্যতম কারণ হল, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব। গাজনপালাগুলি যখন গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে শহরতলি ও শহরমুখী হয়েছে তখন সেও নিজের রূপান্তর ঘটিয়েছে। দ্বিতীয়, কারণ হল সময়। অর্থাৎ কালগত কারণ। সময়ের সাথে সাথে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। খুব স্বাভাবিক ভাবে কালের নিয়মে গাজনপালাগুলির বিষয় ও আঙ্গিকেও এসেছে বদল। তৃতীয়, কারণ রূপে মানুষের রুচিকে উল্লেখ করা যায়। দর্শক মনের বৈচিত্র্য পিপাসাই এই বদলের আরেকটি কারণ। চতুর্থ, কারণ রূপে উল্লেখ করা যায় আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি। যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় গাজনপালাগুলির বিষয়বস্তুতে। এছাড়া আর্থিক লাভের চিন্তা করেই নির্মাতারা দর্শকরুচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর বদল ঘটিয়ে চলেছেন। পঞ্চমত, লোকশিল্পীর অজ্ঞানতাকে উল্লেখ করা যায়। প্রাজ্ঞতাও সঠিক জ্ঞানের অভাব শিল্পকে সঠিক ভাবে ব্যবহার না করে কেবলমাত্র

আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ভুল রূপান্তর ঘটানো ও প্রয়োগ করে চলেছেন রচনাকারেরা। ষষ্ঠ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ও শহরের সাথে গ্রামের সংযোগ স্থাপন সহজসাধ্য হওয়ায় গাজনপালাগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করা এক সময় গ্রামের দলগুলির কাছে বেশ কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল। আজ সেগুলি হয়ে উঠেছে সহজ লভ্য। উৎসব যখন তার কেন্দ্রাঞ্চল থেকে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তার সংস্কৃতি বলয় অতিক্রম করে অন্যস্থানে উৎযাপিত হয় তখন তাঁর আনুষ্ঠানিক রূপরেণুর পরিবর্তন হয়। গাজন উৎসবেও এই পরিবর্তন লক্ষিত হয়। নগর বা নগর পার্শ্ববর্তী মানুষ যখন শহরতলির কোন স্থানে এই উৎসব পালন করেন তাদের নিষ্ঠা রূপরীতিতেও সেই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির হারানো ঐতিহ্য ও সৃষ্টিশীল নিদর্শনগুলি লোকঐতিহ্য ধারায় বিবর্তিত হয়ে চলেছে যুগে যুগে। যেমন ভাবে বিবর্তিত হয়েছে গাজনপালার মধ্যস্থ লোক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলিও। বর্তমান আধা যাত্রা আধা গাজনরূপ এই পালাগুলির নির্মাতাদের মধ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মনে শিল্পের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই। নেই লোকসংস্কৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা। দর্শক মনে ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা অপেক্ষা নাগরিক সংস্কৃতি ও গতানুগতিকতার মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ বেশি। বিশ্বায়নের যুগে আড়ম্বরের প্রতি আকর্ষণ পন্যের বৈচিত্র্যের প্রতি মুগ্ধতা, জগত ও জীবনের নশ্বরতার সমস্ত উপকরণে বিমুগ্ধ হয়ে লোকশিল্পের মুগ্ধতার পাশাপাশি তার প্রতি দ্বিচারিতা করে চলেছে মানুষ। তাই মানুষকেই সজাগ হতে হবে। আধুনিকতা, রূপান্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে তাকে রূপান্তরে উৎসাহিত না করে, স্রোতে ভেসে না গিয়ে সঠিক উপায় অবলম্বন করে ঐতিহ্যগুলিকে বজায় রাখায় সচেষ্ট হতে হবে। তবে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিবর্তনশীলতাই সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম। আর পরিবর্তনশীল সমাজের মানুষের পক্ষে স্থানু হয়ে থাকাও অসম্ভব তাই পারিপার্শ্বিক রূপান্তর ও পরিবর্তনের প্রয়োজনে ও প্রভাবে লোকসংস্কৃতির বিষয় ও আঙ্গিকে বদল সম্ভব কিন্তু বিলুপ্তি অসম্ভব। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষের সংস্কৃতি নতুনতর রূপ নেয়। নতুন ভাবে, নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব তার বিষয় আঙ্গিকেও ধরা দেয়। সামাজিক বিকাশের সঙ্গত কারণেই লোকসংস্কৃতির অনেক অংশ হারিয়ে যায় বা সক্রিয়তা হারায় কিন্তু মূল লৌকিকসংস্কৃতি পরম্পরা কখনো একেবারে বিলুপ্ত হতে পারে না। এই রূপান্তর ভালো নাকি মন্দ সে বিচার করা বড়ই কঠিন কাজ। আসলে লোকনাট্যের ঐতিহ্যের তুলনা করা যায় প্রকৃতির সাথে। আবার প্রাকৃতিক জগতেই রূপান্তর যেহেতু একটি চিরন্তন স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় তাই এ রূপান্তর আমাদের মেনে নিতে বাধ্য করায়। তবে জগতে মন্দকে বর্জন করে ভালো দীর্ঘজীবী হয়। এ ক্ষেত্রেও সেই আশা করা যায়।

৫.৫ লোকনাট্য গাজনের ভবিষ্যৎ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নিম্নবর্গীয় দরিদ্র সমাজে নানান লৌকিক দেব-দেবীর প্রভাব ও প্রচলন রয়েছে যুগ যুগ ধরে। এই লৌকিক দেব-দেবীকে ঘিরেই এখানকার সমাজে ক্রমে গড়ে উঠেছে অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় আচার, উৎসব। গাজন এমনই একটা শস্যকেন্দ্রিক আদিম ধর্মীয় উৎসব। যে উৎসবকে কেন্দ্র করে সারা দক্ষিণবঙ্গের মানুষ চৈত্র মাসে একত্রিত হয়ে উঠত। যার একদিকে ছিল ধর্মীয় আচরণ, রীতি-নীতি অন্যদিকে ছিল মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান। দিন বদলের সাথে সাথে সব কিছুই পরিবির্তনশীল। এই উৎসবেও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। ক্রমে ধর্মীয় অংশ থেকে মনোরঞ্জনমূলক অংশটি আলাদা হয়ে বর্তমানে গাজনপালা নিজে সম্পূর্ণ একটা পেশারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উৎসব রূপে গাজন এবং গাজনপালার লোকনাট্যগত রূপটির সাম্প্রতিক অবস্থা ঠিক কেমন ভবিষ্যতই বা কেমন হতে পারে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ,বিশ্লেষণ ও অনুমানের চেষ্টা করা হল।

আমন ধান ঘরে তোলার কাজ সমাপ্তির পর চৈত্রমাসে পুরাতন বছরের সমাপ্তি ও নতুন বছরের সূচনার এই সন্ধিক্ষনে শিব-পার্বতীর বিবাহ মিলন কল্পনায় আগামী বছরে যথেষ্ট শস্য উৎপাদন ও স্বাচ্ছন্দ্যের কামনায় আয়োজন হত গাজন উৎসবের। সুন্দরবন অঞ্চলকে শিব অধ্যুষিত দেশ বলা যায় তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শিবকেন্দ্রিক অগণিত ‘দেল’ বা ‘দেউল’ রয়েছে। একদিকে এই অঞ্চলের দরিদ্র নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনে ছিল নানারকম প্রকৃতিক বিপর্যয় অন্যদিকে তাদের উপর সমাজের উচ্চবর্গের মানুষের অর্থাৎ জমিদার, বর্গাদারদের শোষণ, পীড়ন, অত্যাচার। এই অসহায় দরিদ্র মানুষগুলির জীবনে ছিল কৃষিই ভরসাস্থল। কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, ক্যানিং, নামখানা, কচুখালি, সন্দেশখালি, কিংবা বারাসাত লক্ষীকান্তপুর অঞ্চলের প্রত্যন্তরের অধিকাংশ মানুষের কাছে কৃষিজমিই ছিল জীবন ধারনের একমাত্র উপায়। এদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পুরোটাই নির্ভর করত কৃষি উৎপাদনের উপর। সেই জন্যই কৃষিজমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দেবধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ শিবকেই কৃষিদেবতারূপে অবলম্বন করেছিলেন। কারণ শিব একাধারে সৃষ্টি ও সংহারের দেবতা। একদিকে তিনি যেমন কৃষিকেন্দ্রিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দূর করেন অপরদিকে হলধররূপী শিব ফসল উৎপাদনেও সহায়ক তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির কাছে শিবের হলধর রূপটিই বেশি জনপ্রিয়। তিনি প্রজননেরও অন্যতম প্রতীক। শিবলিঙ্গের সাথে যুক্ত থাকেন শস্যদেবী পার্বতীও। সৃষ্টির দেবতা শিব আর পৃথিবী দেবী ধরিত্রী অর্থাৎ যেখানে উৎপাদন হয় তাই শিব-পার্বতীর বিবাহ মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে পালিত হত চৈত্র গাজন উৎসব। আবাল বৃদ্ধ বনিতা নিজগোত্র পরিত্যাগ করে শিবগোত্র ধারন করেন এই সময়। সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, উত্তরীয় ধারন করেন। একমাসব্যপী নিরামিষ আহার ও শিবের আরাধনা ও স্মরণ করেন। ২৬শে চৈত্র থেকে পালিত হয় গাজন উৎসবের নানান ধর্মীয় আচার। নানান রীতি-নীতি, কৃচ্ছসাধনা, চড়ক, ঝাঁপান, নীলপূজা ও শেষদিন মনোরঞ্জনমূলক পালা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আবার নিজ গোত্রে ফিরে আসার মাধ্যমে পালিত হত এই গাজন উৎসব। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ছিল

এক উন্মাদনা। একদিকে মনোস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্য অন্যদিকে আবেগের স্রোতে গা ভাসানোর প্রবনতায় গাজন উৎসবের জোয়ারে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ চৈত্র মাসব্যপী মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন।

ক্রমশ সময়ের সাথে সাথে বদল এসেছে। সেই উন্মাদনার জোয়ারে ভাটার সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে এখন কেবলমাত্র কৃষিই একমাত্র জীবন ধারনের উপায় নয় তাই কৃষি নির্ভরশীলতা তাদের জীবনে আজ আর একমাত্র অবলম্বন নয়। মানুষের জীবনেও বেড়েছে গতিশীলতা। মাসব্যপী শিবের আরাধনায় যাপন করা অনেকের কাছেই এখন অসম্ভব। কর্মসূত্রে গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী হয়েছেন অনেকেই। মনে ইচ্ছা থাকলেও তাদের অনেকের পক্ষে এই উৎসব পালন করতে পারা অসম্ভব এখন। শহরবাসী হয়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের অনেকের কাছে এই উৎসব এখন আবেগহীন তাই চৈত্র মাসে গাজন উৎসব পালন হলেও পূর্বের তুলনায় উন্মাদনা হ্রাস পেয়েছে বলা যায়।

গাজন কেবলমাত্র ধর্মীয় উৎসবই নয় এর অন্য একটি দিকও রয়েছে। গাজন উৎসবের শেষ দিনে আয়োজন করা হত গাজনপালাগানের। নাচ, গান, সংলাপ, অভিনয়ের সমৃদ্ধ এই গাজনপালা অনুষ্ঠান ছিল নিম্নবর্গীয় দরিদ্র হিন্দুসমাজের কাছে বিনোদনের অন্যতম উপাদান। অন্যদিকে এটি একটি শিল্পচর্চাও বটে। গ্রামের মানুষের সারাবছর ব্যস্ততার অবসরে এটি ছিল বিনোদনের পাশাপাশি শিল্প প্রতিভা চর্চার একটি অন্যতম মাধ্যম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবোদ্ভুত সংস্কৃতি চেতনায় বাংলাদেশের বিশেষ করে কলকাতার নাগরিক সমাজে ও জীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও সুন্দরবনাঞ্চলের গাঙ্গেয় উপকূলে তার কোন প্রভাব পড়েনি তাই এই অঞ্চলের লোকায়ত সংস্কৃতিগুলি তাদের প্রাচীন ধারাকে বহুদিন ধরে অব্যহত রাখতে পেরেছে। এই অঞ্চলের বহুকালের চর্চিত লোকসংস্কৃতিগুলির মধ্যে 'সং' ও 'গাজনে'ও এখানকার মানুষ তাদের বিনোদন, মনোরঞ্জন, শিল্পচর্চা একাধারে সবকটিরই অনুসন্ধান করেছিল। দিন বদলের সাথে সাথে সব দিকে যে পরিবর্তন ঘটে তাকেও সাদরে গ্রহণ করেছিল এখানকার গ্রামবাসী। প্রথমে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় তৈরি হয়েছিল লোকসংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র, আখড়া, সমিতি প্রভৃতি। পরবর্তীকালে গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় তৈরি হয় গাজনসংস্থা। ক্রমে ক্রমে তৈরি হয় পেশাদারি গাজনদল ও গদিঘর। বর্তমানে কাকদ্বীপ, কামারহাট, কুলতলি, রামগঙ্গা, ঘটুগঞ্জ, জয়নগর, ঘটিহারানিয়া, প্রভৃতি জায়গায় প্রচুর গাজনদল গড়ে উঠেছে।

এরা নিজেদের গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য গ্রামে এমনকি নিজের জেলা ছাড়া অন্য জেলাতেও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পালা পরিবেশন করেন। বিরতি বিহীন ভাবে হয়ত একশোটি রাতের অভিনয়ের আগাম বায়না নিয়ে এরা এক-দেড় মাসের জন্য দলের সাথে বাড়ি ঘর পরিবার পরিজন ত্যাগ করে বেড়িয়ে পড়েন। যাতায়াত, সদস্য এবং তাদের আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র বহন করার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা থাকে। একটি গাজনদলে কলাকুশলী থাকেন ৭-৮ জন, বাদ্যকার ৪-৫ জন, আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩-৪ জন। এছাড়া মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, রাঁধুনি সহ মোট ১৮-২০ জন সদস্য। এইসব

সদস্যদের সাথে দলের মালিকের বাৎসরিক চুক্তি থাকে। আর্থিক চুক্তির পাশাপাশি তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিরও ব্যবস্থা করতেও হয় মালিককে।

পূর্বে গাজন উৎসবে আঞ্চলিক গায়েনরা শিব-দুর্গার সং সেজে গাজনগান পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দপ্রদান করতেন আর তার বিনিময়ে পেতেন চাল, ডাল, সবজি, অর্থ। ক্রমে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির ফলে অর্থ উপার্জন শুরু হয়। বর্তমানে টিকিটের বিনিময়েও পালা পরিবেশন হয়। ব্যবসায়িক কারনেই দর্শক রুচিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় গাজনপালার কাহিনি নির্বাচনে। আধুনিককালে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে সাথে দেবমাহাত্ম্যমূলক গাজনগানগুলি প্রায় হারিয়ে গেছে তার বদলে জায়গা করে নিয়েছে সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক নানান ঘটনাকেন্দ্রিক কাহিনি। সামাজিক বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে রচিত হচ্ছে গাজনগান। সমাজ সচেতনতা ও নীতিমূলক শিক্ষার বিষয়টিও এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। তবে দেব-দেবীকেন্দ্রিক বা পৌরাণিক কাহিনিকেন্দ্রিক বিষয় যে একেবারেই নেই তা নয়। প্রথম ছকে সাধারনতঃ দুর্গার অসুর বধের আঙ্গিকে সমাজে নারীর উপর পুরুষের অত্যাচার ও দুষ্টের দমন এবং দ্বিতীয় ছকে রাধা কৃষ্ণের প্রেম কাহিনি পেশাদারি গাজন দলের পরিবেশনার বিষয় হয়ে উঠেছে। দলগুলিতে রয়েছেন পেশাদার পালাকার। এনারা কেউ পেশা হিসেবে সম্পূর্ণভাবে গাজনপালা রচনাকেই বেছে নিয়েছেন আবার কেউ কেউ অন্য পেশার পাশাপাশি সখে এটি রচনা করে থাকেন। গাজনপালার গানগুলির রচনা ও সুর এরাই করে থাকেন। দলগুলি পালাকারের কাছ থেকে পছন্দ মতো পালা ক্রয় করেন। পালার দামও পালার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নির্ধারণ হয়। পেশাদারি গাজনদলগুলি পেশাদারি শিক্ষক বা নির্দেশকের দ্বারাই অভিনয় রপ্ত করেন। এরা হলেন ‘গাজনমাষ্টার’। কেবলমাত্র অভিনয়ই নয় বিশেষ করে নারী চরিত্রে অভিনয়, নৃত্য ভঙ্গীমা, দাঁড়ানোর ধরন, কথা বলার কৌশল সব প্রশিক্ষণই এনারা দিয়ে থাকেন। এছাড়া বিজ্ঞাপণী প্রচারের ব্যবস্থাও গাজন মালিক করেন কার্ড, লিফলেট, পোস্টারের মাধ্যমে। সেগুলোর জন্য বিশেষ ভাবে সাজসজ্জা, প্রসাধনী, ছবি তোলার ব্যবস্থাও করা হয়।

রথের দিন আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়। ওইদিন থেকে মহড়া শুরু হয়। উদ্বোধনের পর থেকেই শুরু হয় বায়না নেওয়া। কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে বায়না করা হয়। পরিবর্তে চুক্তিপত্র স্বরূপ রসিদ দেওয়া হয় । মাসব্যপী মহড়ার পর শুরু হয় পালা পরিবেশন। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন প্রথম পালা পরিবেশন করা হয়, চলে বর্ষাকালের আগে পর্যন্ত। শহরতলি অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে গাজনপালার জনপ্রিয়তা বেশি, সেখানকার দর্শক সংখ্যাও বেশি, দলগুলির আয়ও অপেক্ষাকৃত বেশি।

দিন বদল আর পরিবর্তনের সাথে সাথে খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে গাজনপালা পরিবেশনেও। আগে কখনো গ্রামেরই জমিদার বাড়িতে বা বিত্তশালী ব্যক্তির উদ্যোগে তার বাড়িতে গাজনগানের আসর বসতো আর এখন ক্লাব সমিতির উদ্যোগে সারাবছরই কোন পুজো বা মেলাকে কেন্দ্র করে আয়োজন হয় গাজনগানের। বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনপালা পরিবেশনায় যে বদল ঘটেছে তাতে তার রূপ ও রীতির বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যার সাথে যাকে আধা

যাত্রা আধা গাজন বলা যায়। যেমন—পালার শুরুতেই থাকে বাজনার সঙ্গত বা কন্সার্ট, পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্যে দিয়ে কাহিনির অগ্রগতি হয়, আদি- মধ্য- অন্ত্য বিশিষ্ট কাহিনি পরিবেশন হয়, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই সমস্ত গাজনপালায় এখন হারমোনিয়াম,ঢোল, কাঁসি, বাঁশির পাশাপাশি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র অক্টোপ্যাড, সিন্থেসাইজার, কিবোর্ড এসবের ব্যবহার হয়। আলোর কারুকার্য, শব্দনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও করা হয়। এছাড়া পৌরাণিক চরিত্রের ক্ষেত্রে ঝলমলে পোশাকের ব্যবহার, চটুল সংলাপ, রসবোধাত্মক গান ইত্যাদির পাশাপাশি ছোট ছোট কাহিনি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এগুলো বর্তমানে আধা যাত্রা আধা গাজন হয়ে উঠেছে। আগে গ্রামেরই কোন খোলা যায়গায় কিংবা মন্দির প্রাঙ্গণে বা তার সংলগ্ন কোন জায়গায় হয়ত ছেঁড়া চট বা ত্রিপলের শামিয়ানা খাটিয়ে পলখড় বিছিয়েই আসর বসতো গাজনের। আজ তার বদলে তৈরি হচ্ছে মঞ্চ, দিনের আলোর পরিবর্তে ব্যবহার হচ্ছে রঙীন নানান ধরনের আলো, রয়েছে শব্দ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গরিব মানুষের দেশ। এখানকার অধিকাংশ মানুষই নিম্নবর্গীয় দরিদ্র কৃষিজীবী, শ্রমজীবী। এখানকার মানুষের কাছে বিনোদন বিলাসিতার তুল্য তাই মনোরঞ্জনের জন্য সারাবছর খেটে খাওয়া সাদামাটা জীবনযাপনের মানুষগুলি অর্থব্যয় করার কথা ভাবতেই পারেনা। তবুও রোজকার গতানুগতিক জীবনের মাঝে একঘেয়েমি দূর করার জন্য কিছুতো প্রয়োজন হয়। গাজনের মতো লোকনাট্যইগুলি তাদের সেই বিনোদনের অন্যতম উপায়। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যতা তাদের জীবনের নিত্যসঙ্গী তাই অতিরিক্ত অর্থব্যয় তাদের কাছে অসম্ভবনীয় বিষয় আর এখানেই শহরাঞ্চলের মানুষের সাথে তাদের তফাৎ। শহরে মনোরঞ্জনের হরেক উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। ভিন্ন ভাবে অর্থ উপার্জনকারী মানুষের সংখ্যাও যথেষ্ট আর তাদের মাসিক বা বাৎসরিক আয়ের পরিমাণও বেশ। তুলনায় কৃষিজীবী এই মানুষগুলি বা গ্রামের অন্য পেশায় নিযুক্ত মানুষগুলির আয় খুবই কম। তারই ফল দেখা যায় বিনোদন জগতেও। শহর বা শহরতলির অতিসাধারণ কোনো প্রেক্ষাগৃহের ছায়াছবির একটি টিকিটের মূল্য অপেক্ষা গাজনপালার টিকিটের মূল্য অত্যন্ত কম। আসলে মনোরঞ্জনের জন্য এর থেকে বেশি খরচ করার সামর্থ্যও গ্রামের অধিকাংশ দর্শকের নেই।

শিল্পী ও কলাকুশলীদের ক্ষেত্রেও এই বৈষম্য যথেষ্ট। গাজন শিল্পীদের ও কলাকুশলীদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ও নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে জন মনোরঞ্জনের উপায় প্রস্তুত করতে হয়। দর্শকেরা প্রায় সকলেই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার ও সাংসারিক প্রতিবন্ধকতার জালে আবদ্ধ। বারো মাস দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলি সারাবছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাঝে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়ে গাজনগানের মধ্যেই খুঁজে পান জীবনের রসদ। অধিকাংশ সময় একেবারেই বিনামূল্যে কিংবা স্বল্প অর্থ ব্যয়ে এখানে প্রানের আনন্দ অনেকখানি তাই গাজন মালিককেও খেয়াল রাখতে হয় ব্যয়ভারের দিকে। শহরাঞ্চলে একজন গায়ক বা শিল্পী একটি অনুষ্ঠান পিছু যা আয় করেন একটি দল নিয়ে ঐ একই জায়গায় অনুষ্ঠান করে গাজনদল আয় করে তার কিয়দংশ। বাৎসরিক চুক্তিতে কলাকুশলীদের আর্থিক আয়ও বিশেষ কিছু নয়।

দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গাজন হল একটি জনপ্রিয় লোক উৎসব ও লোকনাট্য। এই গাজন উৎসব ও গাজনপালার বিস্তৃতি এবং তার জনপ্রিয়তার নিরীখে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে গাজনের দেশ বলা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতির বিশিষ্টতা অনেকখানিই ধরা দেয় গাজনগানগুলির বৈচিত্রে, বৈভবে, অনন্যতায়। দ্রারিদ্র্যের কষাঘাত, ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তন, যান্ত্রিক সংস্কৃতি যথা- বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্রের সর্বগ্রাসী আকর্ষণে লোকজীবনের আনন্দ সহচর লোকসংগীতের অনেক ধারা আজ বিলুপ্ত-বিস্মৃতির দূরপ্রান্তে উপনীত। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের প্রবল ঝঞ্ঝাঘাত উপেক্ষা করে আজও এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির যে ধারাগুলি সরস-সজীবতায় দীপ্যমান তার মধ্যে অন্যতম এই গাজনগান। যে কৃষিজীবী গ্রামীণ সমাজজীবনে গাজনপালা ও গাজনগানের জন্ম হয়েছিল এবং তা অকৃত্রিমভাবে প্রবহমান ছিল বর্তমানে সেখানে কি এই মৌলিক রূপটি বজায় আছে? যুগ পরিবর্তনের ছোঁয়া যেমন নগর জীবনকে প্রভাবিত করেছে তেমন গ্রাম জীবনকে স্পর্শ করেছে ফলে লোকসংস্কৃতির এই ঐতিহ্যবাহী ধারাটি পরিবর্তনের স্রোতে ভাসবে এটাই তো স্বাভাবিক। এখন দক্ষিন চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও আধুনিকতার আশীর্বাদে সমকালীন বাণিজ্যিক উপকরণ পৌঁছে যাচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রাম্য মানুষগুলির জীবনেও আধুনিকতার স্পর্শ যে পরিবর্তন এনে দিচ্ছে তার ছোঁয়া লেগেছে তাদের চিন্তনে, মননে, ভাষায়, পোষাকে, জীবন-যাপনে তাই কখনো সজ্ঞানে কখনো অজ্ঞানে গাজনের কাহিনি ও গানে প্রভাব পড়েছে চলমান বাণিজ্যিক কোনো ছায়াছবির কাহিনি বা গানের। শিল্পীদের মানসিকতাতেও যে পরিবর্তন ঘটেছে তার ফলস্বরূপ সে নিজের ঐতিহ্য, শিকড়কে বজায় রাখার চিন্তা চেতনা হারিয়ে হয়ে উঠেছে পেশাদারি। এভাবেই লোকসংস্কৃতির অঙ্গ গাজনপালাগান থেকে অকৃত্রিম মাটির গন্ধ নীরবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তবে সম্পূর্ণ বিলীন সে হতে পারে না আসলে আধুনিকতার স্পর্শে এই পরিবর্তন আমাদের মেনে নিতেই হয়। দিন বদলের এই ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়ে সে নিজেকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে এবং এখনও দক্ষিন চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে এক বিশেষ মনোরঞ্জনের উপাদান হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে আছে। এখন ইউটিউব এও অসংখ্য গাজনপালা দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের কম্প্যুটার সেন্টারগুলিতে ১০ টাকা, ২০ টাকার বিনিময়ে গাজনপালার ভিডিও মোবাইলে ডাউনলোড করে নেওয়ার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, বর্তমান সময়ে সুদূর গ্রামগঞ্জেও একাধিক আধুনিক মনোরঞ্জনের উপাদান থাকা সত্ত্বেও কেন মানুষ গাজনপালা আজও দেখে? কেন অন্যান্য মনোরঞ্জনমূলক উপাদানের তুলনায় অনেক কম জৌলসপূর্ণ এই গাজনপালা মানুষকে আনন্দ দেয়। রাত জেগে শীতের কনকনে ঠাণ্ডাতেও বহুপথ হেঁটে এসে খোলা আকাশের নীচে মাঝরাত অবধি পালা দেখে আবার যানবাহনহীন মাইলের পর মাইল পথ পায়ে হেঁটে ফিরে গিয়েও সমস্ত কষ্ট তাদের কাছে কেন তুচ্ছ মনে হয়।

আসলে এই প্রশ্ন শহুরে মানুষের মনে বারে বারে উঁকি দিয়েছে আজও দেয়। লোকংস্কৃতির একজন গবেষক হিসেবে এই বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি কারণ উপলব্ধি হয়েছে। যেমন—

অভিনয় দক্ষতা ও প্রতিভাঃ গ্রামের নিরক্ষর বা অর্ধস্বাক্ষর অভিনেতাদের কোনো রকম প্রথাগত শিক্ষাবিহীন অভিনয় মানুষের কাছে মনোমুগ্ধকর। সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রতিভা বা দক্ষতার দ্বারা যে অভিনয় তারা করেন তাতে যে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলতা ধরা পড়ে, তা অসাধারণ। এই সমস্ত অভিনেতারা প্রায় সকলেই একে পেশারূপে গ্রহণ করেছেন কেবলমাত্র উপার্জনের উদ্দেশ্যে নয়, তাদের এই বিষয়ের প্রতি আবেগ-অনুভূতি থেকে যার প্রকাশ হয় তাদের পরিবেশনে। এছাড়া এনারা সকলেই হন গ্রামের মানুষ, একই গ্রামের মানুষ সকলেই প্রায় সকলকে চেনেন। অতি পরিচিত মানুষটিকেই যখন সাজ পোশাক প্রসাধনের আবরনের মঞ্চে অভিনয় করতে দেখেন সেটাও তাদের কাছে অন্যতম ভালো লাগার একটি বিষয়। এছাড়া কোনো কোনো গাজনশিল্পী অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রায় তারকার সম্মান পান। সেই মানুষটিকে অভিনয়ের সময় কাছে থেকে দেখতে পাওয়া মঞ্চে ওঠার আগে ও পরে তাকে সশরীরে সামনে উপস্থিত থাকতে দেখতে পাওয়া এবং ভালোলাগার মতো ার অন্য কোনো অন্যকোনো বিষয়ে এই মানুষগুলি অনুভব করাতে পারে না।

দর্শকের সামনেই উপস্থাপন: রেকর্ড করা অভিনয় আর জীবন্ত উপস্থাপনা দেখার মধ্যে বিস্তর ফারাক। শহুরে থিয়েটার নাটক প্রেমী মানুষেরা যে জন্য ভিড় করেন নাট্যশালায় ঠিক সেই কারণেই গ্রামের মানুষেরা ভিড় জমান এই সমস্ত পালাগানের আসরে। চোখের সামনে অভিনেতাদের সশরীরে উপস্থাপনা তাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা তাদের কাছে বেশ উপভোগ্য। অভিনেতারা অভিনয় করা কালীন কোনও বক্তব্য- মনের দুঃখ ,আনন্দ, গোপন কথা দর্শকদের কাছে সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করার সময় 'দাদা' 'দিদি' সম্বোধন করেন যা অভিনেতাদের তাদের প্রতি এমনকি গাজনপালার প্রতিও দর্শকমনে আন্তরিকতার সৃষ্টি করে আবার কখনো অভিনেতা দর্শকদের কাছে প্রশ্ন করে উত্তর চান বা সমর্থন চান তাতে দর্শকরাও মানসিকভাবে ঐ সময় পালা নাটকটির সাথে একাত্ম হয়ে যান। এমনকি গাজনপালার গল্পের মধ্যে এমনও দৃশ্য তৈরি হয় যেখানে অভিনেতা কাহিনি অনুযায়ী মেয়ের বিয়ের কথা বলছেন এবং তার পরেই দর্শকদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। গল্পের খাতিরে কোনো থানা, স্কুল, কলেজের উল্লেখ করার সময় যে অঞ্চলে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করা হয় সেখানকার থানা, স্কুল, কলেজ, জায়গার উল্লেখ করেন অভিনেতাগণ। এতে দর্শক মন প্রভাবিত হয়। এই যে একাত্মতা অভিনেতাদের সাথে, গল্পের সাথে দর্শকদের, সেটা জীবন্ত উপস্থাপনা বলেই সম্ভব হয়।

মনোরঞ্জন মূলক উপাদানের অভাব: শহরের বুকে আধুনিক মনোরঞ্জনমূলক উপাদানের অভাব নেই। মফঃস্বল অঞ্চলেও প্রায় সেরকমই অবস্থা কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেমন – সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এখনও অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে শহুরে আধুনিকতা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। সেখানকার মানুষের বৈভব্যহীন জীবনে নিত্য দিনের এক ঘেয়েমি দূর করতে

সহায়ক এই গাজনপালাগানের অনুষ্ঠানগুলি। বয়স্ক মানুষ বা গৃহবধূর পক্ষে দূর দূরান্তে গিয়ে মনোরঞ্জন ঘটানো সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে এক রাতের এই পালাগানের পরিবেশন তাদের কাছে অক্সিজেনস্বরূপ। অন্য মনোরঞ্জন বেশি ব্যয়বহুল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গরিব মানুষের দেশ। বিশেষত যত গ্রামাঞ্চলের দিকে যাওয়া যায়, যত সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায় তত দারিদ্রতা মানুষের নিত্যসঙ্গী। এখানকার অধিকাংশ মানুষই শ্রমজীবী তাদের কাছে বিনোদন বিলাসিতার তুল্য তাই সারাবছর আদ্যপান্ত খেটে খাওয়া এই মানুষগুলি কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য অর্থব্যয় করার কথা ভাবতেই পারেননা। তবুও রোজকার গতানুগতিক জীবনের মাঝে একঘেয়েমি দূর করার জন্যও কিছু প্রয়োজন হয়। গাজনপালার মতো লোকনাট্যগুলিই তাদের বিনোদনের অন্যতম উপায়। আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যতা তাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী তাই অতিরিক্ত অর্থব্যয় তাদের কাছে অসম্ভবনীয় বিষয় আর এখানেই শহরাঞ্চলের মানুষের সাথে তাদের তফাৎ। শহরে মনোরঞ্জনের হরেক উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। ভিন্ন ভাবে অর্থ উপার্জনকারী মানুষের সংখ্যাও যথেষ্ট আর তাদের মাসিক বা বাৎসরিক আয়ের পরিমানও বেশ। তুলনায় বিশেষত কৃষিজীবী ওই মানুষগুলি বা গ্রামের অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মানুষগুলির আয় খুবই কম। তার ফল দেখা যায় বিনোদন জগতেও। শহর কিংবা শহরতলির অতিসাধারণ কোনো সিনেমা হলের একটি টিকিটের যা মূল্য মাল্টিপ্লেক্সগুলিতে সেই চলচ্চিত্রের একটি টিকিটের মূল্য তার বহুগুণ। সপরিবারে এক দিনের মনোরঞ্জনে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হবে তা তাদের মাসিক উপার্জনের অনেকটাই। সেক্ষেত্রে গাজনপালাগুলি অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হয় কোনো পূজা বা মেলাকে কেন্দ্র করে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই পাওয়া যায় নিখাদ আনন্দ আর কোনো কোনো জায়গায় টিকিটের বিনিময়ে গাজনপালা পরিবেশিত হলেও টিকিটের মূল্য খুবই কম। সেক্ষেত্রে একদিনের পারিবারিক মনোরঞ্জনের জন্য খরচ ও বিশেষ করতে হয় না।

বিষয় ও চরিত্র: গাজনপালার ছকগুলি বেশির ভাগই দেব-দেবী ও সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনি বিষয়ক হয় যা প্রধানত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। যথা—

পৌরাণিক বা ধর্মীয় পালা

আধ্যাত্মিক চেতনামূলক পালা

নিখাদই মনোরঞ্জনমূলক পালা

সামাজিক পালা

পারিবারিক পালা

অর্থনৈতিক পালা

রাজনৈতিক পালা

সাম্প্রতিক কোনো ঘটনাকেন্দ্রিক পালা

গ্রামের মানুষ অধিকাংশই ধর্মানুরাগী হন তাই পৌরাণিক বা ধর্মীয় পালা এবং আধ্যাত্মিক চেতনামূলক পালাগুলি তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয় আর অন্যান্য সমস্ত পালাগুলির সাথে গ্রাম্য সরলজীবনের মানুষগুলি অর্থাৎ ঐ বৈভবহীন সাধারণ চরিত্রগুলির সাথে সহজেই একাত্ম হতে পারে আর ঘরোয়া কাহিনি ঠিক যেন তাদেরই ঘরের কথা বলে।

হাস্যরস বা কমেডি: বর্তমান সময়ে দৈনন্দিন ব্যস্ততায়, টানাপোড়েনে মানুষের জীবন থেকে নিখাদ হাস্যরসের স্থান প্রায় বিলীয়মান। মনোরঞ্জনের হরেক উপাদান থাকলেও নিখাদ হাসির উপকরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। সেদিক থেকে গাজনপালা হল আদ্যপান্ত হাস্যরসে ভরা একটি অনুষ্ঠান। প্রথম দুটি ছক – পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক- এই দুটিকে বাদ দিয়ে বাকি ছকগুলির প্রতিটিতে কম বেশি হাস্যরস রয়েছে। তৃতীয় ছকটিতে হাস্যরস থাকে সর্বাধিক এছাড়া যে ছকগুলি বেদনার বা বিচ্ছেদের সেগুলিতেও ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে কৌশলে হাস্যরস পরিবেশিত হয়। হাস্যরস কখনো সংলাপে, কখনো অঙ্গ ভঙ্গিতে, কখনো মৌখিক অভিব্যক্তিতে, আবহে, পোশাকে, কোনও ব্যবহৃত দ্রব্যে বা কখনো সম্পূর্ণ নীরবেই ঘটানো হয় তাই বলা যায় আধুনিক মনোরঞ্জনমূলক উপাদান থাকা সত্ত্বেও গাজনপালা মানুষের মনে পছন্দের জায়গা গ্রহণ করার অন্যতম চাবিকাঠি হাস্যরস বা কমেডি।

সঙ্গীত ও নৃত্য: সমাজে লোকমুখে প্রচলিত গাজনগান গ্রাম বাংলার মানুষকে এক সময় মনোরঞ্জনের উপকরণ রূপে বেশ আনন্দ দানের বিষয় ছিল। এর শ্রষ্ঠারা স্বল্প স্বাক্ষর বা নিরক্ষর হয়েও জীবনের হাসি-কান্না অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে আপন ভাবনার ও ভাষা অলংকারের মাধ্যমে সুসজ্জিত করে তাতে নিজের সুর বসিয়ে মানুষের মনে আনন্দ দান করতেন। সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীত শাস্ত্রের জটিলতত্ত্ব বিহীন এই গান এক সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের মনে সারাজীবনের রসদ যোগাত। গাজনপালার মধ্যে সংলাপের পাশাপাশি গানের ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এটিকে সঙ্গীত বহুল একটি অভিনয় বলা যায়। বর্তমানে নানা বিষয়কেন্দ্রিক ছকগুলিতেও গানের বহুল ব্যবহার হয়। গানগুলিতে জীবনের সংগ্রাম, বঞ্চনা, অসঙ্গতি, ক্ষোভ, বেদনা, তিক্ততার পাশাপাশি আনন্দ, প্রেম, বিরহ, আধ্যাত্মিকতা, সমস্ত কিছুরই প্রকাশ ঘটে প্রত্যক্ষ ও সরল ভাবে। সহজ, সরল, সাধাসিধে ভাষায় রচিত গানগুলিতে রচয়িতা কখনো নিজের সুর বসান আবার কখনো কোনো জনপ্রিয় গান বা চলচ্চিত্রের কোনো বিশেষ গানের সুরের অনুকরণ করেন। গানগুলি কখনো হয় পুরোনো আবার কখনো একেবারেই সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় কোনো গান। গাজন শিল্পী অশ্বিনী নাইয়ারের মতো মানুষও আছেন যারা কোনো দিনই গানের প্রথাগত শিক্ষা পাননি। বিদ্যালয়ের শিক্ষাও খুব সামান্য অথচ পালারচনা করেন, গান সৃষ্টি করেন, তাতে সুর দেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যখন তিনি মঞ্চে তা পরিবেশন করেন কেবলমাত্র তার অভিনয় দেখা ও গান শোনার জন্যই হাজার হাজার দর্শক দূর-দুরান্ত থেকে উপস্থিত হন। এরকম শিল্পীরা কিন্তু আবার সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র, গান এগুলির প্রতি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং তার জন্য তারা আধুনিক নানা উপকরণের প্রতিও নির্ভরশীল। সুতরাং বোঝাই যায় যে গাজনপালায় গানের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

গানের পাশাপাশি গাজনপালায় আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল নৃত্য। পুরুষরাই এখানে নারীর সাজে নৃত্য পরিবেশন করেন। বিশেষ এক ভঙ্গীমা রয়েছে নৃত্যের। নায়ক চরিত্রেও নাচের এক বিশেষ ভঙ্গীমা থাকে এবং নায়ক চরিত্রেও একটা বড় অংশে থাকে নাচ। গানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নাচের ব্যবহার দর্শক মনে গাজনপালাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করে।

চটুলতা: গাজনের পরতে পরতে মিশে থাকে চটুলতা। কখনো সংলাপে, কখনো অঙ্গ ভঙ্গীতে, কখনো পোশাকে, কখনো কাহিনির বিষয়বস্তুতে। সব সময়েই তা সরাসরি প্রকাশ পায় এমন নয়। কখনো কৌশলে, রূপকার্থে, দ্ব্যর্থবোধকভাবে আবার কখনো সরাসরিই প্রকাশ পায়। অবলীলায় সংলাপের মাঝে বা সম্বোধনে চটুল কথা, গালিগালাজের ব্যবহার আকছার। নারীকে যৌন আকর্ষণমূলকরূপে উপস্থাপন ও নায়িকা চরিত্রগুলির স্বাভাবিক রীতি। এছাড়া ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে কখনো কখনো আদি রসাত্মক সংলাপ বা অঙ্গ-ভঙ্গীরও যথেষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। গ্রাম্য সংকীর্ণ পরিবেশে এই চটুলতার প্রকাশ অবাক করলেও মানুষের মনে এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া এরূপ যে এ যেন স্বাভাবিক রীতি। নিম্নবর্গীয় গ্রাম্য শ্রমজীবী মানুষদের সীমাবদ্ধ জীবনে গাজনপালার এই চটুলতা তাদের জীবনে মুক্ত ভাবে প্রচলিত নয় অথচ গাজনপালার যে আদি রসাত্মক সুড়সুড়ির আস্বাদ থাকে তা তারা বেশ সাবলীল ভাবেই উপভোগ করেন। পরিবার পরিজনের মধ্যে অনেক সম্ভ্রমবোধ বজায় রেখে চলা মানুষগুলি একসাথে বসে যখন এগুলিই গাজনপালা নামক লোকনাট্যের আবরণে আস্বাদন করেন তখন তাদের কাছে সেগুলি অসম্ভ্রমমূলক অশালীন মনে হয় না, যেন এটি খুব স্বাভাবিক একটা বিষয়। গাজনপালা উপভোগ করার কারণগুলির মধ্যে এই অশালীনমূলক বিষয়টির আস্বাদনও একটি কারণ।

উচ্চারণ ও ভাষা: অন্যান্য লোকনাট্যের মতো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনপালাতেও অভিনেতারা সংলাপ রূপে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা ব্যবহার করেন। কলাকুশলীরা সকলেই যেহেতু এখানকার গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাই তাদের সংলাপের ভাষা এখানকার লোকভাষা। ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গীমা, সম্বোধন, এমনকি গালিগালাজেও এখানকার আদি ভাষার ব্যবহার হয় তাই অন্যান্য মনোরঞ্জনমূলক বিষয়ের থেকে গাজনপালা এখানকার মানুষের কাছে অনেক বেশি আপন বলে মনে হয়। এই পালা যেন তাদেরই ঘরের কথা বলে, তাদেরই জীবনের দর্পণ ফলে আধুনিক হরেক উপকরণ থাকলেও গাজনপালা যেন তাদের জীবনের প্রেক্ষাপটেই তৈরি। তাই তার প্রতি শিকড়ের টান অনুভব করেন এখানকার মানুষেরা।

চটকদারি বিজ্ঞাপন: আধুনিকতার ছোঁয়া যেমন সর্বত্র তেমনি গাজনপালার মতো লোকনাট্যও তার ব্যতিক্রমবিহীন। যাত্রাপালা, নাটক, চলচ্চিত্রকে পরিবেশনের পূর্বে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পোষ্টারের আকারে বিজ্ঞাপন। যুগ যুগ ধরে এই উপায় বহমান। বর্তমানে গাজনপালার দলগুলি যে চটকদারি বিজ্ঞাপন দেয় তা গাজনপালাগুলির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আগ্রহ তৈরি করায় সহায়ক। পুরুষ সেখানে নারীর বেশে, আকর্ষণীয় পোশাক, ঝলমলে

প্রসাধন ও ঝকঝকে প্রসাধনে যেমন অবতীর্ণ হন তেমনি পুরুষক চরিত্রেও তারা আকর্ষণীয় সাজসজ্জা ও চটকদারি মেকাপে মঞ্চে অবতীর্ন হন। পেশাদারি 'ফটোগ্রাফার' ও 'এডিটর' দ্বারা ঐ সমস্ত ছবি তৈরি করা হয়। শহরাঞ্চলে যেমন যাত্রাপালা, চলচ্চিত্রের পোষ্টার মানুষকে আকর্ষণীয় করতে সহায়ক তেমনি গ্রামাঞ্চলে গাজনপালার পোষ্টারগুলি দর্শকমনে ঐ গাজনপালাটি দেখার জন্য আগ্রহ তৈরি করতে সহায়ক হয়।

উল্টোরথের দিন উদ্বোধন হওয়ার পর দু তিন মাস মহড়া হয় এবং বিশ্বকর্মা পূজার দিন থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। চুক্তি থাকে ৭ই আষাঢ় পর্যন্ত। যেহেতু বর্ষাকালে যাতায়াত ও অনুষ্ঠান করার অনেক অসুবিধা থাকে তাই ঐ সময় অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। সেই সময় কেউ কেউ চাষাবাদ করেন সুতরাং এটাই তাদের সারা বছরের মূল আয় এবং তার পরিমাণও বিশেষ নয়। তবুও এরা এই পেশায় যুক্ত রয়েছেন আসলে এর সাথে মিশে রয়েছে আবেগ। গাজনের প্রতি তাদের ভালোবাসা। সেই জন্যই কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় এই পেশায় এলেও কেউ কেউ আবার বংশগত পেশা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্ব-উদ্যোগে এই পেশায় আসেন তাই নিতাই সর্দারের মতোন গাজন শিল্পী বাবার মৃতদেহ দাহ করার সময়ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে। আবেগ এখানে বাস্তবতার যন্ত্রণাকেও ছাপিয়ে যায়। আসলে এই দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে রয়েছে শিল্পীসত্ত্বা। অভিনেতা, গায়ক, পালাকার, সুরকার, যন্ত্রশিল্পী প্রায় সকলেই নিম্নবর্গের হিন্দুসমাজের মানুষ। এনারা সাংসারিক দৈনন্দিন কাজকর্মের রুজি-রোজগারের সাথে সাথে পালা রচনা, গান রচনা, সুর দেওয়ার কাজ করেছেন। জগন্নাথ গায়েন পেশায় চিকিৎসক। পালা, গান রচনা ও সুর দেওয়ার পাশাপাশি নিজ পেশাকে অব্যাহত রেখেছেন। আসলে তিনি সঙ্গীতপ্রেমী ও শিল্পী সেই সাথে রয়েছে গাজনের প্রতি তার আবেগ ও ভালোবাসা। গ্রামের দরিদ্র অভিনেতা, শিল্পী, কলাকুশলী- এই মানুষগুলি যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য ও যথাযথ সুযোগ থাকলে হয়ত আরও বড় শিল্পী হতে পারতেন।

গ্রামেই গাজনের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। যদিও জনপ্রিয়তার নিরিখে গ্রামে ও শহরে সার্বিকভাবে অন্যান্য বিষয়ের কাছে গাজনের বিস্তর তফাৎ তবুও প্রাণের আবেগে এই মানুষগুলি আজও গাজন করে চলেন। শহরতলি থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে তারা যে ভালোবাসা পান সেটাই তাদের সাফল্য। তাতেই তাদের আনন্দ। গ্রামের দর্শকদের মতো গাজন শিল্পীদেরও জীবন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। যেহেতু অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের জীবনেও প্রভাব ফেলে তাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ ভালো নয়। খেটে খাওয়া এই মানুষগুলো জীবনে অভাব অনটনের মাঝে যেটুকু শিল্পচর্চা করেন তা কেবলমাত্র প্রানের আবেগের কারণেই সম্ভব। তার সাথে যুক্ত হয়েছে করোনাকালীন পরিস্থিতির দুরাবস্থা। দীর্ঘ দুই বছর অনুষ্ঠান বন্ধ থাকায় চূড়ান্ত ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় দলগুলি। ২০১৯ সালে দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা দলের মালিক ও বিশেষ অভিনেতা অশ্বিনী নাইয়া একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শিল্পীদের তারা চুক্তির নির্দিষ্ট অর্থ দিয়ে দেবেন প্রথমেই। তারপর যতগুলি পরিবেশনা হবে তার লাভের পুরো অংশই নিজেদের জন্য

রাখবেন। অন্যান্য বছরে অর্থ পেতে দেরি হওয়ার শিল্পীরা ভুক্তভোগী হন তাই সহজেই তারা এই প্রস্তাবে রাজি হন। তাদের প্রাপ্ত অর্থ পাওয়ার কিছুদিন পরেই করোনা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় দলের মালিক ও ঐ শিল্পী চূড়ান্ত ভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হন। তবে কলাকুশলীদের আর্থিক কষ্টে বিশেষ পড়তে হয়নি। কিন্তু সব দল এই সিদ্ধান্ত নেয়নি। তাদের কলাকুশলীদের এতটাই নিদারুণ কষ্টে দিন যাপন করতে হয়েছে যে অনেকে অন্য পেশায় যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিচিত এক দলের মালিক এতটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন যে তিনি নিজেই অন্য যেকোন পেশায় নিজেকে সেই সময় নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যতই তারা অন্য পেশার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে তারা আবার গাজন পেশাতেই ফিরে গেছেন আর এই জন্যই হয়ত অনেক প্রতিবন্ধকতা, সমস্যা, আধুনিকতা থাকা সত্ত্বেও গাজন তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড)* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬), ৫৭২

২. প্রদ্যুৎ সরকার, 'সুন্দরবনের লোক সমাজে শিবের গাজন', *সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা,* সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা (২য় খণ্ড) (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২): ২৮৮

৩. পল্লব সেনগুপ্ত, *পূজাপার্বণের উৎসব কথা* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০১), ২৩

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *উত্তরবাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য* (কলকাতা: চতুষ্কোণ, ১৩৮৩), ৩১

৫. নির্মলেন্দু ভৌমিক, "জনজীবন সংহত গোষ্ঠী ও বাংলার লোকনাট্য", *লোকশ্রুতি,* সংকলন সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯৮৬): ৫০

৬. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেব-দেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬), ২৫

৭. সাক্ষাৎকার: সন্তোষ কুমার হালদার (৪৫), লখিন্দর পণ্ডিত (৩৮) ও অন্যান্য নিউ দ্বিগবিজয়ী গাজন সংস্থা, ০৭ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধেঃ ৮.৩০

৮. সাক্ষাৎকার: বিশ্বজিৎ হালদার (৪২), বিষ্ণুপদ হালদার (৩৮) ও অন্যান্য আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দল, ০৫ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধেঃ ৭.৩০

৯. সাক্ষাৎকার: সুপ্রভাত মণ্ডল (২২), কৌশিক শিকারি (২৮) ও অন্যান্য, শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা, ০৯ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধেঃ ৮.৩০

১০. সাক্ষাৎকার: বিকাশ মণ্ডল (২৬), সুকান্ত হালদার (২৮) ও অন্যান্য, আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ, ০৫ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধেঃ ৭.৩০

১১. সাক্ষাৎকার: প্রদীপ বাওয়ালী (২৫), চন্দন গায়েন (৩২) ও অন্যান্য, আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ, ০৯ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধেঃ ৮.৩০। একটি গাজনপালা অভিনয় হওয়ায় পরবর্তী বছরে আর ক্রয় ও অভিনয় করা হয় না। এইভাবে অলিখিত গাজনপালাগুলি ক্রমে হারিয়ে যায়।

১২. সাক্ষাৎকার: শংকর মণ্ডল (২৭), সুজিত সর্দার, (২৮) ও অন্যান্য, শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা, ০৯ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধেঃ ৮.৩০

১৩. সাক্ষাৎকার: বুদ্ধিশ্বর তাঁতী (৩১), সুভাষ হালদার (২৪) ও অন্যান্য আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দল, ০৫ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধেঃ ৭.৩০

১৪. সাক্ষাৎকার: পার্থ ভুঁইয়া (১৯), কুশল তাঁতী (১৮)ও অন্যান্য নিউ দ্বিগবিজয়ী গাজন সংস্থা , ০৭ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধেঃ ৮.৩০

১৫. সাক্ষাৎকার: ছোট্টু বটব্যাল (১৭), জগন্নাথ মণ্ডল (৩২) ও অন্যান্য, শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা, ০৯ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধে: ৮.৩০

১৬. সাক্ষাৎকার: গৌতম মণ্ডল (২১), সোমনাথ শিকারি (২৯) ও অন্যান্য নাট্যমন্দির গাজনসংস্থা দল, ০৫ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধে: ৭.৩০

১৭. সাক্ষাৎকার: মিন্টু হালদার (২৬), অরবিন্দু পানুয়া (২৩) ও অন্যান্য নাট্যমন্দির গাজনসংস্থা দল, ০৫ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধে: ৭.৩০

১৮. সাক্ষাৎকার: চন্দ্রশেখর দাস (২৩) সুরোজিৎ অধিকারী (৩৬)ও অন্যান্য নিউ দ্বিগবিজয়ী গাজন সংস্থা, ০৭ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধে: ৮.৩০

১৯. সাক্ষাৎকার: নিতাই সর্দার (৩৩) আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দল, ০৫ই ডিসেম্বর ২০১৭, সন্ধে: ৭.৩০। পরিশিষত-৩ এ নিতাই সর্দারের ছবি দ্রষ্টব্য।

২০. *বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পালা,* ২য় বর্ষ, ১৯৮১, ডিসেম্বর, পৃ. ৭৫

২১. "বাঙলা লোকজীবনে সঙের প্রভাব", *শব্দ-শাব্দিক,* লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, সংখ্যা- ৪, (বর্ষ- ১০, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৯২): ১৫৮

২২. বুদ্ধদেব রায়, "গাজন উৎসব ও গান", *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ১৯৮১): ৭৫

২৩. ধূর্জটি নস্কর, "সুন্দরবনের সঙ ও গাজন", *গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা,* সংখ্যা- ১১, (বর্ষ- ৩, নভেম্বর ১৯৮৫, অগ্রহায়ণ ১৩৯২): ৪৮

২৪. দীপঙ্কর দাস, "গাজনের অনুষঙ্গে নানা তামাশা, জটিল আচার", *পুণ্যিপুকুর,* চড়ক ও গাজন সংখ্যা, সংখ্যা- ১ (বর্ষ- ২, ১লা বৈশাখ, ১৪১৯): ১৪

২৫. ধূর্জটি নস্কর, "সুন্দরবনের সঙ ও গাজন", *গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা,* সংখ্যা- ১১, (বর্ষ- ৩, নভেম্বর ১৯৮৫, অগ্রহায়ণ ১৩৯২): ৮

২৬. দীপঙ্কর দাস, "গাজনের অনুষঙ্গে নানা তামাশা, জটিল আচার", *পুণ্যিপুকুর,* চড়ক ও গাজন সংখ্যা, সংখ্যা- ১ (বর্ষ- ২, ১লা বৈশাখ, ১৪১৯): ১৪

২৭. "বাঙলা লোকজীবনে সঙের প্রভাব", *শব্দ-শাব্দিক,* লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, সংখ্যা- ৪, (বর্ষ- ১০, পৌষ-ফাল্গুন, ১৩৯২): ১৫৯

২৮. শক্তিনাথ ঝা, *আলকাপ* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর, ২০১০), ৭

২৯. From Ritual to Theatre –The Human Seriousness of Play, Paj Publications, *A Divisions of Performing Arts Journal*, New York, 1982, Page-10

৩০. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, *বাংলা গাথা কাব্য* (কলকাতা: ১৯৬২), ১৮

৩১. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোক সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং), ৩০

৩২. শিবপদ ভৌমিক ও সুস্মিতা ভৌমিক, *লোকসংস্কৃতি চর্চা* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬), ৫৯

৩৩. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে* (কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২), ৩৫-১৫১

৩৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড)* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৭০), ৫২

৩৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৪৪), ২৫৭

৩৬. বিমেলেন্দু হালদার, *দক্ষিণ ২৪ পরগণা যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা (প্রথম খণ্ড)* (সোনারপুর: প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০১১), ৩২

৩৭. মানস মজুমদার, *লোক ঐতিহ্যের দর্পণে* (কলকাতা: দে'জ ২০১০), ৮৬

৩৮. তুষার চট্টোপাধ্যায়, *লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা, বিষয়ঃ প্রবন্ধ* (কলকাতা: ১৯৯০), ১৩৮

৩৯. ঐ

৪০. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮), ৭

৪১. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, *বাংলা গাথা কাব্য* (কলকাতা: ১৯৬২), ১৮

৪২. শিবপদ ভৌমিক ও সুস্মিতা ভৌমিক, *লোকসংস্কৃতি চর্চা* (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬), ৪

৪৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১০), ২৫৯

৪৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০১০), ২৬০

৪৫. অমিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের রূপরীতি ও আঙ্গিক* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৮), ১৫। কলকাতার সখের যাত্রা বলতে চিৎপুরের যাত্রাপালাকে বোঝায়।

৪৬. অমিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের রূপরীতি ও আঙ্গিক* (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯৮), ১৬

৪৭. বিমেলেন্দু হালদার, *দক্ষিণ ২৪ পরগণা যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা (প্রথম খণ্ড)* (সোনারপুর: প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০১১), ৩০

উপসংহার

ইতিহাসের দিকে দিক্‌পাত করলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের জীবনযাত্রার যে চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তা হল এখানকার নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের কঠোর সংগ্রাম চিত্র। বিপর্যস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দ্রব্য সম্ভারের স্বল্পতা, এই মানুষগুলির অর্থনৈতিক পরিবেশকে এক অনিশ্চয়তায় ঘিরে রেখেছিল। তার সাথে ছিল রোগ, ব্যাধি, অকাল মৃত্যুর মতো নানাবিধ সংশয়পূর্ণ বিপর্যয়। অসহায় দরিদ্র এই মানুষগুলির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সৃষ্টি করেছিল উদ্বেগ, সংশয় ও আশঙ্কা। তার সাথে ছিল দিন-রাত্রি, ঋতুপরিবর্তন, জন্ম-মৃত্যু, নিদ্রা ও স্বপ্নের বিকাশ ও অন্যান্য ঘটনাবলির বৈচিত্র্য সমাবেশ। যা এই সকল নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষগুলির মনের মণিকোঠায় বহু অযৌক্তিক বিশ্বাসের অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শক্তি কল্পনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। গ্রাম্য, নিরক্ষর, অজ্ঞ, দরিদ্র এই মানুষগুলি যুক্তির যথাযথ কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে এই সকল শক্তি সমূহের ধ্যান-ধারণায় বা তুষ্টি সাধনায় সমবেত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল নিরুদ্বেগ, নিশ্চয়তাপূর্ণ জীবন। তারা আস্থা রেখেছিল লৌকিক দেব-দেবীর উপর। আর সেই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক ধর্মীয় উৎসব এর মধ্যে তারা পেয়েছিল নিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনের প্রাথমিক সন্ধানের আশ্বাস। ধর্মীয় উৎসবই হল অসহায় দরিদ্র এই মানুষগুলির জীবন সংগ্রামের কালজয়ী ঘটনার বাঙ্ময় মূর্ছনা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় কৃষিসমাজে গাজন হল সেই রকমই একটি ধর্মীয় উৎসব। যেখানে কঠোর বাস্তব ও সংগ্রামে ঘেরা পরিবেশের বাইরে মানুষের বুদ্ধির অনতিগম্য, অতিপ্রাকৃত জগতের বিভিন্ন শক্তি সমুহের সন্তুষ্টি সাধনের মাধ্যমে পার্থিব সম্পদের অধিকারী হওয়ার এক সুকৌশল প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি ঘটত। বহু বছর ধরে এই প্রচেষ্টায় মানুষ নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রতি বছর সমবেত ভাবে কয়েকদিনব্যপী আচরণ পালনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠী চেতনার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তারা আত্মার নিবিড়তায় পরস্পরকে আবদ্ধ করে তুলতো।

যুগ যুগ ধরে সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিশেষত সুন্দরবনাঞ্চলের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির নিম্নবর্গীয় দরিদ্র কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষগুলির জীবনকে লৌকিক দেব-দেবী প্রভাবিত করেছিলেন। শিব হয়ে উঠেছিলেন তাদের ঘরের দেবতা। তাই সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব্যপী অগণিত শিবমন্দির আর শিবের থান গড়ে উঠেছে। শিব এই মানুষগুলির জীবনে হলধর রূপে অবির্ভূত হয়েছেন। এখানকার অধিকাংশ জায়গায় লিঙ্গরূপী শিব পূজিত হন। শিব ও শিবানীর অভিন্নতা রূপের প্রকাশ এটি। শিব সৃষ্টির দেবতা, সংহারের দেবতা, উৎপাদন ও প্রজননের প্রতীক এবং শিবানী বসুমাতা ধরিত্রী, যেখানে উৎপাদন হয়। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সুন্দরবনাঞ্চল অধ্যুষিত বিশেষত কৃষিনির্ভর দরিদ্র মানুষগুলির জীবনে শিবকেন্দ্রিক গাজন নামক শস্য উৎসবটি ছিল চৈত্র মাসে পুরাতন বছরের শেষ ও নতুন বছরের প্রারম্ভের সন্ধিক্ষণে আগত বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনার উৎসব। এই উৎসবটিকে মনে করা হত শিব-পাবর্তীর বিবাহ উৎসব। সেখানে শিবভক্ত সন্ন্যাসীর দল

অনুগামী বরযাত্রী। চারদিনব্যপী নানান আচরণ পালনের সাথে সাথে শিবমাহাত্ম্যসূচক ধ্বনি ও গান করা হয় এই উৎসবে। গাজন আদিম একটি উৎসব। অন্ধবিশ্বাস, সংশয়, উদ্বেগ থেকে এখানকার আদিম অধিবাসীগণ আস্থা রেখেছিলেন লৌকিক দেব-দেবীর উপর। তাই লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক এই উৎসবের মধ্যে নিহিত থাকে আদিম সংস্কার। চৈত্রমাসের শেষে চারদিনব্যপী গাজন উৎসবের উন্মাদনায় একসময় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ হিন্দু এলাকাগুলি উদ্বেলিত হয়ে উঠত। ২৬শে চৈত্র স্নানের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ভক্তরা। ২৭শে চৈত্র থেকে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত নানান আচরণ, রীতি-নীতি পালন করা হয়। পয়লা বৈশাখের দিন উত্তরীয় কেটে পুকুরের মাটিতে স্থাপিত করে, স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে আমিষ আহারের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসেন নিজ গোত্রে। সম্পন্ন হয় গাজন উৎসবের। কৃষি নির্ভরশীল মানুষগুলির সারা বছরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করত শস্য উৎপাদনের উপর। তাই নতুন বছরের সূচনায় পালিত হওয়া শস্য উৎসবের সাথে মিশে থাকত এই মানুষগুলির ভক্তি ও নিষ্ঠা।

অন্যদিকে গ্রাম জীবনে থাকে বিনোদনের অভাব। বিনোদনের জন্য ব্যয় করার মতো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেরও অভাব ছিল যথেষ্ট। গাজন উৎসবের শেষদিন রাত্রে সারারাত্রিব্যপী অনুষ্ঠিত হত মনোরঞ্জনমূলক পালা অভিনয়। এই গাজনপালা অভিনয় ছিল গ্রামের মানুষের কাছে অন্যতম বিনোদনের অঙ্গ। চৈত্র মাসের শুরুতে গ্রামের অধিবাসীগণ নিজেদের মধ্যে থেকে অভিনেতা, বাদ্যকার, নির্বাচন করে দল তৈরি করত। সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী বহির্ভূত মানুষ সকলেই এতে অংশগ্রহণ করত। এরপর গ্রামেরই কারও বাড়িতে বা নাটমন্দিরে একমাস ধরে চলত গাজনের মহড়া। গাজন উৎসবের শেষ দিনে হত পালা অভিনয়। গাজন উৎসবের এই গাজনপালা নামক লোকনাট্যটি ছিল গ্রামের মানুষের শিল্পচর্চার এক বিশেষ মাধ্যম। ক্রমে ক্রমে গাজন উৎসব থেকে আলাদা হয়ে গাজন লোকনাট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানে স্থানে তৈরি হয় গাজনদল। দিনবদলের সাথে জনপ্রিয়তা বর্ধিত হওয়ায় গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত গাজনদল গড়ে ওঠে একসময় তাতে যুক্ত হয়েছে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। রূপ নিয়েছে পেশাদারি গাজনদলের। বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অসংখ্য, পেশাদারি গাজনদল গড়ে উঠেছে ও তাদের কার্যালয় (গদিঘর) নির্মিত হয়েছে। অর্থ যশ, জনপ্রিয়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিয়োগ হয়েছে দলের তত্ত্বাবধায়ক, নির্দেশক, পরিচালক, বাদ্যকার, পালাকার, আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রক এবং আরও নানান সদস্য। ক্রয় করা হচ্ছে পালা। নির্মিত হয় মঞ্চ। দেশীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের সাথে যুক্ত করা হয় আধুনিক, পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র। সাজসজ্জা থেকে প্রসাধন সমস্ত কিছুতেই এই বদল ঘটেছে। বদল ঘটেছে পালার গানের ভাষায়, সুরে, সংলাপে। তেমনি বদল ঘটেছে চরিত্র নিমার্ণে, বিষয় বৈচিত্র্যেও। মানুষের রুচি ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পালা নির্মাণ, গানের সুরারোপ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আরও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, টিকিটের ব্যবস্থাও হয়। এখন কোনও পূজা বা মেলাকে কেন্দ্র করে বা কেবলমাত্র বিনোদনের জন্যও গাজনের আসর বসে। কেবলমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই অনুষ্ঠিত হয় গাজনপালার আসর। তাই বলা যায়

আজ গাজন কেবলমাত্র উৎসব নয় ক্রমে সে নিজেকে লোকনাট্য ও শিল্পচর্চার মাধ্যমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আদিতে আঞ্চলিক গায়েনরা শিব-দুর্গার সঙ সেজে গাজনগান পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দান করতেন। বিনিময়ে প্রাপ্তি হত চাল, ডাল, সব্জি, সামান্য অর্থ প্রভৃতি দ্রব্যাদি। ক্রমে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সংযোগের ফলে গাজনে গানের বৈশিষ্ট্য ও ভাবনায় পরিবর্তন ঘটেছে। সময়ের বদলে গাজনপালার বিষয়বস্তুতেও দেখা দিয়েছে আধুনিকতা। দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পড়েছে সামাজিক প্রভাব। সম্পূর্ণ দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের অনেকাংশেই স্থান করে নিয়েছে বাস্তব জীবনের ঘটনা। সংলাপ, গান ও ছড়ার মাধ্যমে দেব-দেবীর বন্দনার পাশাপাশি সামাজিক কাজের নানান অসঙ্গতি, দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষপাত ছাড়াও নানান সামাজিক চিন্তাভাবনা এর গানগুলিতে প্রকাশ পায়। ক্রমশ দেব-দেবীর পাশাপাশি মানব চরিত্রও স্থান পেয়েছে। তাদের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক সম্পর্কিত কাহিনি ও সমস্যাগুলি সংলাপ, গান, নাচের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। আশেপাশে ঘটমান কোনো বিষয় বা ঐ এলাকাতেই ঘটে যাওয়া কোন বিষয়কে অবলম্বন করে নির্মিত হয় এই সকল কাহিনি। চারপাশের চরিত্রগুলি থেকেই নির্বাচন করে নেওয়া হয় কাহিনির চরিত্রদের। এতে গাজনপালাগুলি মানুষের কাছে আরও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। চতুর্পাশ্বের সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়গুলি অবলম্বন করে নির্মিত পালা কাহিনিগুলিতে নিখাদ হাস্যরস ও রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের সমস্যা, অবক্ষয়িত রূপ, জটিল বিষয় ও অন্ধকার দিকগুলিকে গ্রাম্য নিরক্ষর মানুষগুলির সামনে উপস্থাপন করা হয়। যার মাধ্যমে তাদেরকে ঐ বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবিত করা হয় এবং সমস্যাগুলির প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই ভাবেই সময়ের সাথে সাথে গাজনপালাগুলির বিষয় ও চরিত্রে বদল এলেও তার মধ্যে প্রকাশ পায় সমকালীন সমাজের চিত্র। বর্তমানে গাজনপালাগুলির বিষয় ও চরিত্রগুলি অনেকাংশেই বাস্তবধর্মী। এর আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ। তাই সহজেই দর্শককে তা আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে এবং বিষয়বস্তু মানুষের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। বহু বছর ধরে অগণিত মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত গাজনপালাগুলি এবং তার অভিনেতাদের সহজ, সরল, প্রাণের আবেদনময় পরিবেশনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম্য নিরক্ষর বা স্বল্প স্বাক্ষরিত মানুষগুলির মনে ও জীবনে এক বিশাল ব্যাপকতায় পক্ষবিস্তার করে। নৃত্য-গীত মূর্ছনা ও সংলাপে গাঁথা ওই লোককাহিনিগুলির পরতে-পরতে রয়েছে এই সমাজের মানুষের জানা, অজানা, বাস্তব নানান বিষয়। তাই এই প্রবহমান, সংস্কৃতিটি জীবন্ত মনুষ্য সমাজকে উদ্দীপিত করে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির শিক্ষা ও চেতনার জন্য লোকনাট্য গাজন অপরিহার্য। যুগ যুগ ধরে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের সাথে সে নিজেকে ছন্দ মিলিয়ে চলেছে। আজও চলছে। তাই তার বিষয়েও সে প্রভাব প্রতীয়মান। মূলত দেব-দেবীমূলক কাহিনিগুলি তাই আজ অনেক বেশি জীবনকেন্দ্রিক। ধর্মচেতনার পাশাপাশি গোষ্ঠীচেতনা, সংস্কৃতিচেতনা এবং গ্রামজীবনের বাস্তব সমাজ চেতনা সেখানে স্থান পেয়েছে। গ্রামীণ সমাজ আজ এমন এক মাধ্যমের পুনরাবিষ্কার করেছে যা তার একান্ত নিজস্ব

এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। লোকসংস্কৃতি আমাদের গ্রামীণ সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করে। গাজনপালাগুলিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পালাকারেরা যে সৌন্দর্য উৎঘাটিত করেন তা মাতৃভূমির প্রতি তাদের ভালোবাসার উৎসস্বরূপ। এর অভিনয়ের ভাষা এখানকার মানুষেরই প্রচলিত মৌখিক ভাষা ফলে দর্শক মনে তা সহজেই গ্রহণযোগ্য এবং স্থায়ী হয়। তাই ঐ অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির জীবনে এটি সহজেই শিক্ষার একটি মাধ্যম হয়ে উঠতে পেরেছে। মনোরঞ্জনের পাশাপাশি এটি গণশিক্ষার একটি বাহন। এছাড়া সঙ্গীত ও নৃত্য সহজেই যেহেতু মানুষের কাছে মনোগ্রাহী হয় তাই আনন্দের পাশাপাশি এগুলিও শিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠতে সহায়ক হয়। গাজনপালাগুলিতে হাস্যরস মিশ্রিত বিনোদনমূলক উপাদানের মধ্য দিয়ে সমালোচনা পরিহাস, সচেতনতাবোধ জাগরণের প্রাধান্য বিস্তার করে। স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং অন্যান্য প্রচারমূলক বিষয়ও গাজনপালায় অংশত নিহিত রাখেন পালাকারেরা। পরিবার থেকে সমাজ অতিক্রম করে রাষ্ট্র সমস্ত বিষয়ের জনসচেতনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিক্ষেপ করা হয় গাজনের পালাকাহিনিতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অগণিত শিল্পী রয়েছেন যারা আপন প্রতিভাবলে ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে পালাগানগুলি রচনা ও পরিবেশন করেন। তাদের কল্পনা, আদর্শ, জীবনবোধ, ভবিষ্যতের বিকাশ পন্থা, তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাদের সৃষ্ট পালাগানসমুহে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষগুলির কাছে কোনো শিক্ষামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম এই গাজনপালাগানগুলি। পালাকারেরা এর মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে সমাজ সচেতনতা বোধ জাগ্রত করা, সমাজ সংস্কার করার কাজটি করে চলেছেন।

তবে গাজনপালার মধ্যস্থ সঙ্গীতগুলিকে পোশাদার রচয়িতার বদান্যতায় ও ব্যবসায়িক স্বার্থে রচিত হওয়ায় সেখানে গাজনপালাগানের ঐতিহ্যবাহী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুপস্থিত। যুগের দাবি মানতে গিয়ে, ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে পরম্পরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কিন্তু গাজনের সুরে পড়েছে তথাকথিত যুগের প্রভাব। আধুনিক কথা ও সুর, আধুনিক পশ্চিমী বাদ্যযন্ত্র দ্বারা যে পরিবেশনা বর্তমানে হচ্ছে তা ঐতিহ্যানুযায়ী পরিবেশনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তথাকথিত নতুনত্বের মোহে, যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে ধ্বংস হচ্ছে পরম্পরা, বিসর্জিত হচ্ছে লোকঐতিহ্যের। দলমালিকের পছন্দ অনুযায়ী গীতিকার এগুলি রচনা ও সুর করেন। শিল্পীর স্বাধীনতা সেখানে তুচ্ছ। যশ, অর্থ লাভ সেখানে মুখ্য। লোকঐতিহ্য বজায় রাখা তাদের কাছে অর্থহীন বিষয়। লোকসংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে গ্রামের সমাজের, মানুষের রুচির পরিবর্তনের সাথে ছন্দ মিলিয়ে চলে। গাজনেও সেই বদল ঘটেছে। যুগের সঙ্গে পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়েই তার এই পরিবর্তন। বর্তমানে শহুরে যাত্রা ও চলচ্চিত্রের, গ্রামীণ সংস্করণ গাজনপালায় পরিলক্ষিত হয়। পরিবেশনার সাথে যাত্রার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পালা অভিনয়ের শুরুর পূর্বে বাদ্যের কনসার্ট, পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনির অগ্রসরতা, কাহিনিতে আদি-মধ্য-অন্ত্য বিভাজন, নৃত্য প্রভৃতি। যাত্রার অনুসরণে ছোট ছোট কাহিনি

পরিবেশনের মাধ্যমে তা রূপ নিয়েছে আধা যাত্রা আধা গাজনের। অধিকতর উপার্জন বা মুনাফার উদ্দেশ্যেই এই রূপরীতি বদল।

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির হারানো ঐতিহ্য ও সৃষ্টিশীল নিদর্শনগুলি লোকঐতিহ্য ধারায় বিবর্তিত হয়ে চলেছে যুগে যুগে। যেমন ভাবে বিবর্তিত হয়েছে গাজনপালার মধ্যস্থ লোকঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলিও। বর্তমান আধা যাত্রা আধা গাজনরূপ এই পালাগুলির নির্মাতাদের মধ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মনে শিল্পের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই। নেই লোকসংস্কৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা। শিল্পের প্রতি প্রয়োজন শিল্পীর তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকার, অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকার। দর্শক মনে ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা অপেক্ষা নাগরিক সংস্কৃতি ও গতানুগতিকতার মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ বেশি। বিশ্বায়নের যুগে আড়ম্বরের প্রতি আকর্ষণ পণ্যের বৈচিত্র্যের প্রতি মুগ্ধতা, জগত ও জীবনের নশ্বরতার সমস্ত উপকরণে বিমুগ্ধ হয়ে লোকশিল্পের মুগ্ধতার পাশাপাশি তার প্রতি দ্বিচারিতা করে চলেছে মানুষ। অপরদিকে পরিবর্তনশীলতাই সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম। আর পরিবর্তনশীল সমাজের মানুষের পক্ষে স্থানু হয়ে থাকাও অসম্ভব। তাই পারিপার্শ্বিক রূপান্তর ও পরিবর্তনের প্রয়োজনে ও প্রভাবে লোকসংস্কৃতির বিষয় ও আঙ্গিকে বদল সম্ভব কিন্তু একেবারে বিলুপ্তি অসম্ভব।

সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজনশিল্পী, কলাকুশলী, পালাকার, মালিক, তত্ত্বাবধায়ক সর্বজনই অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। শিল্পীরা অত্যন্ত প্রতিভাবান হওয়ার কারণে এই প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম হন। যেহেতু বর্ষাকালে যাতায়াত ও অনুষ্ঠান করার অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে তাই দলগুলি ঐ সময় অনুষ্ঠান বন্ধ রাখেন। সেই সময় কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ অন্য উপায় অবলম্বন করেন। সুতরাং এটাই এদের সারা বছরের মূল আয় এবং তার পরিমাণও বিশেষ নয়। তবুও এরা এই পেশায় যুক্ত রয়েছেন আসলে এর সাথে মিশে আছে আবেগ। গাজনের প্রতি ভালোবাসা। সেজন্যই কেউ কেউ বংশ পরম্পরায় এই পেশায় এলেও কেউ কেউ আবার বংশগত পেশা ত্যাগ করে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় স্ব-উদ্যোগে এই পেশাকে নির্বাচন করেন। গ্রামেই গাজনের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। যদিও জনপ্রিয়তার নিরিখে গ্রামে ও নগরে সার্বিকভাবে অন্যান্য বিষয়ের কাছে এই অনুষ্ঠানটির বিস্তর তারতম্য তবুও শিকড়ের টানে, প্রাণের আবেগে, অন্তরের আন্তরিকতায় এই মানুষগুলি আজও গাজনপালা করে চলেন। যদিও তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই দুর্বল, সামাজিক গুরুত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ তবুও তারা গতিশীল। কেবলমাত্র জীবন ধারনের প্রয়োজনে নয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে এই পথে এগিয়ে চলেছেন। সমাজ এদের কাছে কৃতার্থ। প্রাণের আবেগের কারণেই এই গ্রামীণ বিনোদন নামক শিল্পসংস্কৃতির চর্চা করতে পারেন আর এই কারণেই এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। অভিনেতা ও শিল্পীরা যে সসম্মানে অভিনয় করে চলেছেন আসলে শহরতলি থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে তারা যে সম্মান, যশ, ভালোবাসা, অর্জন করেন সেটাই তাদের সাফল্য। তাতেই তাদের আনন্দ, সার্থকতা। আর সম্মান, ভালোবাসা অর্জন

করার পরও তারা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেন। এটাই তাদের বিশেষত্ব। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় দরিদ্র এই মানুষগুলিই এদেশের গাজন উৎসব ও শিল্পকে নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই ভাবেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকনাট্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন এই নিম্নবর্গীয় মানুষগুলি।

পরিশিষ্ট-১

সমীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র

সাক্ষাৎকার: গাজনদল

তারিখ:
গাজনদলের নাম:
দলের ঠিকানা:
গ্রাম:
থানা ও পোষ্ট অফিস:
জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগণা
পিন:
দলের বয়স:
দলের মালিকের নাম:
দলে মোট কতজন সদস্য রয়েছেন:
কতজন অভিনেতা রয়েছেন:
অভিনেতাদের নাম:
অভিনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন কে রয়েছেন দলে:
দলের সাথে কত টাকার চুক্তি:
দলে কোন শিশু বা মহিলা আছে: হ্যাঁ/না
তার নাম:
কত বছর দলে আছে:
দলের সাথে কত টাকার চুক্তি:
গত বছর যে পালা অভিনয় হয়েছিল তার নাম:
গত বছরের পালাকার:
পরিচালক:
নির্দেশক:
এ বছরের পালাগুলোর নাম:
এ বছরের নির্দেশক:
নির্দেশকের বেতন:
কোনো ভিন্নধর্মী শিল্পী রয়েছেন: হ্যাঁ/না
দলটি কোথায় অনুষ্ঠান করে:
আর কোথাও অনুষ্ঠান করে: হ্যাঁ/ না
প্রথম কবে অনুষ্ঠান হয়:
কি কি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হয়:
কোথাও টিকিটের বিনিময়ে অনুষ্ঠান করেন: হ্যাঁ/না
মহড়া কবে থেকে শুরু হয়:
কোথায় হয়:
নির্দিষ্ট কি কোন জায়গায় প্রতি বছর প্রথম অনুষ্ঠান হয়: হ্যাঁ/না
কবে শেষ অনুষ্ঠান করে:
কি কি পুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করার জন্য ডাকা হয়:

বর্ষাকালে এনারা কি করেন:
এদের পড়াশোনা কত পর্যন্ত:
সব থেকে বেশি শিক্ষিত কে:
কতদূর অবধি পড়াশোনা করেছেন:
এদের সন্তানদের এনারা কতদূর পর্যন্ত পড়াশোনা করাতে চান:
এই পেশায় এদের আসার কারণ:
এনারা অন্য কোথাও অভিনয় করেছেন:
অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে দলে থাকবে:

সাক্ষাৎকার: আহ্বায়ক

তারিখ:
সংগঠকের নাম:
বয়স:
ফোন:
ঠিকানা:
কেন এই পেশায়:
কতজন শিল্পী বা কতগুলি দলের সাথে যুক্ত রয়েছেন:
যাদের কাছ থেকে অর্থ পেয়ে থাকেন: শিল্পী/দল/ক্লাব
অর্থের পরিমাণ:
দলের মালিকের সাথে কোনো চুক্তি থাকে: হ্যাঁ/না
কাজের অঞ্চল:
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সাক্ষাৎকার : দল

তারিখ:
গাজনদলের নাম:
দলের বয়স:
দলটির আগে অন্য কোন নাম ছিল: হ্যাঁ/না
কি নাম ছিল:
কোথায় অনুষ্ঠান করত:
দলের মালিকের নাম:
ফোন:
আগে অন্য কোন মালিক ছিল: হ্যাঁ/না
তার নাম:
দলে মোট কতজন সদস্য রয়েছেন:
কতজন শিল্পী রয়েছেন:
কতজন বাজনাদার রয়েছেন:
কোনো ভিন্নধর্মী শিল্পী রয়েছেন: হ্যাঁ/না

সদস্যদের বেতন যেভাবে নির্ধারণ করা হয়:
দলটি কোথায় কোথায় অনুষ্ঠান করে:
বেশি অনুষ্ঠান হয় যে অঞ্চলে:
প্রথম কবে অনুষ্ঠান হয়:
কি কি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হয়:
দলের বাৎসরিক খরচের পরিমাণ:
গত বছরের পালার নাম:
এই বছর যে সব পালাগুলি পরিবেশন হচ্ছে:
পালাকার:
পালাগুলির ক্রয়মূল্য:
কোথাও টিকিটের বিনিময়ে অনুষ্ঠান করেন: হ্যাঁ/না

সাক্ষাৎকার: শিল্পী

তারিখ:
নাম:
বয়স:
ঠিকানা:
ফোন:
কোন দলে রয়েছেন:
কতদিন ধরে রয়েছেন:
দলের সাথে কোনো চুক্তি আছে: হ্যাঁ/না
আগে কোন দলে ছিলেন: হ্যাঁ/না
কি কাজ করতেন:
বেতন ছিল:
এখন যে কাজ করেন:
এখন বেতন পান:
পারিবারিক পেশা:
পরিবারের সদস্য সংখ্যা:
বিবাহিত/অবিবাহিত:
সন্তান:
শিক্ষাগত যোগ্যতা:
আর লেখাপড়া না করার কারণ:
এই পেশাকে নির্বাচন করার কারণ:
দলে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করায় স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া:
বর্ষার সময়ে কি করেন:
কোন মঞ্চ/থিয়েটার/সিনেমাতে অভিনয় করেছেন: হ্যাঁ/না
সুযোগ পেলে করবেন: হ্যাঁ/না
অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে দলে থাকবেন: হ্যাঁ/না
বাড়ির শিশুদের ভবিষ্যতে এই পেশায় আনার ইচ্ছা আছে: হ্যাঁ/না

কত বছর বয়স পর্যন্ত এই পেশায় কাজ করতে চান:

এই পেশায় থাকাকালীন কোনো সমস্যা:

সরকারি কোনো সাহায্য পান: হ্যাঁ/না

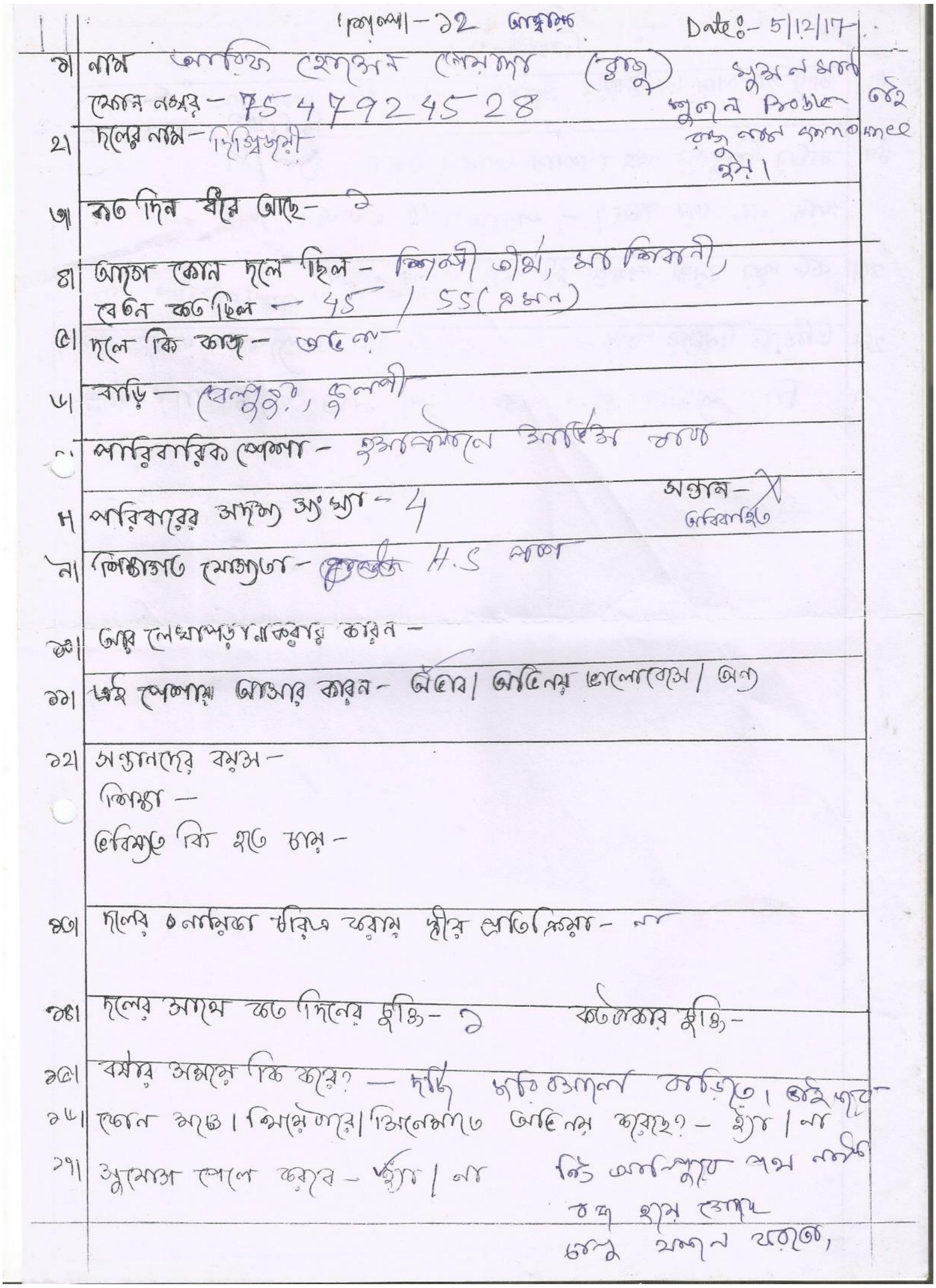
সংখ্যা – ১২ আহবায়ক Date:- 5/12/17

১। নাম – [illegible] (রাজু) [illegible]

ফোন নম্বর – 7547924528

২। দলের নাম – দিগ্বিজয়ী [illegible]

৩। কত দিন ধরে আছে – ৭

৪। আগে কোন দলে ছিল – শিল্পী তীর্থ, মা শিবানী,

বেতন কত ছিল – 45 / 55 (প্রধান)

৫। দলে কি কাজ – অভিনয়

৬। বাড়ি – [illegible]

৭। পারিবারিক পেশা – [illegible]

৮। পরিবারের সদস্য সংখ্যা – 4 সন্তান – X অবিবাহিত

৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা – H.S পাশ

১০। আর লেখাপড়া না করার কারন –

১১। এই পেশায় আসার কারন – অভাব / অভিনয় ভালোবেসে / অন্য

১২। সন্তানদের বয়স –

শিক্ষা –

ভবিষ্যতে কি হতে চায় –

১৩। দলের নায়িকা চরিত্র করায় স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া – না

১৪। দলের সাথে কত দিনের চুক্তি – ৭ কত টাকার চুক্তি –

১৫। বসার সময়ে কি করে? – দর্জি [illegible]

১৬। কোন যাত্রা / থিয়েটার / সিনেমাতে অভিনয় করেছে? – হ্যাঁ / না

১৭। সুযোগ পেলে করবে – হ্যাঁ / না [illegible]

শিল্পী - 2

১৮। অন্য জায়গায় তালিমের সুযোগ পেলে হলে থাকবে? – [illegible], [illegible]

১৯। বাড়ির শিশুদের এই পেশায় আনার ইচ্ছা – হ্যাঁ / না

যদি না, তবে কেন? – [illegible]।

২০। কত বছর বয়স পর্যন্ত এই কাজ করবে – [illegible]

২১। ভবিষ্যতে নিজের স্বপ্ন – [illegible]

[illegible]।

[illegible]

সাক্ষাৎকার: দলের মালিক

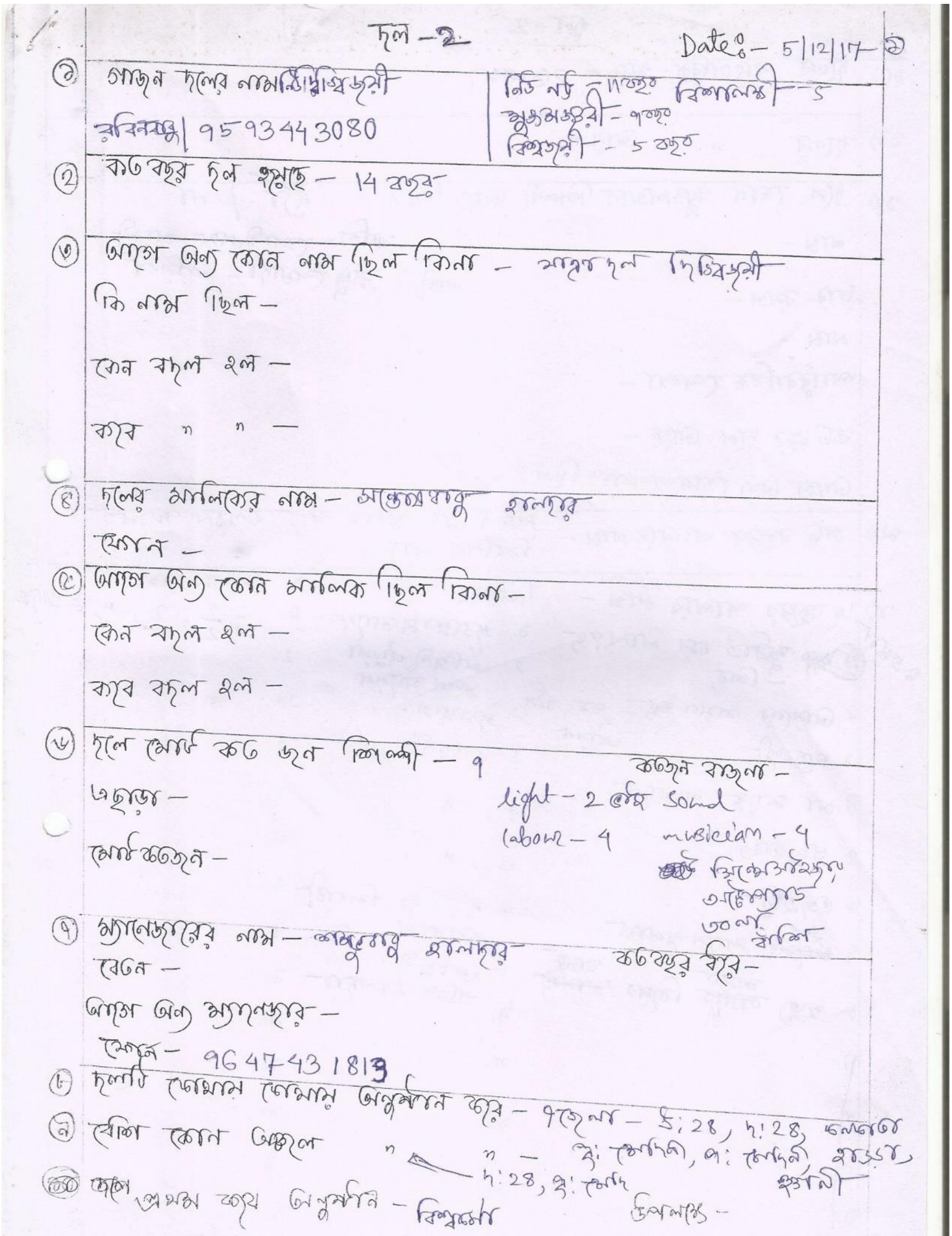
দল – ২
Date:– 5/12/17 – ②

① গাজন দলের নাম– ত্রিদিবজয়ী
রবিনবন্ধু | 9593443080
নিউ নট্ট – ৭ বছর বিশ্বাসলক্ষ্মী – ৫
শুকসঞ্জরী – ৭ বছর
বিশ্বজয়ী – ৫ বছর

② কত বছর দল হয়েছে – 14 বছর

③ আগে অন্য কোন নাম ছিল কিনা – আগে দল ত্রিদিবজয়ী
কি নাম ছিল –
কেন বদল হল –
কবে " " –

④ দলের মালিকের নাম – সন্তোষবাবু হালদার
ফোন –

⑤ আগে অন্য কোন মালিক ছিল কিনা –
কেন বদল হল –
কবে বদল হল –

⑥ দলে মোট কত জন শিল্পী – ৭
কতজন বাজনা –
এছাড়া – light – 2 জন sound
labour – 4 musician – 4
মোট কতজন –

⑦ ম্যানেজারের নাম – অনুকূল হালদার
বেতন – কতবছর ধরে –
আগে অন্য ম্যানেজার –
ফোন – 9647431813

⑧ দলটি মোটামুটি কোথায় অনুষ্ঠান করে – ৭ জেলা – দ: 24, উ: 24, মেদিনীপুর
⑨ বেশি কোন অঞ্চলে " " – পূ: মেদিনী, প: মেদিনী, হাওড়া, বর্ধমান
দ: 24, পূ: মেদ

⑩ দলে প্রথম কবে অনুষ্ঠান – বিশ্বকর্মা
উপলক্ষ্য –
কি কি উপলক্ষ্য – শীতলা, কার্তিক,

দল – 2

১০) দলের বাৎসরিক খরচ – ২৫ লক্ষ।

১১) দলের " আয় –

১২) দলে কোন মুসলমান শিল্পী আছে কি? – হ্যাঁ / না

নাম – বাঁশি – [illegible] আলী

~~[illegible]~~ " রাজু [illegible] – [illegible]

তার বয়স –

নাম –

পারিবারিক পেশা –

কত বছর দলে আছে –

আগে অন্য কোন পেশা ছিল? –

১৩) গত বছরের পালার নাম – [illegible] সিঁদুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

১৪) এ বছরের পালার নাম – লিখেছে – পালার দাম

পালার নাম	লিখেছে	পালার দাম
১. [illegible] চলে লাল রক্ত – শিব,	১. জগন্নাথ [illegible]	১. ১½, ২, ৩, ৫ হাজার
2. [illegible] আসল [illegible] – [illegible] আসল	2. অশ্বিনী [illegible] স্বপন [illegible]	2.
৩. [illegible]	৩. জগন্নাথ "	৩.
৪. মা [illegible] [illegible]	৪. অশ্বিনী	৪.
৫. [illegible]	৫. "	৫.
৬. [illegible] –	৬. "	৬.
৭. ~~[illegible]~~ মীর [illegible]	৭. অমূল্য শিকারী জগন্নাথ	৭.
৮. [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] ~~[illegible]~~	৮. অশ্বিনী – রবিন [illegible]	৮.
৯.	৯.	৯.
১০.	১০.	১০.
১১.	১১.	১১.
১২.	১২.	১২.
		১.

দল – ৩

১৫) এ বছরের নির্দেশক / পরিচালক – অশ্বিনী, জয়ন্ত নাইয়ার, লক্ষ্মীকান্ত পণ্ডিত, ছোটু নাইয়ার, অজয় অঙ্গুলি।

কত টাকা নিয়েছে –

---

১৬) তোমাকে টিকিট ব্যবস্থা হয়? – হ্যাঁ / না

কোথায় – জাজিং, আজাদহিন্দ ফুটবল খেলার মাঠ, বেলা 16th Place

দাম কত – 20/25/30   5 হাজার ticket sell

কত বছর ধরে – 5 বছর ছিল – 14 বছর

---

১৭) দলে সবচেয়ে পুরাতন শিল্পী – অশ্বিনী (40 age)

কত বছর ধরে – 10–11

বেতন কত? – 4½ লাখ

---

১৮) দলে শিশু আছে – হ্যাঁ / না   নাম –

কার সন্তান –

বয়স –

পড়াশোনা –

ভবিষ্যত – এই পেশায় – হ্যাঁ / না

কেন –

অন্য হলে কি হবে? –

অসুবিধা – ১) পুলিশ – 500/1000

২) বায়নার টাকা পুরোপুরি না দেওয়া

৩) অপমান – হুমকি

বায়না – ৫ হাজার

২০ –

সংখ্যা — ১৫ Date:- 5/12/17

১। নাম তরঙ্গিনী [illegible]

ফোন নম্বর — 9593789554

২। দলের নাম — ত্রিশক্তিভূমী

৩। কত দিন ধরে আছে — 10–11

৪। আগে কোন দলে ছিল — মা কালী অপেরা, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

বেতন কত ছিল —

৫। দলে কি কাজ — ১২/১৩ বছর

৬। বাড়ি — [illegible]

৭। পারিবারিক পেশা — [illegible] — [illegible]

৮। পরিবারের সদস্য সংখ্যা — ৫, মা, স্বামী সন্তান — ৩ ছেলে

৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা — ৭ পর্যন্ত

১০। তার লেখাপড়া না করবার কারন — [illegible] ভাল লাগেনি

১১। এই পেশায় আসার কারন — অভাব/ অভিনয় ভালোবেসে/ অন্য

১২। সন্তানদের বয়স — ১৩, ১১, ৭

শিক্ষা — VIII, V, Kg.

ভবিষ্যতে কি হতে চায় — লেখাপড়া,

১৩। দলের নায়িকা চরিত্র করায় স্বামীর প্রতিক্রিয়া —

১৪। দলের সাথে কত দিনের চুক্তি — কত টাকার চুক্তি —

১৫। বর্ষার সময়ে কি করে? গান শেখান

১৬। কোন সংস্থা/ সিরিয়াল/ সিনেমাতে অভিনয় করেছে? — হ্যাঁ / না

১৭। সুযোগ পেলে করবে — হ্যাঁ / না

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible], [illegible]

শিল্পী – 2

১৮। অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে চলে যাবেন? –

১৯। বাড়ির শিশুদের এই পেশায় আমার ইচ্ছা – হ্যাঁ / না

যদি না, তবে কেন? –

২০। কত বছর বয়স পর্যন্ত এই কাজ করবে –

২১। ভবিষ্যতে নিজের স্বপ্ন –

স্বাক্ষর – [illegible]

সাক্ষাৎগ্রহণ – সুবর্ণ মণ্ডল –

ভূমিকায় ম্যানেজার, মালিক।   ৪।১২।১৭

১। নাম — কালি হালদার (মালিক, ম্যানেজার)   বয়স — ৩৮
ফোন নম্বর — 7074927195

২। দলের নাম — আদি শিবশক্তি গাজন টীম

৩। কতদিন ধরে আছে — ১৪–১৫ গাজন   অভিনয় জীবন

৪। আগে কোন দলে ছিল — অভিনয় (পুরুষ — বাচ্চা বয়স ১০ বছর)
বেতন কত ছিল — [illegible]   এখন কত —

৫। দলে কি কাজ — অভিনয়, ম্যানেজার

৬। বাড়ি — [illegible]

৭। পারিবারিক পেশা/বাবার পেশা — চাষ   মাঝেমধ্যে গাজনবাজনা করত,

৮। পরিবারের সদস্য সংখ্যা — ৬   সন্তান — ৫ [illegible] ৩ [illegible]
বিবাহিত/ অবিবাহিত — [illegible]
১৪, ৯, ৭, [illegible]

৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা — VIII

১০। আর লেখাপড়া না করার কারণ — অভাব অনটন

১১। এই পেশায় আসার কারণ — অভাব/ অভিনয় ভালোবেসে/ অন্য

১২। সন্তানদের বয়স — [illegible]   [illegible]
শিক্ষা — [illegible]
ভবিষ্যতে কি হতে চায় —

১৩। দলের মেয়েলি চরিত্র করায় স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া — না

১৪। দলের সাথে কত দিনের চুক্তি — চুক্তি নেই। কতটাকার চুক্তি —
দল যত দিন থাকবে কাজ করবে।

১৫। বর্ষার সময়ে কি করে? — চাষ (২ বিঘা)

১৬। কোন মঞ্চ। সিরিয়াল। সিনেমাতে অভিনয় করেছে? — হ্যাঁ / না
ভিডিও করেছে।

১৭। সুযোগ পেলে করবে — হ্যাঁ / না

পাতা - ২

১৮। অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে চলে যাবেন? – না

১৯। বাড়ির শিশুদের এই পেশায় আনার ইচ্ছা – হ্যাঁ / না

যদি না, তবে কেন? –

২০। কত বছর বয়স পর্যন্ত এই কাজ করবেন – যতদিন / দল যতদিন থাকবে।

২১। ভবিষ্যতে নিজের স্বপ্ন –

রাণী হালদার

১। সংসারটি ভালো যদি চালানো যায়।

২।

রোঘুনাথপুর Set-2 2016 ৩

১. গাজন দলের নাম – হর গৌরী শীতলা গাজন সম্প্রদায়

২. কতদিন ধরে দল রয়েছে – ৩০ বৎসর

৩. আগে কোনো নাম ছিল কিনা – হ্যাঁ না

৪. কি নাম ছিল – X

৫. দলের মালিকের নাম – সন্দীপ মাঝি

৬. কতজন লোক দলে আছে – ২১ জন

৭. দলের মধ্যে অভিনয় করে কতজন – ১১ জন

৮. যারা অভিনয় করে তাদের নাম –

১/ বাপ্পা সরদার
২/ সোনা নস্কর
৩/ দুর্যোধন সরদার
৪/ শুভ হালদার
৫/ অমিত হালদার
৬/ বিকাশ মণ্ডল
৭/ রাজা পাইক
৮/ সুব্রত মুখার্জী
৯/ সোমনাথ পাইক
১০/ সন্তু সরদার
১১/ খোকন হালদার

৯. যারা অভিনয় করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন রয়েছে কে? বাপ্পা সরদার

১০. সে কত বছর ধরে দলে আছে ১৩ বৎসর

১১. তার সাথে দলের চুক্তি কত টাকার? ৩,৫০০ টাকা

১২. দলে কোন মুসলিম আছে কি? – হ্যাঁ না

১৩. সে কত বছর ধরে দলে আছে – X

2017 (২)

(১৪) মুসলমান লোকটির নাম ✗

(১৫) লোকটির বয়স — ✗ আগে কোন পেশা ছিল — ✗

(১৬) দলে কোন শিশু বা মহিলা আছে কিনা — হ্যাঁ না

(১৭) শিশু বা মহিলাটির নাম — ✗

বয়স — ✗

কত বছর দলে আছে — ✗

দলের আগে কত টাকার চুক্তি — ✗

(১৮) দলের ঠিকানা ✗

(১৯) গত বছর যে পালা অভিনয় হয়েছিল সেগুলোর নাম

১) পাগলিনী

২) হোলিখেলা

৩) তথ্য-খেলা

(২০) গত বছরের পালাগুলো যাদের লেখা —

নির্দেশক - বাপ্পা সরদার

পরিচালক - সন্দীপ মাঝি

৩

২০ এ বছরের পালার নাম –

২১ এ বছরের ছোট পালা গুলোর নাম

এ বছরের ছোট পালা গুলোর নাম	লিখেছে	পালার দাম
১ মহিষাসুর মর্দিনী	বাপ্পা সরদার	৭০০
২ সোনাসাগর	"	৫০০
৩ কালো-চাঁদ	পানু দলুই	৯০০
৪ সোনার জ্ঞান বুড়ি		৫০০
৫ তান্ত্রিক		৬০০
৬ ঢেলে তেল ঠাসা	হরি	১০০০
৭ লাবণ্য বুড়ি		৭০০
৮		
৯		
১০		
১১		
১২		

২২ এ বছরের নির্দেশক/পরিচালক – বাপ্পা সরদার
কত টাকা নিয়েছে –

২৩ দলটি কোথায় বেশি অনুশীলন করে – তাঁতিরহাটে, ঝাঁকা বেড়িয়া

২৪ দঃ ২৪ পরগনা ছাড়া আর কোথায় অনুশীলন করে – না

২৫ সবথেকে বেশি লোকের ভিড় হয় (জনপ্রিয়) কোথায়? – ঝাঁকা বেড়িয়া

২৬ টিকিটের ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ না ✓

২৭ কোথায় কোথায় টিকিটের ব্যবস্থা হয় – X

২৮ কত দিন এই টিকিট ব্যবস্থা চালু হয়েছে – X

২৯ কত টাকা দামের টিকিট? – X

2017 (৪)

(৩০) বছরে কবে থেকে মহড়া শুরু হয়? ১লা চৈত্র

(৩১) কবে প্রথম অনুষ্ঠান হয়? কি উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয়?

২৭-১১-১৪২৩ শিবের পূজা

~~কোথায়~~

(৩২) কোথায় হয়? – দক্ষিণ রঘুনাথপুর

(৩৩) নিমন্ত্রণ কি কোনো জায়গায় প্রতি বছর প্রথম অনুষ্ঠান হয়? হ্যাঁ - না

(৩৪) মেলি টাকা নিয়ে হয়? — হ্যাঁ — না

(৩৫) কবে শেষ অনুষ্ঠান করে? — ২৫-০১-১৪২৪.

(৩৬) কি কি পূজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করার জন্য ডাকা হয় –

১। শিব পূজো

২। গোষ্ঠ মেলা

৩। কালী পূজো

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

(৩৭) বর্ষা কাল এরা কি করে? বন্ধ

(৩৮) এদের পড়াশোনা কতদূর অবধি? উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক

সব থেকে বেশি শিক্ষিত কে? কতদূর অবধি? শুভ হালদার, উচ্চমাধ্যমিক

(৩৯) এদের ছেলেদের এরা কতদূর পড়াশোনা করাতে চায়?

ইচ্ছা অনুযায়ী

(৪০) এদের ছেলেদের এই পেশাতেই আনতে চায়? – হ্যাঁ – না

(৪১) এরা এই পেশায় কেন এলো? –

শখ / অভাব / চাষ আবাদ না হওয়া / অন্য কিছু

2017 (৫)

(৪২) ওরা অন্য কোন জায়গায় অভিনয় করছে কিনা? হ্যাঁ – না

যদি করে কোথায় করছে? – নাটক / থিয়েটার / সিনেমায়

(৪৩) অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে চলে যাবে? হ্যাঁ – না

সংগ্রহ করতে হবে –

১। কার্ড

২। লিফলেট

৩। বিজ্ঞাপনের Poster

৪। টিকিট

৫। মালিকের ফোন নম্বর – 8001180170/7699570321

অনিন্দিতা মামি

সাক্ষাৎকারঃ শিল্পী (পুরুষ চরিত্রাভিনেতা)

সাক্ষাৎকার: ১

তারিখ: ৮.১২.২০১৭

নাম: নরেশ অধিকারী

বয়স: ৫৫ বছর

ঠিকানা: শানকিজাহান

কোন দলে রয়েছেন: আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ

কতদিন ধরে রয়েছেন: ২ বছর

আগে কোন দলে ছিলেন: হ্যাঁ/না— না

আগে কি কাজ করতেন: জলসা, কীর্তন

বেতন ছিল: ২০-৩০ টাকা(২০-২৫ বছর আগে)

এখন যে কাজ করেন: হারমোনিয়াম বাজান, গান রচনা করেন, নির্দেশনা করেন

এখন বেতন পান: ১৮০-২০০ টাকা প্রতি রাত্রের পরিবেশনে

পারিবারিক পেশা: চাষ আবাদ

পরিবারের সদস্য সংখ্যা: ৪ জন

বিবাহিত/অবিবাহিত: বিবাহিত

সন্তান: ২টি [কন্যা (৩২ বছর, বিবাহিত), পুত্র (২৪ বছর, চাষ আবাদ করেন)]

সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: কন্যা ষষ্ঠ শ্রেণি ও পুত্র সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি অবধি

আর লেখাপড়া না করার কারণ: অনিচ্ছা

এই পেশাকে নির্বাচন করার কারণ: বিগত ৩০ বছর ধরে গাজন করছেন। নিজের গ্রামেই হত গাজন অনুষ্ঠান তাই ভালোবেসে একে গ্রহণ করেছিলেন।

বর্ষার সময়ে কি করেন: চাষ আবাদ

কোন মঞ্চ/ থিয়েটার/ সিনেমাতে অভিনয় করেছেন: হ্যাঁ/না— না

সুযোগ পেলে করবেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ

অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে দলে থাকবেন: হ্যাঁ/না—না

কত বছর বয়স পর্যন্ত এই পেশায় কাজ করতে চান: যত দিন সম্ভব হবে

এই পেশায় থাকাকালীন কোনো সমস্যা: সরকারি কার্ড না পাওয়া এবং সরকারি অনুষ্ঠানের সন্ধান না পাওয়া

সরকারি কোনো সাহায্য পান: হ্যাঁ/না—না

সাক্ষাৎকার: ২ **সাক্ষাৎকারঃ শিল্পী (নারী চরিত্রাভিনেতা)**

তারিখ: ৮.১২.২০১৭

নাম: শঙ্কর অধিকারী

বয়স: ৩০ বছর

ঠিকানা: শানকিজাহান

কোন দলে রয়েছেন: আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ

কতদিন ধরে রয়েছেন: ২ বছর

দলের সাথে কোনো চুক্তি আছে: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, ১ বছরের

আগে কোন দলে ছিলেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, গ্রামের চৈতে গাজন দলে

আগে কি কাজ করতেন: কীর্তন করতেন
এখন দলে যে কাজ করেন: নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন
এই দলের কয়টি ছকে অভিনয় করছেন: ৩টি ছকে
এই পেশায় আসার কারণ: এই পেশায় অর্থ উপার্জনের সুযোগ বেশি
পারিবারিক পেশা: চাষ
পরিবারের সদস্য সংখ্যা: ৪ ভাই ও তাদের স্ত্রী সন্তান সহ যৌথ পরিবার
বিবাহিত/অবিবাহিত: বিবাহিত
সন্তান: দুই কন্যা (বয়স: ১০ বছর ও দেড় বছর)
সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: বড় মেয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে
শিক্ষাগত যোগ্যতা: চতুর্থ শ্রেণি
আর লেখাপড়া না করার কারণ: আর্থিক অভাব
সন্তানদের ভবিষ্যত: পড়াশোনা করাতে চান
দলে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করায় স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া: স্বাভাবিক
বর্ষার সময়ে কি করেন: চাষ
কোন মঞ্চ/থিয়েটার/সিনেমাতে অভিনয় করেছেন: হ্যাঁ/না— না
সুযোগ পেলে করবেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ
অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে দলে থাকবেন: হ্যাঁ/না— না
বাড়ির শিশুদের ভবিষ্যতে এই পেশায় আনার ইচ্ছা আছে: হ্যাঁ/না। তারা এই পেশায় আসতে চাইলে আসবে
কত বছর বয়স পর্যন্ত এই পেশায় কাজ করতে চান: যত দিন পারবেন
এই পেশায় থাকাকালীন কোনো সমস্যা: সরকারী অনুদানের অভাব
সরকারি কোনো সাহায্য পান: হ্যাঁ/না— না

সাক্ষাৎকার: ৩ **সাক্ষাৎকারঃ তত্ত্বাবধায়ক**

তারিখ: ৮.১২.২০১৭
নাম: বাপি হালদার
বয়স: ৩৮ বছর
ঠিকানা: শানকিজাহান
কোন দলে রয়েছেন: আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ
কতদিন ধরে রয়েছেন: ১৪-১৫ বছর ধরে
দলের সাথে কোনো চুক্তি আছে: হ্যাঁ/না : না
আগে কোন দলে ছিলেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ
কি কাজ করতেন: অভিনয় করতেন, কীর্তন করতেন, করতাল বাজাতেন (১০ বছর বয়স থেকে)
এখন যে কাজ করেন: দলের ম্যানেজার
পারিবারিক পেশা: চাষ আবাদ
পরিবারের সদস্য সংখ্যা: ৭ জন
বিবাহিত/অবিবাহিত: বিবাহিত
সন্তান: ৫ কন্যা (বয়স যথাক্রমে : ৩ বছর, ৭ বছর, ৯ বছর, ১৩ বছর, ১৭ বছর)
সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: দ্বিতীয় শ্রেণি, তৃতীয় শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি ও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত

আর লেখাপড়া না করার কারণ: গান বাজনার প্রতি আগ্রহ
এই পেশাকে নির্বাচন করার কারণ: আর্থিক
বর্ষার সময়ে কি করেন: চাষ করেন (দু বিঘে জমি আছে)
কোনো মঞ্চ/থিয়েটার/সিনেমাতে অভিনয় করেছেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, কীর্তন করেছেন
সুযোগ পেলে করবেন: হ্যাঁ/না— না
বাড়ির শিশুদের ভবিষ্যতে এই পেশায় আনার ইচ্ছা আছে: হ্যাঁ/না। গাজন করায় আপত্তি রয়েছে তবে নাচ, গানের পেশাকে নির্বাচন করলে কোন আপত্তি নেই কিন্তু পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে
কত বছর বয়স পর্যন্ত এই পেশায় কাজ করতে চান: ক্ষমতা বা দল যতদিন থাকবে
এই পেশায় থাকাকালীন কোনো সমস্যা: সরকারি সাহায্যের অভাব
সরকারি কোনো সাহায্য পান: হ্যাঁ/না— না

সাক্ষাৎকার: ৪ **সাক্ষাৎকারঃ আহ্বায়ক**

তারিখ: ৫.১২.২০১৭
নাম: আরিফ হোসেন পেয়াদা (রাজু)
মুসলিম নামটি ঘোষণা করলে সমস্যা হতে পারে তাই রাজু নাম ঘোষণা করা হয়।
বয়স: ২২ বছর
ঠিকানা: বেলপুকুর, কুলপি
কোন দলে রয়েছেন: দিগবিজয়ী গাজনতীর্থ
কতদিন ধরে রয়েছেন: ১ বছর
দলের সাথে কোনো চুক্তি আছে: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ
আগে কোন দলে ছিলেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, শিল্পীতীর্থ গাজনদল, মা শিবানী গাজন সংস্থা
কি কাজ করতেন: অভিনয় করতেন
বেতন ছিল: ৪৫ হাজার বছরে
এখন যে কাজ করেন: অভিনয় করেন
এখন বেতন পান: ৫৫ হাজার
পারিবারিক পেশা: বাবা হাসপাতালে কাজ করতেন
পরিবারের সদস্য সংখ্যা: ৪ জন
বিবাহিত/অবিবাহিত: অবিবাহিত
সন্তান: নেই
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পাশ
আর লেখাপড়া না করার কারণ: আর্থিক অভাব
এই পেশাকে নির্বাচন করার কারণ: অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা
বর্ষার সময়ে কি করেন: দর্জির কাজ, জামা কাপড়ে জরি বসানোর কাজ
কোনো মঞ্চ/থিয়েটার/সিনেমাতে অভিনয় করেছেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, পথনাটক করতো নিউ আলিপুরে। বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। চালু থাকলে করতেন।
সুযোগ পেলে করবেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ
অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে দলে থাকবেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, নাটক, যাত্রার ভালো দল পেলে করবেন
বাড়ির শিশুদের ভবিষ্যতে এই পেশায় আনার ইচ্ছা আছে: হ্যাঁ/না— না ,বাড়ির শিশুরা যেন পড়াশুনা করে এগিয়ে যায়।

কত বছর বয়স পর্যন্ত এই পেশায় কাজ করতে চান: বিবাহ পর্যন্ত। বিয়ের পর হাসপাতালে কাজ করতে চান বা অন্য কোন কাজ করতে চান।
সরকারি কোনো সাহায্য পান: হ্যাঁ/না— না

সাক্ষাৎকার: ৫ **সাক্ষাৎকারঃ সহযোগি কর্মী**

তারিখ: ৫.১২.২০১৭
নাম: লখিন্দর পন্ডিত
বয়স: ৩০ বছর
ঠিকানা: শানকিজাহান
কোন দলে রয়েছেন: দিগবিজয়ী গাজন সংস্থা
কতদিন ধরে রয়েছেন: ১ বছর
দলের সাথে কোনো চুক্তি আছে: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, ১ বছরের
আগে কোন দলে ছিলেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ
কি কাজ করতেন: অভিনয়
এখন যে কাজ করেন: অভিনয় করেন সেই সাথে অন্যান্য শিল্পীদের দেখভালও করেন, পালা রচনা করেন।
এখন বেতন পান: এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা
পারিবারিক পেশা: চাষ, বাবা কীর্তন গান করতেন
পরিবারের সদস্য সংখ্যা: ৬ জন
বিবাহিত/অবিবাহিত: বিবাহিত
সন্তান: ২ টি, ১টি ছেলে ও ১টি মেয়ে (বয়স: সাড়ে পাঁচ বছর ও সাড়ে নয় বছর)
সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেজি ২ ও চতুর্থ শ্রেণি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত
আর লেখাপড়া না করার কারণ: লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহ
এই পেশাকে নির্বাচন করার কারণ: অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা
বর্ষার সময়ে কি করেন: টিউশন পড়ান। অন্যসময় স্ত্রী পড়ান, বর্ষার সময় স্ত্রীর সাথে ঐ কাজ করেন।
কোনো মঞ্চ/থিয়েটার/সিনেমাতে অভিনয় করেছেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, যাত্রা, নাটক করেছেন।
সুযোগ পেলে করবেন: হ্যাঁ/না। অর্থ বেশি পেলে করবেন। তবে যাত্রার দলে মহিলা থাকায় স্ত্রীর আপত্তি রয়েছে।
অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে দলে থাকবেন: হ্যাঁ/না— তখন ভেবে সিদ্ধান্ত নেবেন।
বাড়ির শিশুদের ভবিষ্যতে এই পেশায় আনার ইচ্ছা আছে: হ্যাঁ/না— না, তারা যেন পড়াশোনা করে।
কত বছর বয়স পর্যন্ত এই পেশায় কাজ করতে চান: যতদিন সম্ভব হবে।
এই পেশায় থাকাকালীন কোনো সমস্যা: আর্থিক পরিমাণ আরেকটু বেশি হওয়া প্রয়োজন
সরকারি কোনো সাহায্য পান: হ্যাঁ/না— না

সাক্ষাৎকার: ৬ **সাক্ষাৎকারঃ অভিনেতা ও নির্দেশক**

তারিখ: ৫.১২.২০১৭
নাম: অশ্বিনী নাইয়া
বয়স: ৪০ বছর
ঠিকানা: কুলতলি, মাধবপুর

কোন দলে রয়েছেন: দিগবিজয়ী গাজন সংস্থা

কতদিন ধরে রয়েছেন: ১০- ১১ বছর

দলের সাথে কোনো চুক্তি আছে: হ্যাঁ/না— না

আগে কোন দলে ছিলেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, মাকালী গাজন সংস্থা, মা মনসা গাজন সংস্থা, জগৎজয়ী গাজন সংস্থা, সঙ্গীতাঞ্জলী গাজন দল

কি কাজ করতেন: অভিনয়

এখন যে কাজ করেন: অভিনয় করেন, পালা রচনা করেন, নির্দেশিনা দেন

পারিবারিক পেশা: চাষ, বাবা গান বাজনা করতেন

পরিবারের সদস্য সংখ্যা: ৬ জন

বিবাহিত/অবিবাহিত: বিবাহিত

সন্তান: ৩টি ছেলে (বয়স: ৭ বছর, ১১ বছর ও ১৩ বছর)

সন্তানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেজি, পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নবম শ্রেণি

আর লেখাপড়া না করার কারণ: গানবাজনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ

শিক্ষাগুরু: মুকুন্দ মণ্ডল

এই পেশাকে নির্বাচন করার কারণ: অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা

বর্ষার সময়ে কি করেন: পালাগান রচনা করেন

কোনো মঞ্চ/থিয়েটার/সিনেমাতে অভিনয় করেছেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ, চিৎপুর যাত্রাদল ও কীর্তনীয়া দলে কাজ করেছেন

সুযোগ পেলে করবেন: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ

অন্য জায়গায় অভিনয়ের সুযোগ পেলে দলে থাকবেন: হ্যাঁ/না। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন

বাড়ির শিশুদের ভবিষ্যতে এই পেশায় আনার ইচ্ছা আছে: হ্যাঁ/না— হ্যাঁ

কত বছর বয়স পর্যন্ত এই পেশায় কাজ করতে চান: সারাজীবন

এই পেশায় থাকাকালীন কোনো সমস্যা: আর্থিক সাহায্যের অভাব

সরকারি কোনো সাহায্য পান: হ্যাঁ/না— না

পরিশিষ্ট-২

পালাকাহিনি

১। পৌরাণিক ছক (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা)

প্রথম পর্ব

'মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম'

সাজসজ্জা ও প্রসাধন

সাধু- কমলা ধুতি পাঞ্জাবি, মাথায় জটা, দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে তিলক মুখের প্রসাধন স্বাভাবিক।

শিউলির প্রবেশ- গোলাপী শাড়ি, ব্লাউজ

রানী শঙ্খমালা- লাল জমকালো শাড়ী, লম্বাচুল, গলায় অনেক সোনালী হার, কানে দুল, হাতে পলা, চুড়ি, কপালে লাল টিপ, কাজল, লিপস্টিক। মুখের প্রসাধন বেশি চড়া নয়।

রাজকুমার- বেগুনী ধুতি, মেরুন সিল্কের জামা, জরিদার, ওড়না, কোমর বন্ধনী, গলায় পুঁতির হার। কপালে সাদা টিপ, কোমরে তলোয়ার।

সাধুর প্রবেশ ও শিউলির মা-এর প্রবেশ

আবহে আওয়াজ আসতে থাকে—'বিচার চাই বিচার'।

সাধু ও শিউলির মা মঞ্চের দুপাশে পাশাপাশি দাঁড়ায় দর্শকদের দিকে মুখ করে।

শিউলির মা- "চাই অন্যায় অত্যাচারের বিচার। এই পৃথিবীতে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগে কেন অকালে গেল ঝরে? কেন নারী, আজও বলি হবে পুরুষের নির্মম অত্যাচারে? মোর পূর্ণ বক্ষ শূন্য হইল ভরিল হাহাকারে। হা ঈশ্বর! এই কি ছিল মোর অদৃষ্ট পরে?" (কান্না)

সাধু- "না, রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে মহাপাপ তাই শুরু হয়েছে অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার। পুরুষের অত্যাচারে নারী হয়েছে আজ ভোগের পন্য তাই বিচার চাই বিচার, চাই বিচার"।

রানী শঙ্খমালা- "কিসের বিচার? কার বিচার? পুরুষ ন্যায়ধর্মকে আশ্রয় করিয়া করিতেছে রাজ্য শাসন, সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করি। বলো কিসের বিচার?"

শিউলির মা- "মহারানী, মোর কন্যা শিউলিরে করিয়াছে ধর্ষণ। প্রমাণ গোপন করিতে দিয়াছে নির্মম মারন"।

রানী শঙ্খমালা- "তব কন্যা শিউলিকে করিয়াছে ধর্ষণ? কে সেই ধর্ষণকারী? দিলাম অভয়। তব কন্যা শিউলি কোথায়?"

শিউলির মা- জানতে চাও রানী মা? সে ধর্ষণকারী কে? সেই ধর্ষণকারী তব পুত্র রাজকুমার প্রত্যূষ"।

রানী শঙ্খমালা- "না, এ আমি বিশ্বাস করিনা। মম পুত্র প্রত্যূষ এত নীচ এত হীন কুকর্ম করিতে পারে না। কি বা প্রমাণ রহিয়াছে ঋষিবর বলো"।

সন্ন্যাসী- “প্রমাণ, প্রমাণ লইয়াছি আমি। মোর আশ্রম মুখে শিউলি করিতেছিল পুষ্পচয়ন। হঠাৎ রাজকুমার আসিয়া শিউলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বলপূর্বক করিল ধর্ষন। আর প্রমান লুকাইতে নির্মম ভাবে হানিল মারন”।

রাজকুমার প্রত্যূষের প্রবেশ।

রাজকুমার---(হাত জোড় করে) চমৎকার ঋষিযোগী। বৃথা করিয়াছ পূজার্চনা আর মিথ্যা তোমার তন্ত্র মন্ত্র”।

শিউলির মা- “মিথ্যা? না, ঋষি ব্যক্তিকে সবাই জানিয়াছে আজীবন সত্য, দেবতার পরে যার বিস্তার সেই ঋষিযোগী অধার্মিক? মিথ্যাবাসী উপস্থিত নিজের কুকর্ম ঢাকিতে ঋষিরে সাজাচ্ছে মিথ্যাচারী”।

রানী শঙ্খমালা- (শিউলির মাকে) “ঋষিবাক্য সত্য। দুবৃত্ত লম্পট মোর পুত্র প্রত্যূষ। রাজবংশে কালিমা করিলি লেপন। বল কেন করলি কুকর্ম বল?” (চড় মারে)

রাজপুত্র- “ওগো আমার সম্রাজ্ঞী মাতা বিশ্বাস করো হেন কুকর্ম আমি করিনাই। শুধু কর্মদোষে করিয়াছি অল্প করে প্রহার”।

রানী শঙ্খমালা- “আমি বুঝিয়াছি, ঋষিবর তোরই নামে দিচ্ছে মিথ্যা অপবাদ”। ঋষি- “ধন্য---মাতা, ধন্য তব বিচার---প্রত্যূষে অন্ধ হয়ে করিলে অবিচার? রানী শঙ্খমালা তব পুত্র বলো দিকি তব পদ স্পর্শ করি সত্য কথা বলিতে। তব পুত্র বলো দিকি মোর পদ স্পর্শ করি সত্য কথা বলিতে। তাহলে আমি জানিব আমি মিথ্যাবাদী। আমি মিথ্যাভাষী”।

রানী শঙ্খমালা- “প্রত্যূষ---যদি ঋষিবাক্য করিতে পারিস পালন তবে রক্ষা পাবে তোর জীবন”।

রাজকুমার- “ওগো আমার সম্রাজ্ঞী মাতা তব পদ ছুঁয়ে আমি বলছি হেন কুকর্ম আমি করি নাই”।

শিউলির মা- “হা ঈশ্বর! বজ্র হানো মোর মস্তকে”।

রানী শঙ্খমালা- “শোন, শোন ভন্ড শোন, বহুদিন সত্যবাদী সাজিয়া করিয়াছিস কুকর্ম। ভুলে গিচিস ঋষি ধর্ম। তাই তোকে দিলাম আমি মৃত্যুদন্ড”।

ঋষি- হা-হা-হা-হা-হা (হাসি)

“আমি শুনে হাসি।
আঁখি জলে ভাসি
এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ
আমি আজ চোর বটে”।

দ্বিতীয় পর্ব

সাজসজ্জা

মোগলি- হাঁটুর নীচু পর্যন্ত করে শাড়ি, ব্লাউজ, গলায় হার, চুরি, টিকলি, টিপ, কাজল, লিপস্টিক, মাথায় খোপায় ফুল, নুপুর।

সামু- রঙীন প্রিন্টের ধুতি, মাথায় পালকের মুকুট, দুল, হার, হাতে ও পায়ে বালা।

মহাদেব- বাঘছাল, ত্রিশূল, গলায় হাতে রুদ্রাক্ষ,মাথায় জটা কপালে সাদা তিলক।

মঞ্চে রঙীন আলোর নকশা।

আবহে বাঁশি ও মাদলের সুর

মোগলির প্রবেশ---(মাদল ও বাঁশির তালে নাচ) "আহা! কি সুন্দর লাগছে বটে। এ পাহাড়---ঝর্না-নদী ও পলাস তু বনে বনে আগুন ধরাইছিস বটে। মোর পরানটা উদাস হয় বটেক। এ কোকিলা আর কুহু কুহু সুরে ডাকিস লাই। তোর সুরে মোর হারাই যাব"।

সামুর প্রবেশ- "আরে তোকে বনে বনে কত খুঁজছি। তুই এখানে একা একা কি করছিস বটে"?

মোগলি- "আমি এখানে একা একা বসে তোর কথা ভাবছি বটে। মোদের যখন বিয়া হবে তু পাল্কী চড়ে বর সেজে আসবি বটে কত ভালো লাগবে বল?"

সামু- "মোগলি, মুঝে এ স্বপ্ন কুনো দিন হবেক লাইরে আরে তু সর্দারের বেটি আছিস। মোর বাপ গরিব বলে মোদের এ প্রেম কোনোদিন মেনে লেবেক লাই"।

মোগলি- "মোর বাপ যদি না মানেক বটে আমি তোর হাত ধরে পলাইন যাব"।

(গান) মোগলি- 'তোর প্রেমে হারাইন যাব

প্রেম সাগরে-

জড়াইয়ে ধরব তোরে এ বুকে আপন করে।

বনফুল লতার মতো বাঁধবে বাহু ডোরে

উথাল পাতাল এমন শুধু'

(ওড়না দিয়ে সামু মোগলির চোখ বেঁধে দেয়)

সামু- 'পেতে চায় শুধু তোরে'

মোগলি- 'মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুন

মন বসে না কেন ঘরে...এ...এ...

জড়ায়ে ধরব তোরে আপন করে'।

রাজকুমারের প্রবেশ। সামুর প্রস্থান। মোগলির চোখ বাঁধা থাকে। রাজকুমার প্রবেশ করে মোগলিকে আলিঙ্গন করে।

মোগলি- "কে? কি তোর পরিচয়"?

রাজকুমার- "নাম আমার প্রত্যুষ। বিশাল রাজ্যের রাজপুত্র আমি"।

মোগলি- "এ সামু তু সত্তোর আয় এ জানোয়ারটার মুখটা বর্শা দে ফাটাই দে"।

রাজকুমার- "ঐ ভালো করে চেয়ে দ্যাখ, তোর ভালোবাসার ওই সামু, ওই মনের মানুষকে মেরে আমি তার জ্বালছি চিতাগ্নি"।

আবহে সামুর কণ্ঠস্বরে শোনা যায়- "মোগলি, তোর সঙ্গে দেখা হবেক লাইরে। এ সমাজের আমাদের ভালোবাসা কেউ মেনে লেবেক লাই। তাই তোর সঙ্গে আমার আর দেখা হবেক লাই"।

(ঋষির প্রবেশ)

ঋষি- "সত্য ধর্ম ন্যয় লাগি প্রতিবাদী মানুষ এখনো আছে। ওরে লম্পট তুই অনেক নারীর করেছিস সর্বনাশ। তাই মৃত্যু তোর অনিবার্য"।

রাজকুমার- "মৃত্যু!" (হাসি)। "এই ঋষিবর.......নিজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া এখনও তোর আশা পূরন হয় নাই? তাই আমার আদালতে তোর মতন ঋষিবরকে দানিব দানিব চরম মৃত্যু"। (তরবারি বার করে)

রানী শঙ্খমালার প্রবেশ।

রানী শঙ্খমালা- "ওরে বংশ কুলাঙ্গার। তোর মতো পুত্রকে গর্ভে ধারন করে এ জীবন আমার লজ্জার। যদি আগে জানিতাম তোর মতো কুপুত্রকে গর্ভে ধারন করিতে হইবে আঁতুর ঘরে কণ্ঠ রূদ্ধ করিতাম তোর জীবন"।

ঋষি- "রানী শঙ্খমালা---সত্যের হয় সর্বদা জয়। সত্যের কণ্ঠ কখনও রূদ্ধ করা যায় না। মোর বাক্য লঙ্ঘন করি সেদিন দিয়েছিলে নির্বাসন। এখন নিজ সম্মুখে নিজ কুপুত্রের আচরণ করলে তুমি দর্শন। দেখিব দেখিব রানী মা। বিচারটা হয় কেমন"?

রানী শঙ্খমালা- "দানিব শাস্তি। মাতা হইয়া নয় সাম্রাজ্ঞী হইয়া। দানিব চরম শাস্তি। মৃত্যু দন্ড হইবে তোর প্রাপ্তি"।

রাজকুমার- "ওগো আমার সাম্রাজ্ঞী মাতা বিশ্বাস করো---হেন---হেন কুকর্ম আমি করিনাই। (হাত জোর করে) ঋষিবর ক্ষমা করো---বিশ্বাস করো আমি হেন কুকর্ম আমি আর করব না। ঋষিবর ক্ষমা ক্ষমা করো"

মোগলি- "এর অত্যাচারে কত মেয়ে হয়ে যাচ্ছে ধর্ষিতা। ঝরিয়াছে অশ্রুজল হইয়াছে সর্বহারা। মৃত্যুতে থাকুক ন্যায়বিচারের ধারা"।

মোগলির প্রস্থান।

রানী শঙ্খমালা- "ঋষিবর, সেদিনের মতো করিব না ভুল। পাপী পুত্রের মৃত্যু দিয়া রাজ্যের ফোটাইব শান্তির ফুল"।

ঋষি- "ধন্য বিচার"।

(গান)রানী শঙ্খমালা- ‘ভাবিনি...ভাবিনি...

(কাঁদতে কাঁদতে) পুত্র এই করবে আঘাত

আশাগুলো নিরাশা

স্বপ্ন হাহাকার।

ভাবিনি...ভাবিনি’

রাজকুমার- “ওগো, ওগো জননী আমি যে মহাপাপ করিয়াছি। ক্ষমা মোরে------আমি যে ভুল করিয়াছি। জননী”।

(গান) রানী শঙ্খমালা- ‘কি জীবন আজ কি যে পেলাম

বেদনার বালুচরে হারিয়ে গেলাম”

ভালো চেয়ে চেয়ে আজ পেলাম আঘাত

স্বপ্ন হাহাকার

ভাবিনি....ভাবিনি... (কান্না)

রাজকুমার- “ জননী, তুমি কি এখনও ভাবতে পারোনি গো জননী? তোমার পুত্র কত ভয়ঙ্কর। তাই তোমার মতো রাক্ষসী মাতাকে আমি মৃত্যু দিয়ে লইব সিংহাসনের ভার”।

(গান) ঋষি- ‘ওঁ মহেশ্বরং চারুচন্দ্র গিরি

ওঁ ভৃগুবর পরশুরাম’

মহাদেবের প্রবেশ। আবহে ওঁ শিবায় শিবায় নমঃ নমঃ

মহাদেব- “শান্ত হও ঋষিবর। বুঝিয়াছি তোমার অন্তরের ব্যথা। নাও ত্রিশূল। নির্মূল করো এই নির্মমকে”।

ঋষি- “অশেষ করুনা প্রভু। তাই ভক্তের কাছে আসিয়াছ। দাও প্রভু দাও”।

শিবের হাত থেকে ত্রিশূল নিলেন ঋষিবর।

ঋষি- (রানী শঙ্খমালা মহদেবের হাতে ত্রিশূল দিয়ে) “এই পাষন্ডকে করো নির্মূল”।

(মহাদেবের প্রস্থান)

রানী শঙ্খমালা- “ওরে বংশ কুলাঙ্গার মাতা হইয়া তোকে করিব আমি ধ্বংস”।

রানী শঙ্খমালা হাতে ত্রিশূল নিয়ে এবং পুত্র প্রত্যূষ হাতে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ হয়। রানী ত্রিশূল দিয়ে বধ করে রাজকুমারকে।

রাজকুমার- “জননী, আমি যে মহাভুল করিয়াছি জননী”।

(রানীর হাসি ও কান্না)

রানী শঙ্খমালা- "পুত্রকে জন্ম দিয়ে কি চেয়েছি কি যে পেলাম

দুষ্ট দমন রাজ্য শাসনে 'মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম'।"

সমাপ্ত

২। রাধাকৃষ্ণ ছক (নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা-ছক-২)

'আয়ানের শয়নকক্ষ'

ঘোষণার পর শিল্পীর প্রবেশ, মঞ্চ অন্ধকার।

মঞ্চ আলোকিত হয়। আয়ান শায়িত (উঁচু সিঁড়িতে), নারী পাশে বসে (নীচু সিঁড়িতে)

সাজ-আয়ান—লাল ধুতি, লাল চাদর তিলক, হার। রাধারানী—লাল বেনারসী, হার, চুড়ি, দুল, ওড়না। শ্রীকৃষ্ণ—ঝলমলে পোশাক, মুকুট, হার, দুল, হাতে বাঁশি।

(গান) রাধারানী—ডেকো না..., ডেকো না আমায় ঘনশ্যাম বাঁশি

(সংলাপ) রাধারানী—"পতি মোর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই অবকাশে মম হৃদয় মোর দেবতার সাথে অভিসারে করিব গমন। আসি স্বামী বিদায়"।

(রাধারানী গমনে উদ্যত, আয়ান জেগে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়)

(সংলাপ) আয়ান— "দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ তুমি? কামনার কামানলে পড়িয়া বাজাও আশাবরী রাগিনী। আজ বেত্রাঘাতে তব জীবন করিব সংশয়।"

(আয়ান দ্বারা রাধারানীকে চাবুক দিয়ে আঘাত)

রাধারানী- (চাবুক হাত দিয়ে ধরে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে) "কৃষ্ণ প্রেমের অগ্নিতে দগ্ধ হয়নি ভক্ত প্রহ্লাদ। ঠিক তেমন শত শত চাবুকের আঘাতে ভুলিবনা ভুলিবনা আমি মোর প্রাণের দেবতারে।"

আয়ান—"বেশ রানী, তোমার আশা তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে আমি নিজে হস্তে পৌঁছে দিব দ্বাপরে রহস্যময় শ্রীকৃষ্ণের করকমলে। এসো, এসো আমার সঙ্গে রাধারানী।"

(আয়ান রাধারানীর হাত ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়, মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। মঞ্চে নীল আবছা আলো।

(গান) শ্রীকৃষ্ণ— সাথীহারা মন কাঁদে অনুক্ষণ

বেদনার এ কুয়াশা মরমে অবুঝ হৃদয় কেঁদে কেঁদে সারা হয়

আজ আমি বড় অসহায়

কৃষ্ণ হরে হরে...

বাদ্য

পূজার বেদী যেন বিরহের ঐ বালুচর

রমা যায় সাজানো ফুলের বাসর ঘর

আসে মেঘ সম জীবন কাহিনি মন

লেখা আছে স্মৃতির পাতায়

মরমে অবুঝ হৃদয় কেঁদে কেঁদে শুধু হয়

আজ আমি বড় অসহায়

সাথীহারা...

(আয়ান ও রাধারানীর প্রবেশ করে। রাধারানী কৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং আয়ান কৃষ্ণের সামনে করজোড়ে দাঁড়ায়)

(সংলাপ) কৃষ্ণ—"রমণীকুল প্রকৃতির অংশ

নারী হতে সৃষ্টি নারী হতে ধ্বংস

কিবা হেতু অত্যাচারে প্রিয়তমাকে সমর্পণ

করিলে মোর চরণে?

আয়ান—"ওগো অন্তর্যামী ভগবান তুমি তো ভক্তের ভগবান। কেন ঠাকুর বার[২] শূন্য করে ভক্তের এ জীবন ঠাকুর, পরের পাত্রীর উপর এতই যখন তোমার স্বপ্ন ভগবান, গ্রহণ করো ভগবান, গ্রহণ করো বিরোহী আয়ানের সামান্যতম অর্ঘ্য।"

(গান) কৃষ্ণ— নানা চাইনা চাইনা তোমার প্রেমের পত্নী, ফিরায়ে নাও কেঁদো না

তুমি প্রিয়া অভিমানী ভুল করছো তুমি

পরে আশা কেন মনে থাকো স্বামী

নানা চাইনা চাইনা।

বাদ্য......

(সংলাপ) রাধারানী—"ওগো অন্তর্যামী ভগবান, তুমিতো সবই জানো, তাহলে কেন বারে বারে কাঁদাও ঠাকুর? বলো না বলো না, ঠাকুর বলো না।"

বাদ্য......

(গান) রাধারানী— অতীত স্মৃতির কথা, আজও ঝরাপাতা

আয়ান— কুশানলে জ্বলি আমি বোঝেনা ব্যথা

কৃষ্ণ— কলঙ্ক তো চাঁদে আছে, মধুময় জোছনায়, অভিশপ্ত জীবনে, রহো রহো বেদনা

রাধা— পরকীয়া প্রেমে ব্যথা, আসে নেমে মরমি বধূ আমি এই যে তোমার

কৃষ্ণ— নানা, চাইনা চাইনা

(সংলাপ) আয়ান—"ওগো অন্তর্যামী ভগবান তুমি তো ভক্তের ভগবান তবে কেন ঠাকুর, বার বার কেন কাঁদাও এ ভক্তের ঠাকুর? কেন ঠাকুর কেন?"

(গান) আয়ান— গুরু স্বামী ব্যথিত জীবন

কৃষ্ণ— বিধাতার দান সবই তোমার ভাগ্য লিখন ।

আয়ান ও রাধারানী করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রনাম জানায়।

সমাপ্ত

৩। সামাজিক ছক (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা-ছক- ৭)

চরিত্র—দিদিমা, নাতনি (টুনি), নাতজামাই, হাবিলদার

সাজসজ্জা ও প্রসাধন

দিদিমা- সাদা শাড়ি, দাঁত কালো করা হয়েছে।

হাবিলদার- হাবিলদারের পোশাক, হাতে লাঠি, দাঁড়ি কালি দিয়ে আঁকা।

দিদিমার প্রবেশ

(গান) দিদিমা- 'আমার সোনা নাতনি রে

ও তুই কোথায় গেলি রে

দিনে রাতে আমি তোরে খুঁইজা মরিরে'

দিদিমা- "ও .... ও....তোদের কি পাকাধানে বাঁশটি আমি দিলুম। ভুইলে ভাইলে নে চলে গিলি! মা মোরা মেয়ে, যাদবপুরের পচা খালের পাশে এক ঝুপড়িতে আচে"।

দিদিমা- "আমি চললাম একন থানায়।"

প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার

২য় দৃশ্য

হাবিলদারের প্রবেশ

(গান) হাবিলদার- ‘সারা রাতটা ডিউটি করে কাটালি

ভোর রাত্রে চাবি খুলে তালা ঢোকালি’

দিদিমার থানায় প্রবেশ ।

তাকে দেখেই হাবিলদার গান গায়।

(গান) হাবিলদার- ‘কাহারবা নয় দাদারা বাজাও

উল্টো পাল্টা মারছো লাথি

খুঁড়ি দিদি তুমি দেকছি

আসরটাকে করবে মাটি’

দিদিমা-“আমি মন্দিরা, থানায় এইচি ডায়রি করতে। এট্টা ছেলে নাতনিরে নে পেইলেছে। তার বয়স ১৪ বছর”।

হাবিলদার-“তোমার নাতনি পেইলেচে? বয়স একদম হয়নে গো! সরকারি মতে বয়স একদম হয় নে। তা ছেলের বয়স?”

দিদিমা- “মেক্সিমাম ১৬ বছর”।

হাবিলদার- “ছেলেটা কানাকানি গেচিল”।

দিদিমা- “যাদবপুরের পচা খালের পাশে আছে ধরতে হবে”

হাবলদার—“তালে চলো ঐ পোচা খালের ঝোপে।”

প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার

৩য় দৃশ্য

নাতজামাই এর প্রবেশ বগলে বালিশ নিয়ে।

(গান) নাতজামাই---

‘ও আমি ঘটি বাটি কাঁথা কম্বল

ও দাদা বালিশ নিয়েছি বগলে

দিদিমার জ্বালায় আমি আছি জঙ্গলে’।

সে গাঁজা খেয়ে শুয়ে থাকে। হাবিলদার ও দিদিমা তাকে ধরতে যায়।

হাবলদার- “আগে জনগন লাস্টে পোশাসন”

দিদিমা---“না! ওটা ভুল কথা। আগে পোশাসন তারপরে জনগন।”

(নাতজামাই মঞ্চে বিড়ি খায় সেই সময় হাবলদার নাতজামাইকে ধরে ফেলে। হাবিলদার নাতজামাইকে ধরে ফেলে কিন্তু যেই দেখে সে বিড়ি খাচ্চে অমন ধরার বদলে তার কাছে বিড়ি চায়। নাতজামাই বিড়ি দিলে সরাসরি না নিয়ে অন্য দিকে ফিরে হাত পিছনে দিয়ে নেয়।)

হাবিলদার বলে---"পুলিশ সামনে থেকে কোনো জিনিস নেবেন না।"(পিছন থেকে হাত বেঁকিয়ে নেয়)

নাতনি টুনির প্রবেশ।

(গান) টুনিকে দেখে হাবিলদার---

'সাধের লাউ বানাইলো মোদের বৈরাগী

লাউ এর আগা খাইলাম, ডগাগো খাইলাম

লাউ দিয়ে বানাইলাম ডুগডুগি'

টুনির উদ্দেশ্যে দিদিমা-

'কললি এসব কি

লোকে বলবে ছি ছি ছি'।

টুনি- 'ভালোবাসার একনাম সাধেরই জীবন'

হাবলদার- 'আর এই বয়েসে হলে মা যাবে তোর জীবন'

দিদিমা- 'সাপের গায়ে দিলে পা মারবে ছোবল'

নাতজামাই- 'না জেনে ভুল করেছি গন্ডোগোল'

হাবলদার- 'আরে বাদুরেতে খেয়েচে নিয়েচে কচি তাল'

দিদিমা- 'সাপের গায়ে দিলে পা মারবে ছোবল'

নাতজামাই- 'না জেনে ভুল করেছি গন্ডোগোল'

দিদিমা---রামকৃষ্ণ লেখে গান গেল আমার মান'

দিদিমা জানায় তাদের সে মেনে নিয়েছে। দিদিমা নিজের ঘরে তাদের নিয়ে যেতে চায়।

হাবিলদারের প্রস্থান

(গান) নাতজামাই- 'আমি কথা দিলাম

তুমি আমি যুগে যুগে থাকব সাথে

কথা দিলাম'

টুনি- 'ফুলেতে যেমন গন্ধ থাকে

তুমি আমি এমনি ভাবে যুগে যুগে থাকব সাথে

কথা দিলাম’।

সমাপ্তি

গান

১। বন্দনা গান (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা)

আমাদের প্রতিবাদ রক্তে লেখা

লাল হয়ে লেখা আছে দেওয়ালের গায়

শুরু হবে সত্যের সংগ্রাম

এ রাতে আমরা গাইব গান

চাইব শুধু হাসি

শিল্পতীর্থ গাজন গানে গাইতে এসেছি গান

বাদ্য...

শিশির কনা ঝরে যাবে

নতুন সূর্য উঠবে

মিঠে সুরে সানাই বাজবে

মনে মনে মিলবে

মনে মনে মিলবে

এখনে ভিড়ের মাঝে সবার মাঝে

শিল্পতীর্থ বিরাজ করে

চ্যালেঞ্জ নয় চমক দিয়ে

চাইব শুধু ছুটি

শিল্পতীর্থ গাজন গানে গাইতে এসেছি গান

বাদ্য...

এখনো মাটিতে লেগে আছে দেখো শত সবুজের রক্ত

এ মাটির বুকে গোরেদের হানার সেই বারুদের গন্ধ

মুখোমুখি তাই বিনয় বাদল দীনেশের সংগ্রাম

বীরের মৃত্যু নয়ে বেঁচে আছে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম

বাদ্য...

সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল

যতই আসুক দিক না বিপদ হাওয়া হয় প্রতিকূল

এক হাতে বাজে অগ্নিবীণা কণ্ঠে গীতাঞ্জলি

হাজার সূর্য চোখের তারায় আমরা যে পথ চলি

সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনাতে নজরুল

বাদ্য...

শিল্পীতীর্থ গাজন গানে গাইতে এসেছি গান

গাইতে এসেছি গান এরাতে।

২। নাম ঘোষণার গান (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা)

সাধু বেশী শয়তান
কৌশলতে যায়
অত্যাচারী তার
মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম।
কতকাল গেছে ঝরে
পাপীর অত্যাচারে

৩। করাচ গান (নাট্যমন্দির গাজন সংস্থা)

পানি সাগা সাগা সানি
গামা পানি সাসা পানি
গামা পানি সা সা
সানি সানি ধা
সা গা সা সা
নিধা পা ধা নি
সা নি নি নি
সাগা মাগা সা
সাগা মামা

আ-আ-আ-আ

ও-ও-ও-ও

মেতেছে রক্ত খেলায় অমানুষে

হারিয়ে জীবন সাথী প্রতিশোধে

মনের মানুষ পুড়িয়ে ফেলে শূন্য করে

গাসা সাসা মামা গাগা

মা পা ধা নি সা

এসেছে শরত হিমের পরশ

লেগেছে হাওয়ার পরে

সকাল বেলায় ঘাসের আগায়

শিশিরের রেখা ধরে।

রুনু ঝুনু নুপূর বাজে পায়ের তালে

ভোরেরও কোকিল ডেকে যায় বলে

মনের ময়ূর নাচে পেখম তুলে

বসুন্ধরা আলো করেছে

ঝিকিমিকি জোছনা ভরা নীল আকাশে

দখিনা পবন বয়ে যায় গানের খুশিতে

ঝিকিমিকি জোছনা ভরা নীল আকাশে

দিয়েছে স্বপন হারিয়ে আপন

দিয়েছে লিখন পাপীর হবে যে মরণ

৪। মুখ গান (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা)

এক ফালি চাঁদ

আকাশ হয়ে নেমে এলি তুই কোলে

হাজার তারায় হার মেনেছে

মা এর আঁচল তলে

শিখা হয়ে জ্বলবি রে তুই

আমার প্রাণের দীপে

যতই দুঃখ আসে আসুক

রাখব বুকে তোকে

ছায়ার মতো বাঁধব তোকে

চোখের পলে পলে

এক ফালি চাঁদ

আকাশ হয়ে নেমে এলি তুই কোলে

লালা লা- লা- লা-

লা- লা- লা- লা- লালা- লা- লা-

৫। মুখ্য গান (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা)

যশোদা— 'বিপদে রক্ষা করো ওগো কৃপাধারী

অত্যাচারের বিনাশ করো তুমি সর্বধারী'

বাকাসুর—'মায়াবলে বলীয়ান আমি বাকাসুর

শিশু বধ করিয়া পাইব প্রচুর'

শ্রীকৃষ্ণ—'ভক্তধারীতে আমি কত রূপ ধরি'

(সংলাপ) যশোদা—"ওগো ভক্তের ভগবান"

শ্রীকৃষ্ণ—"ওগো জননী যশোদা, সন্তান রূপে আসিয়াছি। তুমি হইলে মোর ধরাধামের মাতা"।

যশোদা— "আমি মাতা? তুই আমার পুত্র হস? আয় বক্ষে আয় আয়"।

শ্রীকৃষ্ণ—"ধন্য মাতা তুমি বিদিত ভুবনে

জননী সার্থক সন্তান পালনে"

যশোদা— "অবতার রূপে তুমি এলে মায়ের কোলে সেই পরশ রাখি মায়ের আঁচলে তলে"

(গান) শ্রীকৃষ্ণ- 'দর্প-চূর্ণ করি দর্পহারী

দর্প-চূর্ণ করি আমি শিহরী

আমি আঁধারের বুকে আলো জ্বালি

আলোর দিশারী ।

৬। শেষের গান (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা)

পারো যদি মুছে দাও
যত ব্যথা বেদনা
যদি না পারো তবু
দুঃখ দিওনা
চিতার আগুনে পুড়ে
ধূপেরই রূপেরই মতন
দিয়ে যাব তোমায় প্রেম বন্ধ যত
করিব তোমার শুভ কামনা
আমি সইতে পারিনা

চিতার আগুনে জ্বেলে দাও
আমি সইতে পারিনা
বিরহের আগুন জ্বেলো না
আমি সইতে পারিনা।

পরিশিষ্ট- ৩

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভৌগোলিক মানচিত্র

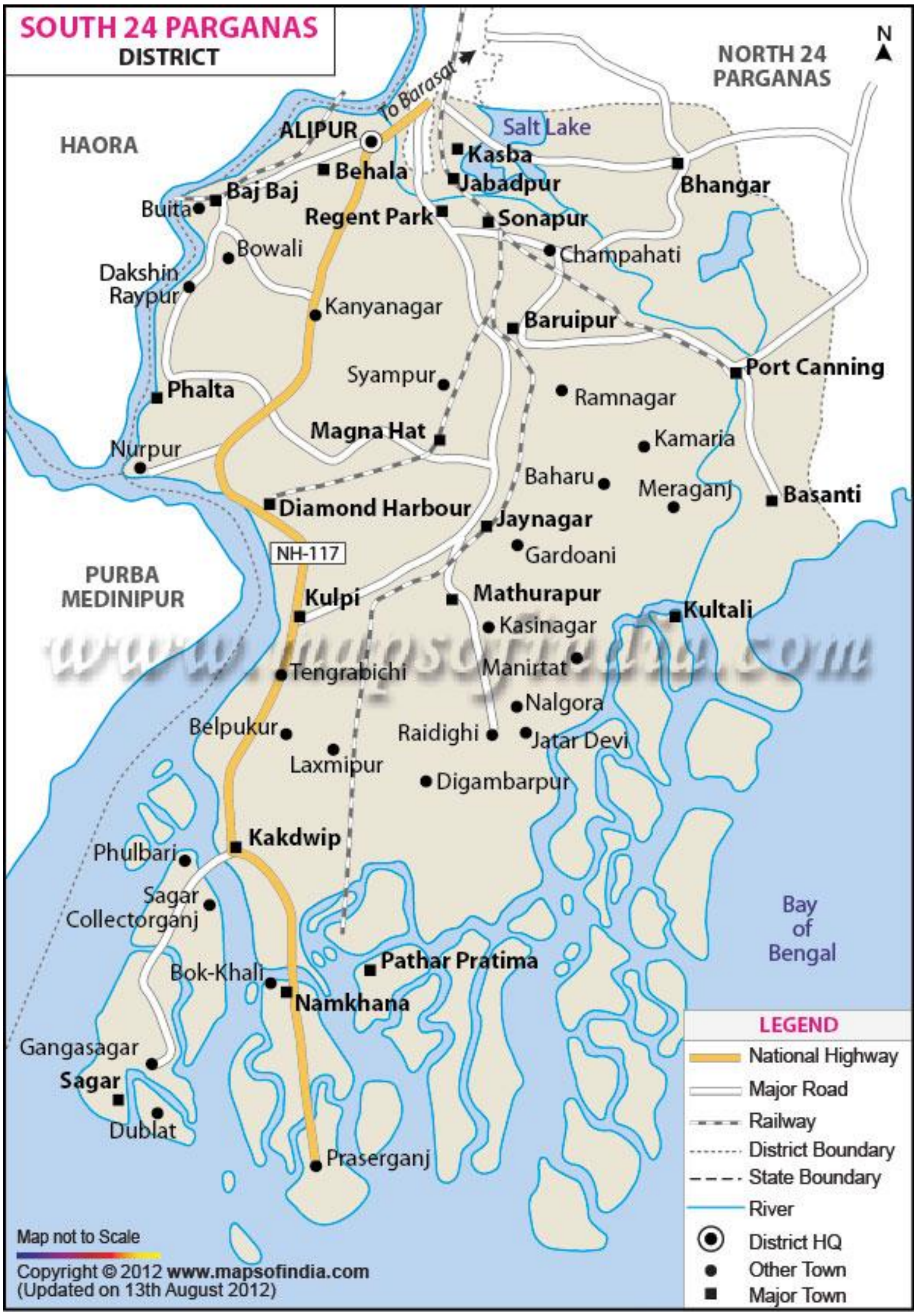

গাজন উৎসবের রীতি

ক. জয়নগর লক্ষীকান্তপুর অঞ্চলের কেশবেশ্বর মন্দিরে গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে সন্নাসীদের সমাগম

খ. মন্দির প্রাঙ্গণে সন্নাসীরা দণ্ডী কাটছেন

গ. দেবতার পাট নিয়ে চলছে

ঘ. মূল পুরোহিত বা প্রধান সন্ন্যাসীগণ

ঙ. চড়ুক গাছ পোঁতা চলছে

চ. সন্ন্যাসীরা স্নানের শেষে পুঁতে দিয়েছেন তাদের উপবীত

ছ. ঝাঁপান পর্ব

জ. নারী পুরুষ নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বনিতা

উল্টোরথের দিন গাজনদলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ক। উল্টোরথের দিন হচ্ছে আরাধ্য দেবতার পূজা

খ। উল্টোরথের দিন শিল্পীদের পরিচয় প্রদান অনুষ্ঠান

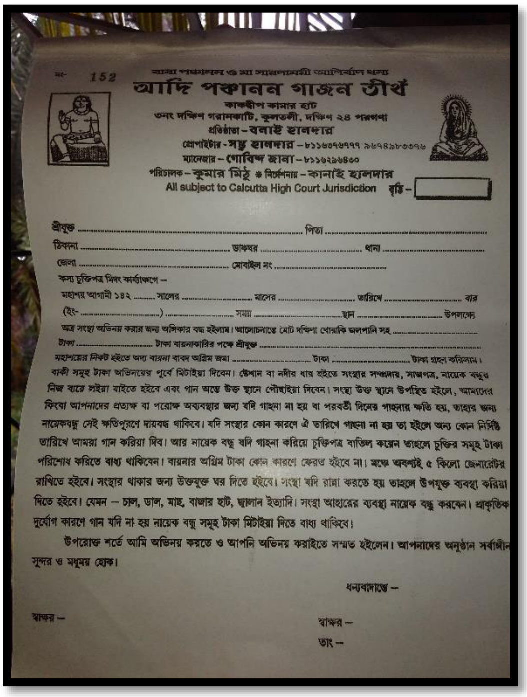

নং 152

বাবা পঞ্চানন ও মা সারদামণী আশির্বাদ ধন্য

আদি পঞ্চানন গাজন তীর্থ

কাকদ্বীপ কামার হাট

৩নং দক্ষিণ গরানকাটি, কুলতলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

প্রতিষ্ঠাতা – বলাই হালদার

প্রোপাইটার - সঞ্জু হালদার – ৮১১৬৩৭৬৭৭৭ ৯৬৭৪৯৮৩৩৭৬

ম্যানেজার – গোবিন্দ জানা – ৮১১৬২৯৬৪৩০

পরিচালক – কুমার মিঠু * নির্দেশনায় – কানাই হালদার

All subject to Calcutta High Court Jurisdiction বৃত্তি –

শ্রীযুক্ত .... পিতা ....

ঠিকানা .... ডাকঘর .... থানা ....

জেলা .... মোবাইল নং ....

অস্য চুক্তিপত্র মিদং কার্য্যাঞ্চাগে –

মহাশয় আগামী ১৪২ .... সালের .... মাসের .... তারিখে .... বার

(ইং- ....) .... সময় .... স্থান .... উপলক্ষ্যে

অত্র সংস্থা অভিনয় করার জন্য অঙ্গিকার বদ্ধ হইলাম। আলোচনান্তে মেটি দক্ষিণা খোরাকি জলপানি সহ ....

টাকা .... টাকা বায়নাকারির পক্ষে শ্রীযুক্ত ....

মহাশয়ের নিকট হইতে অদ্য বায়না বাবদ অগ্রিম জমা .... টাকা .... টাকা গ্রহণ করিলাম।

বাকী সমুহ টাকা অভিনয়ের পূর্বে মিটাইয়া দিবেন। ষ্টেশান বা নদীর ধার হইতে সংস্থার সম্প্রদায়, সাজপত্র, নায়েক বন্ধুর নিজ ব্যয়ে লইয়া যাইতে হইবে এবং গান অন্তে উক্ত স্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন। সংস্থা উক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে, আমাদের কিংবা আপনাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অব্যবস্থার জন্য যদি গাহনা না হয় বা পরবর্তী দিনের গাহনার ক্ষতি হয়, তাহার জন্য নায়েকবন্ধু সেই ক্ষতিপুরণে দায়বদ্ধ থাকিবে। যদি সংস্থার কোন কারণে ঐ তারিখে গাহনা না হয় তা হইলে অন্য কোন নির্দিষ্ট তারিখে আমরা গান করিয়া দিব। আর নায়েক বন্ধু যদি গাহনা করিয়ে চুক্তিপত্র বাতিল করেন তাহলে চুক্তির সমুহ টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। বায়নার অগ্রিম টাকা কোন কারণে ফেরত হইবে না। মঞ্চে অবশ্যই ৫ কিলো জেনারেটর রাখিতে হইবে। সংস্থার থাকার জন্য উপযুক্ত ঘর দিতে হইবে। সংস্থা যদি রান্না করতে হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। যেমন – চাল, ডাল, মাছ, বাজার হাট, জ্বালান ইত্যাদি। সংস্থা আহারের ব্যবস্থা নায়েক বন্ধু করবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারণে গান যদি না হয় নায়েক বন্ধু সমুহ টাকা মিটাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

উপরোক্ত শর্তে আমি অভিনয় করতে ও আপনি অভিনয় করাইতে সম্মত হইলেন। আপনাদের অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও মধুময় হোক।

ধন্যবাদান্তে –

স্বাক্ষর –

স্বাক্ষর –

তাং –

গ। উল্টোরথের দিন বায়নার রসিদ ও শর্তাবলী পত্র

ঘ। গাজনদলের গদিঘর

গাজনপালা অনুষ্ঠানের রীতি নীতি

ক। অভিনয় শুরুর পূর্বে ফাঁকা মঞ্চে হয় কনসার্ট

খ। সাজঘর থেকে ঘণ্টা বাজানো হয়

গ। মঞ্চের পিছনে সাজঘরে করা হয় আরাধ্য দেবতার পূজা

ঘ। মঞ্চের পিছনে সাজঘরে আরাধ্য দেবতার কাছে বন্দনা গান করা হয়

ঙ। অভিনয় শুরুর পূর্বে সাজঘরে শিল্পী দর্শকদের আমন্ত্রণ ও প্রণাম জানিয়ে গান করছেন

চ। শিল্পী অভিনয় শুরুর পূর্বে দেবতাকে প্রণাম জানান

ছ। শিল্পী অভিনয় শুরুর পূর্বে সহ শিল্পীকে প্রণাম জানান

জ। অভিনয় শুরুর পূর্বে শিল্পী মঞ্চ প্রণাম জানান

গাজনপালার প্রসাধন

ক। সাজঘরে শিল্পীরা সজ্জিত হচ্ছেন

খ। প্রসাধন দ্রব্য

গ। পুরুষেরা সেজে ওঠেন নারী চরিত্রের জন্য

ঘ। নারী চরিত্রের জন্য উপযুক্ত কেশসজ্জা করা হয়।

গাজনপালার ছক বিশেষে সাজ ও পোশাক

ক। পৌরাণিক ছক (প্রথম ছক)-এর সাজসজ্জা

খ। রাধা কৃষ্ণ ছক(দ্বিতীয় ছক) এর সাজসজ্জা

গ। সামাজিক ছক (তৃতীয় থেকে যে কোন ছকের) সাজসজ্জা

ঘ। করাচ নাচের সাজসজ্জা

ঙ। নারী চরিত্রের জন্য পুরুষেরাই সজ্জিত হচ্ছেন

গাজনপালার মঞ্চ

ক। গ্রাম অঞ্চলে আয়োজিত গাজনপালারর আসর

খ। শহরতলি অঞ্চলে আয়োজিত গাজনপালারর আসর

গ। শহরের বুকে আয়োজিত গাজনপালার আসর

ঘ। মৌখালিতে টিকিটের বিনিময়ে আয়োজিত গাজনপালার আসর

ঙ। গাজনপালার জন্য তৈরী হয়েছে টিকিট কাউন্টার

গাজনপালায় আলোর ব্যবহার

ক। মঞ্চের উপরে ও নীচে আলোর ব্যবস্থা

খ। রঙিন আলোর ব্যবহার

গ। কেন্দ্রীভূত আলোর ব্যবহার

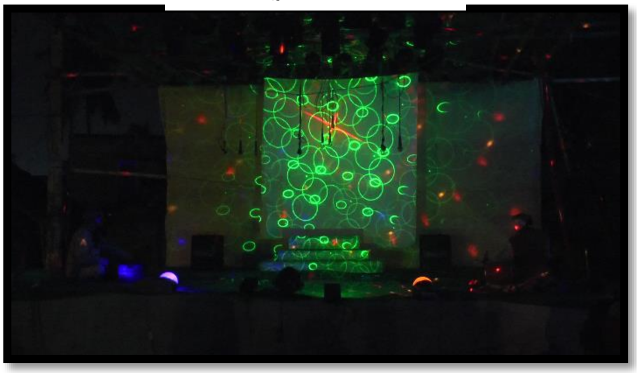

ঘ। নকশাদার আলোর ব্যবহার

গাজনপালায় শব্দের ব্যবহার

ক। মঞ্চের উপরে রাখা আছে শব্দযন্ত্রগুলি ও বিভিন্ন উচ্চতায় ঝলানো রয়েছে মাইক্রোফোনগুলি

খ। মঞ্চের পাশে রয়েছে শব্দ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র

গ। মঞ্চের পাশেও রাখা আছে শব্দ যন্ত্র

ঘ। সুশব্দের জন্য প্রত্যেক অভিনেতা আলাদা আলাদা মাইক্রোফোন ব্যবহার করে

ঙ। প্রয়োজনে শব্দ নিয়ন্ত্রক কর্মীর সহযোগিতার প্রয়োজন হয় পালার মাঝেও

গাজনপালার বাদ্যযন্ত্রাদি

ক। মঞ্চের দুপাশে বাদ্যকারেরা অবস্থান করেন (হারমোনিয়াম, তবলা)

খ। ড্রাম, ঢোল, তবলা

গ। অক্টোপ্যাড

ঘ। কিবোর্ড

ঙ। মঞ্চের উপরেই সকল বাদ্যকার অবস্থান করেছেন (সানাই)

গাজনপালায় দ্রব্যের ব্যবহার

ক। অভিনয়ের অঙ্গ রূপে দ্রব্যের (রেকাব) ব্যবহার হয়েছে

খ। বিকল্পরূপে দ্রব্যের (সন্তানের জায়গায় পুতুল) ব্যবহার হয়েছে

গ। সাজের অংগ্ররূপে দ্রব্যের(ব্যাগ, চশমা) ব্যবহার হয়েছে

ঘ। দ্রব্যটি অভিনয়ে ব্যবহার করা(সিগারেট খাওয়া) হচ্ছে

গাজনপালায় প্রযুক্তির ব্যবহার

ক। মঞ্চে পর্দায় প্রতিকৃতি ও ছবির ব্যবহার

খ। মঞ্চে যন্ত্রের মাধ্যমে কাগজ কুচির ব্যবহার হচ্ছে

গ। আলো নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে

ঘ। শব্দ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে

ঙ। প্রযুক্তিকে অভিনয়ের উপকরণরূপে ব্যবহার করা হয়

গাজনপালায় ছকের ধরন

ক। প্রথম ছক এর বিষয় হয় পৌরাণিক

খ। দ্বিতীয় ছকটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক

গ। তৃতীয় ছক থেকে শুরু হয় সামাজিক কাহিনি

গাজনপালার নৃত্যের ধরন

ক। পৌরাণিক ছকের নাচের ধরন

খ। করাচ গানের সাথে ধ্রূপদী অনুকরণে নৃত্য

গ। রাধাকৃষ্ণ ছকে নাচ প্রায় থাকেই না বলা যায়

ঘ। সামাজিক ছকের নাচের ধরন আধুনিক

গাজনপালায় পুরস্কার প্রদান

ক। আয়োজক বা দর্শক দ্বারা পুরস্কার প্রদান

খ। দল মালিক শম্ভু হালদার দ্বারা পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে

গাজনপালার অভিনেতা

ক। অভিনয়কে জীবন্ত করে তোলার জন্য অভিনেতা সত্যই মঞ্চে ধমপান করেন

খ। পদাঘাত ও প্রতিক্রিয়ায় পারস্পরিক অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে দৃশ্যটি

গ। অভিনেতা নিতাই সর্দার আগের দিন পিতৃ বিয়োগ হওয়ার পরদিন অভিনয় করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন

ঘ। নারী বেশে সজ্জিত হয়ে পুরুষেরা নিজেদের যেন সম্পূর্ণ নারী করে তোলেন দর্শক সমক্ষে

গাজনপালার দৃশ্যে শালীনতা

ক। দৃশ্যাভিনয় অনেক সময় সভ্য সমাজের চোখে শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করে

খ। আঙ্গিক অভিনয়ে যেন অতিরঞ্জিত ভাব প্রকাশ পায়

গ। সাজ পোশাকের মধ্যে শালীনতা হীনতার আভাস মেলে

গাজনদলগুলির বিজ্ঞাপন

ক। দলের পোষ্টার

খ। গাজনদলের কার্ড

গ। আয়োজক সংস্থার কার্ড

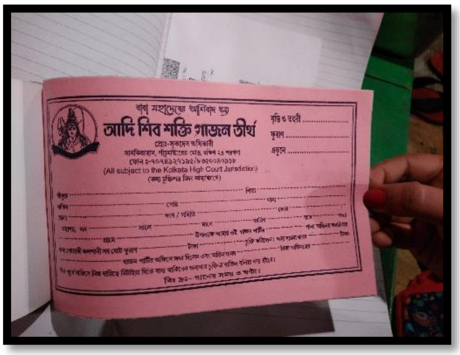

ঘ। দলকে বায়না দেওয়ার রসিদ

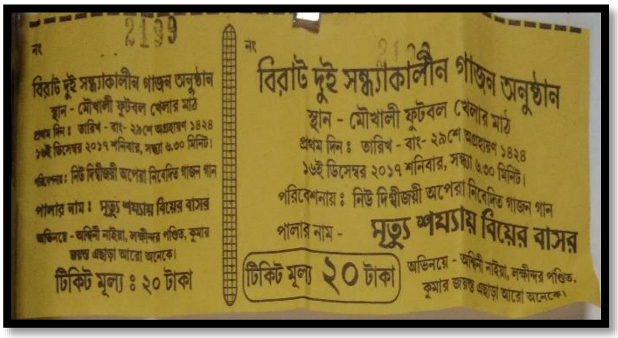

ঙ। গাজনপালার টিকিট

গাজনদলের স্ক্রিপ্ট

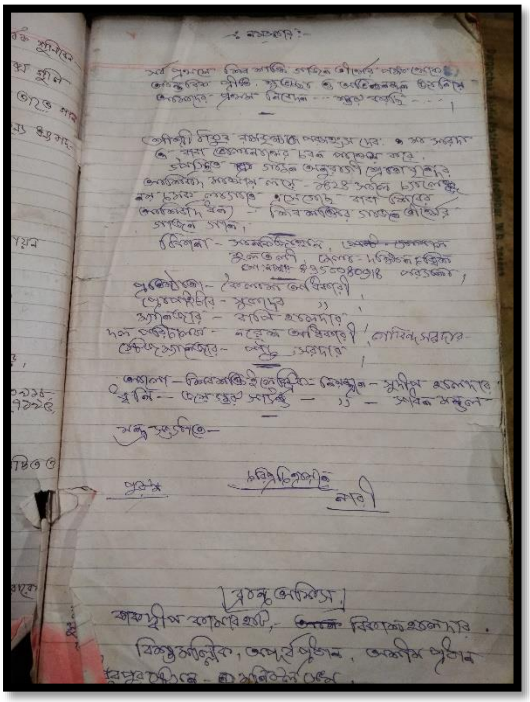

ক। আদি শিবশক্তি গাজনতীর্থ দলের ঘোষণার স্ক্রিপ্ট

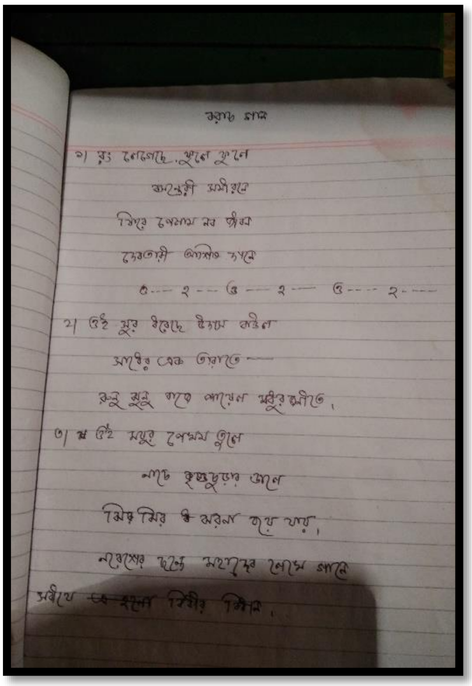

খ। করাচ গানের স্ক্রিপ্ট

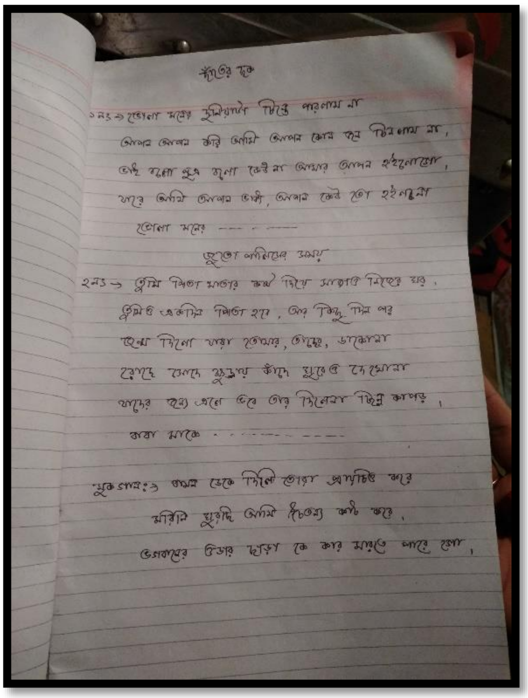

গ। ছকে কেবলমাত্র গান রচিত হয়েছে

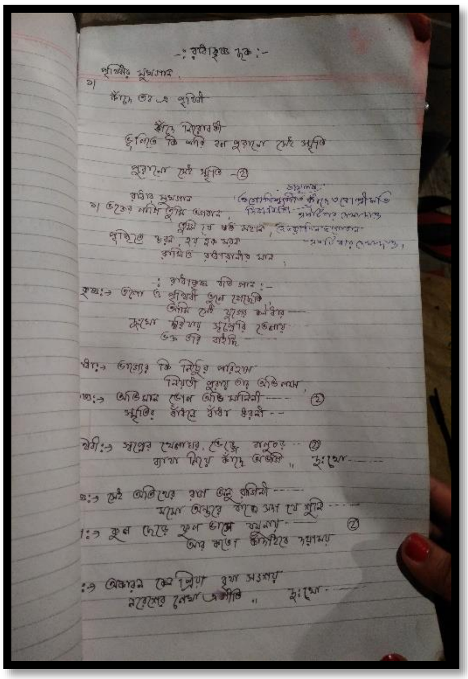

ঘ। সামাজিক ছকের স্ক্রিপ্ট

দলের সদস্যদের জন্য ব্যবস্থাদি

ক। দলগুলির যাতায়াতে জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা থাকে

খ। মঞ্চের নীচেই শিল্পীদের নিদ্রা যেতে হয়

গ। দলগুলিতে নিয়ন্ত্রক কর্মী থাকেন

সাক্ষাৎকার

ক। গাজন শিল্পীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষিকা

গ্রন্থপঞ্জি

আকর পাঠ

সংগৃহীত গাজন পালা

‘অভিশপ্ত আতঙ্ক’, রচনা- ড. জগন্নাথ গায়েন, নির্দেশনা- কানাই হালদার ও কুমার মিঠু (আদি পঞ্চানন গাজনতীর্থ, ৩.১২.২০১৭)

‘মৃত্যু শয্যায় বিয়ের বাসর’, রচনা- জগন্নাথ গায়েন ও অশ্বিনী নাইয়া, নির্দেশনা- লখিন্দর পণ্ডিত ও অশ্বিনী নাইয়া (নিউ দিগ্বিজয়ী অপেরা, ৬.১২.২০১৭)

‘বর কেন যাযাবর’, রচনা- বাবলু হালদার ও সম্রাট নাইয়া, নির্দেশনা- যুধিষ্টির হালদার (নিউ নট্ট কোম্পানী, ৭.১২.২০১৭)

‘ঘুম পাড়ানী পরীর দেশ’, রচনা- মাষ্টার গৌর চন্দ্র নস্কর, নির্দেশনা- বিশ্বনাথ দাস (আদি মুক্তাঙ্গন গাজন সংস্থা, ১০.১২.২০১৭)

‘মরনলগ্নে মিলন সানাই’, রচনা- মাষ্টার স্বপন গায়েন, নির্দেশনা- পাঁচু গোপাল হালদার (দি পঞ্চানন গাজনতীর্থ, ১৩.১২.২০১৭)

‘কর্মের শেষ পর্বে ভালোবেসে কি পেলাম’, রচনা- মহাদেব শিকারী, নির্দেশনা- নরেশ অধিকারী, (আদি শিবিশক্তি গাজনতীর্থ, ১৮.১২.২০১৭)

‘বিধবার গায়ে হলুদ’, রচনা ও নির্দেশনা- হরিসাধন মণ্ডল (দি নাট্যমঞ্জরী গাজনতীর্থ, ২১.১২.২০১৭)

‘রক্ত পিপাসু কালোছায়া’, রচনা- মাষ্টার রামকৃষ্ণ বৈদ্য, নির্দেশনা- সমীর হালদার (নাট্য মন্দির গাজনতীর্থ, ২৩.১২.২০১৭)

‘ক্ষুধার্ত চায় লালরক্ত’, রচনা- মাষ্টার স্বপন গায়েন, নির্দেশনা- অশ্বিনী নাইয়া (নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা, ২৫.১২.২০১৭)

‘মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দিলাম’, রচনা- রামকৃষ্ণ বৈদ্য, নির্দেশনা- প্রফুল্ল সরদার (শিল্পতীর্থ গাজন সংস্থা, ২৭.১২.২০১৭)

পৃথিবী আজও কাঁদে’, রচনা- মহাদেব শিকারী, নির্দেশনা- নরেশ অধিকারী, (আদি শিবিশক্তি গাজনতীর্থ, ১৫.১১.২০১৮)

‘অহংকারী রাধা’, রচনা- নরেশ অধিকারী, নির্দেশনা- অশ্বিনী নাইয়া (নাট্য মন্দির গাজনতীর্থ, ১৮.১১.২০১৮)

‘এক দিনের মুখ্যমন্ত্রী’, রচনা- মাষ্টার গৌর চন্দ্র নস্কর, নির্দেশনা- বিশ্বনাথ দাস (আদি মুক্তাঙ্গন গাজন সংস্থা, ২০.১১.২০১৮)

‘স্বামী যাচ্ছে জেলে’, রচনা- মহাদেব শিকারী, নির্দেশনা- নরেশ অধিকারী, (আদি শিবিশক্তি গাজনতীর্থ, ২৫.১২.২০১৯)

‘আমার ঠিকানা জেলখানা’, রচনা- নরেশ অধিকারী, নির্দেশনা- অশ্বিনী নাইয়া (নাট্য মন্দির গাজনতীর্থ, ২৮.১২.২০১৯)

‘অয়নের শয়নকক্ষ’, রচনা- মাষ্টার স্বপন গায়েন, নির্দেশনা- অশ্বিনী নাইয়া (নিউ দিগ্বিজয়ী বিজয়বার্তা, ৩০.১২.২০১৯)

‘আঁচলে বাঁধা আলো’ রচনা-মাষ্টার গৌর চন্দ্র নস্কর, নির্দেশনা- সমীর হালদার (নাট্য মঞ্জরী গাজন সংস্থা, ৩১.১২.২০১৯)

সাক্ষাৎকার

০৩.১২.২০১৭-৩১.১২.২০১৯ তারিখের মধ্যে উক্ত দলগুলির অভিনেতা, বাদ্যকার, তত্ত্বাবধায়ক, আহ্বায়ক, নায়েব, সহায়ক শিল্পীদের সাক্ষাৎকার (পরিশিষ্ট-১-এ দ্রষ্টব্য)

বৈদ্যুতিন মাধ্যমের গাজন পালা

https://www.youtube.com/watch?v=Wiofb4-TpsU

https://youtu.be/48t56LetukA?si=GMz_DpL2ECJbbPEw

https://youtu.be/tP3GdywUQSI?si=6d37NfAH2XyoO_gm

https://youtu.be/Exk1o7qIgf4?si=TjPndtsdF3ft5cWT

https://youtu.be/fiiAnijviik?si=I2xW7Vjyn1OKBoO4

https://youtu.be/ZGDpu9xI3PM?si=BQI5cCmhyIHjEHw3

https://youtu.be/93_5vL8u1Jg?si=rp9S0cRNd8BONPLl

https://youtu.be/8DAaeOslHss?si=qxK32_F2Sc9MvXNN

https://youtu.be/T-47FJ3Jhbs?si=7mu2EWWxojW041Aa

https://youtu.be/jhY79RTAifc?si=3OMnPLOOYQmO_40V

https://youtu.be/2-JmbRIZl1c?si=BZH1h1jNuJfH8mZV

https://youtu.be/8DAaeOslHss?si=U8jFyum0AhwoxbTH

https://youtu.be/TMH4ScYpKDo?si=RdzOZRS3tDlysMR4

https://youtu.be/W7w2Lu2xkfQ?si=nlDa4m6xrNVD5vZI

https://youtu.be/54QpQVdcZm8?si=Nm6B-dPMalCOyiBy

https://youtu.be/MJ_wg4kBCZ0?si=rYNr-iApjeBKdn2e

https://youtu.be/93_5vL8u1Jg?si=guVDqcKjov8zmQGd

https://youtu.be/0l7QKjd_jYA?si=mGVlgEAfdibGm4cr

https://youtu.be/Dp1-VbgSdi4?si=VjtEGe9fK7fK-zHF

https://youtu.be/RFsrdbl8TvU?si=VIpeOSznDsn_5T5a

https://youtu.be/0G3lLyA5mf0?si=8IXc0xOz44aRr2gP

https://youtu.be/QB4Watw44W4?si=5n8GDknyJ-2hJl6P

https://youtu.be/QB4Watw44W4?si=5-MPMFi7dCiT1zU5

https://youtu.be/hOu9eXWop5c?si=sBY6muE4qaMUHvA2

https://youtu.be/8cBHYplGhMU?si=tTFMTP1dnacJAl8R

https://youtu.be/xwk2lbMmWxA?si=FyLnWPm8BGf98_VH

https://youtu.be/Exk1o7qIgf4?si=fZGcNALf6Ygzlz2V

https://youtu.be/-Hj5BO_hZWA?si=MqHy-Fp7kx_pPA1H

https://youtu.be/ZGDpu9xI3PM?si=u-ZZOf1ZXOn08gAR

গবেষণা পত্র

হালদার, পীযূষ কান্তি।*চব্বিশ পরগনার গাজনপালা আঙ্গিক, বিষয় ও লোকশিক্ষা*। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, (এম.ফিল), তত্ত্বাবধায়কঃ ড. সুজিত কুমার মণ্ডল, ২০১৪।

গ্রন্থ

ছাটুই, তুহিনময়।*গাজন তলার গান*। কলকাতা: যুবদর্পণ পত্রিকা, ১৯৯৪।

নস্কর, দেবব্রত। *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালা গান ও লোক সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৯।

নস্কর, ধূর্জটি। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গাজন ও গাজনমেলা*। ডায়মণ্ডহারবার: আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদ গ্রাপস প্রিন্টিংস, প্রথম প্রকাশ ২৬ চৈত্র ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

সমাদ্দার, রণজিৎ কুমার। *চড়ক গাজন (প্রবন্ধ)*। কলকাতা: ভারতকথা, ১৯৮৬।

হালদার, বিমলেন্দু। *দক্ষিণ ২৪ পরগণা যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা (প্রথম খণ্ড)*। সোনারপুর: প্রিয়নাথ প্রকাশনী, ২০১১।

হালদার, বিশ্বজিৎ। *লোক-ঐতিহ্যের ধারায় দুই ২৪ পরগণার শিবসংস্কৃতি: চড়ক, ধর্মদেল, গাজন ও বালাগান*। কলকাতা: তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।

সহায়ক পাঠ

বাংলা গ্রন্থ

অধিকারী, ইন্দুভূষণ। *লোকধর্ম অতীত ও বর্তমান*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১০।

আহমেদ, আফসার। *গাজীর গান: শিল্পরীতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

আহমেদ, রাজিব (সম্পা.)। *সুন্দরবনের ইতিহাস: ১ম-২য় খণ্ড*। ঢাকা: গতিধারা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১২।

ইসলাম, মধু (সম্পা.)। *শিল্প-সাহিত্যে সুন্দরবন*। ঢাকা: সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার, প্রথম প্রকাশ: ২০০২।

ইসলাম, রফিকুল। *সুন্দরবনের সেই সব কথা*। ঢাকা: এলিট পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

ইসলাম, রবিউল। *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন*। ঢাকা: এলিট পাবলিশার্স, ২০০৮।

ইসলাম, শেখ রেজওয়ানুল। *সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন ও ঐতিহ্য*। ঢাকা: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ২০১৩।

ওয়াহাব, আব্দুল। *বাংলার লোকবাদ্য*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬।

কাঁড়ার, মানস ও চিরন্তন মুখোপাধ্যায়। *প্রশ্নোত্তরে সুন্দরবন*। হাওড়া: শতভিষা, ২০১৮।

কাঞ্জিলাল, তুষার। *আমার জীবন আমার সুন্দরবন*। শুধু সুন্দরবন চর্চা, ২০১৯।

কাঞ্জিলাল, তুষার। *সুন্দরবনের সাতকাহন*। কলকাতা: কৃতি, জানুয়ারি ২০১৯।

কামাল, শেখ মাসুম। *সুন্দরবনের খণ্ডচিত্র*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: ২০০৭।

কামিল্যা, ড. মিহির চৌধুরী। *রাঢ়ের পূর্বপুরুষ পূজা—গ্রামদেবী, লোকধর্ম, লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: ভোলানাথ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ২৮ মে ১৯৯১।

কুণ্ডু, সুরেশ। *আমি সুন্দরবন বলছি*। কলকাতা: ডি.পি.এম পাবলিশিং কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ: ২০১২।

কুণ্ডু, সুরেশ। *সুন্দরবন: অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ*। কলকাতা: নান্দনিক, ২০১৮।

গুড়িয়া, মহাদেব। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সমগ্র*। কলকাতা: পাণ্ডুলিপি, ২০১৩।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০২।

ঘোষ, সঞ্জয়। *সুন্দরবনের পূর্বপুরুষ পূজা*। কলকাতা: সুচেতনা, ২০১২।

ঘোষাল, শান্তিময়। *বাঙলা সাহিত্যে রাম ও ভারতকথা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৩।

চক্রবর্তী, তপন। *বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১।

চক্রবর্তী, তপন। *বাংলাদেশের বন ও বনানী*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০১৯।

চক্রবর্তী, তারাপদ। *পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় স্থাপত্য: মন্দির ও মসজিদ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮।

চক্রবর্তী, রঞ্জন ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী। *সুন্দরবনের অর্থনীতি,* জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ। কলকাতা: রিডার্স সার্ভিস, ২০০৭।

চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্য চন্দন (সম্পা.)। *জটার দেউল-এর ইতিবৃত্ত*। রায়দিঘি: জটার দেউল সংস্কৃতি সংঘ, ২০১২।

চট্টোপাধ্যায়, সাগর। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলার পুরাকীর্তি*। কলকাতা: প্রত্ন ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

চৌধুরী, আকিল। *সবুজে সংগ্রামে সুন্দরবন*। ঢাকা: অনন্যা, ২০১২।

চৌধুরী, কমল। *চব্বিশ পরগণা: উত্তর দক্ষিণ, সুন্দরবন*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০১৩।

চৌধুরী, কমল। *সুন্দরবন : উৎসে ফেরা* । কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০০৫।

চৌধুরী, মাহবুব উদ্দীন। *ছোটদের সুন্দরবন*। ঢাকা: উত্তরণ, ২০১২।

ছাঁটুই, তুহিনময়। *লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতি দর্পণে পীর-গাজী-বিবি*। কলকাতা: পত্রপুট, ১৯৯৮।

জব্বার, আবু জাফর। *একাত্তরের সুন্দরবন*। ঢাকা: অনুপ্রাণন প্রকাশন, ২০১৮।

জলিল, এ.এফ.এম আব্দুল। *সুন্দরবনের ইতিহাস*। ঢাকা: আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬।

জাকারিয়া, সাইমন। *বাংলাদেশের লোকনাটক: বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৮।

জানা, দেবপ্রসাদ (সম্পা.)। *শ্রীখণ্ড সুন্দরবন*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০০৪।

জানা, মণীন্দ্রনাথ। *সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: দিলীপ বুক হাউস, ১৯৮৪।

জানা, শুভেন্দু। *সাগরদ্বীপ: অতীত ও বর্তমান*। কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৯।

জানা, শুভেন্দু। *সাগরদ্বীপে প্রচলিত ভাষা*। কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী, ২০১৯।

দত্ত, কালিদাস। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত (১ ও ২ খণ্ড)*। বারুইপুর: সুন্দরবন সংগ্রহশালা, ১৯৮৯।

দত্ত, কালিদাস। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস ও উপাদান*। বারুইপুর: কালিদার দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা, ১৯৯১।

দত্ত, গুরুসদয়। *বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৮।

দত্ত, সৌমেন। *প্রেক্ষাপট সুন্দরবন*। কলকাতা: আজকাল, প্রথম প্রকাশ: ২০১০।

দাশ, ড. নির্মল। *লোকভাষা থেকে ভাষালোক*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১০।

দাশ, বিবেকানন্দ। *গঙ্গারিডি দেশ ও জাতি*। কলকাতা: নান্দনিক, ২০১৮।

দাশ, শচীন। *জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২য় সংস্করণ: ১৯৯৯।

দাশ, শচীন। *প্রবন্ধ সংকলন*। কলকাতা: সমকালের জিয়নকাঠি, ২০১৯।

দাস, গিরীন্দ্রনাথ। *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, দ্বিতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ১৯৯৮।

দাস, জয়দেব ও অমল নায়েক। *অজানা সুন্দরবন*। শিবগঞ্জ, বাসন্তী: চম্পা মহিলা সোসাইটি, ২০১৫।

দাস, ধ্রুব। *ভারতের লোকনাট্য*। কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১২।

দাস, মলয়। *সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ২০১১।

দে, অসিত কৃষ্ণ (সম্পা.)। *সুন্দরবন বিচিত্রা*। কলকাতা: সাহা বুক স্টল, ১৯৮৫।

দে, রথীন্দ্রনাথ। *সুন্দরবন*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১।

নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজ সংস্কৃতি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।

নস্কর, দেবব্রত। *সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭।

নস্কর, ধুর্জটি। *সুন্দরবনের লোকসাহিত্য ও বিচিত্র রচনা*। বারাসাত: প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৮।

নস্কর, ধুর্জটি। *সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ*। কলকাতা: শ্যামলী পাবলিশার্স, ১৯৯৭।

নস্কর, ধূর্জটি। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শৈব তীর্থ*। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ১৪০৭।

নস্কর, ধূর্জটি। *বাদাবনের বংশধর* । দক্ষিণ বরাশত, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: দেবলা প্রকাশনী, প্রথম মুদ্রণ ২৬ জানুয়ারি ২০১৬।

নস্কর, সনৎকুমার ও ছন্দা রায়। *সুন্দরবনের প্রান্তিকজীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ২য় খণ্ড। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

নাথ, সঞ্জীব। *বাংলার লোকনাট্য: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৩।

নাহা, দিলীপকুমার। *প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্যভাষা*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ: ২০০০।

পাল, অতুল। *নদীপথে সুন্দরবন*। ঢাকা: তৃপ্তি প্রকাশ কুঠি, ২০০২।

পুরকাইত, সনৎকুমার, উমাশঙ্কর মণ্ডল (সম্পাদিত)। *প্রসঙ্গ সুন্দরবন (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা: ভূগোল ও পরিবেশ, ২০১৯।

পোদ্দার, অরবিন্দ। *মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ*। কলকাতা: দেব উচ্চারণ, তৃতীয় মুদ্রণ: জুলাই ১৯৮১।

প্রামাণিক, শংকরকুমার। *সুন্দরবন: জল-জঙ্গল-জীবন*। কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮।

প্রামাণিক, শংকরকুমার। *সুন্দরবনের জল ও জঙ্গলজীবীদের বিধবা*। কলকাতা: বিবেকানন্দ বুকস্টোর, ২০২০।

প্রামাণিক, শংকরকুমার। *সুন্দরবনের মৌলেদের কথা*। কলকাতা: গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৮।

বর্মন, সন্তোষকুমার। *আদি সুন্দরবনের ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭।

বর্মন, সন্তোষকুমার। *সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা*। সোনারপুর: ম্যাট্রিক্স সাইবার প্ল্যানেট, ২০১০।

বসু, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ।*বাংলার লৌকিক দেবতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭।

বাতেন, মুহাম্মদ আবুল। *সুন্দরবনের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বনজীবী মানুষের কথা*। (ঢাকা: প্রকাশক: আফজল হোসেন, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৪।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০১০।

বিশ্বাস, শিশির। *সুন্দরবন বাঘ বাউলে*। কলকাতা: আলোকবর্ষ ও সুচেতনা, ২০১৭।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোকসংস্কৃতি* । নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট অফ ইন্ডিয়া, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ: ২০০৪।

মজুমদার, তুলিকা। *বাংলার বনদেবতা*। কলকাতা: করুণাময়ী পাবলিশার্স, ২০০৭।

মজুমদার, নীহার। *এবং বাংলার লৌকিক জলযান*। কলকাতা: আত্মজা, ২০১৭।

মজুমদার, মৌসম। *চেনা-অচেনা সুন্দরবন*। কলকাতা: তপতী পাবলিশার্স, ২০১৫।

মণ্ডল, অঞ্জলি বিকাশ। *সুন্দরবনের সেকাল-একাল*। পিয়ালী: রূপকথা প্রকাশন, ২০১১।

মণ্ডল, অনুকূল। *সুন্দরবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: দি সী বুক এজেন্সি, ২০১৪।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী, ড. অচিন্ত্যকুমার হালদার, ড. সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.)। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত সংস্কৃতি*। কলকাতা: ড. বি আর আম্বেদকর স্মৃতিরক্ষা সমিতি, ২০১১।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পুরাকথা*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০২।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ*। কলকাতা: নবচলন্তিকা, ১৯৯৭।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরাকথা*। বারুইপুর: প্রত্ন-ইতিহাস-সংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র, ২০০৩।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্তৃত অধ্যায়*। কলকাতা: নবচলন্তিকা, ১৯৯৯।

মণ্ডল, দেবজ্যোতি। *সুন্দরবন ও বাংলা সাহিত্য*। জয়নগর: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ২০১৬।

মণ্ডল, নিরঞ্জন। *সাগরদ্বীপের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: কগনিশ্ন পাবলিকেশন, ২০১৮।

মণ্ডল, প্রবীর। *আমার সুন্দরবন*। কলকাতা: রূপকথা, ২০১৬।

মণ্ডল, বরেন্দু। *সুন্দরবন ও আমাদের কথা*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৫।

মণ্ডল, শশাঙ্ক। *ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন*। কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯৯৫।

মণ্ডল, সত্যানন্দ। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার* লোকশিল্প। কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম.প্রা.,লি., ১৯৮৪।

মণ্ডল, সুজিতকুমার (সম্পা.)। *বনবিবির পালা*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০১০।

মণ্ডল, স্বপনকুমার। *সুন্দরবন: ভ্রমণ বৃত্তান্ত*। কলকাতা: কথা, ২০১১।

মান্না, অনির্বাণ। *লোকজ উপাদান: নব্বই ও পরবর্তী কবিতায়*। কলকাতা: এস এস প্রিন্টার্স, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৫।

মিত্র, অশোক। *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (৩য় খণ্ড)*। দিল্লি: গভ: অফ ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৯৯১।

মিত্র, শান্তনু ও সায়ন্তনী সাউ। *সুন্দরবনের জল কাদার প্রাণি*। কলকাতা: বই কারিগর, ২০১৮।

মিত্র, শিবশঙ্কর। *সুন্দরবন সমগ্র*। কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৫।

মিত্র, সনৎ কুমার। *পশ্চিমবঙ্গের লোকবাদ্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ: ২৩শে মার্চ ১৯৮৫।

মিত্র, সনৎ কুমার। *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ* । কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০০।

মিত্র, সনৎকুমার। *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০০।

মিত্র, সুরেশ চন্দ্র। *বাংলা নাটকের বিবর্তন*। কলকাতা: বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১০।

মিদ্যা, বিকাশকান্তি। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্থাননাম*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০১০।

মিস্ত্রী, সুভাষ। *লোকায়ত সুন্দরবন (১ম খণ্ড-৩য় খণ্ড)*। সোনারপুর: লোক প্রকাশন, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬।

মিস্ত্রী, সুভাষ। *লোকায়ত সুন্দরবন* । কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৪।

মুখোপাধ্যায়, অসীম। *চব্বিশ পরগনার মন্দির*। কলকাতা: আনন্দ ধারা প্রকাশনী, ১৩৭৭।

মুখোপাধ্যায়, পুরঞ্জয়। *প্রবাদ প্রবচন দক্ষিণ ২৪ পরগনা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১৬।

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ। *আঞ্চলিক—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ, ২০০৪।

মৈত্র, অলোক। *বাঙলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য ও সন্ধানে*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১২।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭।

রায়, প্রণবকুমার। *সুন্দরবনের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৪।

রায়চৌধুরী, বিশ্বজিৎ। *সুন্দরবন*। কলকাতা: নান্দনিক, ২০১৪।

লালন, আনোয়ার হোসেন। *ভালোবাসার সুন্দরবন*। ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন, ২০০৩।

লাহিড়ী, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ ও সঞ্জয় মৌলিক (সম্পা.)। *সুন্দরবন ও আইলা*। হুগলি: তেপান্তরের স্বপ্ন, ২০১৯।

লাহিড়ী, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ। *সুন্দরবন অনধিকার চর্চা*। কলকাতা: রংরুট, ২০১৬।

লিপি, মার্জিয়া। *বাংলাদেশের উপকূল পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য*। (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৮)

সরকার, কানাইলাল। *সুন্দরবনের ইতিহাস (অখণ্ড)*। কলকাতা: পাণ্ডুলিপি, ২০১৭।

সরকার, কানাইলাল। *সুন্দরবনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড-দ্বিতীয় খণ্ড)*। পিয়ালী: রূপকথা প্রকাশন, ২০১১।

সরকার, পবিত্র। *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ এপ্রিল ২০০৩।

সরকার, প্রণব। *বাংলার লোকসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ডি ডি এন্টার প্রাইস, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

সরকার, প্রণব। *বাংলার লোকসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ডি ডি এন্টারপ্রাইস, ২০১৩।

সরকার, প্রণব। *সুন্দরবনের আঞ্চলিক জীবন, বিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতি*। সোনারপুর: লোক প্রকাশন, ২০১০।

সরকার, সুকান্ত। *নদী-বাংলার কথা-কাহিনি*। কলকাতা: সৃজন পাবলিশার্স, ২০২০।

সামসুদ্দিন, শেখ। *অশনিগ্রাসে বৈচিত্র্যময় সুন্দরবন*। কলকাতা: উবুদশ, ২০১২।

সামসুদ্দিন, শেখ। *সুন্দরীর সংসার (দ্বিতীয় খণ্ড)*। জয়নগর: সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ২০১৬।

সাহা, বিকাশকান্তি। *সুন্দরবন কথা*। কলকাতা: দে পাবলিকেশনস্, ২০১৬।

সিং, সুকুমার। *দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ইতিহাস (একখণ্ডে)*। কলকাতা: মাস এন্টারটেনমেন্ট প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ: ২০১০।

সিংহ, অনিমেষ। *সুন্দরবন ও নদীকথা*। কলকাতা: একুশ শতক, ২০১৯।

সিংহ, মিতা। *বাঘ কুমির সুন্দরবন*। কলকাতা: নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১৬।

সিদ্দীকি, আ স. ম হেলাল। *এক পলকে সুন্দরবন*। ঢাকা: অঙ্গিকার প্রকাশনী, ২০১৩।

সেন, গৌর। *সুন্দরবনের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: বুলবুল প্রকাশন, ২০১৮।

সেনগুপ্ত, অভিজিৎ। *এ জীবন সুন্দর*। কলকাতা: ঋকাল বুক্‌স, ২০১৯।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ* । কলকাতা: পুস্তক বিপণি, চতুর্থ সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৮।

হাজরা, অমলেন্দু। *দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকথা ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৬

হাফিজ, আব্দুল। *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৫।

হালদার, নরোত্তম। *গঙ্গারিডি আলোচনা ও পর্যালোচনা*। কলকাতা: দে বুক স্টোরস, ১৯৯৮।

হালদার, পলাশ ও তুহিনময় ছাঁটুই। *দক্ষিণ ২৪ পরগণার লৌকিক দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলা*। কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০।

হালদার, বিমলেন্দু। *দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা (১ম খণ্ড)*। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারী ২০০১ মাঘ ১৪০৭।

হালদার, বিমলেন্দু। *দক্ষিণবঙ্গের জনসংস্কৃতির কথা ও ইতিহাস বিচিত্রা,* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০১।

হোসেন, মোঃ মোশাররফ। *সুন্দরবন: বৈচিত্র্যের অপর নাম*। ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৬।

ইংরেজি গ্রন্থ

Bandopadhyay, Alapan & Anup Matilal (Indited). *The Philosopher's Stone: Speeches and writings of Sir Daniel Hamilton*. Gosaba: Sir Daniel Hamilton Estate Trust, 2003.

Banerjee, Anuradha. *Population and Human Settlement of Sundarban Delta*, New Delhi: Concept Publishing, 1998.

Chatterjee, Sisir (Editor). *Community Awareness in Sundarban*. Kolkata: Abc Publication, 2012.

Chattopadhyay, Haraprasad. *The Mystery of the Sundarban*, Kolkata: A. Mukherjee & Co. Pvt. Lt, 1998.

Chowdhury, Tanmay. *The Sundarbans*, Kolkata: Charchapada, 2012.

Curtis, S. J.. *Working Plan for the Forests of the Sundarbans Division*. Kolkata: Bengal Gov.. Press, 1933.

Das, Gautam Kumar. *Sundarbans environment and ecosystem*, Kolkata: Sarat Book Distributors, 2006.

De, Rathindranath. *The Sundarbans*, London: Oxford University Press, 1990.

Dey, Satyendralal and Amal Kanti Bhattacharyya. *The Refugee Settlement in the Sundarbans*. Kolkata: W.B: Socio-economics Study, 2012.

Ghosh, Priyanka. *Impact of Biodiversity Conservation on rural livelihoods in and around the Sundarban tiger reserve (STR): A case study of struggles over access to forest-based resources*. New Delhi: Nehru memorial museum and library, 2013.

Guha, Chandan & Surabhi Bakshi. *Mangrove Swamps of the Sundarbans: An Ecological Perspective,* Kolkata: Naya Prakash, 1987.

Hunter, Sir William, Wilson ICS. *A Stastical Account of Bengal, Vol: I, Part: II, Sundarbans,* Kolkata: West Bengal Govt, Reprint, January, 1999.

Hunter, W.M.. *A Statistical Account of Bengal: Districts of South 24 Paraganas and Sundarbans*. Vol: I. London: D.K. Publishing House, 1st reprint, 1973, 1975.

Jalis, Annu. *Forest of Tigers: People Politics and Environment in the Sundarbans*. New York: Routledge, 2010.

Kutub Uddin, H.M.. *Impact of Natural Calamities, on Agriculture, Reclaimed Land of Sundarbans (Vol. I),* Kolkata: Abc Publication, 2013.

Majumdar, R.C., H.C. Chowdhury & K.K. Dutta. *Advanced History of Inida*. New Delhi: Mannual of the Geology of India, 1983.

Mondal, A.K.. *The Sundarban of India: A Development Analysis*. Kolkata: INDUS, 2003.

Mondal, A.K. & R.K. Ghosh. *Sunadarban: A Social Bio-Ecological Study* Kolkata: Book land, 1989.

Mondal, Asim Kr.. *Twilight And Dark-Life in a Sundarbans Village*. Kolkata: Mondal Prakshani, 2010.

Mukhopadhyay, Amites. *Living wirth Disasters: Communities and Development in the Indian Sundarban*. New Delhi: Cambridge University Press, 2016.

O'Donnell, Anna and Wondon Quentin (ED.). *Climate Change Adaptation and Social Resilience in the Sundarban*. New York: Routledge, 2015.

Pargiter, F. E.. *Revenue History of SUNDARBANS from 1765-1870*, Alipore: Govt of Inida, 1934.

Pramanik, S.K.. *Fisherman Community of Coastal Villages of West Bengal*. Jaipur: D.K. Publishers, 1993.

Raha, Atanu Kumar. *Indian Sundarban an overview*, Kolkata: SBR WW, WB, 2004.

Risley, H. H.. *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol. I & II, Calcutta: Govt of India, 1881.

S.P. Chaudhuri. *Renewable Energy in the Sundarbans*, (Kolkata: The Energy and Resource Institute (TERI), 2009)

Sarkar, Sutapa Chatterjee. *The Sundarbans: Folk Deities, Monsters and Mortals*. New York.: Routledge, 2017.

Sharma, Prashant Kumar. *The Impact of Climate Change on Sundarbans*, New Delhi: Adroit Publishers, 2018.

Sobhrajani, Manisha. *Forest of Tides: The Untold story of Sundarban*. London: Hachette, 2018.

Talukdar, J. & M. Ahmed (Eds). *The April Disaster: Study on Cyclone: Affected Region in Bangladesh*. Dhaka: Community Development Library, 1992.

পত্র-পত্রিকা

কপাট, সন্দীপকুমার। "শৌখিন যাত্রার আসর"। *গ্রামীণ পুঁথি*, শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ৪৩-৪৬

খাস্তগীর, আশিস। "ধ্বন্যাত্মক শব্দে বাংলার লোকজীবন"। *বলাকা*, ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ৩৫-৩৯

গঙ্গোপাধ্যায়, মদনমোহন। "লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে"। *পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (৭ম বর্ষ, অক্টোবর, ১৯৮৮): ১-৩

চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ। "হিন্দুনামের উৎস"। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা,* গঙ্গাসাগর সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭): ১৬-১৮

চক্রবর্তী, বরুণ কুমার। "লোকসংস্কৃতির চর্চা করব কেন?"। *বলাকা,* ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ৮-২৩

চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন। "ভালো যাত্রা নাটকের অভাব কেন" *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ৭-১১

ঝা, শক্তিনাথ। "গণনাট্যের সংস্কৃতি বনাম লোকসংস্কৃতি"। *গণনাট্য-* লোকসংস্কৃতি সংখ্য, ২য় সংখ্যা (৪১ বর্ষ, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৫): ৩১-৩৪

দত্ত, কালিদাস। "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীতঃ মৌর্য, সুঙ্গ ও কুষাণ যুগ"। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা,* ১৪তম সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি,১৯৯৬): ২-৮

দত্ত, শ্যামল। "প্রসেনিয়াম ও লোকনাট্য"। *পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (৭ম বর্ষ, অক্টোবর, ১৯৮৮): ৩৯-৪১

দত্ত, সরোজকুমার। "গঙ্গারিডি ইতিহাসে অনুসন্ধান"। *গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্রিক পত্রিকা,* গঙ্গারিডি সমাচার সংখ্যা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর,১৯৮৮): ২-৮

দাশ, পার্থসারথি। "মহারুদ্র সিদ্ধনাথ শিবঠাকুর জীউ"। *পুন্যিপুকুর,* চড়ক ও গাজন সংখ্যা, ১ম সংখ্যা (১লা বৈশাখ, ১৪১৯): ৩৫-৩৮

দাস, করুণাসিন্ধু। "সংস্কৃতিঃ ভাষিক শটিতে"। *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* সংখ্যা-২ (১৯ বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৬): ১৮৭-১৮৯

দাস, সত্যব্রত। "শ্যামপুরের যাত্রা ও যাত্রাশিল্পী"। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ৪৭-৫৫

দে, ব্রজেন্দ্রকুমার। "যাত্রাপালার পটপরবর্তন"। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ১২-১৫

দেওয়ানজি, মলয়। "সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে"। *পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (৭ম বর্ষ, অক্টোবর, ১৯৮৮): ২৫-৩৫

নস্কর, ধূর্জটি। “সুন্দরবনের স্থাননামঃ সাগর”। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা,* গ্রীষ্ম সংখ্যা (মে-জুন, ১৯৯৯): ৪৫-৫৭

নাথ, সৌমেন। “কলকাতায় ধর্মঠাকুরের মন্দির”। *কৌলাল* (৭ম বর্ষ, ডিসেম্বর, ২০১৭): ৬১-৬৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান। “লোক সাহিত্যে নৃতাত্ত্বিক উপাদানঃ অনুসন্ধানের উপক্রমণিকা”। *বলাকা,* ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ৪০-৪৬

বিদ্যাবিনোদ, ফণীভূষণ। “যাত্রার কথা”। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ৩-৬

বেরা, অঞ্জন। “লোকসংস্কৃতি মাধ্যম এবং গণমাধ্যম”। *লোকশ্রুতি,* ১ম সংখ্যা (পৌষ, ১৪১০): ১৯৮-২০৪

মণ্ডল, অনিমা। “সুন্দরবন আলেখ্য”। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা,* গ্রীষ্ম সংখ্যা (মে-জুন,১৯৯৯): ৪৩-৪৫

মান্না, অনির্বাণ। “লোকনাট্যঃ একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগকলা”। *বলাকা,* ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ১১৫-১২৫

মান্না, নিমাই। “লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ সমাজ”। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (২৩তম বর্ষ, অক্টোবর, ২০০৪): ৫৪-৫৮

রায়, অমল। “লোকসংস্কৃতি আক্রান্ত হচ্ছে গ্রামেই”। *পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (৭ম বর্ষ, অক্টোবর, ১৯৮৮): ১৯-২৪

রায়, পুষ্পজিৎ। “রাজ্যের লোকশিল্পীরা রুষ্ট ক্ষুব্ধ”। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (৩১তম বর্ষ, অক্টোবর, ২০১২): ১০৭-১০৯

রায়, বুদ্ধদেব। “গাজন উৎসব ও গান”। *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় পত্রিকা* (২য় বর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৮১): ৭৫-৮৩

সরকার, রেবতীমোহন। “সংস্কৃতিঃ মানব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে”। *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা,* সংখ্যা-২ (১৯ বর্ষ, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৬): ২১৩-২২৩

সাঁতরা, অম্লান। “যাত্রার সেকাল-একাল”। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (অক্টোবর, ২০১৪): ৬৮-৮৭

সেন, তপনকুমার। “অবহেলিত সঙের গান”। *গ্রামীণ পুঁথি,* শারদ সংখ্যা (১৫তম বর্ষ, ১৯৯৬): ৮-১৩

সেনগুপ্ত, পল্লব। "বাঙালির লোকসংস্কৃতির পূর্বসূত্র"। *লোকসংস্কৃতি সংবাদ*, ১ম সংখ্যা (১ম বর্ষ, ২০১০): ২০-২৪

হালদার, ইপ্সিতা। " গানগাওয়াটা আমার নিজস্ব প্রার্থনার মতো"। *আরশিনগর*, ৫ম সংখ্যা (জানুয়ারি, ২০১৫): ১২০-১২৬

হালদার, গৌতম। "সুন্দরবনঃ প্রকৃতি ও পরিবেশ"। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা*, ১৪তম সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬): ৮-১১

হালদার, গৌতম। "সুন্দরবনের কথা"। *গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা*, গঙ্গাসাগর সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭): ১৫-১৭

হালদার, নারায়ণ। "লোকভাষা কি এবং কেন?"। *বলাকা*, ৩৬ সংখ্যা (২৭ বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮): ৩০-৩৪

আন্তর্জাল সহায়ক-সূত্র

https://en.wikipedia.org/wiki/Pashupati_seal

https://www.himalayanart.org/items/65664

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=OKrkWsyuBYyMvQTXm7s g&q=goddess++janguli&oq=goddess++janguli&gs_l=psy-ab.12...97365.100875.0.102493.15.14.0.0.0.0.502.2351.0j1j4j2j0j1.8.0....0...1c.1.64.psy-ab.9.2.703...0j0i67k1.0.bMYKDteOHog.

https://www.google.co.in/search?q=goddess+ekjata&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO i-X7uN3aAhVDNI8KHC5lBwkQ_AUICygC&biw=1366&bih=662

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=xqnkWprSBYb4vATZ- paoCg&q=goddess++shashthi&oq goddess++shashthi&gs_l=pab.12..0.3930.10323.0.11871.20.17.0.2.2.0.4 02.2829.3j1j5j3j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..10.9.1279...0167k1j0i8i10i30k1j0i24k1.0.Fm06e56cfls

https://www.google.co.in/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=xKnkWqHJBcvdvgTH-qqlAg&q=goddess++parnashabari&oq=goddess++parnashabari&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.1100.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0...0.QPPFOhoG76Y